সাহিত্য-বিতান

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রণীত



বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

গ্রাম – কুলগাছিয়া ; পোঃ – মহিষরেখা

জেলা – হাওড়া।

প্রকাশক : শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি এম. এ., বি. এল.
গ্রাম — কুলগাছিয়া ; পোঃ — মহিষরেখা
জেলা — হাওড়া ; বি. এন. আর.

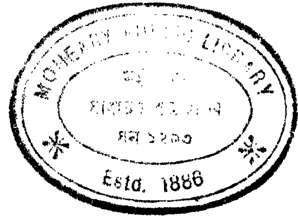
প্রথম সংস্করণ — আশ্বিন ১৩৪৯
মূল্য আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু বি. এ
কে পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা—৬

সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিক

স্বর্গত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণে



সূচী

মুখবন্ধ

যে প্রবন্ধগুলিকে গ্রন্থাকারে একত্র করিয়া 'সাহিত্য-বিতান' নাম দিয়াছি, তাহাদের পরিচয় ঐ নামটির মধ্যেই আছে, সাহিত্যের 'মণ্ডপ' বা 'আসর' বলিতে যাহা বুঝায় এই গ্রন্থে তাহারই ভাব রক্ষা করিয়াছি। পাঠকগণ ইহাতে সাহিত্যবিষয়ক, বিশেষতঃ বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে, নানাবিধ আলোচনা—বৈঠকী আলাপও পাইবেন। ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-কথা'-নামক গ্রন্থে আমি মুখ্যতঃ সাহিত্যের তত্ত্বঘটিত আলোচনা করিয়াছিলাম—সেখানে বিশেষ অপেক্ষা নির্ব্বিশেষের দিকেই দৃষ্টি ছিল; এই গ্রন্থে আমি—সাহিত্যের শুধুই তত্ত্ব নয়—নানাবিধ সৃষ্টিকর্ম্মের সাক্ষাৎ রস-সন্ধান, এবং কবি ও সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয়ও করিয়াছি। ইংরাজীতে এইরূপ বহু প্রবন্ধ-পুস্তক আছে—Appreciations, Discoveries, Countries of the Mind প্রভৃতির নাম অনেকে স্মরণ করিবেন এই হিসাবে 'সাহিত্য-বিতান'কে 'সাহিত্য-কথা'রই উত্তরভাগ বলা যাইতে পারে। সেই যোগ রক্ষা হইয়াছে ইহার প্রথম প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধে আমি সাহিত্য-বিচারের মূলতত্ত্ব আর একবার সংক্ষেপে ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার উদ্যম করিয়াছি—ইহাই পরবর্ত্তী আলাপ-আলোচনার মানদণ্ড।

এই প্রথম প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বলিবার আছে। আধুনিক কালে, য়ুরোপীয় মনীষীসমাজে—অপর সকল বিদ্যার মত, এই সাহিত্য-বিদ্যাও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে; সাহিত্য-সমালোচনা একটি বড় জিজ্ঞাসার বিষয় হইয়াছে। আমাদের দেশেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা যখন জাতীয়-জীবনের মতই শক্তি ও স্বাস্থ্যযুক্ত ছিল, তখন এই বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল—সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সুদীর্ঘ ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু প্রাচীনের দৃষ্টি ও আধুনিকের দৃষ্টিতে প্রভেদ আছে, ও তাহা অবশ্যম্ভাবী; এজন্য ইংরাজীতে যাহাকে—'Modern Study of Literature' বলা হয় তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ জীবনের আর সকল ব্যাপারের মত সাহিত্যের সৃষ্টি ও তাহার রসাস্বাদেও

নূতনতর আদর্শ ও নূতনতর রুচির উদ্ভব হইয়াছে—মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই কারণেই, সেই এক প্রাকৃতিক শোভা ও এক মনুষ্য-সমাজ যেমন আজিকার কবি-শিল্পীর প্রাণ-মনকে ভিন্নভাবে স্পর্শ করে, তেমনই কাব্যেরও রসাস্বাদনে অভিনব পিপাসা ও অভিনব বোধ-বৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে, সেজন্য সেই পুরাতন প্রণালীতে কাব্য-বিচার আর যথোপযুক্ত হইতেছে না। আমাদের দেশে এই নূতন বা আধুনিক বিচার-পদ্ধতি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; অথচ, আধুনিক কবি-প্রবৃত্তি বলিতে যাহা বুঝায়, যুগধর্ম্মের বশে ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে, তাহা এক্ষণে প্রায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা রক্ষণশীল তাঁহারা, 'চিত্রকলা'য় 'ইণ্ডিয়ান আর্টে'র মত, কাব্যকলাতেও সেই প্রাচীন আদর্শ রক্ষা করিতে না পারিলেও—কাব্য-সমালোচনায় ভারতীয় রস-সংস্কার ও তদনুযায়ী বিচার-পদ্ধতির পক্ষপাতী। এই অসঙ্গতির ফলেই আমাদের দেশে সাহিত্য-সমালোচনার কোন আদর্শ বা পদ্ধতি এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। এক্ষণে এমন একটি তত্ত্বকে ও এমন একটি আদর্শকে দৃঢ়রূপে স্থাপনা করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে সর্ব্বকালের সকল কাব্য ও সর্ব্ববিধ কবি-মানসকে একই প্রমাণে প্রমাণিত করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশের দুই একজন আধুনিক কাব্য-সমালোচক এরূপ নূতন মাপকাঠির আবশ্যকতা স্বীকার করেন না—সেই প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সংশয়মাত্র নাই; অথচ, সেই বিচার মুখ্যতঃ রস-বিচার—কাব্যের রূপ-বিচার নয়। এখানে এ বিষয়ে আর কিছু বলিব না, যথাস্থানে আমি সে আলোচনা করিয়াছি। য়ুরোপীয় কাব্যবিচারে এই রূপের তত্ত্ব বড় হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষের সেই যে রূপ-ভঙ্গি তাহাই আধুনিক সাহিত্যবিচারের 'ষ্টাইল-তত্ত্ব'। আমি এ বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি একটি নূতন তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার দুঃসাহস করিয়াছি; আমি খাঁটি আর্ট ও খাঁটি কাব্যসৃষ্টির মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি—এ দুঃসাহস এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। তত্ত্বহিসাবে ইহাতে যে দোষই থাকুক—আমার বিশ্বাস, নিছক আর্টকর্ম্মকে কবিকর্ম্ম হইতে পৃথক না রাখিলে কাব্যবিচার সমস্যাজটিল হইয়া পড়ে; যে রূপ-কর্ম্মকে আমরা বাণী-রচনা বলি, এবং যাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলিতে জীবন ও জগতের বিশিষ্ট রূপকেই রসোজ্জ্বল হইতে দেখি—তাহার মূল্য ও কাব্যের সেই বিশেষ অধিকারটিকে অগ্রাহ্য করিতে হয়। এ সম্বন্ধে এখানে ইহার অধিক বলিবার

প্রয়োজন নাই, আমি কেবল এই প্রথম প্রবন্ধের প্রতি সকল সাহিত্যজ্ঞানী পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

'সাহিত্যের আসর' নামক প্রবন্ধটিতে সাহিত্য-বিচারের কয়েকটি মূলতত্ত্ব একটু সরল ও সহজ ভঙ্গিতে আর একদিক দিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি; অতএব এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রবন্ধের সহিত পড়িতে বলি। বাকি প্রবন্ধগুলিতে আমি অধিকাংশস্থলে তত্ত্ব-বিচার নয়—রস-নির্ণয় করিয়াছি; ইহাই এ গ্রন্থের মুখ্য অভিপ্রায়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সর্ব্বশেষে, এই 'সাহিত্য-বিতান' সম্বন্ধে আমার একটা কৈফিয়ৎও আছে। ইহার কয়েকটি প্রবন্ধে যে ধরণের আলোচনা আছে—তাহা সাহিত্যের আসরে সমবেত শ্রোতৃবর্গের তাদৃশ শ্রুতিরোচক হইবে না, বরং কিঞ্চিৎ কটু বলিয়াই মনে হইতে পারে। তথাপি, আমি এইরূপ বিপরীত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি এইজন্য যে, রসের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বিরূপের পরিচয়ও প্রয়োজন—বরং যে বস্তুকে সহজে যুক্তি বা বাক্যার্থের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না—তাহাকে নেতি-মুখে প্রমাণ করার যে রীতি আছে তাহা নিন্দনীয় নয়। আমি কোন্ প্রবন্ধগুলির কথা বলিতেছি তাহা এই গ্রন্থপাঠকালে সকলেই বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু পাঠকালে তাঁহারা যেন ইহাও লক্ষ্য করেন যে, সেগুলিতে আমি ব্যক্তিকে আক্রমণ করি নাই—তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রবৃত্তি বা রুচিরই দোষ-দর্শন করিয়াছি। এ দোষ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হইয়াছে—তাহাতে প্রমাণ হয়, যুগ-প্রভাব হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণুরও নিস্তার নাই। এইজন্য সাহিত্যের রস-সন্ধান এ গ্রন্থের মুখ্য অভিপ্রায় হইলেও, আমি ইহাতে এ যুগের বাংলাসাহিত্যের দুরবস্থা ও তাহার কারণ আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি; এবং জাতির সহিত জাতীয়-সাহিত্য ও জাতির ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধেও কয়েকটি আলোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি; 'সাহিত্য-বিতান' বা সাহিত্যের আসরে সাহিত্যবিষয়ক কোন আলাপই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

এই দারুণ দুর্দ্দিনে এ ধরণের পুস্তক প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়' যে সাত্বিক শ্রদ্ধা ও সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাংলাসাহিত্যের পক্ষে আশাপ্রদ। সাহিত্যের ব্যবসায়ী যাঁহারা তাঁহাদের নিকটে ইহা সৎ-সাহস নয়—দুঃসাহস; বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় ত দূরের কথা—অন্য সময়েও গল্প-

উপন্যাস এবং স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছুতে মূলধন নিয়োগ করা আমাদের দেশের পুস্তকব্যবসায়িগণের কার্য্য নহে। সাহিত্যের প্রকাশ বা প্রচার নয়—পুস্তক-বিক্রয়ই যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ গ্রন্থপ্রকাশের আগ্রহ না হওয়াই সম্ভব। সাহিত্যের সেবা ও ব্যবসায় সম্বন্ধে এই গ্রন্থেরই একস্থানে আমি যাহা লিখিয়াছি—'বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়ে'র এই উদ্যম যদি তাহারই সূচনা হয়, তবে আশা করি, বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে এই 'গ্রন্থালয়' সাহিত্যের ব্যবসায়কে সৎ-সাহিত্যের প্রচারমূলক সেবার সহিত যুক্ত করিয়া বাংলাসাহিত্যের একটা বড় কল্যাণ সাধন করিবেন—জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

'বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়ে'র সেই ব্রতধারী তরুণ ব্যবসায়ীকে আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

নীলক্ষেত, রমনা,

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'সাহিত্য-বিতানে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে প্রায় চারি বৎসর বিলম্ব হইয়াছে; প্রথম সংস্করণ ১৩৪৯ সালে মুদ্রিত হয়, এবং দুই বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। কাগজ প্রভৃতি সংগ্রহ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রকাশকের নানা অসুবিধাই ইহার কারণ; কিন্তু এই বিলম্ব গ্রন্থকারের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধাজনক হইয়াছে, তাহাই বলিবার জন্য এই ভূমিকার অবতারণা।

প্রথমতঃ, এই সংস্করণকে প্রায় নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে, কারণ, এবার বইখানিকে একটা নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় অনুসারে পুনঃ-সংকলিত করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এই গ্রন্থকে আমার 'সাহিত্য-কথা'-নামক গ্রন্থের উত্তরখণ্ড বলা হইয়াছিল, তার কারণ, তাহাতে মুখ্যতঃ সাহিত্যসমালোচনাই ছিল, এবং সেই প্রসঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকের রচনাকে যেন উপলক্ষ্য করা হইয়াছিল। এবারও কতকটা সেইরূপ বলা যাইতে পারে বটে, তথাপি, এবার ঐ কবি ও সাহিত্যিকগণকে উপলক্ষ্যের পরিবর্ত্তে লক্ষ্যস্থানীয় করা হইয়াছে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ধারা যে পর্য্যন্ত আসিয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, সেই শেষের দিকের কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের বিস্তারিত সাহিত্যিক পরিচয় প্রায় কালক্রমিক ভাবে ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, এজন্য এই গ্রন্থকে একাধারে 'সাহিত্য-কথা' ও 'আধুনিক বাংলাসাহিত্যে'র পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে, প্রথম সংস্করণের কয়েকটি প্রবন্ধ যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তেমনই অন্যত্র হইতে দুই একটি তুলিয়া আনিয়া এইখানে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ—দ্বিতীয় সংস্করণ-প্রকাশে বিলম্ব না হইলে এগুলিকে পাওয়া যাইত না।

আরও একটা কৈফিয়ৎ আছে। যেহেতু এই পুস্তকের অধিকাংশভাগের বিষয় হইয়াছে জীবিত লেখকগণের সাহিত্যিক-প্রতিভা ও সাহিত্য-কীর্ত্তি, এবং যেহেতু তাহার যে আলোচনা কোথাও মুখ্যতঃ, কোথাও প্রাসঙ্গিকভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে কালের ব্যবধান আছে, অতএব, কোন কোন স্থলে লেখকবিশেষের

রচনার লক্ষণ-বিচারে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে ; ইহার কারণ, ঐ সকল লেখকের শক্তির বিকাশ ঐ কালের মধ্যেই হইয়াছে, এজন্য তাঁহাদের রচনা-গুণও যেমন, আমার সমালোচনাও তেমনই পরিবর্ত্তনশীল হইয়াছে। তথাপি আমি সেই পূর্ব্বের আলোচনা প্রত্যাহার করি নাই, তার কারণ, সেখানে লেখকের প্রসঙ্গ অপেক্ষা সাহিত্যের সমালোচনাই মুখ্য মনে করিতে হইবে। কেবল একটি প্রবন্ধে ('বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য') একজন লেখক সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব ধারণা (প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য) অনেকাংশে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি, ঐ প্রবন্ধেই তাহার পৃথক কৈফিয়ৎ আছে। এইরূপ সংশোধনের যে সুযোগলাভ তাহাও ঐ বিলম্বের জন্যই ঘটিয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ।

বড়িশা, ২৪পরগণা,
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৫৬।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সাহিত্য-বিচার

১

যাহারা সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁহাদের কাজ ঐ সৃষ্টিকার্য্যেই সমাপ্ত হয়, প্রতিভার কোন জবাবদিহি নাই। সকল সৃষ্টির আদিস্রষ্টা—ভগবানেরও—সৃষ্টিই একমাত্র সাক্ষ্য, তাহার অতিরিক্ত কিছু তিনিও বলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু সেই সৃষ্টির অর্থ, মানুষকে আপনার জ্ঞানে বুঝিয়া লইতে হয়। কবি ও ঋষি, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক, কতরূপে তাহার কত ব্যাখ্যাই করিতেছেন; কিন্তু এই সকলের মধ্যে কবিই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার, কারণ তিনি সৃষ্টির ব্যাখ্যা আর এক সৃষ্টির দ্বারাই করেন—ভাগবতী প্রেরণাকে অনুসরণ করিয়া সেই সৃষ্টির রসরূপ আমাদের চিত্তগোচর করেন। অতএব কবি ভগবানের পরেই দ্বিতীয় স্রষ্টা। তাঁহার সৃষ্টিরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তাহারই নাম সাহিত্যসমালোচনা; কারণ, যাহাকে সমালোচনা বলা হয়, তাহা আসলে ব্যাখ্যা মাত্র, কবির সৃষ্টিকে ভাল করিয়া আমাদের চিত্তে ধরাইয়া দেওয়াই তাহার অভিপ্রায়। আমি এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে নানা প্রসঙ্গে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহাই একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ আকারে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব; সাহিত্য-বিচারের কয়েকটি মূল তত্ত্ব যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট ও সুনিরূপিত করাই আমার অভিপ্রায়।

প্রথমেই, সাহিত্য কি—অন্তত আমার আলোচনার বিষয়ীভূত যে সাহিত্য, তাহার একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। যদি বলা যায়, মানুষ তাহার ভাষায় যাহা কিছু রচনা করে তাহাই সাহিত্য, তবে সাহিত্য-বস্তুটির কোন বিশেষ ধারণাই হইল না; কারণ, ভাষা মানেই সাহিত্যের ভাষা নয়, এবং রচনা-

শব্দটিও অতি ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব এই সংজ্ঞাই মানিয়া লইতে হইলে, ভাষা ও রচনা—এই দুইটি শব্দের উপরে জোর দিতে হইবে। রচনা মুখে-মুখেও করা যায়, কিন্তু সাহিত্যের ভাষা যেমন কণ্ঠনিঃসৃত বাক্যাবলীই নয়, তেমনই, তাহার রচনাও কথোপকথন মাত্র—এমন কি, বক্তৃতাও নয়। যে রচনায় কেবল মস্তিষ্কজাত বিদ্যার অনুশীলন বা বুদ্ধিপ্রণোদিত তত্ত্বের বিচারণা আছে, যাহাতে সৃষ্টির বস্তুঘটিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আছে, তাহা খাঁটি সাহিত্য বা কাব্য-সৃষ্টি নহে; তাহা জিজ্ঞাসা, মীমাংসা ও আলোচনা মাত্র। সাহিত্যের রচনা বলিতে একরূপ সৃষ্টিই বুঝায়; বাক্য যদিও এইরূপ সৃষ্টির উপাদান, তথাপি এখানে তাহা কিছুকে নির্দ্দেশ বা জ্ঞাপন করে না; একটা রূপকে প্রকাশ করে—মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। ভাস্কর ও চিত্রকর ভিন্ন উপাদানে যেমন একটা কিছু গড়িয়া তোলে—আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করে, সাহিত্যস্রষ্টা কবিও তেমনই এক আশ্চর্য্য উপায়ে, বাক্যেরই সাহায্যে, একটা কিছুকে আমাদের অন্তশ্চক্ষুর গোচর করেন, বাহিরের রূপকে অন্তরে রূপময় করিয়া তোলেন। এই যে বাঙ্ময়ী রচনা—ইহা কোন তথ্য, ভাব বা চিন্তার ব্যাখ্যা, বিবৃতি বা নির্দ্দেশ নয়; ইহাতে বক্তৃতা নাই, তর্ক নাই, যুক্তিপ্রয়োগ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অনির্ব্বচনীয় কোন অনুভূতির আধারও নহে। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে যাহাকে রস বলে, সেই 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' একটি চেতনার উদ্রেকই ইহার সার-মর্ম্ম নয়; একটা অতিশয় অপার্থিব, অতীন্দ্রিয় নিরুপাধি কিছুর ইঙ্গিত বা উদ্বোধন সাহিত্যের অভিপ্রায় নয়। ভগবানের সৃষ্টি এই বিশ্ব যেমন বস্তুতেই প্রকাশমান, ভাব যেমন সর্ব্বত্র রূপ পাইয়াছে, এবং এই রূপকেই আমরা সৃষ্টি বলিয়া থাকি, তেমনই সাহিত্যের সৃষ্টিও রূপময়; বাক্যে এই রূপ দেওয়াকেই আমরা রচনা বলিব। বাক্যে রচিত আর যাহা কিছু—তাহাতে রূপ নাই, কেবল কথা আছে, এবং কথারও অর্থ আছে; সেখানে সকলই পরোক্ষ—চিন্তার ব্যবধান থাকায় কিছুই রূপে প্রকাশ পায় না। অতএব সাহিত্য বলিতে যদি কেবল ভাষাগত রচনা বুঝিতে হয়, তবে রচনা-কথাটির এই বিশেষ অর্থ করিতে হইবে। আমি এখানে সাহিত্য অর্থে সেই রচনার কথাই বলিতেছি।

কথাটা আর একবার বুঝিয়া লওয়া যাক—সেই সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কে ভাষা কি বস্তু, তাহার ধারণাও স্পষ্ট করিয়া লই। ভগবানের সৃষ্টি—যেমন,

কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য—কথা বলে না, রূপে প্রকাশ হয় মাত্র; তাহার ভাষা সেই রূপই; যাঁহার দৃষ্টিশক্তি আছে তিনি সেই রূপকেই দেখেন, আর কিছুর প্রয়োজন হয় না,—আমাদের চিত্তে প্রকাশ হইতে পারাই তাহার সার্থকতা। সাহিত্যও এই প্রকার রূপ-সৃষ্টি; ওখানে যেমন রঙ, রেখা ও আকার প্রভৃতির সাহায্যে একটা কিছু প্রকাশ পাইয়া থাকে, এখানেও তেমনই বাক্যই সেই রূপসৃষ্টির নিদান; বাক্য কিছু বলে না, সেই রূপকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করে। অতএব, বাক্য এখানে একটা অসাধারণ কার্য্য করিয়া থাকে; ভাব ও অর্থের নির্দ্দেশই যাহার উৎপত্তির মূলে—ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও সংবাদ-জ্ঞাপনই যাহার সাধারণ কর্ম্ম, তাহার দ্বারা বস্তুকে একেবারে সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর করাইতে হয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই সাহিত্যসৃষ্টিতে ভাষার এই প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যাইবে। সভামধ্যে সহসা কোনও মহিমময় পুরুষমূর্ত্তির আবির্ভাব আমাদের দৃষ্টিগোচর করাইবার জন্য কবি লিখিলেন—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"; ইহাতে প্রত্যক্ষ-দর্শনের ফল হইল। অবশ্য ঐরূপ পর্ব্বতচূড়া-দর্শনের ঘটনা যাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে, অথবা যিনি কল্পনায় সেই অবস্থা অনুভব করিতে পারেন, তিনিই এই ভাষাকে দৃশ্যরূপে উপলব্ধি করিবেন। এ ভাষা বিবরণ বা বিজ্ঞাপনমূলক নয়, ইহা প্রদর্শনমূলক। এখানে একটি উপমায় যাহা সাধিত হইয়াছে, তাহাই নানা স্থানে, নানা উপায়ে সাধিত হয়; এবং বাক্যের কি বিচিত্র ও অসীম শক্তি, কবিদিগের ভাষায় তাহার অফুরন্ত নিদর্শন আমরা পাইয়া থাকি।

অতএব এই যে ভাষার সাহায্যে রূপসৃষ্টি—এই তত্ত্ব সাহিত্যপরিচয়ের একটা বড় তত্ত্ব। বাংলা 'রূপ' কথাটির প্রচলিত অর্থ যাহা, তাহা হইতে এই অর্থ যে ভিন্ন, তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত, ভাবের যাহা বিপরীত তাহাই রূপ; ভাব একটা মানস-বস্তু বা মানস-ক্রিয়ার ফল; একটা আইডিয়া, ধারণা বা চিন্তাকেও ভাব বলিব; ইহা মনেই উৎপন্ন হইয়া বাহিরের জগতে আরোপিত,—অথবা বাহিরের জগতের সংস্পর্শে মনের মধ্যে উদ্রিক্ত হয়; ইহার কোন্ রূপ নাই। আর একজাতীয় ভাব আছে, তাহা মানুষের আর এক প্রকার অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তির ফল; সে একটি পৃথক প্রবৃত্তি, তাহাকে রস-প্রবৃত্তি বা আনন্দ-পিপাসা বলা যাইতে পারে। ইহাও দুইমুখী—অন্তর্মুখী, বা নিছক ভাবমার্গী; এবং

বহির্মুখী, বা জগৎ ও জীবনের বস্তুগত অস্তিত্বের আশ্রয়কামী। এই শেষোক্ত প্রবৃত্তি কখনও abstract বা সম্পূর্ণ মনোগত বিষয়ে আসক্ত হইতে পারে না, ইহা নিরন্তর বস্তু-রূপের কামনা করে। এই প্রবৃত্তির বশেই মানুষের চিত্তে সৃষ্টি-প্রেরণা জাগে, বাহিরের সৃষ্টিকে—বিধাতার বস্তুময়, ঘটনাময়, দৃশ্যময় রচনাকে—তাহারই স্বকীয় ছন্দ, রঙ ও রেখায়, একটা অপূর্ব্ব অর্থসমন্বিতরূপে আবিষ্কার করে। এই যে আবিষ্কার, ইহাই গভীরতর অর্থে রূপসৃষ্টি; এখানে রূপকথাটির অর্থ আরও সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল। (কবি-বিধাতার হস্তলিপি-রচিত যে কাব্য প্রত্যক্ষ দৃশ্যরূপে সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, তাহারই অক্ষরে অক্ষরে দাগা বুলাইয়া, তাহার অন্তর্নিহিত ভাবকে—ভাবনা করিয়া নয়, মনুষ্যচেতনার অধিগম্য তাহার যে রূপ, তাহাই দৃষ্টিগোচর করিয়া—বাক্যের পটবস্ত্রে তাহাকে দৃশ্যরূপে স্থাপন করাই উৎকৃষ্ট কবিকীর্ত্তি; তাহাকেই আমি খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়াছি।) এই প্রসঙ্গে, ভাব ও রূপের পার্থক্য-বিচারে, আমি উপরে অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তির যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা মনে রাখিতে হইবে; ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মনোবৃত্তি ও রস-প্রবৃত্তি দুইটি স্বতন্ত্র বৃত্তি হইলেও, সাহিত্যসৃষ্টিতে এই দুই বৃত্তির মিশ্রণ বা বৃত্তিসঙ্কর এমনভাবে হইয়া থাকে—অনেক সময়ে তাহা এত গূঢ় ও প্রচ্ছন্ন থাকে যে, সাহিত্যবিচারে ভ্রম-প্রমাদ প্রায়ই অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তথাপি আশা করি, সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইবে না।

২

এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছি, তাহার পর, খাঁটি সাহিত্যরচনা কি, সে বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট ধারণা করিবার সুবিধা হইবে। পূর্ব্বে আমি এক স্থানে বলিয়াছি, সাহিত্যসৃষ্টি চিত্র বা ভাস্কর্য্যের মতই একটা রচনাকার্য্য। গদ্যেই হউক আর পদ্যেই হউক, এইরূপ রচনাকে সাধারণভাবে কাব্য বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা—সকল সৃষ্টিধর্ম্মী রচনাকেই কাব্যজাতীয় সাহিত্য বলিতে হইবে। যেহেতু এ সকলই এক অর্থে রূপ-সৃষ্টি, অতএব ইহাও অন্যান্য শিল্পকলার মত একটা শিল্পকর্ম্ম বলিয়াই সহসা মনে হইবে। কিন্তু খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির লক্ষণ বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইহা ঠিক আর্ট বা কলাকীর্ত্তি নহে; তাহা হইতে ভিন্ন, অথবা শ্রেষ্ঠ। সঙ্গীতও একটি কলা, সুর-রচনায়

সাহায্যে ভাবোদ্রেক করাই তাহার অভিপ্রায়; কিন্তু সে ভাব যতই গভীর বা মর্ম্মান্তস্পর্শী, কিংবা চিদ্‌ঘন আনন্দের উদ্রেককারী হউক, তাহা রূপাশ্রয়ী নয়; জগৎ ও জীবনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তাহাতে নাই। চিত্র ও ভাস্কর্য্যও দুই বিভিন্ন কলা; ইহাদেরও আদি-আদর্শ সঙ্গীত; অর্থাৎ ইহারা বস্তুর রূপ বা রঙ-রেখা ও আকার প্রভৃতির সাহায্যে অভিব্যক্ত হইলেও, রূপ-কে রূপকে পৌঁছাইতে না পারিলে—বিশেষের সাহায্যে নির্ব্বিশেষের ব্যঞ্জনা, সকল উপাদানের সাহায্যে একটা সঙ্গীত-সঙ্গতির রসাবেশ উদ্রেক করিতে না পারিলে—তাহা উচ্চাঙ্গের কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টিতে এইরূপ ভাবাবস্থামাত্র উদ্রেক করিবার নৈপুণ্য থাকিলেই চলিবে না, তাহাতে জীবন ও জগৎঘটিত একটা সাক্ষাৎ উপলব্ধি—ভাবে নয়, রূপসমন্বিত হইয়া বিদ্যমান থাকা চাই; অর্থাৎ, জীবন ও জগতের একটা সাক্ষাৎ পরিচয় সেই ভাবাবস্থাতেও আমাদের চৈতন্যগোচর হওয়া চাই। ইহাতে আর্টের নৈপুণ্য যতই থাকুক, বাস্তবসৃষ্টির রহস্যবোধ—প্রত্যক্ষ প্রকাশমান রূপেরই একটা নিবিড় চেতনা—যদি লুপ্ত হয়, তবে তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য-পদবাচ্য নয়। যে-রচনায় ভাব বহির্মুখী না হইয়া একেবারে অন্তর্মুখী হইতে চায়, যাহাতে জীবন ও জগৎ কোন এক দিক দিয়া খণ্ড-ভাবে একটা বিচিত্র অন্তর-অনুভূতির symbol বা প্রতীক হইয়াছে দেখা যায়, তাহা আর্ট মাত্র—বা ছোট আর্ট; সাহিত্য যে আর্ট, তাহা আরও উচ্চ, আরও বড়। সেই সকল অপর আর্ট আত্মসর্ব্বস্ব; তাহা ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধ্যান-কল্পনাকে প্রকাশ করে, সার্ব্বজনীন চেতনা, বা জীবনের বস্তুগত সমগ্ররূপ তাহার লক্ষ্য নয়। যাহা আর্ট মাত্র, তাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে একটা মানস-সুষমা দান করে; বস্তু বা ইন্দ্রিয়ার্থের সম্পর্কশূন্য হওয়ায় তাহা আর সৃষ্টি-রহস্যে অনুপ্রাণিত হয় না; সাক্ষাৎ দেহ-চেতনা হইতে মুক্ত হয় বলিয়াই তাহা সৃষ্টিকে অস্বীকার করে। একটা ছবি, একটা প্রস্তরমূর্ত্তি, একটা শাল বা কার্পেটের নক্সা—এমন কি, একটা সুরসমষ্টির ঐক্যতান এই জন্যই আর্ট বা শিল্পরচনা হিসাবে সার্থক হয় যে, তাহাতে জীবনের কোন ব্যাখ্যা বা রূপ-প্রদর্শন নাই; বরং জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়া 'রস' নামক একটি বস্তুর সাধনাই তাহার লক্ষ্য। কিন্তু সাহিত্য এইরূপ আর্টসাধনা নয়, তাহা খাঁটি সৃষ্টিকর্ম্ম। এই সৃষ্টিকার্য্যের বিষয় ও প্রেরণা কি, এক্ষণে তাহাই বলিব।

এ পর্য্যন্ত ইহাই বলিয়াছি যে, সাহিত্য-রচনার উপাদান যেমন ভাষা—সাহিত্য বাঙ্ময় বিগ্রহ, তেমনই, সেই বিগ্রহ জীবনেরই একটি সুপ্রকাশিত রূপ। এখন এই জীবন কথাটিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে—সাহিত্যের সম্পর্কে ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। সমস্ত বহির্জগতের পরিবেশ—সেই পরিবেশের যতখানি মানুষের চেতনায় বিরাজ করে তাহারই আশ্রয়ে, এবং মানুষের দেহ-মন-প্রাণের সহিত অখণ্ডনীয় নিয়তিসূত্রে সংযুক্ত হইয়া, পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতির পরিবেষ্টনীতে মানুষকে প্রধান নায়ক করিয়া, যে বিরাট নাট্যলীলার অভিনয় হইতেছে, তাহাই জীবন—তাহাই সাহিত্যের বিষয়। জীবন বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। তথাপি এই ব্যাপক অর্থ বুঝাইবার জন্য আমি প্রায় সর্ব্বত্র 'জীবন ও জগৎ' এই যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। সাহিত্যের বিষয়ীভূত জীবনকে নাট্যলীলা বলিবার কারণ আছে। জীবনের এই বহিঃপ্রকাশ যে আর এক ভঙ্গিতে মানুষের জ্ঞানগোচর হয়, তাহাতে জীবনধারণের সমস্যাই প্রবল; তাহাতে কোন রূপ নাই, অর্থাৎ সমগ্রতার উপলব্ধি নাই; তাহা খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে, প্রয়োজনের তাড়নাসম্ভূত চিন্তা-সমষ্টিরূপে, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে। এজন্য তাহা একটা রূপ-পরিণামী আদি-অন্তযুক্ত দৃশ্যপরম্পরার মত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না—কেবল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও ঘটনাপরম্পরায় প্রতিভাত হয়। তাই জীবনের যে রূপকে আমি সাহিত্যের সাধনা বলিয়াছি, তাহাকে নাট্যলীলার সহিত তুলনা করাই সঙ্গত। জীবনের অপর অভিজ্ঞতাকে বাস্তব নাম দেওয়া হইয়া থাকে, এবং ইহাই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুর্দ্ধর্ষ প্রমাণরাশির বলে একটা তত্ত্বরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জীবনের এই মূর্ত্তির সঙ্গে সাহিত্যের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই—মানুষ যেখানে এই বাস্তবের উপাসনা করে, সেখানে সে সাহিত্য-সৃষ্টি করে না। সাহিত্যের বিষয় যে জীবন, তাহাও বাস্তব—কেবল তাহা জড়-বাস্তব নহে, চিন্ময় বাস্তব। মানুষের দেহ অ্যানাটমি-বিদ্যার নিকটে যাহা, ভাস্কর বা চিত্রকরের নিকট নিশ্চয় তাহা নহে; সেই দেহের নানা অঙ্গসংস্থান, অস্থি ও স্নায়ুশিরার সংখ্যা, ও তাহাদের বিন্যাসপদ্ধতির জ্ঞানই মনুষ্যমূর্ত্তির পরিচয় নহে। সেই মূর্ত্তি আপাদমস্তক সর্ব্ব-অঙ্গের যে ছন্দ, তাহার লীলায়িত গতিভঙ্গি, তাহার স্বাস্থ্যের লাবণ্য, তাহার মুখের হাসি ও চোখের কটাক্ষ যে

রূপের সাক্ষ্য দেয়—পেশী মাংস অস্থি ও স্নায়ুশিরার সমষ্টি যে-দেহ, সে-দেহে তাহা থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানীর নিকটে দেহ একটা বহু অঙ্গ-বিশিষ্ট যন্ত্রমাত্র, তাহার প্রাণ সেই যন্ত্রের একটা ক্রিয়া; এবং সেই প্রাণ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ ছাড়া তাহার কোন অর্থ বা অভিপ্রায় নাই। ইহার পর, এই যন্ত্রের বিকল হওয়ার যত কারণ, এবং তাহা নিবারণ করার যত কৌশল—তাহাই যন্ত্রবিদ্‌কে অনন্যমনা করিয়া রাখে। প্রাণধারণের পক্ষে ইহার প্রয়োজন আছে; কিন্তু সৃষ্টির রহস্যবোধের পক্ষে ইহা নিতান্তই খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র। ইহা সেই অন্তশ্চক্ষুর গভীরতর দৃষ্টিকে রোধ করিয়া দাঁড়ায়, যাহা পদক্ষেপ হইতে কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত সর্ব্ব-অঙ্গের মিলিত সুষমায়—কণ্ঠের আর্ত্তচীৎকার ও কলধ্বনি, দেহের স্বেদ-কম্প-পুলক-শিহরণ—এই সকলের মধ্যে, একটি অখণ্ড চিৎ-সত্তার অপরূপ প্রকাশ আবিষ্কার করে। এই যে সৃষ্টি, ইহার মূলে কেবল জড়ের জড়ধর্ম্মের উত্তেজনাই নাই, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ একটি সম্বোধি জাগ্রৎ হইয়া থাকে। আমি বিজ্ঞানের জড়বাদ ও সাহিত্যের এই জীবনবাদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একটি সাধারণ উপমা ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে আমার বক্তব্য কিছু বিশদ করিবার সুবিধা হইয়াছে—উপমা যেমন সাহিত্যের ভাষা, তেমনই সাহিত্য-বিচারেও উপমার উপযোগিতা অল্প নহে।

সাহিত্যে আমরা এই জীবনকেই—আকারে-ইঙ্গিতে, রূপকে-প্রতীকে, ভাবে ও ভাবনায়—কখনও সুরের অনির্ব্বচনীয়তায়, কখনও বাক্যের অপরূপ ব্যঞ্জনায়, কখনও বা অর্থে, কখনও অর্থহীনতায়, কখনও স্থিরচিত্রে, কখনও ঘটনার গতিচ্ছন্দে, কখনও রূপবিবর্জ্জিত অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে, কখনও মানস-কণ্ডুয়নজাত নানা মতবাদের ভূমিকায়—এবং প্রায় এই সকলের একাধিক ভঙ্গির মিশ্রণে, প্রতিবিম্বিত হইতে দেখি। কিন্তু আসলে জীবনকে সাহিত্যে রূপ দিবার ভঙ্গি এক বই দুই নহে—অন্তত যাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে একই। সেই রূপ কি, আর একবার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। কবিও রূপকার—কিন্তু চিত্রকর ও ভাস্করের মত রূপকার নহেন; সাহিত্যের আর্ট—সঙ্গীত, চিত্র বা তক্ষণকলার আর্ট নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেন, তাহা আবার বলি। সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ম্ম হয় বাক্যে—বাণীতে; ইহাতে সেই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। বাক্যে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা

অর্থবান্ অথচ অর্থাতীত ; তাহা ভাবময় অথচ রূপাশ্রিত ; তাহা চিত্র ও মূর্ত্তি-কলার অনুকারী, অথচ দেশে ও কালে তাহাদের মত সীমাবদ্ধ নয় ; তাহা সঙ্গীতযুক্ত অথচ নির্ব্বিশেষ নয়—সবিশেষ। এই জন্যই বাণী ভিন্ন অপর কিছুতেই এ সৃষ্টি সম্ভব নয়। সৃষ্টিতে যাহা খণ্ডরূপে, ব্রহ্মের জড়মূর্ত্তিরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাই কবির অখণ্ড অনুভূতিতে—যেন একপ্রকার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়-চেতনায়—সমগ্ররূপে চিন্ময় হইয়া উঠে ; কোনও একটা ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রধান হইয়া মনকে অধিকার করে না, হৃদয়ের একটা বিশেষ বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া সূক্ষ্ম ভাব ও শেষে সূক্ষ্মতর রসাবেশে লয়প্রাপ্ত হয় না। এই সর্ব্বানুভূতির ঐক্যবোধযুক্ত যে রূপ, তাহাকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনের রূপ বলিয়াছি ; এবং দেশ ও কালের ভূমিকায় এই রূপ নিরন্তর উদ্বর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া আমি নাট্যলীলাকেই সাহিত্যের আদর্শ বলিয়াছি ; সঙ্গীত যদি অন্যান্য শিল্পের আদর্শ হয়, তবে সাহিত্যকে—তাহার সৃষ্টিনিহিত রূপকে—নাট্যরূপ বলিতে হইবে। যাহা দেশে ও কালে—যুক্ত নয়—খণ্ডিত, যাহা ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তের একটা অসংলগ্ন সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই একটা প্রাণবন্ত গতিধারায় আদি মধ্য ও অন্ত যুক্ত করিয়া দেখানোই সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ম্ম। সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যে—মহাকাব্য, কাহিনী, উপন্যাস, এমন কি, উৎকৃষ্ট খণ্ডকবিতায়, জীবনের এই নাট্যলীলাত্মক রূপ আছে। এই জন্যই বোধ হয় জীবনকে প্রতিবিম্বিত করিবার উৎকৃষ্ট বাণী-মুকুর নাটক ; আর কোথাও জীবনের রূপ-সমগ্রতা আমাদের চিত্তে এমন অবাধে সংক্রামিত হয় না। যখন কোন রচনার এইরূপ লক্ষণ আমরা বিচার করি, তখন দেখিতে হইবে, তাহার মধ্যে একটা কিছুর সমগ্র প্রকাশ আছে কি না—জীবনকে যেখানে যেদিক দিয়াই দেখি, তাহাতে একটা পূর্ণ পরিধি কেন্দ্র-যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে কি না ; কাব্য বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক—রচনার বিষয়বস্তু যেমনই হউক—সিন্ধুর বিশাল বক্ষে যেমন, তেমনই পুষ্করিণী ও গোস্পদে সেই এক চন্দ্রবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে কি না। এই যে সমগ্রতার রূপ-সংবেদনা, ইহাতেই জীবনের সকল অনর্থ অর্থবান হইয়া উঠে, সকল দুঃস্বপ্ন দূর হইয়া অন্তর যেন অরুণালোকে উদ্ভাসিত হয়। এখানেও দেহের সেই উপমাটা আর একবার কাজে লাগিবে, জীবনের রূপ বুঝিতে দেহের রূপই ধরা যাক। জড়বাদী দেহকে যে ভাবে দেখে, তাহাতে

যেমন রূপ নাই, আছে গ্রন্থিবদ্ধ কয়েকটা খণ্ডের সমষ্টি—তেমনই, দেহকে দেখিবার কালে যাহার দৃষ্টি দেহকে অতিক্রম করিয়া তাহার পশ্চাতে একটা ভাবময় সত্তাকে আবিষ্কার করে, অথবা দেহকে সেইরূপ একটা মানস-সংস্কারের প্রতীকরূপেই গ্রহণ করে—সেও এই রূপের কারবারী নহে। একটা উদাহরণ দিব। যে কবি বিশ্বমানবের ধ্যান করেন, তিনি মানুষের দিকে না তাকাইয়া—তাহাকে অতিক্রম করিয়া—মানব-নামে একটা পরম সত্তার পূজা করেন; তিনি মানুষের দেহ-দশার সকল দুঃখ, তাহার জীবনযাত্রার নিয়তি-নির্দ্ধারিত পাপ-তাপের মধ্যে, অর্থাৎ তাহার বাস্তব প্রকৃতির মধ্যেই, জীবনের রহস্য সন্ধান করেন না; মানুষকে ভাল না বাসিয়া, মানবতার একটা ভাববিগ্রহ গড়িয়া তাহারই পূজা করেন। তাঁহার রচনায় জীবনেরই রহস্য রূপময় হইয়া উঠে না। আবার, যে-রচনায়, দেহের কোন একটি অঙ্গের—যেমন ভ্রূলতা, নয়ন-ইন্দীবর, বা ভুজবল্লরীর—রমণীয়তাকেই প্রেক্ষণীয় করিয়া তোলা হয়, সে রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম্ম নয়, এক প্রকার শিল্পকলা মাত্র।

আমি যে রূপসৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম্ম বলিয়াছি, তাহা ঐ দেহের মতই জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সুষমার অভিব্যক্তি; সে রূপ—ঐ দেহেরই মত—জীবনেরও যেন কান্তি; তাহাতে জীবনের সকল বিষমতা ও বিরোধ, সকল খণ্ডতা ও অসংলগ্নতা, একটি সমগ্ররূপে সমাহিত হইয়া প্রকাশ পায়। দেহের রূপ যেমন কোন একটা অঙ্গবিশেষের রূপ নয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এবং অখণ্ড হইলেও তাহা দেহময়, এজন্য তাহা একই কালে বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—জীবনের রূপও, তেমনই, সাহিত্যে আমাদের চিত্তগোচর হয়। যেখানে জীবনের এই রূপ আমাদের চেতনায় একটি অপরূপ অর্থ-সঙ্গতি লাভ না করে—সেখানে সাহিত্যের প্রেরণা বিফল হইয়া থাকে। দেহ ও দেহের কান্তির যে উপমা দিয়াছি, জীবন ও জীবনের রূপ তাহা হইতেই বুঝিয়া লইতে হইবে; কায়া হইতে কান্তি যেমন পৃথক করা যায় না, সাহিত্যেও তেমনই, জীবন হইতে জীবনের রূপকে পৃথক করা যায় না। অতএব তত্ত্ববিচারে দেহাত্মবাদ নামে যে একটি সিদ্ধান্ত আছে, সাহিত্যবিচারেও এইরূপ সিদ্ধান্তকে কায়া-কান্তিবাদ নাম দেওয়া যাইতে পারে। পরিশেষে, সাহিত্যসৃষ্টির সম্পর্কে জীবনের যে ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি, তাহাতে আর একটি কথা যোগ করিলেই

আমার বক্তব্য শেষ হয়। তাহা এই যে, সাহিত্যে জীবন ও জীবনের রূপ বলিতে যাহা এবং যতখানিই বুঝি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা নর-লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগৎ-নাট্যলীলার নায়ক মানুষ; জীবনে যাহা কিছু দেখি তাহা মানুষেরই দেহ-নিয়তির সঙ্গে মিলাইয়া দেখি; যেখানে সেই দেখা নাই, সেখানেই সাহিত্যসৃষ্টি হয় নাই। সাহিত্যে আমরা জীবনের যে চিন্ময় প্রকাশ দেখি, তাহা মনুষ্যজীবনের জবানিতেই ঘটিয়া থাকে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সে রচনা আর্ট-জাতীয় বস্তু হইবে, খাঁটি সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্য হইবে না।

৩

এতক্ষণ সাহিত্যের প্রকৃতিবিচার করিয়াছি, এবং সে বিচারে সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ—যাহাকে আমি স্বরূপ-লক্ষণ বলি—তাহার কথাই বলিয়াছি। কিন্তু শুধু সেই দিক দিয়াই বিচার করিলে চলিবে না, আরও একদিক আছে, সেই দিক দিয়াও দেখিতে হইবে, নতুবা এ বিচার অসম্পূর্ণ থাকিবে। সাহিত্যের প্রকৃতি-বিচারে তাহার বাহিরের রূপ যেমন একটা বড় কথা, তেমনই সেই রূপসৃষ্টির প্রেরণাও অনুধাবনযোগ্য। এই প্রেরণার জন্ম হয় কবিচিত্তে। অতএব কবিচিত্ত বলিতে কি বুঝি, তাহাই এক্ষণে বলিব।

সাধারণ মানুষের চিত্ত ও কবিচিত্তে প্রভেদ এই যে, সাধারণ মানুষের চেতনায় অনুভূতির ক্ষেত্র অতিশয় সঙ্কীর্ণ—যতই গভীর হউক, তাহার প্রসার অল্প। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব বড়ই সীমাবদ্ধ। অনুভূতির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ বলিয়াছি এই অর্থে যে, তাহা এক হইতে অপর ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতে পারে না, খণ্ডের গণ্ডি পার হইয়া সমগ্রের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। আমরা যাহাকে কবি-কল্পনা বলি—উৎকৃষ্ট অর্থে, তাহা এই প্রসারশীল অনুভূতির ফল; ইহা হইতেই কবিচিত্তে জীবনের রূপদর্শন ঘটে। দ্বিতীয় যে লক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহা আরও গভীর, তাই ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। কবির ব্যক্তিত্ব সাধারণ মানুষের মত সীমাবদ্ধ নয়, অর্থাৎ কবির মধ্যে একজন ব্যক্তিরই কামনা-ভাবনা নাই, তিনি যেন সকল মানুষের প্রতিনিধি। ইংরেজীতে ইহাকে rich ও composite personality বলা যাইতে পারে। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি

শেক্‌স্পীয়ারকে এক মনীষী যে বলিয়াছিলেন—'genius of humanity', ইহা যথার্থ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ইংরেজীতে individuality বলে, ইংরেজীতে আর একটি শব্দ আছে—personality; এই দুইটি শব্দের অর্থগত প্রভেদ এখানে কাজে লাগিবে। প্রত্যেক মানুষের বাহির ও অন্তরের গঠনে অপরের সঙ্গে যে বৈলক্ষণ্য আছে—যাহা তাহারই, যাহা দ্বারা আর সকল হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া লওয়া যায়, তাহাই তাহার individuality। কিন্তু personality বলিতে এই ব্যক্তিত্ব নয়—সাধারণ মানব-চরিত্রেরই এক ঘনীভূত বা প্রবলতর প্রকাশ বুঝায়। কবির personality ইহা হইতেও বড়; তাহা ঘনীভূত বা প্রবল নয়, তাহাতে কোন বিশেষ পুরুষ-মহিমা নাই, তাই তাহা ব্যক্তিত্বেরই একটা বিশেষণ নয়—ব্যক্তিজীবনেরই একটা পৌরুষময় মূর্ত্তি নয়। সে যেন এক পুরুষচিত্তের আধারে সকল পুরুষচিত্তের সমান স্ফূর্ত্তি—ইহাই Genius of Humanity; এবং ইহাই genius, বা কবি-প্রতিভা। ইহারই কারণে কবির অনুভূতি সর্ব্বমানবীয় অনুভূতি হইয়া দাঁড়ায়; তাঁহার সৃষ্টি যতই অপূর্ব্ব হউক, তাহা সকলের অনুভূতিগোচর হয়,—কারণ, তাহা ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি বা উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি নহে। অতএব কবিচিত্তের যে আর এক লক্ষণ—যে প্রসারশীল অনুভূতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাও এই লক্ষণের সহিত যুক্ত হওয়া চাই, তবেই উৎকৃষ্ট প্রতিভার জন্ম হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কবিচিত্ত সর্ব্বমানব-চিত্তের প্রতিনিধি বলিয়াই তাহা অতিশয় normal বা সুস্থ; individuality বা ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যের দিক দিয়া দেখিলে কেহই normal নয়। তাই উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভা এত দুর্লভ।

কবিচিত্তের এই লক্ষণ—এই সর্ব্বময় personality-র প্রসঙ্গে, আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবিচিত্তে এই যে বহুমুখিতার লক্ষণ আছে, তাহা সত্ত্বেও সে চিত্ত বহুর নয়—একেরই চিত্ত; অর্থাৎ তাহা খণ্ডিত বা অসংলগ্ন নয়, তাহা হইলে কবির সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র দৃষ্টির মূলগত ঐক্য থাকিত না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে একই ব্যক্তির মধ্যে যে multiple personality-র অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—কবির এই personality বা চিৎ-সত্তা সেইরূপ বহুত্বসম্পন্ন নয়; তেমন প্রকৃতি normal বা সুস্থ প্রকৃতি নয়। কবির চিত্ত বহুল নয়, তাহা বিরাট; সংখ্যাধিক্য নয়—প্রসার ও প্রশস্ততাই সেই সার্ব্বজনীনতার কারণ; সে

বহুত্বে গণিতের নিয়ম নাই ; এক প্রকার প্রেমেরই যাদুশক্তি আছে। সেখানে একটা 'আমি'র মধ্যেই সকল 'আমি' স্পন্দিত হইতেছে—সর্ব্বমানবচিত্ত একমুখী হইয়া একই শক্তির পুরুষসত্তাকে বিরাট-পুরুষ করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য কবির মধ্যে ব্যক্তি যিনি, তিনিও নৈর্ব্যক্তিক হইয়া আছেন। কবিচিত্তে ব্যক্তি ও নির্ব্যক্তির এই লুকাচুরি কবিপ্রতিভার আর এক রহস্য, ব্যক্তিত্বই যেন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে নৈর্ব্যক্তিক করিয়াছে। তাই যে-জগৎ তাঁহারই জগৎ—তিনি ভিন্ন আর কেহ যাহা রচনা করিতে পারিতেন না—সেই জগৎ তথাপি একার জগৎ নহে, সকলের জগৎ,—উৎকৃষ্ট কাব্যপাঠকালে এই উপলব্ধিই আমাদিগকে সমধিক বিস্মিত ও পুলকিত করে। এই জন্যই বলিতে হইবে, কবি নিজচিত্তে সকল চিত্তকে ধারণ করেন—ব্যক্তিই বিরাট হইয়া উঠে।

আধুনিক কালে কবিচিত্তের এই লক্ষণ স্বীকৃত হয় না, এখন এইরূপ personality অপেক্ষা individualityর উপরেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু individuality বা কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই উৎকৃষ্ট কবিকর্ম্মের পরিপন্থী। যে কবির চিত্তে স্বাতন্ত্র্য যত অধিক, তিনিই সেই পরিমাণে জগৎ ও জীবনের সহিত যোগযুক্ত নহেন, তিনি সার্ব্বজনীন মানব চিত্তের অধিকারী নহেন, তাহার রচনা আত্মভাবস্পর্দ্ধী ; তিনি নিজেরই idiosyncrasy বা ব্যক্তিগত খেয়ালের বশে নিজের বিচিত্র-গঠন মানসদর্পণে জগতের যে প্রতিবিম্ব রচনা করেন, তাহা যেমন সৃষ্টির সত্যে অনুপ্রাণিত নয়, তেমনই তাহা সর্ব্বমানবচিত্তের দৃষ্টিগোচর নহে। যাহাদের সহিত সেইরূপ মানসধর্ম্মের মিল আছে, কেবল তাহারাই—অনুরূপ আত্মাভিমান তৃপ্ত হয় বলিয়া—সে রচনার পক্ষপাতী হয়। আধুনিক সাহিত্যসমাজে এই ধরণের রসিকেরাই সম্মান পাইয়া থাকেন ; এবং ইংরেজীতে ইঁহারা যে intellectuals নামে অভিহিত হন, তাহাও সঙ্গত ; কারণ, ইঁহারা সাহিত্যবিচারে প্রকৃতই মনোবিলাসী ; ইঁহারাও আত্মভাবপন্থী। সাহিত্যে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি আধুনিক কালে অত্যধিক বাড়িয়া উঠিয়াছে—ইহাতে সাহিত্যের স্বকীয় আদর্শ নষ্ট হইতেছে, জীবনের দেহচেতনাগত রূপমাধুরী, এবং কায়ার সহিত অভিন্ন যে কান্তি, সাহিত্যে তাহা আর ফুটিতে পারিতেছে না।

কবিচিত্তের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে, এই ভাবতন্ত্রের মতই,

সাহিত্যের Realism বা বস্তুতন্ত্রের কথাও প্রাসঙ্গিক বটে। ভাবতান্ত্রিক যেমন আত্মভাবের আদর্শে আপনার জগৎ পৃথক গড়িয়া থাকেন, এবং তাহার মূলে আছে স্বাতন্ত্র্যের অভিমান, বস্তুতান্ত্রিকের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। এই সকল লেখক যেমন কোন স্বকীয় স্বতন্ত্র অনুভূতি দাবি করেন না, তেমনই, কোনপ্রকার অনুভূতি-কল্পনাও তাঁহাদের নাই। বস্তুতান্ত্রিকের বুদ্ধি জগৎকে বস্তুসমষ্টিরূপেই দেখে—সে যেন কতকগুলা বক্র ভগ্ন অসম্পূর্ণ অর্থহীন রেখার সমাবেশ। ইহার কারণ, পুরুষের যে সম্বিৎ কোন কিছুকেই অসম্পূর্ণ দেখিতে চায় না—হয় কল্পনা, নয় বিশ্বাস, অথবা প্রেমের দ্বারা জগতের সব কিছুর একটা সঙ্গতিবোধ করে—ইহারা তাহাকে প্রশ্রয় দেয় না; ইহাদের প্রেম নাই, ইহারা অবিশ্বাসী, নাস্তিক। আমি পূর্ব্বে যে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের কথা বলিয়াছি, ইহারা সাহিত্যেও তাহারই আরাধনা করে। ইহাদের মতে মানুষের দেহও তড়িৎ-তাড়নার মত কতকগুলা সুখদুঃখ-অনুভূতির আধার। সেই অনুভূতি যেন মুহূর্ত্তের অনুভূতি মাত্র; যদি তাহার পরম্পরাও থাকে, তবে তাহার কোন পরিণাম নাই। এরূপ রচনায় রূপসৃষ্টি তো পরের কথা, একটা সঙ্গতি-সুষমাও লক্ষিত হয় না; ইহা শিল্পকলারও অন্তর্ভুক্ত নহে; কারণ, সেখানেও অর্থহীন রং রেখা প্রভৃতিকে একটা সুবলয়িত সুষমা দান করার প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু রহস্যের কথা এই যে, এই সকল বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকেরা বস্তুর নিছক বাস্তবতাকেও আয়ত্ত করিতে পারেন না। ইহার কারণ, বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে আত্ম-সংস্কার বর্জ্জন করা যতই সম্ভব হউক, যে-রচনা আদৌ অনুভূতিমূলক—সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-পরিচয়ের উপরেই যাহার নির্ভর, তাহাতে বস্তুর মধ্যে লেখকের আত্ম-প্রবেশ থাকিবেই। সেই আত্ম-সংস্কারকে দমন করা অসম্ভব বলিয়াই বাস্তব-চিত্রের মধ্যেও আত্মভাবেরই একটা অতিশয় বিকৃত ক্ষতবিক্ষত বিকলাঙ্গ রূপ ফুটিয়া উঠে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, Realism বা বস্তুতন্ত্র সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

অতঃপর, সাক্ষাৎ সাহিত্যসৃষ্টিতে কবিচিত্তের প্রেরণা কি, তাহাই বলিব। সাহিত্যসৃষ্টিতে কবির মূল প্রেরণা ভাবও নয়, চিন্তাও নয়—বাহিরের সহিত অন্তরের একাত্মতা; এই জগৎ ও জীবন যেন তাঁহার চেতনাকে অধিকার করিয়া রূপের ভাষায় আপন কথা বলে; অর্থাৎ তাহার কোন অংশই দেশ কাল হইতে

বিচ্ছিন্ন না হইয়া—যেমন আছে, হয়, ও ঘটে—তাহারই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়।) এখানে এই যে রূপের কথা বলিলাম, ইহা ভাবের বিপরীত মাত্র। (জীবনের কোন একটা অভিজ্ঞতা হইতে, অথবা আমারই অন্তরের কামনা হইতে, ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে; এই ভাব অতিসূক্ষ্ম অনুভূতি-রসে পরিণত হইয়া এক প্রকার কাব্যের প্রেরণা হয়। কিন্তু এই ভাবমূলক রচনার রূপ নাই, ইহার ভাষা ভাবেরই ভাষা—আমারই হৃদয়োত্থিত এক অশরীরী বিগ্রহ, ইহা আমার সম্মুখে জগতেরই একটা ঘটনা বা দৃশ্যরূপে উদয় হইতেছে না। তাই ইহা জীবন-দর্শন নয়, এক প্রকার আত্মদর্শন মাত্র। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে—জীবনের রূপও নয়, ভাবের রসসৃষ্টিই কাব্যের মূলীভূত অভিপ্রায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভাব বরং বস্তুমুখী; রস ভাবেরও সূক্ষ্মতর পরিণাম, একেবারে বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য! কিন্তু আমি যে রূপের কথা বলিয়াছি, তাহা বস্তুর সহিত অভিন্ন; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা বস্তুতন্ত্রের বাস্তব নহে। এখানে কায়া ও কান্তির উপমা স্মরণ করিতে হইবে। অতএব কবিত্বের মূল প্রেরণা—বাহিরের সহিত অন্তরের একাত্মতা। ইহাকে যদি আত্মার সহিত দেহের মিলন, জড়ের সহিত চিৎ-এর পরিণয় বলি, তবে কথাটা বড়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিবে। যদি বলি—ইহাই প্রেম, তাহা হইলে কথাটা কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ইহারও পরে, যদি বলি, এই প্রেম আত্মমুখী নয়, বহির্মুখী—ইহা আত্মরতি নয়, জগৎ-রতি, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটা আর একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। জগৎ ও জীবনের প্রতি এই আসক্তি যখন ভাবের আকারেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা নয়, সেও নিজেরই সুখদুঃখের গীতময় উচ্ছ্বাস; তাহার যে কবিতা, সেও রূপাত্মক নয়, ভাবাত্মক; এ জন্য তাহা উৎকৃষ্ট গান হইলেও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি নহে—উৎকৃষ্ট আর্ট হইলেও, উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে। তথাপি সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কবির সেই আসক্তি আছে—ইহারই বশে কবিচিত্ত এক আশ্চর্য্য উপায়ে জগতের বিক্ষিপ্ত বস্তুরাশির মধ্যে অনুস্যূত হইয়া নটলীলায় প্রবৃত্ত হয়; তখন কিছুই আর ভাব নয়, 'ভব', বা—ঘটনায়, দৃশ্যে, আকারে, অবস্থানে—শরীরী হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কবি যখন বলেন—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই;"

—তখন তাহাতে খাঁটি জগৎ-প্রীতির প্রেরণাই আমরা লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু এখানে তাহা ভাবের আকারেই আছে—'ভব' হইয়া উঠে নাই ; অর্থাৎ, একটি ভাবরূপেই তাহা আমাদের চিত্তে সংক্রামিত হয়—জীবনের কাহিনীতে রূপ ধারণ করিয়া চাক্ষুষ হইয়া উঠে না। ভাব ও রূপের এই প্রভেদ অল্প নহে। ভাবের আদিও নাই, অন্তও নাই—উহা একটা চিত্ত-চমক মাত্র ; কিন্তু রূপে, অর্থাৎ জীবনের ঘটনায়, যখন তাহা নাট্যীকৃত হয়, তখন তাহা আদি-অন্ত-যুক্ত হইয়া জীবনের গভীরতম রহস্যকে অপরোক্ষ করিয়া তোলে। উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকে যে কামনা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা কামনা মাত্র ; তাহাতে রূপসৃষ্টির সম্পূর্ণতা নাই, ভাব হইতে ভাবেই তাহার পরিসমাপ্তি। কিন্তু রূপসৃষ্টিমূলক সাহিত্যে আমাদের অনুভূতি এইরূপ ভাবমূলক অসম্পূর্ণ অনুভূতি হইবে না। সেখানে ভাবিবার কিছুই নাই, সকলই দেখিবার ; তাই কামনাও একটা ঘটনার রূপে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এখানে কবি যাহা কামনা করিতেছেন, তাহা নিশ্চয় অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; বরং মৃত্যুর নিয়তিকে লঙ্ঘন করার যে সম্ভাবনা, তাহাই এই কামনাকে বৃহৎ ও কবিত্বময় করিয়াছে। কিন্তু এই কামনা যদি রূপে প্রকাশ পাইত, তবে দেখা যাইত 'আমি' মরে নাই, 'আমি' মানুষের মাঝে বাঁচিয়া আছে। আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিত, ঐ 'আমি'টাকে তখন দেখিতে পাওয়া যাইত বলিয়া 'আমি' আর ব্যক্তি-আমি থাকিত না, সাধারণ আমি হইয়া যাইত—ভাবে যাহা ব্যক্তি-'আমি', রূপে তাহা সকলের 'আমি' হইয়া উঠে। এই জন্যই কাব্যসৃষ্টিতে Subjectivity বা মন্ময়তা অপেক্ষা Objectivity বা তন্ময়তাই কবিকল্পনার উৎকর্ষ প্রমাণ করে।

অতএব, এই যে রূপসৃষ্টি, ইহার মূলে আছে প্রেম—কারণ এমন করিয়া দেখিতে বা দেখাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে 'আমি'টাকে উৎসর্গ করিতে হয়। যিনি এই বিশ্বের আদি-স্রষ্টা, তিনিও এই প্রেমের প্রেরণায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াই, জগৎ-সৃষ্টি করিয়াছেন—নির্ব্বিকল্প কৈবল্যের অবস্থা ভাল লাগে না বলিয়াই, রসব্রহ্ম জগৎ-ব্রহ্মের রূপ ধারণ করিয়াছেন ; এবং "ভাব হইতে রূপে যাওয়া আসা" নয়, নিত্য রূপের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন। কবির চিত্তেও সেই প্রেম জাগে—ভাগবতী সৃষ্টির সেই মূলকল্পনাকে মানবীয় সৃষ্টিতে মানবদেহানুভূতির ভাষায় অনুবাদ করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা হয় ; তাই

সাহিত্যে জগৎরূপী ব্রহ্মের দর্শন ঘটিয়া থাকে। রূপ—রূপ—রূপ! তত্ত্ব নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়; দেশ ও কালের দ্বিগুণিত সূত্রে বয়ন-করা, সর্ব্বেন্দ্রিয়-মনোহর সেই কাব্য—দেহকে দেহ দিয়া অনুভব করার মতই, প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠে। সকল রূপ-পিপাসার মূলে এই দেহ-প্রেমই আছে; এই রূপ-পিপাসার দেহপ্রেমই কবির প্রতিভায় দিব্যদৃষ্টিতে পরিণত হয়; তখন কিছুই আর ক্ষুদ্র, খণ্ড, কুৎসিত অপ্রীতিকর থাকিতে পারে না। ভাবের আত্মপরায়ণতায় যাহা তুরীয়ধর্ম্মী—অর্থাৎ অরূপের অসীমায় যাহা অর্থাতীত ও আদি-অন্তহীন, তাহাই দেহের প্রেম-পিপাসায়—সমগ্র, সুসীম, রূপময় ও অর্থপূর্ণ। কিন্তু কেবল-মাত্র রূপ-পিপাসাই এই প্রেম নয়; রূপ-পিপাসায় কিছুই সৃষ্টি হয় না, তাহাতে ইন্দ্রিয়বিলাসের উপকরণ রচনা হয় মাত্র, তাহাকেই আর্ট বলে। তাহাতে জীবনের সমগ্রতাবোধ নাই, কারণ তাহাতে পিপাসাই আছে, প্রেম নাই। সেখানেও দেহের খণ্ডরূপেরই আরাধনা হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে এই রূপ-পিপাসার একটি চমৎকার অভিব্যক্তি আছে—

Mamua, when our laughter ends
And hearts and bodies, brown as white,
Are dust about the doors of friends,
Or scent ablowing down the night,
Then, Oh! then, the wise agree
Comes our immortality:
Mamua, there waits a land
Hard for us to understand,
Out of time, beyond the Sun...
There the Eternals are, and there
The Good, the Lovely, and the True
And Types, whose earthly copies were
The foolish broken things we knew...
Never a tear, but only Grief;
Dance, but not the limbs that move;
Instead of lovers, Love shall be,
And there, on the Ideal Reef,
Thunders the Everlasting sea.

—এখানে রূপবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ যে অস্তিত্ব, তাহার বিরুদ্ধে বিশেষের অনুরাগী, দেহপিপাসাতুর প্রাণের যে দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাই, তাহা প্রেম নয়—পিপাসারই ভাবোচ্ছ্বাস। কবিচিত্তের প্রেম জগৎ ও জীবনকে "foolish broken things" বলিবে কেন? সকলকেই সুসম্পূর্ণ ও সুসম্বদ্ধ দেখিবে, এবং সেই দেখাতেই হৃদয়ে আর কোন আক্ষেপ থাকিবে না—আপন সৃষ্টির মধ্যেই একটা শাশ্বত ও চিরন্তনী সত্তা উপলব্ধি করিবে। সাহিত্যেই আমরা এই অপূর্ব্ব আশ্বাস লাভ করি; আর সকল পথে প্রশ্নকে এড়াইয়া চলিতে হয়, অথবা প্রশ্ন বাড়িয়াই চলে, সমাধান আর হয় না। এই জন্য সাহিত্যকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ বা প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞান-পন্থা বলা যাইতে পারে।

৪

যাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সৃষ্টি, তাহাতে Idealও নাই, Realও নাই, কিন্তু রোমান্স আছে—থাকিবেই। রোমান্স অর্থে অতিচারী কল্পনা নয়, সত্যকার কবিকল্পনা। যে কল্পনা জড়কে চিন্ময় দেখে, খণ্ড ও বিচ্ছিন্নকে সমগ্র ও অর্থপূর্ণ করিয়া লয়—যাহা ভগ্নকে যুক্ত করে, অসংলগ্নকে সুসম্বদ্ধ করিয়া তোলে, তাহাই সাহিত্যকে রোমান্স-গুণযুক্ত করে—অর্থাৎ, জীবনের খণ্ড-রেখায় যে মণ্ডলাভাস আছে, তাহার পূর্ণমণ্ডল আবিষ্কার করে। এই কল্পনার মূলে আছে প্রেম, ইহাই সুস্থ; কল্পনা যেখানে আত্মপরায়ণ বা আত্মদ্রোহী, সেখানে রূপসৃষ্টির রোমান্স নাই; অবাস্তব ভাববিলাস, অথবা বাস্তবের বস্তু-বিশ্লেষণ আছে। যাহা নাই, তাহার মনোহর মায়ারূপ-রচনা সত্যকার কাব্যসৃষ্টি নয়; যাহারা এই প্রকার রচনাকেই কাব্য বলে, তাহারাই উৎকৃষ্ট উপন্যাসকেও রোমান্স বলিয়া নাসাকুঞ্চিত করে; এবং জীবনের কাহিনীতে কল্পনাহীন বাস্তবের আধিপত্য থাকিলেই তাহাকে আদর্শ উপন্যাস বা সাহিত্যসৃষ্টির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য করে। এজন্য যে রচনায় প্লট বা সুসম্পূর্ণ কাহিনী নাই—ঘটনা সকলের মধ্যে সাক্ষাৎ কার্য্যকারণের সম্বন্ধ মাত্র আছে, কিন্তু কোনও একমুখী পরিণামের মিলিত অভিপ্রায় নাই, তাহাই ইহাদের মতে জীবনের উৎকৃষ্ট চিত্র; কারণ তাহা বাস্তব, তাহা রোমান্স নয়। কিন্তু এইরূপ রচনাই সাহিত্যপদবাচ্য নয়, কারণ ইহাতে কবিদৃষ্টির লক্ষণ নাই। কাব্যসৃষ্টিতে কবির দৃষ্টি স্থির, একাগ্র ও পূর্ণতার অভি-

মুখী ; তাহাতে অসম্বদ্ধ বাস্তবের বিবৃতি নাই বলিয়াই তাহা অবাস্তব বা মিথ্যা নয়। রোমান্স-বিরোধী যে বাস্তব, তাহাতে যাহা কিছু 'হয়', তাহার শেষ সেইখানেই ; সেই 'হওয়া'র কোন পরোক্ষ পরিণতি নাই, তাই সেইরূপ রচনায় কোন কাহিনী বা সুসঙ্গত প্লট থাকে না। কিন্তু উৎকৃষ্ট কবিকল্পনা সকল 'হওয়া'কেই একটি সম্পূর্ণ 'হওয়া'র রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে—'হওয়া'র এই সম্পূর্ণতাই রোমান্স, ইহাতে বাস্তবই পূর্ণ আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল রচনায় বাস্তবই নাই, অসংলগ্ন স্বপ্নপুঞ্জকে—রূপে নয়, ভাবে অপরূপ করিয়া তোলা হয়—তাহাকে আমি রোমান্স বলিতেছি না, তাহাকে সাহিত্যিক সৃষ্টি বলিব না ; তাহাও আর্টের অন্তর্গত। আবার যেখানে 'হওয়া-উচিত'কেই জবরদস্তি করিয়া 'হয়'-এর উপরে চাপানো হয়, অর্থাৎ 'হওয়া'কে তাহার আপন নিয়মেই সম্পূর্ণ 'হইতে' দেখার দৃষ্টি নাই—ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আদর্শে জীবনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একটা ছাঁচে ঢালিয়া দেখানো হয়, সেখানেও রোমান্সের চিত্ত-চমৎকার নাই, একটা সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির তৃপ্তিসাধন বা সংস্কারবদ্ধ চিত্তের উল্লাসই আছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, জীবন যাহার বিষয়, সেই সাহিত্য আর্টের মত নীতিহীন হইতে পারে না—যদি তাহা হইত, তবে সাহিত্যে জীবনের রূপসমগ্রতা প্রকাশ পাইত না ; কারণ, কোন একটি বৃন্তে সংহত ও মণ্ডলায়িত না হইলে রূপের রূপত্ব থাকে না—সেই রূপকে ধারণ করিবার কিছুই থাকে না, তাহার কোন significance বা অর্থ ই থাকে না। এই গভীরতর নীতি কেমন করিয়া প্রকাশ পায়, তাহাই বলিব। প্রথমত, জীবনের আলেখ্য-রচনায়, সর্ব্বসংস্কারমুক্ত একটা মানবাত্মার কল্পনাই মিথ্যা ; কারণ, তাহা আর দেহ-দশাধীন থাকিবে না বলিয়াই তাহা অবাস্তব। সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির সংস্কার কোন-না-কোনরূপে মানুষের চেতনায় বদ্ধমূল থাকিবেই, কারণ, মূলে উহা প্রকৃতিগত। উহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে জীবনের যে অংশ বাকি থাকে, তাহা কবিচিত্তের ধ্যানযোগ্যই নহে—রূপসৃষ্টির উপকরণই শূন্য হইয়া যায়। এই সকল নীতির তাড়নায়, এবং তাহাদেরই সংঘর্ষে, জীবনের গভীরতর নীতি—সৃষ্টির নিয়তি-নিয়মের গূঢ় রহস্য—মানুষের কাহিনীতেই ধরা পড়ে ; এবং তাহারই আলোকে কবির সৃষ্টি সমগ্রতার অর্থে অর্থবান হইয়া উঠে। অতএব সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির আদর্শে যেমন জীবনের সত্যকার রূপসৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তেমনই,

ঐরূপ সংস্কার-বন্ধনকে একেবারে অস্বীকার করিলে বাস্তব দেহ-মনকেই অস্বীকার করিতে হয়; এবং এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই যে দ্বন্দ্বাতীত পরমবস্তুর উপলব্ধি হয়, জীবনের সেই রহস্যময় নিয়তির রসরূপকে আর প্রত্যক্ষ করা যায় না। এইজন্য আর্ট যে অর্থে নীতিহীন, সাহিত্য সে অর্থে নীতিহীন নয়। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে আর এক নীতির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তাহা নীতিহীনতার নীতি—নীতির পরিবর্ত্তে দুর্নীতিরই একটা প্রবল সংস্কার। বাস্তবতা বা সম্ভাব্যতার দিক দিয়া ইহাই নাকি আরও সত্য। কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে এই দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেই নীতিই ইহার তুলনায় আরও সত্য, আরও বাস্তব। এই দুর্নীতিও মনেরই একটা সংস্কার, এবং ইহা বিকৃত ও অস্বাভাবিক বলিয়া জীবনকে শুধুই ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, কুৎসিত করিয়া দেখে। সম্ভাব্যতা বা probability-র যে অজুহাত ইহারা দেয়, সত্যকার কবিদৃষ্টির পক্ষে সে প্রশ্ন গুরুতর নয়; কারণ কবিচিত্তে এইরূপ কোন সংস্কার না থাকায়, তাহা জীবনের নিম্নতম ও ঊর্দ্ধতম সীমায় অবাধে গতায়াত করিতে পারে, এবং সেই পূর্ণদৃষ্টিতে সম্ভব-অসম্ভব-বোধের বাধা আর থাকে না। যাহা এমন করিয়া দেখিতে পাইতেছি, তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে কেন? সেই দৃষ্টি ইহাদের নাই বলিয়া ইহারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, ইহাদের রচনাও সাহিত্য নয়।

আর একটি কথা বলিয়া আমি কবি-প্রেরণার পরিচয় শেষ করিব। আমরা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি-রচনার কথা জানি, এই ট্র্যাজেডিতে জীবনকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেখা হয়—তাহাতে একটা নিদারুণ নিষ্ফলতার চিত্র ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কোন উৎকৃষ্ট কাব্যে জীবনকে একটা অভিশাপ রূপে প্রকটিত করা সম্ভব নয়—বৈরাগ্য বিরক্তি বা বিদ্বেষ কবিচিত্তের প্রেরণা হইতে পারে না, জীবনকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ করাই কবি-কল্পনায় সুস্থ প্রবৃত্তি। কোথাও বা, পরম জ্ঞানের যে পরম অনুভূতি, তাহারই এক স্নিগ্ধ-করুণ হাস্যজ্যোতি জীবনের উপরে বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়; এই humour বা উৎকৃষ্ট হাস্যরস কবিচিত্তের স্বাস্থ্য ও সুস্থিরতার প্রমাণ। কোথাও বা, বাহ্যত কবিচিত্তের এই স্থৈর্য্যলক্ষণ নাই—জীবনের অতল অকূলকে মন্থন করিয়া তাহার তলদেশে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা—অথবা সেই ঘূর্ণ্যমান প্রবাহের মধ্যবিন্দুকে ঘূর্ণাসমেত লক্ষ্য করার বাসনাই প্রবল বলিয়া বোধ হয়; তখন কাব্যে জীবনের অপর রস-রূপ—ট্র্যাজেডির উদ্ভব

হয়। কিন্তু উভয়ত্র সেই একই সমান, সুস্থ, normal কবিচিত্তের ক্রিয়াই আছে। সাহিত্যে আর এক প্রকার ট্র্যাজেডিও আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে জীবনের রস-রূপের পরিবর্ত্তে, মৃত্যুর অন্ধকারই ঘনাইয়া উঠে, আমাদের জীবাত্মার আর্ত্ত ক্রন্দনে আর সকল সুর ডুবিয়া যায়—নরনারীর অতিশয় একক পৃথক ব্যক্তি-চেতনা অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ট্র্যাজেডি নয়। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বতন্ত্র অনুভূতিই জীবনের বাস্তবকে আশ্রয় করিয়াছে—অনুভূতির প্রখরতা আছে, কল্পনার প্রসার নাই; ভাবাতিরেকের বিদ্রোহ আছে, প্রেমের প্রশান্তি নাই। ইহাতে সর্ব্বমানবহৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব নাই বলিয়া, বরং ব্যক্তির idiosyncrasy-ই অতিমাত্রায় প্রকট বলিয়া, এ কাব্য সর্ব্বকালীন ও সার্ব্বজনীন চেতনার অনুমোদন লাভ করিবে না। Sentiment বা ভাবাতিরেক যতই বাস্তবানুগ, এবং কল্পনা যতই সংযত হউক, এ ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি একদেশদর্শী বলিয়া জীবনের সমগ্র রূপ তাঁহার আয়ত্ত নহে। মানবজীবনের উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছিলেন যে কবি, সেই শেক্স্পীয়ার সম্বন্ধে এক মনীষী লেখকের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বড়ই সত্য—"He was the most living and least sentimental of authors"।

অতএব জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, যাহা আবহমানকাল মানুষের অন্তর তৃপ্ত করিয়াছে—তাহার দিকে চাহিলে সাহিত্যের এই স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না। হোমার, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, শেক্স্পীয়ার হইতে আমাদের বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, বড় বড় কবির সাহিত্যসৃষ্টিতে এই লক্ষণ যেখানে যতখানি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার দ্বারাই ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কার কতখানি, তাহা নিরূপণ করা যাইবে। যাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, তাহাতে মানুষ শুধুই মনোবিলাসের আনন্দ পায় নাই, মানুষের চিত্ত গভীরভাবে আশ্বস্ত হইয়াছে। সেই আশ্বাস উদ্রেকের পন্থা বিভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ সাহিত্যে জগৎ ও জীবন এমন সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতার উপকরণে রূপময় হইয়া উঠিয়াছে যে, সৃষ্টির রহস্যভার-বাস্তবের সকল সংশয়—বাস্তবের মধ্যেই সমাহিত হইয়া একটি অপরূপ অর্থের ব্যঞ্জনায় মানুষকে আশ্বস্ত করিয়াছে। এই আশ্বাস ও আনন্দের কারণ, মানুষ এই সাহিত্যের মধ্যে আপনাকেই সমস্ত মানবের সহিত একাত্মভাবে দেখিবার

শক্তি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই সকল কাব্যসৃষ্টিতে জীবনের রূপ এমন একটি সমগ্রতায় ফুটিয়া উঠে, যাহা বুদ্ধির আয়ত্ত নয়, কেবল অনুভবযোগ্য। বুদ্ধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানুষের গভীরতর চেতনায়, জীবনের এই রূপদর্শনে যে সংশয়মুক্তি ঘটে, তাহাতেই প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়; তাই অতিশয় মর্ম্মান্তিক কাহিনীও মধুর হইয়া উঠে; আবার, সত্য ও ন্যায়ের যে আধ্যাত্মিক সংস্কার মানুষের জন্মগত—কিন্তু যাহা জীবনের বাস্তব খণ্ড অভিজ্ঞতায় বার বার পীড়িত হয়, তাহা এই সাহিত্যের মধ্যেই চরিতার্থ হইয়া থাকে। এই আশ্বাস যেখানে নাই, দেহ-আত্মার দ্বন্দ্ব যেখানে মিটে নাই, সেখানে কবিকল্পনাই অসম্পূর্ণ—কেবলমাত্র আর্টের দোহাই দিয়া সে রচনা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। সৃষ্টিরও যেমন শেষ নাই, তেমনই কবিচিত্ত ও মানবহৃদয় তাহার সমকালব্যাপী,—এই তিনকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্য।) যুগবিশেষের ভাবধারায়, ব্যক্তিত্বের অভিমানে, বা সঙ্কীর্ণ রসিকমণ্ডলীর রুচি ও রসবোধের আদর্শে, সাহিত্য সীমাবদ্ধ নয়। অতএব সাহিত্যের প্রকৃত বিচার সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের চিত্তে হইয়া থাকে; সেই বিচারের উপর বুদ্ধিপ্রয়োগ করাই পণ্ডিতের কাজ, এবং পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত যে পরিমাণে সেই বিচারের অনুসরণ করিতে পারে, সেই পরিমাণেই তাহা যথার্থ, নতুবা তাহার কোন মূল্য নাই। এখানে কোন মতবাদ, কোন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত অভিমানের স্থান নাই। কবিচিত্ত যেমন সর্ব্বমানবচিত্তের প্রতিনিধি, সাহিত্য-বিচারেও তেমনই সর্ব্বমানবচিত্তের প্রতিনিধিত্ব চাই। এজন্য কাল ও নিরন্তর-প্রবাহিত মানবচিত্তই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারালয় হইয়া আছে। এ দিক দিয়া দেখিলে সাহিত্যের এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে; কারণ, এই সজ্ঞান ধারণার পূর্ব্বেই পাঠকের চিত্তে সে বিচার শেষ হইয়া যায়, জ্ঞানবিচারের পরোক্ষ প্রমাণের জন্য হৃদয়ের অপরোক্ষ অনুভূতি অপেক্ষা করিয়া থাকে না। "আগে দর্শনধারী, তারপর গুণ বিচারি"—এ বাক্য সাহিত্যের পক্ষেও অধিকতর সত্য। দর্শনে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সংবেদনায়, যাহা মুগ্ধ করে না, তাহার গুণবিচার অনাবশ্যক। এজন্য সাহিত্যের সমালোচনা অনেক স্থলেই "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং", অথবা অরসিকেরই রসোদ্গার। তথাপি কাব্যজিজ্ঞাসা ক্রমেই একটা বড় জিজ্ঞাসা হইয়া উঠিয়াছে—কবিকর্ম্মের বৈচিত্র্য ও কবিপ্রেরণার পরিধি যত বাড়িয়াছে, ততই এক দিকে যেমন রুচিভেদ, অপর

দিকে তেমনই আদর্শ-নির্ণয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। পরিশেষে সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল প্রাদুর্ভাবে, এমনই অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে যে, কাব্যের আদি প্রবৃত্তি ও আদর্শকে সকল অসাহিত্যিক মতবাদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য এ কালে সৃষ্টি অপেক্ষা সমালোচনার প্রয়োজন বাড়িয়াছে। কিন্তু এ জিজ্ঞাসার শেষ নাই, যেটুকু নির্দ্দেশযোগ্য তাহারই বিচারণা আছে—মীমাংসার সঙ্কেত আছে, সিদ্ধান্ত নাই; তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইত। এতকাল ধরিয়া ইহার যে চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহাতে যে কয়টি পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে, আমি এক্ষণে তাহারই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

৫

সাহিত্যবিচারের জন্য বহুপূর্ব্বে যে শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে আমাদের দেশে ও য়ুরোপে, উভয়ত্র—কতকগুলি সূত্র বা বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং সকলের মধ্য দিয়াই একটি তত্ত্ব ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন যুগে, য়ুরোপীয় ও ভারতীয় উভয় কাব্যশাস্ত্রে, কবিকর্ম্ম-সম্বন্ধে যে ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কাব্যের সহিত প্রাকৃত সৃষ্টির—কবিকল্পনার সহিত জীবনের—যেটুকু যোগ স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা হইতে আধুনিক কালের ধারণা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কবির রচনা বাস্তবের প্রতিলিপি বা অনুকৃতি হিসাবেই একটি আর্ট, এবং সেই আর্টের সাফল্য নির্ভর করে কতকগুলি সুপরীক্ষিত রচনাপদ্ধতির উপরে—ইহাই যেমন অবশেষে য়ুরোপীয় কাব্য-বিচারের প্রধান সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই আমাদের দেশে কাব্যসাধনাকে জীবনের বা জগতের বাস্তব হইতে অনেক পরিমাণে মুক্তি দিলেও, রচনার বহিরঙ্গ-বিষয়ে আরও সূক্ষ্ম কলাকৌশলবিধির সৃষ্টি হইয়াছিল; শব্দার্থের প্রকৃতি ও সম্বন্ধ লইয়া দর্শন ও ব্যাকরণের মীমাংসা; শব্দযোজনা-রীতির দোষ-গুণ, সুন্দর বচনভঙ্গিমা, বা নানা শব্দালঙ্কারসৃষ্টির নিগূঢ় কৌশল—কাব্যের আত্মা, দেহ, অলঙ্কার প্রভৃতির সূক্ষ্ম ভেদনির্দ্দেশ—এ সকলই কাব্য-বিচারের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। ইহার ফলে আমাদের কাব্যশাস্ত্রে কল্পনা বা কবিদৃষ্টি এবং তাহারই বিষয়ীভূত যে জগৎ ও জীবন, তাহা গৌণ হইয়া উঠিল; এবং শেষে কাব্য

জীবনেরই রূপসৃষ্টি না হইয়া রসাত্মক বাক্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এই শাস্ত্র অনুসারে সাহিত্য কোন অর্থে জীবনের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ নয়—জীবনেরই গভীরতর রূপের প্রতিচ্ছায়া নয়। কাব্যকে বাস্তব জীবনানুভূতির ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া, কতকগুলি conventions বা কৃত্রিম বিধি-বিধানের সংস্কার অনুসারে তাহার রচনা ও সম্ভোগ—একরূপ চিত্তচমৎকারের মানস-উদ্যান-সৃষ্টিই হইল কাব্যের আদর্শ। ইহাও সাহিত্যের আর্টবাদ; তাই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র আর এক দিক দিয়া যে গভীর তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিল, তাহা সাহিত্য-বিচারের অনুকূল নয়—তাহা নির্ব্বিশেষ রসতত্ত্ব, বা Aesthetics-এরই সগোত্র। এই রসতত্ত্ব যে সময় হইতে সাহিত্যের বিচারাসন অধিকার করিয়াছে, তখন হইতে সাহিত্যেরও অবনতি ঘটিয়াছে; সাহিত্যকে জীবন হইতে কৃত্রিম রসবিলাসের ক্ষেত্রে তুলিয়া ধরায় তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে; কবিচিত্তের তেমন স্ফূর্ত্তি আর নাই। সাহিত্যকে এক অতি অসাহিত্যিক শাসনের অধীন করিয়া তাহার আদর্শ বিচার করিবার চেষ্টা, আমাদের দেশে, এখনও বিংশ শতাব্দীতে বন্ধ হয় নাই; এখনও, যাহারা পণ্ডিতমাত্র, অর্থাৎ পুথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র সম্বল—যাহাদের কোন প্রতিভাই নাই, তাহারাই শাস্ত্রের চর্ব্বিতচর্ব্বণকে পুনরপি চর্ব্বণ করিয়া, সাহিত্যবিচারের নামে নিজেদেরই পাণ্ডিত্য-অভিমান চরিতার্থ করিতেছে।

কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্যবিচারের ধারা একই খাতে বহিয়া শেষে রুদ্ধ হইয়া গেলেও, য়ুরোপের জীবন্ত সমাজে তাহা নব নব সৃষ্টির অনুসরণ করিয়া নানা স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। সেখানে প্রথম হইতেই জীবনের সহিত—বহিঃপ্রকৃতি ও প্রত্যক্ষ বাস্তবের সহিত—সাহিত্যের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল; সাহিত্যের সৃষ্টিতেও যেমন, সমালোচনাতেও তেমনই, সাহিত্যের আর্ট রসতত্ত্বের এমন শূন্যবাদে পৌঁছিতে পারে নাই। তারপর, একদা যখন সেই সমাজে জীবন ও জগতের রহস্য আরও বড় হইয়া দেখা দিল, এবং সাহিত্যে সেই রহস্য-বিকাশের অন্ত রহিল না, তখন কিছুকাল সাহিত্যবিচারের চেষ্টাও স্থগিত ছিল, কোন নব্য পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, সাহিত্য যখন কোন জাতির জীবনে জীবন্ত হইয়া উঠে, তখন পণ্ডিতী-বিচারের অবকাশ থাকে না; আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যের প্রথম ও প্রকৃত বিচার মানুষের চিত্তেই হইয়া থাকে—কেতাবে পুথিতে নয়। মধ্যে আবার এই সৃষ্টি-প্রেরণা

মন্দীভূত হইয়া শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ও যুক্তিবাদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে, কবিকল্পনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়ঘোষণা হইল, এবং কবির দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়া জীবনকে এক নূতন মহিমায় মণ্ডিত করিল। এইকালেই কবিমানসের এই নূতন প্রবৃত্তি যে সকল প্রশ্নের সৃষ্টি করিল, তাহা হইতে নূতন করিয়া কবিপ্রতিভা ও বহিঃসৃষ্টি, অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষ-তত্ত্ব—ভাবুকের ভাবনা অধিকার করিল; এ বিষয়ে কবিদের সাক্ষ্যও অল্প সহায়তা করিল না। কিন্তু এই সকল আলোচনায় কবিপ্রতিভার মাহাত্ম্য ও কাব্যসৃষ্টির রহস্যই সুগভীর হইয়া উঠিল, এবং কাব্যবিচার—মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-দর্শনের সীমান্তবর্ত্তী হইয়া উঠিল। অতঃপর এই শতাব্দীর শেষভাগে সৃষ্টির নিয়তিনিয়মের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেই এক নূতন দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হইল, এবং মানব-চেতনার সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকে একই তত্ত্বের অধীন করিয়া Aesthetics বা রসতত্ত্বের নূতন ভিত্তি-স্থাপনা হইল। শোপেন্‌হাওয়ার হইতেই এই নূতন রসতত্ত্বের সূচনা হয়, এবং বেনেদেত্তো ক্রোচের মনীষায় ইহা স্ফুটতর ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। সাহিত্যসৃষ্টির সম্বন্ধেও এই নূতন দার্শনিক চিন্তা এমন এক বিচারপদ্ধতির সন্ধান দিয়াছে—রূপ ও ভাবের এমন অভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, সাহিত্যের আর্টবাদই সৃষ্টিবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সৃষ্টি ভাগবতী সৃষ্টির মতই বিশেষের সৃষ্টি, প্রত্যেক রচনাই আপন বিশিষ্ট রূপে উজ্জ্বল। কবির অনুভূতি একটা প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলিয়াই রূপাত্মক; এবং সকল রূপই বিশেষের রূপ, রূপ কখনও নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। কবির নিজ চিত্তের প্রকৃতি অনুসারে এই বিশেষের বিশেষত্ব ঘটে; তাহাতে কাব্যসৃষ্টির তারতম্য হয় না; কারণ সকলই রূপ,—কাব্যে সেই রূপের যথাযথ প্রকাশই নিখুঁত সৃষ্টি। ইহাই সাহিত্যবিচারের আধুনিক ষ্টাইল-তত্ত্ব। ইহার অনুসরণে সাহিত্যের এই সৃষ্টিধর্ম্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে—এক দিকে যেমন ভাব, ও রূপের অভেদ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং তাহাতে কবিদৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ জগৎ-চৈতনাকে যুক্ত করা হইয়াছে, তেমনই, কবিকল্পনাকে স্বাতন্ত্র্যগৌরবও দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রের কৃত্রিম বিধিবন্ধন যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তেমনই আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ-প্রণালীও বর্জ্জিত হইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক কবিকর্ম্মই স্বতন্ত্র বা অনন্যসদৃশ; এজন্য তুলনা দ্বারা, সাধারণ লক্ষণ

ধরিয়া খাঁটি সাহিত্যিক সৃষ্টির শ্রেণীবিভাগ চলে না। রচনাবিশেষের প্রেরণা সত্য ও সম্পূর্ণ কি না—রচনাগত রূপের মধ্যে তাহার প্রমাণ আছে; যদি রচনার সর্ব্ব অঙ্গে একটা বিশিষ্ট রূপ-সামঞ্জস্য থাকে, তাহা হইলেই সে রচনার প্রেরণা মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ নয়, রচনা সার্থক হইয়াছে। সাহিত্যসৃষ্টির এই ষ্টাইল-তত্ত্বও সাহিত্যের আর্টকে স্বীকার করে; কিন্তু good art ও great art-এর প্রভেদও স্বীকার করে; যাহা great art-এর পর্য্যায়ভুক্ত, সেই সাহিত্যে ষ্টাইলের রহস্য আরও গভীর; কারণ, তাহাতে জীবনের বিরাট ও বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে; তাহাতে কেবল অনবদ্য প্রকাশ-কৌশল নয়—যাহা প্রকাশিত হইতেছে, তাহারও বিশিষ্ট গৌরব চাই। আমিও সাহিত্যকে সাধারণ অর্থে আর্ট বলিতে কেন কুণ্ঠিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কোন একটা বিশেষের রূপ-সামঞ্জস্য হইলেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি হইবে না, জীবনের একটা সমগ্র রূপের ছায়া—অঙ্গবিশেষের নয়, সমগ্র দেহের কান্তির মত—তাহাতে ফুটিয়া উঠা চাই; নতুবা তাহা আর্ট মাত্র, উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়। এই সৃষ্টিতত্ত্বকে আমি যে কায়া-কান্তিবাদ নাম দিয়াছি, তাহারও এই অর্থ করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে সাহিত্য-বিচারের আর এক পদ্ধতির কথা বলিব। এই পদ্ধতি অনুসারে সাহিত্যকে রচনার দিক হইতে বিচার করা হয় না; অর্থাৎ, রূপসৃষ্টি হিসাবে তাহা কতখানি সার্থক হইয়াছে—নিখিল কাব্যকলার আদর্শ তাহাতে কতখানি পরিপুষ্ট হইয়াছে, এবং জগৎ ও জীবনের কতখানি সুবলয়িত ও সর্ব্বজনহৃদয়গ্রাহী রূপে চিত্রিত হইয়াছে—সে বিচার করা হয় না; লেখকের দিক হইতে, তাঁহারই ব্যক্তিমানসের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়া, রচনাবলীর মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা হয়। ইহাও সাহিত্যের সাহিত্যিক বিচার নয়, কারণ ইহাতে সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা কবিমানসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়,—কাব্যবিচারে জগৎ ও জীবনের রূপ বড় না হইয়া কবির মনোজগতই বড় হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যে ষ্টাইল-তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, ইহা তাহারই আতিশয্যঘটিত পরিণাম। একালে এইরূপ পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এক্ষণে কবিকল্পনা অতিশয় অন্তর্মুখী ও আত্মনিষ্ঠ হইয়াছে, এজন্য কবিচিত্ত এখন আর সর্ব্বমানব-চিত্তের প্রতিনিধি নহে; অতএব সার্ব্বজনীন জীবনানুভূতিই এখন আর কাব্যের আদর্শ নহে। এই ভাবতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা পূর্ব্বেও সবিস্তারে বলিয়াছি।

৬

সাহিত্য-বিচারের কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলিলাম। তথাপি বার বার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যের প্রকৃত বিচার এইরূপ কোন পদ্ধতিতেই চূড়ান্ত হইতে পারে না। যুগ পার হইয়া যুগান্তরে যে সাহিত্য বাঁচিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহা কালের ও চিরন্তন মানবচিত্তের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সকল পদ্ধতি তাহার সাক্ষ্য মান্য করিয়াই আপনার মান রক্ষা করিতে পারে। এই কষ্টিপাথরে কষিত হইয়া কত এককালের উৎকৃষ্ট রচনা দীপ্তি হারাইয়াছে; এবং, এত পদ্ধতি সত্ত্বেও একালের পণ্ডিতেরা কোনও আধুনিক শ্রেষ্ঠ কাব্যের অমরতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু তথাপি সাহিত্যের বিচার কোন কালে বন্ধ হইয়া থাকে না—বিচার চলিতেছে, কষ্টিপাথরে দাগ পড়িতেছে, সেই দাগই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে কালান্তরে। আস্তিক্য-বুদ্ধি, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, মানব-প্রীতি—ও সেই সঙ্গে ভাষার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে একটি সহজাত সংস্কার, যে ব্যক্তি বা জাতি বা সমাজের মধ্যে দেখা দেয়, সেইখানেই যেমন সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা ঘটে, তেমনই সেই সৃষ্টির স্বাদ বুঝিবার মত লোকেরও অভাব হয় না। বিচার করিবার পূর্ব্বেই সাহিত্য বুঝিতে পারা চাই; যেখানে বিচার আগে—পরে সাহিত্যের রসাস্বাদন, সেখানে বিচারই নিষ্প্রয়োজন, অথবা তাহা সম্ভব নহে। এইজন্য আমি এইরূপ বিচারপদ্ধতিকে আমার এই আলোচনায় সর্ব্বাগ্রে স্থান দিই নাই। আমি, মুখ্যত, সাহিত্যের আদর্শ ও তাহার মূল প্রবৃত্তির কথাই বলিয়াছি; তাহাতে এইটুকুমাত্র ফললাভের আশা করি যে, আজিকার এই আদর্শবিপর্যয়ের দিনে যাঁহাদের সহজ সাহিত্যবোধ আছে, তাঁহাদেরও দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন না হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার আছে। আমি সাহিত্যের যে খাঁটি আদর্শ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই আদর্শের উৎকৃষ্ট সাহিত্য এক একটা যুগেও অতি অল্পই সৃষ্টি হইয়া থাকে—শতাব্দীকালেও একাধিক মহাকবির উদয় হয় না। ইহা ভাবিয়া দেখিলে, আমাদের সাহিত্যের এই বর্ত্তমান অজস্রতার মূল্য কি, তাহা অনুমান করা দুরূহ হইবে না। সাহিত্যের নামে অক্ষমতার এই উন্মাদ-সুলভ অনাসৃষ্টি জাতির দুর্ব্বলতাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমি প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির যে লক্ষণ ও কবিচিত্তের যে পরিচয় বিস্তারিতভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি, ততদূর চিন্তা

না করিয়া অতি সহজেই এই সকল রচনার ব্যর্থতা প্রমাণ করা যায়। প্রথমত, এইজাতীয় সাহিত্যে জীবনের যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহা বাস্তবও নয়, আদর্শও নয়; তাহার বিরূপতাই সকল সুস্থ চিত্তকে আঘাত করে। এ যেন চিরপরিচিত বস্তুকে আরও পরিচিত না করিয়া অপরিচিত করিয়া তোলা!—একের দুঃস্বপ্ন অপরের মস্তিষ্ক পীড়িত করিয়া তোলে। এই অতিশয় মিথ্যাকেও স্বীকার করিয়া লওয়াইবার জন্য, বিকৃত দৃষ্টিকে প্রতিভার লক্ষণ এবং বিসদৃশকে অনন্যসাধারণ বলিয়া দাবি করা হয়। আসলে, ইহা normal বা সুস্থ নয়, অতএব প্রতিভার প্রধান লক্ষণ ইহাতে নাই। আরও প্রমাণ—এই সকল রচনার ষ্টাইল নাই। অতএব রচনাহিসাবেই এগুলি বিকলাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ; ভাষাও যেমন অপরিচ্ছন্ন, ভাব তেমনই অপরিপুষ্ট—কল্পনার কোন কেন্দ্রগত ঐক্য নাই। ইংরেজীতে যাহাকে authentic বলে, ইহাদের অনুভূতি সেইরূপ authentic বা সমূলক নয়। বেশ বুঝিতে পারা যায়, যাহা বর্ণিত হইতেছে, তাহাতে প্রচুর ভান বা ফাঁকি আছে, প্রত্যক্ষ-দর্শনের উপলব্ধি তাহাতে নাই; এজন্য ভাষার সকল প্রসাধনই কৃত্রিম। এই কৃত্রিমতার জন্যই এই সকল রচনার কোন ষ্টাইল নাই। যাহা দেখি নাই, অর্থাৎ যাহার সম্পূর্ণ প্রকাশ অন্তরে হয় নাই, বাহিরেও তাহার প্রকাশ অসম্পূর্ণ হইবেই। দৃষ্টি না হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না; আবার সৃষ্টি যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ এই ষ্টাইলের অভাব। এজন্য, পূর্ব্বে যে ষ্টাইল-তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, তাহাকে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ বলা যাইতে পারে, এবং সাহিত্য-বিচারে এই তত্ত্বের বিশেষ উপযোগিতাও স্বীকার করিতে হয়। এই দৃষ্টিই কবিদৃষ্টি, এই শক্তিই প্রতিভা; যেখানে সেই দৃষ্টি ঘটিয়াছে, সেইখানেই রচনায় সৃষ্টির সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবে।

কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বস্তু—এই সকল রচনার দূষিত ভাষা; অথচ ভাষাই রচনার সর্ব্বস্ব। যিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেন, তাঁহার সবচেয়ে বড় সাধনা বা তপস্যা ভাষাকে লইয়া; সাহিত্য যদি একটা আর্ট হয়, তবে শুধু এই অর্থেই। তাই ভাষার বিষয়ে সাহিত্যশিল্পীর যত্ন ও ভাবনার অন্ত নাই। কিন্তু আধুনিক লেখকগণের ভাষা সম্বন্ধেই ভাবনা সব চেয়ে কম; তাহার কারণ, যে-দৃষ্টির বলে সৃষ্টির প্রেরণা জাগে, সে দৃষ্টি ইহাদের নাই, এবং সেইজন্য কোন-কিছুকে সম্পূর্ণ রূপ দিবার প্রয়োজনই হয় না; যদি সে প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে ভাষার

দুয়ারে সাধ্য-সাধনা করিতেই হইত। অতএব, সাধারণ পাঠকের পক্ষে সাহিত্য-বিচারের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়—রচনার ভাষাটিকে মাত্র পরীক্ষা করা, এবং সে বিষয়ে ইহাই মনে রাখা যে, mannerism বা কৃত্রিম ভঙ্গিমা—অথবা ব্যাকরণ, অভিধান ও ইডিয়মের বিরুদ্ধাচরণ—ইচ্ছাকৃত হইলেও, স্বতন্ত্র ষ্টাইলের লক্ষণ নয়; তাহা লেখকেরই অক্ষমতা ও অযোগ্যতার নিঃসংশয় প্রমাণ। মনে রাখিতে হইবে যে, যে-রচনাকে আমরা সাহিত্যিক সৃষ্টি বলি, তাহা কোন মত, তথ্য বা তত্ত্ব-প্রচারের বাহন নয়, তাহা তর্কবিতর্ক নয়—কাহিনী; তাই পরিস্ফুট, পরিচ্ছন্ন ও সুডৌল ভাষাই তাহার সর্ব্বস্ব। এই ভাষার দোষ থাকিলে বুঝিতে হইবে, লেখকের লেখক-জন্মই সত্য নহে, এবং রচনাও সাহিত্যপদবাচ্য নয়।

তথাপি, এই কালের এই কৃত্রিম রচনারাশির মধ্যে এমন রচনাও বিরল নয়, যাহাতে লেখকের শক্তির নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। যদিও ইঁহাদের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, অনুভূতি সংশয়ক্লিষ্ট, ও কল্পনা সঙ্কীর্ণ, তথাপি ইঁহারাই সাহিত্যসাধনার ধারাটিকে এখনও রক্ষা করিতেছেন। খাঁটি সৃষ্টিশক্তির পরিচয় না দিলেও, ইঁহারা জগৎ ও জীবনের অনেক অনাবিষ্কৃত তীর্থ এবং মানব-মনের অনেক নূতন ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সন্ধান দিয়াছেন। আমাদের দেশে এ যুগেও এমন যে দুই চারিজন লেখকের সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি, তাঁহাদের রচনাতেই কবিচিত্ত ও সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া থাকি।

সর্ব্বশেষে আমি দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা শেষ করিব আধুনিক সাহিত্যের আদর্শ ও মূল্য সম্বন্ধে এক বিখ্যাত ইংরেজ লেখিকার উক্তি এইরূপ—

"It seems that it would be wise for the writers of the present to renounce the hope of creating masterpieces. Their poems, plays, biographies, novels are not books but note-books, and time like a good schoolmaster, will take them in his hands, point to their blots and scrawls and erasions, and tear them across; but he will not throw them into the waste-paper basket. He will keep them because other students will find them very useful. It is from the note-books of the present that the masterpieces of the future are made."

অপরটি আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের উক্তি, তিনিও বলেন—কিন্তু সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বড় নয়, সকল সমাজও বড় নয়, এবং এক একটা সময় আসে, যখন ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহে মানুষকে ছোট করিয়া দেয়, তখন সেই দুঃসময়ের বিকৃত দর্পণে ছোট বড় হইয়া দেখা দেয়, এবং তখনকার সাহিত্যে মানুষ আপনার ছোটকেই বড় করিয়া তোলে—আপনার কলঙ্কের উপরেই স্পর্দ্ধার সঙ্গে আলো ফেলে। তখন কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব্ব, এবং টেনিসনের আসনে কিপ্লিঙের আবির্ভাব হয়।

"কিন্তু মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি ত সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোট তাহা গলিয়া ধূলায় পড়িয়া ধূলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিষই টেঁকে—যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এমনি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায়, তাহা মানুষের সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ধন।

"এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের, একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যের হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শমতই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি, তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।"

আষাঢ়, ১৩৪৭

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হইয়াছে। এ ধরণের গ্রন্থ-প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি নূতন যুগের সূচনা করিতেছে; কেন তাহাই বলিব। যাহা বিগত হইয়াছে তাহার প্রতি বাঙালীর মমতাও প্রায় বিগত হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমানের উপাসক, আমাদের ঐতিহাসিক চেতনা নাই বলিলেই হয়। সম্ভবতঃ পলিমাটির দেশ বলিয়াই আমাদের জীবনের কোন ভাগে কোনও বনিয়াদ পাকা হইতে পারে না—মাটির উপরেও যেমন কোন চিহ্ন থাকে না, মনের ভিতরেও তেমনই কোনও স্মৃতি পুষিয়া রাখি না। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই আমরা জোর করিয়া আমাদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন হইতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই, সেই চেতনার যাহা প্রধান সহায়—সেই অতীতের স্মৃতি, পিতৃ-গণের পরিচয় উদ্ধার করিতে পারি নাই; সে রুচি নাই, সময় নাই। আমরা কালের ধ্যান করি, ভূত-ভবিষ্যতের হিসাব আমরা করি না—ভবিষ্যতের উৎসাহ নাই, বর্ত্তমানের উত্তেজনা আছে। তাই বেশী দিন নয়,—গত শতাব্দীর যে ইতিহাস, যাহা এখনও এ যুগ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং যে যুগ গত সহস্রবৎসরের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে —সেই যুগের যাহা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—সেই সাহিত্যও আমরা ভুলিতে চাহিয়াছি। এক একটি বিরাট পুরুষরূপে, মনীষায় ও প্রতিভায়, যাঁহারা এ জাতির নূতন জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বাণী বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা আমরা করি নাই, সে সাহিত্য ক্রমেই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

এতদিন পরে আজ আমরা সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার যে পরিচয় পাইতেছি তাহা যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমনই আশাপ্রদ। প্রাচীন-সাহিত্যের সম্পর্কে কিছু কাজ বহুপূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে-সাহিত্য জীবন্ত—যাহার রসধারায় পুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই, যাহাকে এখনও ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ হয় নাই, এবং না বুঝিয়া লইলে বর্ত্তমানের সংশয় ঘুচিবে না,—সে সাহিত্যের আদি

সৃষ্টিগুলিকে এ পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর ধূলিস্তর হইতে কেহ উদ্ধার করেন নাই; বিকৃত, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাহাদের পরিচয় একরূপ অজ্ঞাত হইয়াই আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থাবলী সেই অভাব-মোচনের প্রথম উদ্যম—ঠিক এইভাবে এমন কাজ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করে নাই; তাই বলিয়াছি, ইহা এক নূতন যুগের সূচনা করিতেছে।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর এই প্রথম খণ্ডে বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদি-রূপটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সাহিত্যিক মূর্ত্তি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার চিরপরিচিত প্রতিকৃতিকেও অ-পূর্ব্বপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি যে কেবল বাংলা গদ্যের আবিষ্কর্ত্তা নহেন, পরন্তু তাঁহার রচনা যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সর্ব্বগুণান্বিত ক্লাসিক,—'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি' হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার আত্ম-জীবনচরিত পর্য্যন্ত পাঠ করিলে প্রতি-পত্রে ও প্রতি-ছত্রে তাহার প্রমাণ মিলিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার সহিত পরিচয় নাই এমন শিক্ষিত বাঙালী কে আছে? তথাপি এই গ্রন্থের পাতাগুলি একটির পর একটি উল্টাইয়া পড়িবার কালে যে রস আস্বাদন করিলাম, ইহার ভাষায় যে একটি মৃদু-মধুর কস্তুরী-সৌরভ অনুভব করিলাম, তাহার কারণ কি? ইহার বাক্যগুলিতে এমন একটি নির্ম্মল প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধ-গম্ভীর মাধুর্য্য আছে, যাহা বাংলা গদ্যের আজিকার এই বিচিত্র-বিকাশের পরেও একটি বিশিষ্ট ও দুর্ল্লভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। মনে হইল, এতদিন পরে একটি বস্তুর প্রকৃত পরিচয় পাইলাম, যে বস্তু—বাংলা গদ্যসাহিত্যের—রোমান্টিক নয়, খাঁটি ক্লাসিক্যাল রীতি; এ বস্তু যদি না, থাকিত, তবে বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অভাব থাকিয়া যাইত। গ্রন্থাবলীর সাহায্যে, এক সঙ্গে এমন করিয়া সাজাইয়া না দিলে, কোন লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভার সম্যক পরিচয় সম্ভবপর হয় না।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর এই 'সাহিত্য'-ভাগ নূতন করিয়া পড়িতে হইবে—কেমন করিয়া বাংলা গদ্যের জন্ম হইয়াছিল তাহাই আজ এই পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে সবিস্ময়ে উপলব্ধি করিতে হইবে। যাহা ছিল না তাহা সৃষ্টি করা যে কত বড় প্রতিভার কাজ—'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র ভাষা তাহারই পরিচয় দিতেছে। এই ভাষা যাঁহার প্রাণে ও কানে এক নূতন ধ্বনিরূপ অঙ্কুরিত করিয়াছিল,

তাঁহার চিত্ত কোন ছাঁচে গঠিত ছিল, আজ তাহা বুঝিতে পারি। সেকালে, তাঁহার জীবদ্দশায়, বিদ্যাসাগরচরিত্রের সেই সারস্বত-রূপ কেহ দেখিবার অবকাশ পায় নাই—পর্ব্বতের শিখরই সকলে দেখিয়াছিল, সানুদেশ দেখে নাই। কত বড় সাধনা ও রসবোধ থাকিলে তবে ভাষার এই শুদ্ধ-সংযত শ্রী, ও মধুর-গম্ভীর ধ্বনি আয়ত্ত করা যায়, তাহা আজিকার দিনেই বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে পারি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যে দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির সমন্বয় হইয়াছিল—যাহার মত আশ্চর্য্য ঘটনা সে যুগের ইতিহাসে আর নাই—তাহারই ফলে, বাংলা গদ্যে এই রূপ এমনভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের—অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির—অতিশয় পেলব ও মার্জ্জিত, শুদ্ধ ও সংযত রস-নৈপুণ্যের সঙ্গে আধুনিক মনোবৃত্তির অনুযায়ী যুক্তিনিষ্ঠা, পরিমাণ-বোধ ও স্বাভাবিকতা, এই দুইয়ের মিলন ঘটিয়াছে—এই রচনার ষ্টাইলে। সংস্কৃত কবিগণের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল তাহাই আধুনিক আদর্শে, যুগপ্রবৃত্তির শাসনে সংযত হইয়া বাংলাভাষার নবরূপ নির্ম্মাণের প্রেরণা হইয়াছিল; মধুসূদন দত্ত কান ও প্রাণের যে সাধনায় বাংলা অমিত্রচ্ছন্দ আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন, বিদ্যাসাগরও আর এক পথে তেমনই সাধনার ফলে এই গদ্যচ্ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাষার সঙ্গীতগুণই যে সাহিত্যসৃষ্টির আদি প্রেরণা, তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, বাংলাগদ্যের রূপটি উদ্ধার করিতে কোন্ নিগূঢ় শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যের ছন্দ-ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই উপরে বঙ্কিম ও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কারুকীর্ত্তির অশেষ নিদর্শন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্য-রচনা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র ভাষা মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এই মহাপুরুষের মহত্ত্ব তাঁহার অপর কীর্ত্তিনিচয়কে আশ্রয় করিলেও, তিনি তাঁহার অশ্রান্ত অবকাশহীন কর্ম্মজীবনে বাংলাসাহিত্যের সম্পর্কে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিণত লেখনীর লিপি-কৌশলের কথা বলিব না, কিংবা তাঁহার ভাষার নানা ভঙ্গির কথাও বলিব না; এই গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত পড়িলে, ভাষাকে অবলীলাক্রমে যে-কোন ছাঁচে ঢালিবার সেই শক্তি সকলেই লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইবেন। আমি কেবল তাঁহার এই প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল

পঞ্চবিংশতি' হইতে একটি বাক্যচ্ছন্দের উদাহরণ দিব। ইহার শব্দাড়ম্বর লক্ষ্য না করিয়া—লেখকের প্রাণ যে শব্দার্থনিরপেক্ষ সুর-মহিমায় অভিভূত হইয়াছে, এবং কান সেই সুরকে ভাষায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাহাই লক্ষ্য করিতে বলি। এইরূপ বাক্যযোজনার মোহ তাঁহার রচনায় মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইলেও এমন দৃষ্টান্ত অধিক নাই। আমি যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রাণের গূঢ় রূপটি অসম্বৃত হইয়া পড়িয়াছে।

একই ঘটনা কাহিনীর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে দুইবার বিবৃত হইয়াছে; প্রথমবারের কথাগুলি এইরূপ—

তথায় তিনি, রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শনাদি করিয়া নির্গত হইলেন; এবং সমুদ্রে দৃষ্টিপাত মাত্র দেখিতে পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে এক অদ্ভুত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া, এক পরমসুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী, হস্তে বীণা লইয়া, মধুর কোমল তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। (বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য, পৃঃ ৬৮)।

এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ অন্যরূপ—

যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্র, দুর্ব্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংসবিধান বাসনায়, মহাকায় মহাবল কপিদল সাহায্যে, শতযোজন বিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর, লোকাতীত কীর্ত্তিহেতু, সেতু সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন—তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল; তদুপরি এক পরমসুন্দরী রমণী, বীণাবাদনপূর্ব্বক, মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। (ঐ, পৃঃ ৬৮-৬৯)।

পূর্ব্বের ঐ ভাষাই যথার্থ ও পরিমিত—বাক্যরচনা হিসাবে অনবদ্য। পরবর্ত্তী রচনায় লেখক বিষয়-বস্তুকে যেন অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র ভাষার সঙ্গীত-তরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আদর্শ গদ্য ইহা নহে, কারণ ইহাতে শব্দ-অর্থের পরিমাণ-সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু ইহাতে যতি-তাল-সংযোগে কি অপূর্ব্ব ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে—একটি অখণ্ড সুর অল্প-পরিসরের মধ্যে পূর্ণবিকশিত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে! এই শক্তি যাঁহার ছিল তিনি বালকপাঠ্য গদ্যও লিখিয়াছেন—'কথামালা'র মত অতি-সরল মিতাক্ষর ভাষায়, সেইজাতীয় একখানি ইংরাজী ক্লাসিকের অনুবাদ করিয়াছেন! এই যে প্রতিভা ইহার সাহিত্যিক পরিচয় আবার ভাল করিয়া করিতে হইবে। বিদ্যাসাগরকে এই দিক দিয়া চিনিবার বিশেষ

প্রয়োজন আছে, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়-মনের যে প্রতিবিম্ব আছে তাহা আরও উজ্জ্বল ও অভ্রান্ত।, 'কথামালা'র সম্বন্ধে একটি যে প্রশ্ন আমার মনে জাগিয়াছে তাহা এইখানে বলিয়া রাখি। ইংরেজীতে James-এর Aesop's Fables একখানি ক্লাসিক হইয়া আছে; মূল গ্রীক কেমন জানি না, কিন্তু এই অনুবাদ নাকি মূলকে অনুসরণ করিয়াই এমন উপাদেয় হইয়াছে; সে যাহা হউক, ইহার ইংরাজী ভাষা ও রচনাভঙ্গি অতিশয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অনুবাদে এই পুস্তকই ব্যবহার করিয়াছিলেন মনে হইবার কারণ আছে, এবং তাঁহার অনুবাদের ভাষাও এমন সরল সংহত ও বিশুদ্ধ যে, ইংরাজীর মত এই বাংলা অনুবাদের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এজন্য আমার মনে হয়, এই পুস্তকখানি স্কুলপাঠ্য হইলেও বর্ত্তমান খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করা যাইত। এবং তাহা হইলে একদিকে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও অপরদিকে 'কথামালা'র ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপিচাতুর্য্যের দুই বিভিন্ন ভঙ্গিও যেমন সহজে চোখে পড়িত, তেমনই ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার রুচি বা অভিপ্রায়ের আরও একটি সাক্ষ্য হইয়া উঠিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—এই ভাষাই যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদি সাধুভাষা তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি এই গ্রন্থাবলীতে তাঁহার ষ্টাইলের যে কালানুক্রমিক বিকাশ লক্ষ্য করিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং তাহার পরেই 'শকুন্তলা'য় আমরা ভাষার যে রূপ দেখিতে পাই তাহা বাংলারই সাধুরূপ—যেমন বিশুদ্ধ তেমনই প্রাঞ্জল। শকুন্তলায় কথোপকথনের ভাষা—বিশেষতঃ নারী-চরিত্রগুলির—একেবারে খাঁটি বাংলা বলিলেই হয়। কিন্তু 'সীতার বনবাসে' দেখিতেছি, ভাষার সে লঘুলীলা আর নাই—সে ভাষা শুধুই সাধু নয়, গুরু-ভাষা। 'শকুন্তলা'য় কালিদাসের, এবং 'সীতার বনবাসে' ভবভূতির—ভাব ও ভাষার আবহাওয়াই ইহার কারণ নয়, এই দুই রচনার মধ্যে যে আর একটি বৃহত্তর রচনার ব্যবধান রহিয়াছে তাহাই ইহার কারণ। এই রচনা—মহাভারতের অনুবাদ; এবং ইহাই এই খণ্ডের বৃহত্তম রচনা। ইহার পূর্ব্বের দুইখানি গ্রন্থে তিনি ভাষার যে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, এখানে তাহা করিতে পারেন নাই। মূলের ভঙ্গি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি পদবিন্যাসে

সংস্কৃতের রীতি স্বীকার করিয়াছেন; ইহার ফলে, মহাভারতের ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া উঠিয়াছে—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদেও সেই আদর্শ বজায় আছে। আমার মনে হয়, এইভাবে মহাভারত অনুবাদ করার ফলে, অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা সংস্কার বা অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছিল, এবং 'সীতার বনবাস' বা 'রামের রাজ্যাভিষেক' রচনাকালে তিনি এই আদর্শ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 'ভ্রান্তিবিলাসে'র ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল ও প্রাঞ্জল হইলেও বিষয়-বস্তুর তুলনায় উহা আরও লঘু হইতে পারিত। কিন্তু এ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই নয় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার শেষ পরিণতি বা বিকাশ ঐরূপ দাঁড়াইয়াছিল, এবং ইহাই তাহার কারণ। বরং বিদ্যাসাগরের ভাষা ও ভঙ্গির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিলে, আমি উপরে যে-ভাষার সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহাই বিদ্যাসাগরী ভাষার একমাত্র আদর্শ নয়,—ইহাই আমার বক্তব্য।

বর্ত্তমান খণ্ডে তাঁহার সমুদয় সাহিত্য-রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। সে রচনার পরিমাণ বেশী নয় বটে, কিন্তু তথাপি আশ্চর্য্য হইতে হয়—তাঁহার মত কর্ম্মবীর যোদ্ধপুরুষের পক্ষে সাহিত্যচর্চ্চার এই অবসরটুকুও মিলিয়াছিল কেমন করিয়া! অপর খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তিনি সারাজীবন সেবাধর্ম্মের যে অগ্নি বক্ষে বহন করিয়া যে-ধরণের কর্ম্মযজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে, এবং তাহারি কারণে, কি পরিমাণ লেখনী-কর্ম্মও করিয়াছিলেন। শেষ-বয়সের রচনা 'রামের রাজ্যাভিষেক' যে কারণেই অসমাপ্ত হইয়া থাকুক, তাহার সঙ্গে ক্লান্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস জড়িত হইয়া আছে। আত্ম-জীবনচরিতের অধ্যায়গুলি যেখানে আসিয়া হঠাৎ শেষ হইয়াছে, তাহাতে আমাদের চিত্ত হায় হায় করিয়া উঠে। আপনার জীবনের কথা লিখিবার বাসনা ছিল—স্মৃতি অটুট ছিল, উপকরণ একটিও হারায় নাই—তথাপি লেখা আর হইয়া উঠিল না! তাহার কারণ আলস্য নয়, সংকল্পের শৈথিল্যও নয়—এতবড় পুরুষসিংহের পক্ষে তাহা অসম্ভব; কিন্তু সময় হইয়া উঠিল না! সাহিত্যিক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সেই ট্রাজেডিই তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। যে প্রাণ এত কোমল, এত তীব্র—যাঁহার জ্ঞান-পিপাসা, যাঁহার সাহিত্যপ্রেম এত প্রবল, এবং প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য অবিসংবাদিত, সেই ব্যক্তি আপনাকে লইয়া বসিবার, আপনার হৃদয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার সময় পায় নাই! তাঁহার দেশ কাঁদিতেছে—নিজের কথা

শুনিবার সময় তাঁহার নাই ; অন্যায়, অসত্য, অশিক্ষা, অনাচার ও অনাহার তাঁহার দেশের মানুষকে অমানুষ করিয়া ফেলিতেছে—ভাবকল্পনায় মজিবার সময় নাই ; নিজের চেয়ে পর বড়, সাহিত্যের চেয়ে মানুষ বড়—তাই পণ্ডিত, সাহিত্যিক, ভাবুক ঈশ্বরচন্দ্র আপনাকে সবলে সংযত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রামশীলতার মধ্যে যে প্রেম ছিল, এবং তাহারি কারণে তাঁহার চরিত্রে যে কঠোর সংযম ছিল—রচনাবলীর ভাষার ছত্রে ছত্রে তাহাই পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

তথাপি এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত দুইটি রচনা, এই মহাপুরুষের কীর্ত্তিগত পরিচয়কে ব্যক্তিগত পরিচয়ের দ্বারা পূর্ণতর করিয়া তুলিবে। ইহাদের একটির নাম 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ', অপরটি তাঁহার স্বরচিত 'জীবন-চরিত'। এই দুইটি রচনাই পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, একালের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। আত্মজীবন-চরিতে অল্প অংশই লিখিত হইয়াছিল, এজন্য কেহ মনে না করেন যে এই পৃষ্ঠাগুলির তেমন কোন মূল্য নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাল্য-জীবনের যে স্মৃতি, নিজ বংশ-পরিচয় ও পিতৃমাতৃকুলের যে কয়েকটি চরিত্র, এবং নিজ পরিবারের যে কঠোর দারিদ্র্য ইহাতে যেরূপ নিষ্ঠার সহিত বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে সেই ভবিষ্যৎ মহামহীরুহের মৃত্তিকানিহিত শিকড়গুলির এবং অঙ্কুর-কালের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মত মূল্যবান আর কিছুই নাই। উত্তর কালে যে বিরাট মনুষ্যত্বের চূড়া বাংলাদেশের আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ভিত্তিস্থাপনা যদি কেহ চাক্ষুষ করিতে চান, তবে এই অসমাপ্ত আত্ম-জীবন-চরিত সে পক্ষে যথেষ্ট। একদিকে যেমন দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নেও তিনি তাঁহার আত্মীয়গণের ত্যাগ, দৃঢ়তা, স্বল্পে-সন্তোষ ও সদাচারের আদর্শে ভিতরে ভিতরে আপনাকেও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—তাহার প্রভাব এই ক্ষণজন্মা বালকের পক্ষে নিষ্ফল না হইবারই কথা, তেমনই, আর একদিকে সংসারের স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার মধ্যে তিনি সেই বয়সেই যে দুই একটি স্নেহ মমতা ও করুণার মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়ে তাহা অতি গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল ; এইরূপ একটি মহিলার কথা তিনি যেভাবে এই জীবনকাহিনীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে—সেই দয়ার সাগরের দয়া-ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ হইয়াছিল কবে ও কি ভাবে,—জানিয়া চমকিত হইতে হয়। একস্থানে লেখক বলিতেছেন—

✓ "আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার

বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ দয়া সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।" পড়িয়া মনে হয় সমগ্র বাংলাদেশ এই দেবীর নিকটে চিরঋণী হইয়া আছে। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার ভক্তির কারণ আরও একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সে চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতার যখন উপবাস করিয়া কাটাইতে হইত, সেই সময়ে একটি সামান্য স্ত্রীলোক যে ভাবে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল—"পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রকাশ করিতেন না।"

কিন্তু 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' নামক ক্ষুদ্র রচনাটি পড়িয়া বিদ্যাসাগর-চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কোথাও নয়। এই "বিলাপ"—তিনি প্রকাশ করিবার জন্য রচনা করেন নাই, কারণ, ইহার মধ্যে যে মর্ম্মান্তিক দুঃখের অতি করুণ কাতরধ্বনি রহিয়াছে, তাহা অপরকে শুনাইবার উচ্চ রোদনরব নহে। এখানে আমরা যেন মানব-হৃদয়ের এমন একটি নিভৃত গোপন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি যেখানে প্রবেশের অধিকার আমাদের নাই—সে কাজ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। আমার মনে হয়, ইহাতে মৃত মহাত্মার অনুমতি ছিল না, আমরা যেন সত্যই অন্যায় কাজ করিয়াছি; তথাপি ইহা পাঠ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। সেই সিংহবৎ পুরুষের হৃদয় যে কিরূপ কোমল ছিল, সে কথা বাংলা দেশে কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু সে কোমলতা সর্ব্বদাই পৌরুষযুক্ত হইয়া দেখা দিয়াছে—পরের দুঃখে কেবল বিগলিত হওয়াই নয়, সেই দুঃখ নিবারণের জন্য অসীম হৃদয়-বলের অভিব্যক্তিও হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃখ নিজের দুঃখ—এ দুঃখের প্রতিকার-চেষ্টা যেমন নিষ্ফল, তেমনই অনাবশ্যক। একটি বন্ধু-কন্যা শিশুর শোকে এতবড় জ্ঞানী ও প্রবীণ পুরুষ যে এমন করিয়া কাঁদিতে পারে, তাঁহার হৃদয়ও যে এত দুর্ব্বল ছিল, তাহা কে জানিত? কান্নার প্রত্যেক কথাটির মধ্যে হৃদয়ের কি ক্ষুধা প্রকাশ পাইয়াছে! বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই অতি বৃহৎ মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা আমাদের চক্ষে তাঁহাকে এক নূতন মহিমা দান করিয়াছে।

জীবনে যে কোন দুর্ব্বলতার অধীন হয় নাই, যাহার কীর্ত্তি-গৌরবের শতাংশের এক অংশ লাভ করিলে মানুষের আত্মপ্রসাদের অন্ত থাকে না, যে কত মানুষের কত দুঃখ দূর করিয়াছে, তিনি যে একদিনের জন্যও আপনাকে অতিশয় সাধারণ মানুষ ভিন্ন আর কিছু মনে করেন নাই,—যে-দুঃখ যে-শোক সার্ব্বজনীন তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করার মত আত্মাদর তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না—'প্রভাবতী সম্ভাষণ' পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধচিত্তে তাহাই ভাবিয়াছি। এ যেন কোন মহাকবি-রচিত নাটকের একটি অতি গভীর রসাত্মক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে চিত্রগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার সবগুলিই যেমন মূল্যবান, ছাপাও তেমনই উত্তম হইয়াছে। 'শ্মশানে বিদ্যাসাগর'-চিত্রটি অতিশয় চমকপ্রদ, এমন কি, রোমাঞ্চকর বলিলেও হয়। এ অবস্থায় এরূপ চিত্র প্রতিকৃতি-হিসাবে যথার্থ না হইতে পারে, তথাপি চিত্রের এ মূর্ত্তি এখনও জীবিত—ইহার মধ্যে সেই মহাজীবনের নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। জরা ও ব্যাধিপীড়িত মুমূর্ষু দেহে—বিশেষ করিয়া ওই মুখে—যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তূলিকার অযোগ্য নহে। যে-জীবনের মত প্রবল প্রচণ্ড জীবন প্রায় কেহ ভোগ করে না—সে-জীবনের অবসান হইয়াছে, এ-মানুষ আর সে-মানুষ নহে; সকলের মধ্যে যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিল, সে আজ একা! সেই বীর্য্য, সেই প্রতিভা, সেই জ্বলন্ত আত্মপ্রত্যয়—ও-মুখে সে সকলের চিহ্নও নাই। তথাপি এ মুখও বিদ্যাসাগরের মুখ—স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ কোন বিকৃতি ইহাতে নাই। এই অতি অসহায় দীন-মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, এতদিনে এই মহাপুরুষের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে—নিজেকে নিঃস্ব করিয়া, নিঃশেষে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া, আজ তিনি জাহ্নবীতীরে বালুশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। আজ তাঁর ছুটি—মহাবিশ্রাম, মহানিষ্কৃতি! এ চিত্র দেখিয়া বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে। তাই বলিয়াছি, এক হিসাবে অপর প্রতিকৃতিগুলি হইতে উহার মূল্য স্বতন্ত্র—চিত্র হিসাবেও ইহা অতুলনীয়। আমাদের দেশের আর কোন মহাপুরুষের এমন শ্মশান-চিত্র দেখি নাই।

রবীন্দ্র-কাব্যের কবিপুরুষ

১

যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে—জাতির যুবশক্তির সেই বিরাট বোধন-যজ্ঞে, টাউন-হলের শিবাজী-উৎসব সভায়—নূতন সামচ্ছন্দের উদ্গাতারূপে; সেদিন তিনি শিবাজীর উদ্দেশে রচিত তাঁহার বিখ্যাত কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন। সেই সভায় যাঁহারা তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং সেই কণ্ঠের সেই আবৃত্তি শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই আজ আর ইহজগতে নাই; থাকিলে স্মরণ করিবেন, সেদিন আমরা রবীন্দ্র-কবিপুরুষের কোন্ রূপ দেখিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের মধ্যাহ্ন তখন অতীতপ্রায়, অথচ সে-যাবৎ উষা ও প্রভাতের রবিরশ্মি ত দূরের কথা—সেই মধ্যাহ্ন-পূর্ব্ব প্রহরের ভাস্বর কিরণচ্ছটাও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই! তখন 'নৈবেদ্যে'র যুগও শেষ হইয়াছে; তাহার অনেক পূর্ব্বেই কবির জীবন-কুঞ্জে বসন্তের যৌবন-উৎসব প্রায় সমাধা হইয়া গিয়াছে, অথচ দেশের মধুব্রতগণ তাহার কোন সংবাদই রাখেন নাই। কবি যখন গাহিতেছিলেন—

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জে
গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিয়াছে ফল।
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিয়াছে ফল।

—তখন তাঁহার সেই গান কাহারও রসপিপাসাকে উতলা করে নাই। এত বড় কবির এমন নিঃসঙ্গ কবি-জীবন কেমন করিয়া সম্ভব হইল, এবং সেই প্রায় অবজ্ঞাত, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মতৃপ্তিমাত্র-সম্বল সাহিত্য-সাধনায় তিনি যে কখনও কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হন নাই—রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা, ও কবিপ্রাণের স্বরূপ-নির্ণয়ে ইহা মনে রাখিবার প্রয়োজন আছে; এই প্রসঙ্গে আমি, এক অনুরূপ উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি স্মরণ করিতেছি—

সহায়তা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, অনুকূলতা নাই, কেবল আপনার অন্তরের অপ্রতিহত ধৈর্য্য ও উপবাস-সহিষ্ণু অকাতর অনুরাগে চিরজীবন একাকী কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

—বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই যে কথা বলিয়াছিলেন—তাঁহার নিজের জীবনে তাহা সম্ভব হইয়াছিল আরও একটা কারণে, আমি উপরে তাহারই আভাস দিয়াছি।

কিন্তু আমি যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম, তখন তিনি তাঁহার সেই নিভৃত নিঃসঙ্গ সাধনার আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দেরই উত্তরসাধকরূপে, সেই দুই মহাপুরুষের দ্বারা সদ্য-কর্ষিত বাংলার যুবজন-মনোভূমিতে যে ভাব-বীজ বপন করিয়া তাহা হইতে যে আশু পুষ্পোদ্গম করাইতেছিলেন, তাহাতে আমাদের সেকালের সেই আকাশ বাতাস 'সুরার মত সুরভি' হইয়া উঠিতেছিল—তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। কিন্তু সে পরিচয়ও রবীন্দ্রনাথের আসল পরিচয় নয়; তখন তাঁহার কবি-প্রাণে বাহির হইতে একটা বাতাস লাগিয়াছিল—তাহার সেই নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনতার কূলে জনতার হৃদয়-তরঙ্গ আছাড়িয়া পড়িতেছিল। এইরূপ বিচলিত হওয়ার মূলে কবির নিজেরই অস্বস্তির দুইটি কারণ হয়তো ছিল। প্রথমটি—মনুষ্যহৃদয়-সুলভ দুর্ব্বলতা। সকল প্রতিবেশ-প্রভাব জয় করিয়া, দেশ ও কালের সকল অনিত্য প্ররোচনা অস্বীকার করিয়া, তিনি এক নিরুদ্দেশ সাধন-তীর্থের অভিমুখে চলিয়াছিলেন বটে—পথের পথ-সঙ্কট অপেক্ষা দূর দিগন্তবলয়ের রহস্য-সীমা তাঁহাকে অধিকতর আকুল করিত বটে, কিন্তু তিনি যে-দেশে যে-সমাজে জন্মিয়াছিলেন তাহার অশুচি অবস্থা তাঁহার আত্মমর্য্যাদাবোধে আঘাত করিত, তাঁহার সেই অতিশয় দৃপ্ত ও স্বতন্ত্র আত্মিক সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইত; বাংলার সেই নবজাগরণের যে ক্ষণে, এবং যে পরিবারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার ভাব-জীবনের স্বাতন্ত্র্যবোধ যতই প্রখর হোক, এ অস্বস্তি হইতে তাঁহার অব্যাহতি ছিল না। তাই যতদিন তাঁহার দেহে ও মনে যৌবনের পূর্ণ আধিপত্য ছিল, ততদিন তাঁহার চিত্তে সেই ব্যথা বাজিত; কখনও অধীর আক্ষেপে গাহিয়া উঠিতেন—

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!"

কখনও বা সবলে আত্মসংযম করিয়া মগ্ন-স্বরে গুঞ্জন করিতেন—

এখনো সময় নয়!
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি' গণি'
অনিমেষ চোখে পূর্ব্ব-গগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এই দুইটি কবিতাকেই তিনি পরে তাঁহার স্ব-নির্ব্বাচিত কবিতা-সংগ্রহ হইতে বাদ দিয়াছিলেন।

আর একটি যে অস্বস্তি, তাহা তাঁহার কবিচিত্তেরই বিবেক-দংশন। রবীন্দ্র-নাথের কবিকল্পনা যেমন অতিশয় অন্তর্মুখী—আত্মভাবপরায়ণ, তেমনই, তাঁহার কবি-মানস অতিশয় আত্মসচেতন ছিল; তাঁহার প্রকৃতিতে ভাবানুভূতির সূক্ষ্মতা ও তত্ত্বজ্ঞানের তীক্ষ্নতা এই দুইএরই এক আশ্চর্য্য মিলন ঘটিয়াছিল। তাই নিজ কবি-স্বভাবের বশ্যতা যতই অলঙ্ঘনীয় হোক, তিনি ইহাও জানিতেন যে, তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী অন্তঃপুরচারিণী, আত্ম-বিহারিণী, উচ্চ-অবরোধবাসিনী; তাহার বিচরণ-স্থান সাধারণ মানুষের সমাজ নয়, সে আপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বপ্নলোক সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে স্বেচ্ছা-বন্দী হইয়া আছে। সেখানে সে আপনাকে আপনি প্রদক্ষিণ করিয়া যে গীত গাহিয়া থাকে, তাহাতে মানুষের হাসি-কান্নার ধ্বনি নাই—প্রতিধ্বনিমাত্র আছে; তাহাতে মানুষের বাস্তব দেহ-দশার প্রতিই সেই সশ্রদ্ধ সহানুভূতি নাই, যাহা না থাকিলে কবিকেও অমানুষ হইতে হয়। ইহাই ভাবিয়া তিনি সময়ে সময়ে বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করিতেন। তাই একবার বড় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী, দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জ-ছায়ায়
রেখোনা বসায়ে!

*   *   *

সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুদিন করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন, তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর, তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,

বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল। যেদিন জগতে চলে' আসি
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশী ?
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার-সীমা।

কিন্তু সেদিনও এই আবেদনে একটা প্রবল আত্মধিক্কারমূলক বাসনাই ছিল, তাহার বেশী কিছু ছিল না। তখন তাঁহার কবি-স্বভাবেরই উন্মেষকাল, তাই লোকালয়ে ফিরিবার—জাতির জীবনে যুক্ত হইবার—আকুল উৎকণ্ঠার মধ্যেও, তিনি তাঁহার জরা ও যৌবন উভয়েরই সেই এক অধিষ্ঠাত্রী দেবীর—তাঁহার সেই দিব্যলোকবাসিনী কাব্য-লক্ষ্মীর ধ্যানেই শেষে সকল লজ্জা সকল আক্ষেপ নিবারণ করিয়াছিলেন; তখনও তিনি গাহিলেন—

"দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি; তারি মাঝে যাব অভিসারে
তাঁর কাছে, জীবনসর্ব্বস্ব-ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'।—কে সে? জানিনা কে, চিনি নাই তারে!
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী, যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

এই 'অন্তর-প্রদীপখানি'র কথাই আজ আমি বলিতে বসিয়াছি; রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে—নিজের জীবনব্যাপী সেই সাধনার মূলমন্ত্র সম্বন্ধে—কখনও কোন কালে ভুল করেন নাই। কবি তাঁহার পূর্ণ যৌবনকালে, কবি-শক্তির উন্মেষের ক্ষণে, একটা স্ববিরোধী প্রেরণার প্রতিক্রিয়া-মুখে অনেকটা আবেশবিহ্বল অবস্থায় এই যে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যে কত সত্য তার প্রমাণ—এই কবিতার শেষ কয় পংক্তি আজ যখন আমরা পাঠ করি, তখন স্পষ্টই মনে হয়, কবিজীবনের সুদীর্ঘ সাধনার অবসানে, উহাই যেন রবীন্দ্রনাথের শেষ উক্তি,—কবির সদ্য-নীরব কণ্ঠধ্বনি এই শ্লোকগুলির মধ্যেই যেন এখনও শোনা যাইতেছে—

তারপর দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে

উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহারা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্ন-বদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমা-লক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্ম পরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচির-সঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অন্তিম ক্ষমা। হয় ত' ঘুচিবে দুঃখ-নিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্ব প্রেম-তৃষা।

—ইহারই সাধনা কবি সারাজীবন ধরিয়া করিয়াছিলেন! সেদিন ও আজিকার মধ্যে মাত্র এইটুকু তফাৎ যে, কবির মনে শেষে আর কোন সংশয় ছিল না; তিনি এইখানেই তাঁহার সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—এই জীবনেই দেবী প্রসন্নবদনে ভক্তের কণ্ঠে বরমাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই কথাই পরে বলিব।

২

আজ রবীন্দ্র-জীবনের দীর্ঘ যাত্রাশেষে, বিদায়কালীন তাঁহার সেই মূর্ত্তির পাশে, আমার সেই প্রথম-দেখা মূর্ত্তিটিকে স্মরণ করিতেছি। সেই যৌবন আর এই জরা—এই দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান আছে? কালের ব্যবধান আছে, ভাবেরও আছে কি? আমরা জানি, তাঁহার কল্পনা নব নব ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া সেই ব্যক্তিত্বকে বহুরূপী করিয়াছে। তথাপি সে কল্পনা কি চিরদিন ভাবের একটা ভ্রূমধ্য-বিন্দুতে সংবদ্ধ ছিল না? রবীন্দ্রনাথ যখন অনতিকাল পরেই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিশেষ মমত্ব সংবরণ করিয়া নির্ব্বিশেষ মানবপ্রেমের সাধনায় অগ্রসর হইয়া চলিলেন, তখন কি তাঁহার কবিচিত্তে কোন ভাবান্তর ঘটিয়াছিল? ভাবে ভাষায় ছন্দে, রচনার নিত্য-নূতন আদর্শ-সন্ধানে তাঁহার কবি-মানস যে নিরন্তর বৈচিত্র্য কামনা করিয়াছে, তাহার মূলে কোথায় সেই ঐক্যসূত্র আছে যাহা আবিষ্কার করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিধর্ম্মের মত তাঁহার কবিধর্ম্মও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে? আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা

প্রতিভাকে যে অর্থে নবনবোন্মেষশালিনী বলিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কেবল সেই অর্থেই নবনবোন্মেষশালিনী নহে ; কাব্যের অন্তরালে যে কবি-পুরুষ থাকে—রবীন্দ্র-কাব্যের সেই কবিপুরুষও যেন নিত্য নবীনরূপে আমাদিগকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছে। তথাপি রবীন্দ্র-কাব্য, তথা সাহিত্যের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলে, এত রূপান্তর সত্ত্বেও, কবির একটি স্থির-মূর্তির দর্শনলাভ দুরূহ হইবে না—যৌবন ও জরার মধ্যে কোন ব্যবধান আছে বলিয়া মনে হইবে না ; কিন্তু সে কোন্ দিকে, কোথায় ?

এ প্রশ্ন প্রায় কেহ করে না। রবীন্দ্রপ্রতিভার বহুমুখিতা, রবীন্দ্রসাহিত্যের বহুবিষয়িতার বিস্ময়পূর্ণ আলোচনাই হইয়া থাকে ; তাহার সেই নানা ভাব ও নানা রূপের সমন্বয়-চেষ্টাও যেভাবে হইয়াছে তাহার মূলে আছে সেই এক কথা—'বিশ্ব' বা 'ভূমা' ; ইহাও আমরা শিখিয়াছি রবীন্দ্রনাথেরই মুখ হইতে, এবং তাহার যে-অর্থে আমরা সন্তুষ্ট হই, রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাখ্যাকালে সে অর্থ আমাদের মনে থাকে না। তখন ভূমার যাহা সাক্ষাৎ-বিরোধী, সেই সকল তত্ত্ব ও মতবাদ তাহার উপরে—যেখানে যেমন প্রয়োজন—আরোপ করিয়া, আমরা সেই সাহিত্যের নানাত্বই স্বীকার করি ; এক-এক জন এক-এক দিক দেখাইয়া অন্ধের হস্তীদর্শন সম্পন্ন করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের কবিকীর্তি ও কবি-মানসের অতি নিপুণ দার্শনিক ব্যাখ্যাও আমরা শুনিয়াছি, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু কাব্যরস উবিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কোন দার্শনিক তত্ত্বের কবি-ভাষ্য রচনা করেন নাই ; তিনি কবি—কাব্য-রচনাই করিয়াছেন। কাব্যে কবিশিল্পীর পক্ষে রূপচর্য্যাই স্বাভাবিক, সেই রূপ-বৈচিত্র্যই আমাদিগকে উপভোগ করিতে হইবে ; তাহার মধ্যে কোন ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান করাই ভুল—'একে'র সজ্ঞান তত্ত্বনিষ্ঠা কবির কাব্যপ্রেরণারও অনুকূল নয়। রবীন্দ্রনাথের 'এক' কোন তত্ত্ব নয়, সে তাঁহারই 'আমি'—যে-আমি বাহিরের এই বস্তু-বিশ্ব বা জীবন-দৃশ্যকে জ্ঞানের বিষয় করে নাই, রসাস্বাদনের বিষয় করিয়াছে মাত্র। তাহার নিকটে আত্মজ্ঞান ভিন্ন আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই—এবং সে জ্ঞানও আনন্দের আত্মপ্রত্যয়, কোন ন্যায় বা নীতির—কোন নিয়তি-নিয়মের সংস্কারই তাহাতে নাই। তাই সে সাহিত্যের যত-কিছু জটিলতা ও বৈচিত্র্য, সে জীবনের যত কিছু প্রয়াস-প্রচেষ্টা, সে চিত্তের যত-কিছু ভাবান্তর—সকলই একটি অন্তঃস্থির দীপশিখার অস্থির রশ্মি-বিকিরণ

বলিয়া মনে করিতে হইবে; ভিতরে ভাবস্থির আত্মোপলব্ধির আনন্দ, উপরে রূপ-চঞ্চল মানস-রশ্মিপ্রবাহ। রবীন্দ্র-কাব্যের মূল প্রেরণা—এই ভাব ও রূপের সঙ্গতি-সাধন; সেজন্য তাঁহার কবিচিত্ত যেমন আকুল আগ্রহে সর্ব্ববিধ বিরোধ ও বৈচিত্র্যকে বরণ করিয়াছে, তেমনই সারাজীবন ধরিয়া কবি যে সাধনা করিয়াছেন তাহা এই বিরোধকে—এই বেসুরাকে—বশ করিবার জন্য। বিরোধ থাকুক, তাহাকে মানিব না—এই যাহার সাধন-মন্ত্র, তাহার জীবনে ও তাহার কাব্যে কোনরূপ বিরোধকে গ্রাহ্য করিবার লক্ষণ যে থাকিবে না, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কবির সব-চেয়ে বড় আশ্বাস এই যে, বাহিরের এই নানা রঙের নানা রূপের যে বসনখানি তিনি একদা গানের সুরে রচনা করিয়া তাঁহার মনের সজ্জা-সাধ মিটাইয়াছিলেন, তাহাও শেষে আর থাকিবে না—

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহ-মন ভূমানন্দময় হবে।
* * *
বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে।

উপরে যাহা বলিলাম তাহাও তত্ত্বকথার মত হইল; উপায় নাই। যাহা উপলব্ধির বস্তু, যাহা অপরোক্ষ করিবার বিষয়—সজ্ঞান মনের জিজ্ঞাসায় যে-দ্বন্দ্বের অবসান নাই, সে দ্বন্দ্ব-নিরসনের চেষ্টাই বৃথা। কবির উৎকৃষ্ট রসচৈতন্যে যাহা নির্দ্বন্দ্ব হইয়া—অর্থাৎ সকল যুক্তি, সকল নীতি-নিয়ম বা ব্যবহারিক সত্যনিষ্ঠার দায় হইতে মুক্ত হইয়া—কেবল অস্তিত্বমাত্রের আনন্দ-স্বাদ হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাকে বুঝাইবার ভাষা নাই, বুঝাইতে গেলেই তাহা আর একরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরালে যে কবি-পুরুষ রহিয়াছে—যে আপনাকে সেই কাব্যের রূপ-দর্পণে শত ইঙ্গিতে সহস্র ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকেই অপরোক্ষ করিতে হইবে; এবং সেই অপরোক্ষ করার একমাত্র উপায়—সকল দার্শনিক মতবাদ, সামাজিক নীতি বা রাষ্ট্রীয় মঙ্গল-অমঙ্গল-সংস্কার মন হইতে দূর করিয়া, রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুরটি বার বার কাণ পাতিয়া শোনা—প্রাণ-মনকে অতিশয় ঋজু করিয়া সেই সুরের মুখে স্থাপন করা। রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল ও বিচিত্র বাণী-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার সকল কক্ষ পার হইয়া সেই একটি কক্ষে উপনীত হইতে হইবে—যেখানে কবি তাঁহার মনের সকল অভিমানও

ঐশ্বর্য্য মোচন করিয়া নিভৃতে আপন হৃদয়-লক্ষ্মীর সহিত কেবলমাত্র সুরের কটাক্ষ বিনিময় করিতেছেন। অথবা, এমন স্থানে এমন অবস্থায় কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, যখন কবির মুখেই শুনিতে পাইব—

এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে,
—এনেছি শুধু বীণা,
দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

৩

রবীন্দ্রসাহিত্য একটি বহুরূপময় বিচিত্র শিল্পসম্ভার, তাহাতে নব নব রেখা ও বর্ণবিন্যাসের অন্ত নাই। সেই বর্ণ ও রেখার বুনানীতে মানবমানসের অতি সূক্ষ্ম উৎকণ্ঠা এবং সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়ানুভূতির ইন্দ্রজাল ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব্ব কৌশলে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও মুখ্যত ভাবাত্মক—সেই ভাষা ও সেই ছন্দ রূপকে বরণ করিয়াও অপরূপেরই আরাধনা করে। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত বা কাব্যপ্রেরণা এতই অভিনব, এতই অনন্যসাধারণ—যে, কোন পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সুপরিচিত সাহিত্যিক আদর্শে তাহার বিচার, পরিচয়, বা উৎকর্ষ-প্রমাণ সম্ভব নয়। এ সাহিত্যে ব্যক্তি-সত্তার যে একটি অদ্ভুত প্রকাশ ঘটিয়াছে, যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মন্ত্রের সাধনা ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে—আমাদের দেশে সে সাধনা নূতন নয়, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে সাধনা দেশকালকে অতিক্রম করিবার সাধনা—তাহা কখনও এমন করিয়া দেশ-কালের অবিরাম চলচ্চিত্র-ছায়াকে কাব্যের প্রেক্ষাপটে প্রক্ষিপ্ত করিয়া এমনতর সিদ্ধিলাভ করে নাই। ভারতীয় সাধনার যে বিশিষ্ট ধারায়—যে বহুভাবজটিল ঐতিহ্যের গভীর গহনে—ইহার মূল নিহিত আছে, তাহা হইতেও পূর্ব্বে এ জাতীয় কবিপ্রতিভার উদ্ভব হয় নাই, ইহাই বোধ হয় এ প্রতিভার আধুনিকত্ব। আজ সেই নিঃসঙ্গ নির্জ্জন সাধনার গুহা-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; জগৎ ও জীবনকে অন্তরালে রাখিয়া—কালকে অগ্রাহ্য করিয়া—কেবল সর্ব্বরূপরাগবর্জ্জিত শাশ্বতের ধ্যানে বসিলে শাশ্বতকেই যেন সর্ব্বস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা হয়। একালে জীবন-চেতনা এতই বাড়িয়াছে, জগৎ-দৃশ্য মানুষের মনকে এত দিক দিয়া এত

ভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে, অনিত্যের আস্ফালনে সেই নিত্যের আসন টলিয়াছে। তাই আজ সেই শাশ্বত-পন্থী ভারতের আত্মাই যেন রূপের আসরে অরূপকে নামাইয়া আপনার সঙ্গে নূতন করিয়া বোঝাপড়া করিবার জন্য কাব্যকেই সাধন-পন্থা করিতে বাধ্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা এক অর্থে যেমন প্রাচীন, আর এক অর্থে তেমনই আধুনিক; সেই প্রাচীন উৎস হইতেই যে ধারা কাব্যরূপে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে আধুনিক জীবনের তটচ্ছায়া ও আধুনিক মানসের খরসূর্য্যালোকিত আকাশ—দুই-ই পূর্ণ-প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তথাপি সেই ছায়া তাহার বুকের উর্ম্মিশোভা বৃদ্ধি করে, পথের উপল-রাশি তাহাকে গীতিমুখর করে মাত্র; আকাশের সেই সূর্য্যকর তাহার অন্তরের শীতলতাকে আরও মধুর করিয়া তোলে। দেশ ও কালের প্ররোচনা সে কোথাও বোধ করে নাই, কিন্তু তাহার প্রভাবকেও সে এড়াইয়া গিয়াছে। সে স্রোত আপনার গতিবেগেই আপনি মুগ্ধ, আপনাতেই আপনি তৃপ্ত। তাহার আত্মার সেই আনন্দময় নিত্যসত্তা—অস্তিত্বের সেই কালবিজয়ী নির্ম্মল স্রোত-ধারা—কোন চিহ্ন, কোন কলঙ্ক কখনও ধারণ করে না; কিছুই তাহাকে বাঁধিতে পারে না, কারণ তাহার নিকটে সকল বন্ধনই লীলাচ্ছলে আত্মসমর্পণ; আপনাকে মুগ্ধ করিবার জন্য আপনার দ্বারাই মোহসৃষ্টি।—

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি
তোদের আছে?
আমি যে বন্দী হ'তে সন্ধি করি
সবার কাছে।
আমারে ধরবি ব'লে মিথ্যা সাধা,
আমি যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা,
কেবলি এড়িয়ে-চলার ছন্দে তাহার
রক্ত নাচে।

অতএব রবীন্দ্র-কাব্যের একেবারে মূলে—প্রাচীন বা আধুনিক, বিগত বা বর্ত্তমান মানব-সংসারের কোন নিয়তি-নিয়মের প্রেরণা নাই, কোন প্রয়োজন-চেতনাই নাই। ইহার নিজস্ব মূল্য যেমন সংসার সমাজ বা রাষ্ট্রঘটিত কোন ভাবনা—কোন ইজ্‌ম্ (-ism)-এর দ্বারা যাচাই করিয়া লইবার নয়, তেমনই, প্রত্যক্ষ-প্রয়োজনাধীন মানবজীবন সম্বন্ধে কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠাও ইহার দ্বারা সম্ভব

হইবে না। রবীন্দ্রনাথ নামক একটি ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া মানবচৈতন্যের যে এক প্রকাশ সাহিত্যে ঘটিয়াছে, সাহিত্যের ইতিহাসে তেমনটি আর ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। কিন্তু ভাষায় ছন্দে যাহা কখনও এমন রূপময় হইয়া উঠে নাই, মানব-চৈতন্যের সেই নিগূঢ় উপলব্ধি—দূর প্রান্তরপারের অপরূপ গোধূলি-আলোর মত, কত মৌনী সাধকের নিঃসঙ্গ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিয়াছে। এতকাল পরে ভারতবর্ষে এমন এক কবির উদয় হইয়াছে, যিনি সেই সন্ধ্যাকালের নিত্য-বিলীয়মান আলোকচ্ছটাকে ধরণীতলের সর্ব্বত্র এবং দিবালোকের সকল প্রহরে ব্যাপ্ত ও দীপ্ত করিয়াছেন; সেই আলোর সেই আভাটিকে, সেই স্থির নিস্পন্দ শান্ত জ্যোতিকে, তিনি মধ্যাহ্নের খর-ঝঙ্কার আলোক-বীণায় স্পন্দিত করিয়াছেন।

কিন্তু ইহা সম্ভব হয় কেমন করিয়া? মৌন এমন মুখর, গূঢ় এমন প্রকাশ হয় কেমন করিয়া? আমরা জানি, যাহা প্রকাশ তাহাই সাহিত্য—তাহাই কাব্য, তাহাই সৃষ্টি; কবির আত্ম-দর্পণে বাহিরের রূপের যে ছায়া পড়ে তাহাকেই নূতন কায়া দান করা কবির কাজ। সেই ছায়ার সহিত কবির মনের মায়া জড়িত হইয়া যাহার সৃষ্টি হয় তাহাই বাণীর আকারে একটি নূতন কায়া; কিন্তু যতই নূতন হউক, তাহা ঐ বাহিরের কায়ারই একটা প্রতিরূপ। কাব্যসৃষ্টিতে ইহাই কবিকল্পনার কাজ—বিশেষত, গীতি-কবিতায়। কিন্তু এ কবির কল্পনা আরও স্বরাট, আরও স্ব-তন্ত্র; আমি রবীন্দ্র-কাব্যের মূল-প্রকৃতির কথাই বলিতেছি। এখানে কাব্য অর্থে, কবির চিত্তফলকে প্রতিবিম্বিত ও রূপান্তরিত—জগতেরই একটা প্রতিচ্ছায়া নয়; এ যেন বহিঃসৃষ্টির আধারে কবিরই আত্মার বিসৃষ্টি, বা প্রক্ষেপ। ভিতরে যে 'আমি', বাহিরেও সেই 'আমি'; এক 'আমি' যেন দুই ভাগ হইয়া আপনাকেই আপনি—একটি মধুর ছলনা বা লীলার সাহায্যে—উপভোগ করিতেছে! কেবল এই উপভোগ করাটাই কিন্তু কবির কাজ নয়; তেমন কাজ অনেক সাধক, অনেক তত্ত্বরস-রসিক (Mystic) করিয়াছেন ও করিবেন। সেই উপভোগের আনন্দকে বাণীর সাহায্যে আমাদিগের অন্তরগোচর করাই কবির কাজ—এবং গানের সুরে তাহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা গীতি-কবির চরম সিদ্ধিলাভ। সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যই এইরূপ গান, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা শুধুই 'লিরিক' বা গীতিধর্ম্মী নয়—আরও গভীরতর অর্থে সঙ্গীতাত্মক। কবি-কল্পনার এই প্রবৃত্তি ও পরিণতির

মূলে ভারতীয় ভাব-সাধনার রীতিই সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অনুভূতি অরূপের অনুভূতি, তাহাই এতকাল পরে ভাষায় এমন রূপ পাইয়াছে; যাহা বাক্যবিরহিত, যাহা একক, স্থির, অনুদ্বেল, তাহাই এমন বহু-বিচিত্র, চঞ্চল, পরিবর্ত্তমান প্রবাহের রূপ ধারণ করিয়াছে—রূপের সহিত অরূপের এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে এই অঘটন সংঘটনের কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইহা যে কেমন করিয়া সম্ভব হয়, সে প্রশ্ন অবান্তর; কারণ, যাহা রহস্য তাহাই কাব্যে যখন রস-রূপ ধারণ করে, তখন আর কোন প্রশ্নই থাকে না—জিজ্ঞাসায় যাহা পরোক্ষ, আস্বাদনে তাহা অপরোক্ষ হয় তখন কবির ভিতরকার সেই 'আমি' এই রহস্যের স্বপ্নাবেশে গাহিয়া উঠে—

হৃদয় আমার প্রকাশ হ'ল
অনন্ত আকাশে,
বেদন-বাঁশী উঠ্‌ল বেজে
বাতাসে বাতাসে।
এই যে আলোর আকুলতা
আমারি এ আপন কথা,
উদাস হ'য়ে প্রাণে আমার
আবার ফিরে আসে।

আবার—

যে-আমি ঐ ভেসে চলে
কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে।
ও-যে সদাই বাইরে আছে
দুঃখে সুখে নিত্য নাচে
ঢেউ দিয়ে যায়, দোলে যে ঢেউ খেয়ে।
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে
একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে।
যে-আমি যায় কেঁদে হেসে
তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে
অন্য আমি উঠ্‌তেছি গান গেয়ে।

কিন্তু তবু—

এই-যে আমি ঐ আমি নই
আপন মাঝে আপনি যে রই,
যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,
শান্ত আমি, দীপ্ত আমি,
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে ॥

—এই দুই-আমির তত্ত্বও অতি পুরাতন, ইহাই শ্রুতির সেই—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—দুইটি সুন্দর পক্ষী, দুই সখা, পাশাপাশি একই বৃক্ষে বসতি করে; তাহাদের একজন স্বাদু পিপ্পল-ফল ভক্ষণ করে, আর একজন নিজে না খাইয়া অপরের পানে চাহিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই দুই-আমির আরও নিকট সহযোগিতা ঘটিয়াছে, তাই তিনি ঋষি না হইয়া কবি। এখানেও সেই দেখা আছে বটে, কিন্তু সেই দেখা ভোগ-সম্পর্কশূন্য নয়—সেই দেখারই আনন্দে অপর 'আমি'-পাখীটি গানে গানে দিঙ্‌মণ্ডল প্লাবিত করিয়াছে।

৪

রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরালে এই যে কবিপুরুষ—ইহার সংজ্ঞা কি? ইহা কি আমাদের সাধারণ অর্থের সেই Personality? এই দুই আমির লুকা-চুরির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি-আমি স্পষ্ট হইয়া উঠে? Personality-র যে ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনে নিশ্চয়ই একটা আছে; কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ ছাপাইয়া যে কবি-ব্যক্তি—যাহাকে আমি কবি-পুরুষ বলিয়াছি—তাঁহার কাব্যের মর্ম্মমূলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং যাহা মানুষটি হইতে পৃথক একটি কবি অভিমান মাত্র নয় (কারণ, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা তাঁহার জীবন-সাধনা হইতে স্বতন্ত্র নয়), কবির সেই যে অন্তরঙ্গ সত্তাকে আমরা তাঁহার কাব্যের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনুভব করি, তাহাকে কোন্ সাইকলজির দ্বারা চিনিয়া লওয়া যায়? সেই দুই 'আমি'র মিলনক্ষেত্রস্বরূপ এই যে এক ব্যক্তি-চৈতন্য—এখানে এক-আমি সর্ব্বদা আর-এক আমির মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া বিলাইয়া দেয়, ব্যক্তি আপনাকে অস্বীকার করিয়াই আপন ব্যক্তিত্বের ঘোষণা

করে। দুই-আমির এই দ্বন্দ্বে মিলন ও বিরহ একই কালে নিরবচ্ছিন্ন হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'র ধ্যানেও যে ব্যক্তিগত অভিমান আছে—পরমুহূর্তেই তাহা বিশ্বদেবতার ধ্যানে লয় পায়—

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুর মেলাতে॥
আমার একতারাটির এই তারে
গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে॥

-একথা তিনি বার বার বলিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই।—

বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া;
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার
নুইয়ে দাও॥

কবির কবিতা যখন একবারে গান হইয়া উঠে নাই—যখন ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে সেই ব্যক্তি-আমি আরও ঘন রূপ-রস পান করিতেছে, তখনও কবির সেই এক কথা—

দেহে আর মনে প্রাণে হ'য়ে একাকার
একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার॥
...এ কী বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।...
তোমারি মিলন-শয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ॥

—এই যে 'আমি', ইহার ব্যক্তিত্বকে কোনও মনস্তত্ত্ব বা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির জাল ফেলিয়া ধরা যাইবে না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিকও নহেন—মিষ্টিক হইলে, তাঁহার কবিত্বই নিষ্ফল

হইত ; যাহা কখনও কাব্যে ধরা দেয় নাই তিনি যে তাহাকেই কাব্যে এমন করিয়া ধরিয়া দিয়াছেন , ইহাই ত' রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যসাধারণ গৌরব। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানকে এতটুকু কোথাও আবৃত হইতে দেন নাই ; তাঁহার সাধনা অতিশয় আত্ম সচেতন একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, চোখ বুঁজিয়া নয়—

অপরূপকে দেখে গেলেম দুইটি নয়ন মেলে—
পরশ যারে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা।

—বহিরিন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া কোন অচেতন-চেতনায় পাওয়া নয়, 'দুইটি নয়ন মেলে' এবং 'সকল দেহে' তিনি সেই পরম বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতে চান ; ইহার মূলে যে আত্মজ্ঞানের আনন্দ আছে—সে জ্ঞানের সাধনা করিতে হইলে মনের সকল দুয়ার খুলিয়া জগৎকে প্রবেশের অধিকার দিতে হয়। এই সদা-জাগ্রত চেতনার বিরাম নাই, তাই ইহা মিষ্টিকের সাধনা নয়—

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না,
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
আমারে যে নামতে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে,
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চলবে বেড়ে দিনে রাতে,
আপনা নিয়ে করব যবে
বেচা-কেনা॥

রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরালে যে কবিপুরুষ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম ; ইহা হইতেই, রবীন্দ্র-কাব্য বা রবীন্দ্র-সাহিত্যের যাহা সৃষ্টি-অংশ তাহার আদর্শ ও প্রেরণা সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা সম্ভব হইবে। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নাই, আমি কেবল সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার অন্য কোন সাহিত্যের মাপকাঠিতে করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয় ; তাহা এমনই অনন্যসাধারণ যে, তাহার জন্য সাহিত্যের একটি নূতন

সংজ্ঞা নির্ম্মাণ করিতে হয়। প্রচলিত আদর্শে যাচাই করিলে, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থত হইয়া আছে, তাহার অনেকখানিই স্বীকার করিতে হয়। আমি ইতিপূর্ব্বে নানা প্রবন্ধে ও নানা প্রসঙ্গে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এ প্রসঙ্গেও সেই দুই-'আমি'র তত্ত্ব কাজে লাগিবে। জগৎ-দৃশ্যের একান্ত সম্মুখীন সুখ-দুঃখের ভোক্তা যে 'আমি', সাহিত্যে আমরা তাহার যে-রূপ দেখিতে পাই—রবীন্দ্র-কাব্যেও ঢেউয়ের দোলায় দোল-খাওয়া সেই 'আমি'র সকল উৎকণ্ঠা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সুষমায় বিচিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, সুখ-দুঃখের সেই তরঙ্গরাজির কলরোল নয়, তাহার মধ্যে যে 'মৃদঙ্গ-তাল' আছে, কবি তাহারই সহিত তাঁহার গানের সুর মিলাইয়াছেন; ভোক্তা নয়—দ্রষ্টা যে 'আমি', তাহারই রস-দৃষ্টি সে সাহিত্যে মানুষের জীবনকে ভিন্নতর ভাবভূমিতে তুলিয়া ধরিয়াছে। এ সাহিত্য, মানুষের প্রকৃতিগত যে জীবন-চেতনা তাহাকেই গভীর করিয়া তোলে না, সেই দেহগত আকুতিকেই একটি গভীরতর প্রাণধর্ম্মের মহিমা-বোধে চরিতার্থ করে না। ইহার কাজ স্বতন্ত্র; ইহা মানুষের মনকে মুক্ত করে, ক্ষুধাকে শান্ত ও সংযত করে, সুখ-দুঃখবোধকে বহির্মুখী না করিয়া আত্মানুভূতির সহায় করিয়া তোলে; অতি তুচ্ছকেও দুর্ল্লভতার আসনে বসাইয়া জড়ের উপরে চিৎ-এর জয় ঘোষণা করে। সর্ব্বোপরি, ইহা মানুষকে এমন একটি মন্ত্রে দীক্ষিত করে যাহাতে, এই জগৎ—এই মানুষের মেলা—একটি পরম-সুন্দর পরম-পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে হয়। এইজন্য, অপর সাহিত্যকে যদি 'Literature of Power' বা প্রাণমূলে শক্তিস্ফূরণের সাহিত্য বলা সঙ্গত হয়, তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে এই অর্থে 'Literature of Culture' বলা যাইতে পারে যে, তাহা কোনরূপ শক্তি নয়—একটি সূক্ষ্ম রসবোধের দ্বারাই চিত্তের এমন উৎকর্ষ সাধন করে যে, আকাশের মতই তাহা মুক্ত ও প্রসারিত হয়; নদীর মত, তটের শাসন মানিয়াই গভীর ও বেগবান হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথার উল্লেখ করিব। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেরণা যে একান্ত ভারতীয় তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনই, বাঙালী ভিন্ন আর কোন কবির পক্ষে ঐরূপ কাব্য-সাধনা যে সম্ভব হইত না, ইহাও অতিশয় সত্য; ইহা জাতিগত অভিমান বা অবুঝ গর্ব্বের কথা নয়; বাঙালী-জাতির ইতিহাস, তাহার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটু জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই আমার ঐ

উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন,—যিনি সে তত্ত্ব অবগত আছেন তিনিই রবীন্দ্র-কাব্য ও তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী কবিপুরুষকে উত্তমরূপে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিবেন; নতুবা, কেবল 'বিশ্বকবি' বলিয়াই অভিহিত করিলে রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ পরিচয়ে বাধা ঘটিবারই সম্ভাবনা।

৫

আমি রবীন্দ্রনাথের বহির্জীবনের যে রূপ প্রথম দেখিয়াছিলাম, এ আলোচনার আরম্ভে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি; এক্ষণে পুনরায় তাহার কথা কিছু বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। সেই প্রথম দেখার পরে রবীন্দ্রনাথকে অতি নিকটে ও দূর হইতে দেখিবার বহু সুযোগ আমার হইয়াছিল; কিন্তু আমি তাঁহার সেদিনের সেই রূপই আজ বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতেছি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের দেহে পরিণত যৌবনের সেই দীপ্তি উত্তরকালে ম্লান হইয়া আসিলেও, তাঁহার মন সেই দীপ্তির পরিচয় শেষ পর্য্যন্ত বহন করিয়াছে। সে দিনের রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের—বাংলার ও ভারতের—রবীন্দ্রনাথ; তখন তিনি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ (National Council of Education)-এর একজন প্রধান কর্ম্মী; পরে তিনি বিশ্বমানব ও বিশ্ব-ভারতীর রবীন্দ্রনাথরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তথাপি আমার মনে হয়, এ দুই-এর মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা তাঁহার সেই যৌবন, এবং যৌবন-অতিক্রমের পার্থক্য মাত্র; একটিতে প্রাণের বন্ধন-মোচনের উৎসব, অপরটিতে সেই প্রাণকে বাঁধিয়া ক্ষতিভয়গ্রস্ত মনের সঞ্চয়-কামনা। কিন্তু দুইটিতেই, 'এবার ফিরাও মোরে'—কবির সেই আর্ত্ত আবেদন সমান নিষ্ফল হইয়াছে, ভাবে বা কর্ম্মে—কোথাও তাহা বস্তুর বাস্তবতাকে বরণ করিতে পারে নাই। অতএব, দুইই যখন এক, তখন আমি কবির সেই পূর্ব্বেকার রূপটিকেই অধিকতর বরণীয় মনে করি; কারণ, তাহাতেই তাঁহার কবি-মানস মাটিকে একটু অধিক স্পর্শ করিয়াছিল। সেদিন কোন নিভৃত শান্তিনিকেতনে নয়—রাজধানীর অশান্তি-নিকেতনে, সেই কোলাহলময় জনারণ্যে—কবির যৌবন-শেষের সেই পুরুষমূর্ত্তির ললাটে ও মুখমণ্ডলে যে আকস্মিক দিব্যদীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার সেকালের রচনাতে এখনও তাহা অম্লান হইয়া আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তর-গহনের যে কবিরূপের কথা বলিয়াছি—কবি নিজেই যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—তাহার আলোকে সে

দিকে চাহিলে বুঝা যাইবে, কবির কবি-স্বপ্ন এ সকলের কোনটাতেই বাঁধা পড়ে নাই। নিজের ইষ্ট-দেবতা রবির উদ্দেশে সাবিত্রী-মন্ত্র পাঠ করিয়া কবিই বলিয়াছেন—

তেজের ভাণ্ডার হ'তে কী আমাকে দিয়েছ যে ভরে'
কে-ই বা সে জানে।
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা
মুহূর্ত্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় স'রে।
তেমনি সহজ হোক হাসি কান্না, ভাবনা বেদনা
না বাঁধুক মোরে।

'না বাঁধুক মোরে'—ইহাই কবির আত্মার নিগূঢ় কামনা। যখন যাহার পালা তখন সে-ই সঙ্গে থাকুক—

ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডব লীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়—
সঙ্গে যেন থাকে।

কিন্তু—

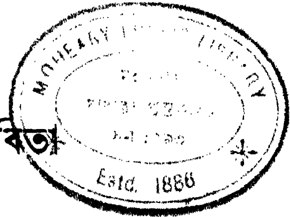
তার পরে তারা যেন সর্ব্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।

ইহার কারণ কি, কবি অকপটে সেই স্বীকারোক্তিও করিয়াছেন-

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্চ্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কি মত্ততায়, কি আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্য পথে হ'য়ে বিবাগিনী
ল'য়ে তার ডালি,
সে কি তব সভাতলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালী।

এই 'বিবাগিণী রাগিণীই' রবীন্দ্র-কবিপুরুষের প্রাণের রাগিণী—ইহাই রবীন্দ্র-কাব্যের আদি ও অন্ত্য সুর। এই রাগিণীই একদা যে অপূর্ব্ব অনুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল তাহা যেমন ভুলি নাই, তেমনই, এই 'আলোর কাঙালী'কে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে না পারিলে তাহার স্বপ্নের নানা বর্ণডোরে-বোনা বাণীর সেই দুকূলবাস—ভুবনের অঙ্গনে আঁকা রূপ-কল্পনার সেই ইন্দ্রজাল—যাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া মুছিয়া যায়, তাহার মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিব না।

[অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮]



রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা

ইংরেজীতে 'রিদ্‌মিক প্রোজ' নামে যে রচনা-রীতির নামকরণ হইয়াছে তাহা স্বরসংঘাতের বিন্যাসজনিত একপ্রকার ধ্বনিতরঙ্গের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই 'রিদ্‌মিক প্রোজ'কেই বাংলায় আনিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন ধরিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু আজিও সফল হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ চেষ্টা হয়তো শুধুই খেয়ালের ব্যাপার নহে—তাঁহার আর্টবিলাসী মনের বৈচিত্র্য-লিপ্সাও ইহার কারণ বটে; কিন্তু মনে হয়, তদপেক্ষা গভীরতর কারণ তাঁহার কবি-স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা গীতিধর্ম্মী, তিনিই বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি হইতে কাব্যের গীতিচ্ছন্দকে সহস্রধারায় প্রবাহিত করিয়াছেন; ছন্দোবন্ধের যে বন্ধন, তাহাকে মিলের বাঁধনে দৃঢ়তর করিয়া তিনি আপনার বিশিষ্ট কবি-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই মিল ও ছন্দের স্বভাবসুলভ বশ্যতাও তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে—নিজ স্বভাবকে অতিক্রম করিবার বাসনা তাঁহাকে বারবার অধীর করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, মানসীর 'নিষ্ফল কামনা'র মত কবিতা এবং অমিত্রাক্ষর-কবিতা রচনার ইচ্ছা প্রবল হইলেও, তিনি সাহস করিয়া তাহার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন নাই—তেমন সাফল্যলাভ করেন নাই বলিয়া, ইচ্ছা থাকিলেও আত্মসংযম করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁহার কবিধর্ম্মের অনুকূল নহে, যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও অমিত্রাক্ষরের যতি-কৌশল নাই—গীত-স্বর-বর্জ্জিত, ছন্দ-মাত্র-সহায় স্বরমূর্চ্ছনায় তাহা সঙ্গীত সৃষ্টি করে না; বরং তাঁহার সেই কবিতার পংক্তিগুলি যেন শব্দ-মাত্রের বর্ণবিন্যাস-গুণে গীতিঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠে। প্রমাণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) এস নাথ, ওই দেখ
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে, বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্ন-শয়ন,

কচি কচি পীতশ্যাম কিশলয় তুলি'
আর্দ্র করি' ঝরণার শীকরনিকরে।
গভীর পল্লবছায়ে বসি', ক্লান্তকণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত, 'বেলা যায়' 'বেলা যায়'
বলি'। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এস নাথ, বিরল বিরামে।

(২) মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূসম ; সম্মুখে গভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি,
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে ; দিবালোক-তট হ'তে
এস, নেমে এস, কনক-চরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ-সাগরে।
কোথা ছিলে, প্রিয়ে ?

এই সকল পংক্তিতে যে ছন্দঃ-স্রোত বহিয়াছে, তাহা অমিত্রাক্ষরে রচিত হইলেও আবেগময় গীতিসুরযুক্ত ; এই সুরই যদি মিলের সাহায্য পায় তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সুন্দরী আরও লীলা-চঞ্চল, আরও বিলাস-বিহ্বল হইয়া উঠে ; যথা—

কতদিন এই বনে
দিক্ দিগন্তরে আষাঢ়ের নীল জটা
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্ম্মহীন দিনে সঘন কল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয় ; এসেছিল কতদিন

অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাস হিল্লোলাকুল যৌবন উৎসাহ,
সঙ্গীতমুখর সেই আবেগ-প্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে
আনন্দ প্লাবন ; ভেবে দেখ একবার
কত উষা, কত জোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুখে তোমার জীবনে—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চির চিত্ররেখা—
চিররাত্রি চিরদিন ?

উপরি-উদ্ধৃত কাব্যখণ্ডগুলিতে গীতিসুর প্রবল হইয়া আছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্ব্ব ভাবের বাহন বটে ; এমন কি, ইংরেজী কাব্যে গীতিপ্রধান (lyrical) অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটি পৃথক আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অমিত্রাক্ষর মিত্র না হইয়া সত্যই অমিত্র হইয়া উঠে ; নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি তাহার প্রমাণ—

(১) নেহারিল নত করি' শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিল চাহিয়া নব গৌর তনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস ; সরোবরে
পা' দুখানি ডুবাইয়া দেখিল আপন
চরণের আভা।—বিস্ময়ের নাই সীমা।

(২) নয়নে নয়নে হয়ে
ফিরে আসে আঁখি, বেধে যায় হৃদয়ের
কথা ; হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে ; চাহে
নিশীথের তারা, লুকায়ে জানালা পাশে !
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল,

সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন,
তিলেক বিচ্ছেদ লাগি' কাতর হৃদয়!

—এইরূপ অসংখ্য আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-লক্ষ্মী গীতিপ্রাণা,—নূপুর খুলিয়া এক পা'ও চলিতে তাহার বাধ'-বাধ' ঠেকে। তাই, ছন্দোহীন—অর্থাৎ, পদমাত্রা ও মিলের শাসন-মুক্ত, অথচ সুরলয়যুক্ত—রচনার আকাঙ্ক্ষা তিনি গদ্যেই মিটাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য পুরুষের চালে পা ফেলিয়া চলে না, নট বা নটিনীর বিলাস-লীলায় তাহার ভঙ্গিমা সর্ব্বত্রই লীলায়িত। তাঁহার গদ্যও ভাবে ও রূপে কাব্যধর্ম্মী। গদ্যের অবারিত অনিয়ন্ত্রিত গতিভঙ্গিকে তিনি কেমন সুরময় করিয়া তোলেন, তাহার উদাহরণ তাঁহার রচনা-রাশির মধ্যে সর্ব্বদাই মিলিবে, আমি এখানে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিব।—

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন্ বেদুয়ীন্ দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্প-কোরকের মত, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া, জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল? সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণ-মদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেন্‌শা বাদ্‌শা শুভ্রচরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাব্‌শী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ, অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে? ("ক্ষুধিত পাষাণ"—গল্পগুচ্ছ)

২

কাব্যে ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ছন্দ কেন—মিল ত্যাগ করাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু স্বল্পপরিসর সুসঙ্কীর্ণ

পদবিন্যাসের গীতিচাতুরী তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেও, উদারতর ছন্দ-স্বাধীনতাও তাঁহাকে চিরদিন লুব্ধ করিয়াছে; তাই, কখনও পয়ারের চতুর্দ্দশ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, কখনও তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহার কাব্য-বিহঙ্গ পক্ষবিস্তার করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ইহারই প্ররোচনায় তাঁহার ছন্দঃসৃষ্টির সর্ব্বশেষ সফল প্রয়াস—'বলাকা'। মিল ও ছন্দ কোনটাকে ত্যাগ না করিয়া তাঁহার ভাব-কল্পনার 'হংসবলাকা'* কবিতার চরণ-চারণকে ইচ্ছামত দীর্ঘ বা হ্রস্ব করিয়াছে—অমিত্রাক্ষরের যতি-স্বাচ্ছন্দ্যকে মিত্রাক্ষরে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ছন্দ-মুক্তি ঘটে না। গদ্যে যে মুক্তির উপায় আছে, পদ্যে তাহা নাই। যে-শৃঙ্খল রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মীর চরণে, বাহুতে, ও কটিতটে শৃঙ্খল না হইয়া নূপুর-কাঞ্চী-কঙ্কণের মত স্বচ্ছন্দ নৃত্যচ্ছন্দে বিচিত্র ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠে—সেই শৃঙ্খল মোচন করিবার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় vers libre-এর উদ্ভাবনায় এখনও পরিশ্রান্ত হইতেছেন। একদা 'লিপিকা'র গদ্যকাব্যে তিনি ইহার এক রূপ ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা যে কাব্যচ্ছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না—গদ্যেরই সে একটা আবেগময় ভঙ্গিমা মাত্র, ইহাও নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন। গদ্যের এই ভঙ্গিমা ইতিপূর্ব্বে আরও এক জন আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—যিনি 'রাজকাহিনী'র মত গদ্য-কাব্য লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি অপূর্ব্ব বস্তু দান করিয়াছেন—তিনিও এই খেয়ালের বশে পদ্যগন্ধী গদ্য লিখিবার হাস্যকর প্রয়াস হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে 'রাজকাহিনী' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব—তাহাতে, গদ্যের গদ্যত্ব বজায় রাখিয়াই রচনাকে কতটা কাব্যের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব তাহার নিদর্শন আছে।—

(১) যেদিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, সেইদিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রাণী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে' সেই রূপার চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, কেবল সূর্য্যমূর্ত্তির নীচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকী ছিল মাত্র। পুষ্পবতী যত্ন ক'রে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, এক গাছি সোনার তার, সরু হ'তেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মত পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোল্‌তার হুলের মত বিঁধে

* ইহাও একটি আর্ষপ্রয়োগ; 'প্রদোষ' অর্থে যেমন ভোর-রাত্রি নয়, তেমনি 'বলাকা' অর্থে 'বক'—হংসের শ্রেণী বা পংক্তি নয়।

গেল। যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মত পরিষ্কার সেই রূপার চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মত ঝক্ ঝক্ করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্ম্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে, একটু ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে। এই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁপে উঠল, তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বল্লেন—"মা, আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝি বা সেখানে কি সর্ব্বনাশ ঘটল!"

(১) বাপ্পাদিত্য সেই সূর্য্যকুণ্ডের জলে সূর্য্য-পূজা ক'রে, গাজনীর রাজপ্রাসাদে শ্বেতপাথরের শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্দ্ধেক রাত্রে কার একটি মধুর গান শুনতে শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়ন-মন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন;—সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মস্‌জিদ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপ্ ধপ্ করছে, আকাশে আধখানি চাঁদ, চারিদিকে নিশুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হ'ল এ গান যেন কোথায় শুনেছেন। হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরও স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চম্‌কে উঠে শুনলেন—"আজ কি আনন্দ, ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!"—এ যে সেই গান! নগেন্দ্রনগরের রাজপুত রাজকুমারীর ঝুলন-গান!

—এ রচনা পাঠ করিয়া স্বতই মনে হয়, এই বস্তু কি কাব্যচ্ছন্দে রীতিমত কবিতার আকারে আরও রমণীয় হইত না? কিন্তু বার বার ইহাই প্রতীতি হয় যে, এই রূপই ইহার যথার্থ রূপ, অন্য কোনও রূপে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইত না। উৎকৃষ্ট রচনার ইহাই নিঃসংশয় লক্ষণ।

এ ভাষাও গদ্য, তথাপি ইহার বিষয়বস্তু একপ্রকার কাব্যই বটে। ভাবের সহিত রূপের নিখুঁত সামঞ্জস্য রক্ষার ফলে ইহা এইরূপ গদ্যভঙ্গিতে রচিত হইতে বাধ্য—ইহাকেই বলে 'ফর্ম্' ও 'কন্‌টেণ্ট'-এর ঐকান্তিক পরিণয়। কারণ, ইহা যে-ধরণের কাব্য তাহা নিছক রস-পরিণামী নয়, এখানে ভাব-সৌন্দর্য্য কথাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। ইহাতে চিত্রের পট-বিস্তার আছে; বর্ণনা ও বিবৃতির গদ্যই ভাবাকুলতার সৃষ্টি করিয়াছে। এ কাহিনী শুনিতে শুনিতে মনে হয়, এক সুদূর সুন্দর রূপকথার রাজ্যে স্বপ্নপ্রয়াণ করিয়াছি। সেখানে সুধাধবল মর্ম্মর-প্রাসাদের অলিন্দে বসিয়া অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে দূরবিসর্পী প্রান্তরসীমায় চাহিয়া আছি। পৃথিবী রহস্যময়, কিন্তু মানুষের জীবন অতিশয় সরল ও সংক্ষিপ্ত; সে জীবনের ছবিগুলি রেখা-বিরল ও বর্ণ-বহুল,

এবং সেই বর্ণ-বৈচিত্র্যকে উজ্জ্বল করিয়াছে ভাবের একটিমাত্র স্বর—জ্যোৎস্না-রাত্রে বাঁশির আলাপের মত। সে স্বরে জয়-পরাজয়, হাসি-কান্না, রণদুন্দুভি ও ঝুলনগান,—রাজা ও রাখাল, আর্টের ঐশ্বর্য্য ও প্রাকৃতিক বন্য-শোভা—এমন একটি কোমল মধুর রাগিণীতে মিলিত হইয়াছে যে, রসিক মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন বালকটি রহিয়াছে সে উৎকণ্ঠিত উৎকর্ণ হইয়া সারারাত্রি জাগিয়া থাকে—রূপকথার সমাপ্তি চায় না। ইহাই রূপকথা, ইহার এমন রূপ আর কোথায়ও দেখি নাই।

৩

কিন্তু গদ্য নয়—চাই পদ্যেরই পরিবর্ত্ত; ছন্দকে বর্জ্জন করিয়া কবিতা রচনা করিতে হইবে; ইহাই হইল এ যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাধনা, রবীন্দ্রনাথের শেষ সাধনাও তাহাই। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার প্রতিভার অন্তিমকালে বুঝিয়াছেন, 'মডার্ন' না হইলে এ যুগে সকল কীর্ত্তি নিষ্ফল। যে রস-কল্পনার বশে ভাষায় অর্থাতীত ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ছিল, সে রস এ যুগের রস নয়। রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন কবিতাগুলির ভাষা এবং ভাববস্তু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—ইহা সে কাব্য নয়। এ ভাষা অতিমাত্রায় 'বাস্তব'। ইতিমধ্যে তরুণসম্প্রদায় সর্ব্ববিধ বন্ধনমোচনের মত কাব্যেরও ছন্দোবন্ধন মোচনের জন্য অধীর হইয়াছে, নহিলে কবি হওয়ার বড়ই অসুবিধা। ইহারাও 'মডার্নিজ্‌ম'-এর দোহাই দেয়, কিন্তু আসলে ইহাদের রসবোধের বালাই নাই; তাই ভাষাও নাই—সে প্রাণও নাই, সে কানও নাই। তাহাদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা রবীন্দ্রনাথও সমর্থন যে করেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে। বাংলা ভাষায় ধ্বনিচ্ছন্দের যত রাজ্য আছে তাহার সকলই তিনি আবিষ্কার ও অধিকার করিয়াছেন; এখন ছেলেরা হুইটম্যান হইবার চেষ্টায় নিষ্ফল তাণ্ডবে মাতিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সাফল্যের পন্থা দেখাইবেন। সাহিত্যিক গদ্যের অন্বয়রীতি উল্টাইয়া, এবং যেমন করিয়া হউক, শব্দের বর্ণসংঘাত-সাহায্যে ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টি করিয়া, যদি কবিতা রচনা করিতে হয়, তবে তাহার সেই কৃত্রিমতা ছন্দোবন্ধন অপেক্ষাও দুরূহ। যাহা সহজ গদ্যে অথবা সরলতর পদ্যে আরও সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করা যাইত, তাহার এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, অতঃপর কাব্য—ভাবের বাণীরূপ না

হইয়া, শব্দ নাচাইবার রঙ্গস্থল হইয়া উঠিবে। যেহেতু ইহাতে ভাব অপেক্ষা শব্দের প্রাধান্যই অধিক, রসসৃষ্টির পরিবর্ত্তে ধ্বনিসৃষ্টিই ইহার মুখ্য অভিপ্রায়, এজন্য ইহাতে কবি ও কাব্যের প্রাণান্ত ঘটে। উদাহরণ দিব। যাহা আদৌ গদ্য, তাহাকে কাব্যরূপ দিতে চাহিলে—অথবা যে ভাষায় ছন্দোহীন 'রিদ্‌ম' সম্ভব নয়, তাহাতে কেবলমাত্র বর্ণসংঘাত ও পংক্তিপর্ব্বের সাহায্যে কাব্যচ্ছন্দের অনুরূপ শ্রুতি-সুখ উৎপাদন করিতে চাহিলে, যাহা হয়—তাহাই যে-রচনাটিতে বিশেষ করিয়া হইয়াছে, আমি সেই 'পৃথিবী'-সন্দর্ভটির সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করিব।

কারণ, এই রচনাটিতেই ছন্দোহীন ছন্দের ভঙ্গিমা অতিশয় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধরণের অন্যান্য 'কবিতা'গুলিতে আর সকলই ছিল; কিন্তু ভাষার এমন শব্দ-সঙ্কর, সমাস-সন্ধিযুক্ত শব্দ-ঘনঘটার গুরু-গুরু গরগর ডম্বরুনাদ আর কোথায়ও এমন সার্থক হইয়া উঠে নাই। শব্দের এই ঘনঘটা যেখানেই একটু নরম হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই—

হাওয়ার মুখে ছুটলো ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেড়া কয়েদী ডাকাতের মতো—

অথবা

চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।

—ভাষা এমনই ভব্য, এবং উপমা এমনই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে!—কারণ, 'চাঁদের পেয়ালা' অপেক্ষা 'চায়ের পেয়ালা' শুনিতে অনেক ভাল, এবং 'স্বর্গীয় মদের ফেনা' বাংলাভাষার বস্ত্রহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ভাঙা কুঁড়ের চাল' 'হাওয়ার মুখে' উড়িবার মত হালকা হইতে পারে, কিন্তু 'কয়েদী ডাকাতের মত' জোয়ান সে নয়, এবং ছিঁড়িবার মত শিকল তাহার দেহের কোথায়ও শক্ত করিয়া বাঁধা থাকে না। এই কবিতার আর একটি চিত্র এইরূপ—

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখীর মত তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে'
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে—

কালবৈশাখীর ঝড়ের ছবি,—কিন্তু কোনও একটা রূপ স্পষ্ট নাই।
আকাশটা কেশর-ফোলা সিংহ, ঝড় হইয়াছে শ্যেনপাখী, এবং দিগন্ত—বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ একটা কিছু; চিত্রের অংশগুলি সামঞ্জস্য-হীন। কিন্তু ভাষার এই ঘনঘটা সত্ত্বেও ভাবের মহত্ত্ব কুত্রাপি নাই। কালবৈশাখীর ভীষণতা উপলব্ধি করিতে হইবে কেবল বাক্যের ঘনঘটায়, শব্দের ঝড়ে; অর্থাৎ ইহা বিশুদ্ধ Onomatopœia। নতুবা, ঝড়ের সঙ্গে শ্যেনপাখীর তুলনা! আকাশজোড়া কালো মেঘ আর একটা বড় চিল!—তার চঞ্চু হইল বিদ্যুৎ! ছোটকে বড়র উপমান করিলে বড়ই ছোট হইয়া যায়; এরূপ কল্পনাকে সুস্থ বলা যায় না। আদিম যুগের কাব্যে এইরূপ উপমাই আমরা বেশি দেখিতে পাই, তাহাতে কবিকল্পনার শৈশব-সারল্য ও প্রাবল্যই প্রকাশ পায়; আধুনিক কবির পক্ষে সে কৈফিয়ৎ খাটে না।

এই কবিতার ভাষাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। অতি-আধুনিক কাব্যে বাণীর বাণীত্ব নাই—ছন্দ অনাবশ্যক হইয়াছে সেইজন্যই। এখানেও শব্দের ঝড় বহাইতে গিয়া কবি শব্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই 'আধ-পোষা নাগ-দানবে'র 'আধ-পোষা' অভিপ্রেত অর্থ বহন করে না; 'ডাল-পালা আলুথালু করে'র মত ইডিয়ম-বিরুদ্ধ প্রয়োগ আর্ষপ্রয়োগ হইয়া দাঁড়ায়। 'অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ পুঞ্জিত তার ধূলায়' এবং 'বনের মৃদু মর্ম্মর উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে অধীর কলকল্লোলে,'—প্রভৃতিতে, আওয়াজের খাতিরে যেমন 'ধূলো'র বদলে 'ধূলায়' লিখিতে বাধে নাই, তেমনই 'উঠেছে'র সঙ্গে 'উচ্ছসিয়া'র মত সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে কবি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কোনখানে 'আঁকড়ে' আবার কোথায়ও 'উপ্‌চিয়ে' ('উপ্‌চে' নয়)—ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরঙ্কুশ কবি বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও হইতে পারেন নাই। 'আতপ্ত দক্ষিণে-হাওয়া ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহ-মিলনের স্বগত প্রলাপ আম্রমুকুলের গন্ধে'—ইহা স্বগত প্রলাপ হইতে পারে, কিন্তু কাব্য নয়,—শব্দসমষ্টি মাত্র। রেখা ও রঙের জাল-বোনা—চিত্ররচনা হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ কথার জাল-বোনাও কি কাব্যকলা? 'তোমার স্বভাবের গর্ত্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকে বেঁকে'—বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাষা কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে! 'তার ত্রুটির পূর্ণ মূল্য শোধ হয়েছে বিনাশে', 'সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যুষে',

'জীবনের কোনও একটি ফলবান খণ্ড'—এ সকল শব্দযোজনা কি বাংলা? শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তিনি স্বীকার করেন না, অট্টহাস্যের স্থলে 'অট্ট বিদ্রূপ' শুনিতে নূতন, এবং সেজন্য জোরালো বলিয়া মনে হয়; কিন্তু হাস্যের আওয়াজ আছে—বিদ্রূপের তো আওয়াজ নাই; তাহা হইলে 'অট্ট-বিদ্রূপ' হয় কেমন করিয়া? 'বিদ্রূপ' অর্থে নিশ্চয়ই 'হাস্য' নয়! রচনার সব চেয়ে বড় দোষ—অকারণ বাগ্‌বাহুল্য, তাহাও ইহাতে আছে, যথা—

> তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য্য-প্রদক্ষিণের পথে
> যে বিপুল নিমেষগুলি
> উন্মীলিত নিমীলিত হ'তে থাকে
> তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো এক আসনের
> সত্য মূল্য যদি দিয়ে থাকি—

—ইহাতে ভূগোল, গণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র মিলিয়া কালকে যেরূপ অসীম করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কাব্যরসের উপযোগী বটে; কিন্তু 'বিপুল নিমেষে'র ক্ষুদ্র অংশ তো ক্ষুদ্র নয়, অন্তত দশ হাজার বৎসর হইবে। তার পর—'আসনের সত্য মূল্য', এই কবিতারই আর এক স্থানে আছে—'ত্রুটির পূর্ণ মূল্য শোধ হয়েছে বিনাশে'; এ ভাষা মূল্যবান বটে।

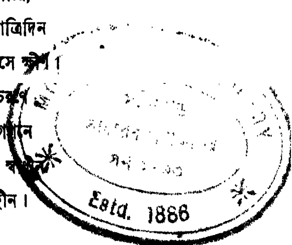
৪

রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'রিদ্‌মিক প্রোজ'-এর একটি বিশিষ্ট নমুনা এইরূপ। স্বীকার করি, ইহাতে একটা ধ্বনিস্রোত রহিয়াছে,—এবং তাহা কাব্যচ্ছন্দকে বর্জন করিয়া। কিন্তু প্রশ্ন এই, ইহা কি কবিতা হইয়াছে? এই রচনার আগাগোড়া একটা আতিশয্য বা জবরদস্তি—'এফেক্ট্'-সৃষ্টির প্রাণপণ প্রয়াস—থাকাতে সত্যকার কাব্যপ্রেরণা কোথায়ও স্ফূর্ত্তি পায় নাই। ইহাতে আছে কতকগুলা কথা, কথা, আর কথা। এমনতর কথা আরও সহজ ভঙ্গিতে, বিশুদ্ধতর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলে আরও সরল ও কৃত্রিমতাশূন্য হইত। রবীন্দ্রনাথের মত ভাবুকের চিন্তাগভীর ভাবরাশি অর্থপূর্ণ হইবেই—অর্থগৌরবকে কাব্যগৌরব দান করিবার জন্য কতকগুলি কষ্টকল্পিত তাক্-লাগানো উপমার কোনও প্রয়োজনই ছিল না; এ সকল বস্তু যে কাব্যবস্তু নয়, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানেন। ভাষা ও সাহিত্যের এই দুর্গতির দিনে কেবলমাত্র ভঙ্গি-চাতুর্য্যের লোভে রবীন্দ্রনাথের মত

ঋষিকল্প রসস্রষ্টার এই আধুনিকত্বের মোহ কেন? বাংলা ভাষা ও ছন্দ লইয়া যে কারিগরি তিনি করিয়াছেন তাহা বাঙালীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অসামান্য গীতি-প্রতিভা বলে তিনি বাংলা ভাষাকে রূপ-যৌবনের লাস্যলীলায় উর্ব্বশীর মতই মনোহারিণী করিয়াছেন। কিন্তু শেষ বয়সে যখন যৌবন-প্রতিভা আর নাই, তখন তাঁহার কাব্য-অপ্সরী রূপের পরিবর্ত্তে অপ-রূপের সাধনা করিতেছে। ভাব-অর্থ-নিরপেক্ষ চিত্রকলার রেখা-লেখ-বিলাসের মত, অতিশয় তুচ্ছ ও সামান্য বস্তুকে—জীর্ণ ভাব ও জরাগ্রস্ত কল্পনাকে—কেবল ভঙ্গিমার সাহায্যে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা কবিকর্ম্ম নহে। এ সকল রচনায় যে 'রিদ্‌ম' আছে, তাহার কোনও বিশিষ্ট গৌরব নাই; টানা সহজ গদ্যে সেটুকু অনায়াসে চলিতে পারে, তার জন্য নূতন পংক্তি-প্রথার প্রয়োজন নাই। হসন্ত ও যুক্তবর্ণের সুবিধা যতই থাকুক, বাংলা ভাষায় 'রিদ্‌ম'কে শ্রুতিগম্য ও সুখশ্রাব্য করিতে হইলে, ছন্দের দৃঢ়বন্ধন চাই। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দেই এই 'রিদ্‌ম'-রহস্য প্রথম ধরা পড়িয়াছিল—এক দিকে যেমন যতিস্থাপনের স্বাধীনতা, অপর দিকে তেমনই পদ্যের পদবন্ধনকে স্বীকার করিয়া, তিনি বাংলা কাব্যে 'রিদ্‌ম্‌'-এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই 'পৃথিবী' কবিতায় যাহা করিয়াছেন তাহা একটা *tour de force* বা 'পালোয়ানী প্যাঁচ' বলিয়া গণ্য হইতে পারে—তাহার অতিরিক্ত আর কিছু দাবী ইহার নাই।

রবীন্দ্রনাথ জন্ম-মৃত্যুর উর্দ্ধে, তাই একই জীবনে বহু জন্মের সাধনা তিনি করিলেন। এই জীবনেরই কোনও এক পূর্ব্বজন্মে তিনি ভাষা ও ছন্দের যে সাধনা করিয়াছিলেন আজ তাহাকে পায়ের ধূলার মত ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন। একদিন তিনিই লিখিয়াছিলেন—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি একেবারে উর্দ্ধমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বচ্ছন্দে
মেলি' দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।



মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজসম
উদ্দাম সুন্দর গতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।

—সেদিনের সে আশ্বাস আজ আর নাই। পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাইবার বিধি তিনি অন্যভাবে পালন করিতেছেন। বাংলা-সাহিত্যই অরণ্য হইয়া উঠিয়াছে, তিনি সেই অরণ্যে পরমসুখে বাস করিয়া তাহারই বৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। আমরা সেই অরণ্যে বৃথাই রোদন করিতেছি।

[অগ্রহায়ণ ১৩৪৩]

মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ অবশেষে এই মর্ত্ত্যের মলিনতামুক্ত হইয়া সেই লোকে প্রস্থান করিলেন—'বাচো যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'; যেখানে চন্দ্রতারকার ভাতিও ম্লান, বিদ্যুৎ দ্যুতিহীন, অগ্নির তো কথাই নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে মর্ত্ত্য-মমতার কথা আমরা জানি, তাঁহার উদয়কালের সেই 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' হইতে অস্তকালের—

একদা কোন্ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে—

—পর্য্যন্ত, প্রাণের আকুতি ও দীর্ঘশ্বাসের গীতি স্মরণ করিলে, আমরাও যেমন সেই জ্যোতির্ম্ময় পরপারের দিব্যস্বপ্নে আশ্বস্ত বোধ করি না, তেমনই খেয়াপারের সেই ক্ষণটিতে রবীন্দ্রনাথও কেমন বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিতে ইচ্ছা হয়। এ ভাবনা দুর্ব্বল মানবচিত্তের ভাবনা; মানুষ আমরা, এবং এতকাল রবীন্দ্রনাথের অতি গভীর মানবতার কাব্যদুগ্ধধারে আমাদের প্রাণ পুষ্ট হইয়াছে, তাই, আজ মৃত্যুর আলোকে সেই মহামানবের মূর্ত্তি একবার আমাদের চোখ দিয়া দেখিতে চাই। আমরা জানি, মৃত্যুর দ্বারপথে রবীন্দ্রনাথ কোন নূতন পথে প্রবেশ করিলেন না—চিররাত্রির সেই তিমিরাবরণ তিনি অনেক আগেই ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি এই পারে থাকিতেই তমসার ওপার পর্য্যন্ত সেতু রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জানার ভিতর দিয়া তিনি যে অজানাকে জানিয়াছিলেন, মৃত্যুর আবির্ভাবে যখন সেই অজানাকে তাহার সাক্ষাৎরূপে জানিলেন, তখন তাঁহার প্রাণ কি একটুও চমকিত হয় নাই? তিনি অরূপ-অসীমকে রূপের সীমায় দেখিবার সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সকল দেখাই রূপরঞ্জিত ছিল; এক্ষণে তিনি সেই অরূপকে সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত অবস্থায় কিরূপ দেখিলেন? মৃত্যুর সে রূপ কি একটুও ভিন্ন নহে? রবীন্দ্র-কাব্যে, জীবন ও মৃত্যুর সারূপ্য-সাধনার যে অপূর্ব্ব গীতিসুর বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিঃশ্বসিত হইয়াছে, আজ সেই সুর আমাদের প্রাণে নূতন করিয়া আরও গভীরভাবে বাজিয়া

উঠিতেছে; আজ রবীন্দ্রনাথ যে-মৃত্যুকে বরণ করিলেন, সে-মৃত্যু কি সেই জীবনের দাবীও স্বীকার করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রাণ কি সেই ভাবের শরীরে শরীরী হইয়াই দিব্যধামে পৌঁছিয়াছে? এ প্রশ্ন হয়তো অন্য সময়ে অবান্তর, এমন কি অশোভন,—তাঁহার একান্ত নিজস্ব আত্মিক উপলব্ধির সম্বন্ধে আমাদের কোনও কৌতূহল যেমন অনাবশ্যক, তেমনই নিরর্থক; রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তির ব্যক্তিচেতনার সেই অপর পৃষ্ঠে—তাহার গূঢ়তম সত্তায়—কোন্ বিশ্বাস, কোন্ ধ্রুব-জ্ঞান কি ভাবে বিদ্যমান ও বিকাশমান ছিল, সেই অপ্রকাশকে জানিবার শক্তি আমাদের নাই—অধিকারও নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার জীবনের যে প্রকাশের দিকটি দেখিয়াছি, যাহা আমাদের এই মর্ত্যসংস্কার-মলিন প্রাণকেই আশ্বস্ত ও উজ্জীবিত করিয়াছে, তাহার অবসান ও পরপারের সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে প্রবেশ, এই দুইয়ের মধ্যে—লোকান্তরের মত—ব্যক্তিত্বেরও একটা রূপান্তর কল্পনা করিয়া, মর্ত্ত্যের সহিত অমর্ত্ত্যের ব্যবধান বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না; সেই মৃত্যুর ছায়া, রবীন্দ্র-কাব্যের আলোকে আলোকিত আমাদের চিত্তপ্রাঙ্গণে পড়িয়া, যে ভাবের উদ্রেক করিতেছে—আজ তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

২

সেদিন কবির শ্রাদ্ধবাসরে যখন সেই ঋষিমন্ত্র পাঠ হইতেছিল—'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—তখন কবির নিজের রচিত আর একটি মন্ত্র আমাদের প্রাণে আর এক ভাবের উদ্রেক করিতেছিল—

ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার হউক অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়,
তোমারি হউক জয়॥

—এখানে, পৃথিবীর মলিন আলোক অপসারিত করিয়া, অপ্রকাশের তিমির-তোরণ ভেদ করিয়া যাহার প্রকাশকে কবি বন্দনা করিতেছেন, তাহা যে এই বায়ু, জল, ওষধি ও পার্থিব রজঃ প্রভৃতিকে মধুমৎ করিয়া তুলিবার সেই একই অমৃত-আলোক-ধারা—এ আশ্বাস আমাদের প্রাণে জাগে না। এ গান শুনিয়া মনে হয়, জীবনের কক্ষে শতদীপ জ্বালিয়া আমরা বাহিরের অন্ধকার রাত্রিকে যতই ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করি না কেন, জীবনের সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণের পথে, সেই মৃত্যুই দুর্জ্ঞেয় রহস্যপুরীর প্রাকারতলে, নক্ষত্রশলাকাখচিত বিরাট তোরণদ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন যে তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়ের প্রার্থনা আত্মার আর্ত্তরবের মতই উত্থিত হয়—'মৃত্যুর হোক লয়' বলিয়া মৃত্যুর যে রূপকে স্বীকার করিতে হয়—মনে হয়, তাহা হইতে ঋষি অথবা কবি কাহারও নিষ্কৃতি নাই। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থান-গীতিও চিরযুগের মৃত্যুভয়-পীড়িত মানুষের অন্তিম আকুতি-স্বরে ভরিয়া উঠিয়াছে। জীবনের যে উৎসবশালায় তিনি স্বহস্তে অসংখ্য দীপ জ্বালিয়াছেন, স্বরচিত বিচিত্র কুসুমমাল্যে আমাদের ললাট ভূষিত করিয়াছেন, সেই উৎসবশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন তিনি বাহিরের অন্ধকারে পদক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার দূরাগত কণ্ঠের আর এক গীত আমরা এখানে বসিয়া শুনিলাম—

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথা
লও লও ক্রোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকার॥
হয় যেন মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥

—তাহাতে আমাদের উৎসবশালার এই দীপাবলী আর তেমন উজ্জ্বল বোধ হয় না। তখন আমাদের সেই উৎসব-নায়ক রবীন্দ্রনাথকে সেই মহা-অজানার সম্মুখে যে-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অন্তরের অভয় কামনা করিতে শুনি, তাহাতে মনে হয়, জীবনেই মৃত্যুকে জয় করিবার যে সাধনাই করি না কেন, জীবিতের চক্ষে

মৃত্যুর আবরণ ঘোচে না—মৃত্যুর সেই জলজ্জটাকলাপ জীবনের আলোককে উপহাস করিয়া, আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়া, অন্ধকারকেই অন্ধতর করিয়া তোলে; মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয় না হইলে, অসীমের পথে সেই অন্ধকার পার হইবার ধ্রুবতারাটির সন্ধান মেলে না। কবি যে 'বন্ধন-ক্ষয়ে'র কামনা করিলেন, তাহাতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, দেহের ইন্দ্রিয়-বেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার মনের সেই মণিপদ্ম, রূপ-রস-স্পর্শের—বর্ণ, গন্ধ ও মধুর যে অশেষ আনন্দে দলে দলে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সকল সংস্কার, মৃত্যুর সহিত মুখামুখী হইবার কালে, তিনি মোচন করিতেই চাহিয়াছিলেন? একদিন যে গাহিয়াছিলেন—

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ,
তার অণু পরমাণু পেলো কত আলোর সঙ্গ।
আছে কত সুরের সোহাগ তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হ'ল মগ্ন।
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েছে বরমালা,
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বাললো॥

—আজ এই মুহূর্ত্তে সে কথা কি তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন! কবির প্রাণ কি তখন 'কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনে'র সকল মোহ দূর করিয়া—নিজের সেই অপরিমেয় প্রাণ-বহ্নির নির্ব্বাণ কামনা করিয়া—স্নিগ্ধ শীতল শান্তি-পারাবারে তরী ভাসাইবার জন্য, মুক্তিদাতা কর্ণধারকে ডাক দিল—তাহারই ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা করিল! এত সাধ ও সাধের জীবন পিছনে পড়িয়া রহিল; যে কণ্ঠ অন্ধকারের বক্ষ চিরিয়া গানে গানে আলোকের উৎস অবারিত করিয়াছিল, সে কণ্ঠ শুধুই নীরব হইল না—গানের সেই সুরও ভুলিয়া গেল!

রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে গম্ভীর বেদগাথার মতই উদ্গীত তাঁহার সেই স্বরচিত গানগুলির মধ্যে, অনন্তের পথে সেই দেহমুক্ত আত্মার যে যাত্রী-বেশ মানসচক্ষে দেখিতে পাইলাম, তাহা জীবনের নিকট বিদায় লওয়ার বেশ; মহাভারতকার যুধিষ্ঠিরাদির যে মহাপ্রস্থান-বেশ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাও সেই বেশ। এই মহাযাত্রার পথে পশ্চাতের আকর্ষণ এতটুকু থাকিবার যো নাই—সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে হয়; সকল মমতা, সকল মোহ জয় করিতে হয়।

কবি এইখানে থাকিতে যে আলো দুই চক্ষে ভরিয়া লইয়াছিলেন, সে আলোকে মৃত্যুর পথ আলোকিত হইল না; গানের সহস্র ফুলে যে মালা গাঁথিয়াছিলেন, সেই মালার কথাও মনে রহিল না; পৃথিবীর আর কোন কবির জীবনে যে আনন্দ এমন নিরবচ্ছিন্ন গীতময় হইয়া উঠে নাই, সেই আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডারও খেয়াপারের কড়ি যোগাইল না। যখন সেই চরম মুহূর্ত্তে, কবির মুখ হইতে, সকল যুগের সকল মানবের সেই এক আর্ত্ত আবেদন, কম্পিত কণ্ঠে, নিরাভরণা বাণীর বেশে, বাহির হইয়া আসিল—

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

তখন, শোকস্তব্ধ হৃদয়কে বারবার কেবল এই কথাই বলিলাম—

সকল অভ্যাসহারা সর্ব্ব আবরণ ছাড়া
সদ্য শিশুসম
নগ্ন-মূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম'।

৩

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-সাধনায় মৃত্যুকে কখনও ভোলেন নাই, বরং জীবন ও মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইবার সাধনাই তাঁহার কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। মানুষ যাহার কথা চিন্তা করিতে ভয় পায়, আমাদের যাবতীয় মর্ত্ত্যসংস্কার যাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে,—যাহার বর্ণনায় সকল কালের কবির কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, এবং গান রোদন হইয়া উঠিয়াছে,—রবীন্দ্রনাথ সেই মৃত্যুকে বারংবার যে সঙ্গীতে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে ব্যথাও সুখ হইয়া উঠে, হর্ষ ও বিষাদ একই অশ্রুজলে বিগলিত হয়। কবি জীবনকে ভালবাসিতেন বলিয়াই—যে-মৃত্যু সেই জীবনেরই পরিণাম, তাহাকে একটা সর্ব্বনাশ বা মহাশূন্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, করিলে জীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে। জীবনকে শুধুই ভোগ করা নয়—সেই ভোগ যে একটা মোহ, তাহার মূলে যে কেবল অন্ধ ইন্দ্রিয়-চেতনাই আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে বাধিত বলিয়াই তিনি জীবনের সহিত মৃত্যুর সঙ্গতি-সাধনে এমন উৎসুক ছিলেন। এই ভাব-সাধনায়

হইয়া, শব্দ নাচাইবার রঙ্গস্থল হইয়া উঠিবে। যেহেতু ইহাতে ভাব অপেক্ষা শব্দের প্রাধান্যই অধিক, রসসৃষ্টির পরিবর্ত্তে ধ্বনিসৃষ্টিই ইহার মুখ্য অভিপ্রায়, এজন্য ইহাতে কবি ও কাব্যের প্রাণান্ত ঘটে। উদাহরণ দিব। যাহা আদৌ গদ্য, তাহাকে কাব্যরূপ দিতে চাহিলে—অথবা যে ভাষায় ছন্দোহীন 'রিদ্‌ম' সম্ভব নয়, তাহাতে কেবলমাত্র বর্ণসংঘাত ও পংক্তিপর্ব্বের সাহায্যে কাব্যচ্ছন্দের অনুরূপ শ্রুতি-সুখ উৎপাদন করিতে চাহিলে, যাহা হয়—তাহাই যে-রচনাটিতে বিশেষ করিয়া হইয়াছে, আমি সেই 'পৃথিবী'-সন্দর্ভটির সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করিব।

কারণ, এই রচনাটিতেই ছন্দোহীন ছন্দের ভঙ্গিমা অতিশয় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধরণের অন্যান্য 'কবিতা'গুলিতে আর সকলই ছিল; কিন্তু ভাষার এমন শব্দ-সঙ্কর, সমাস-সন্ধিযুক্ত শব্দ-ঘনঘটার গুরু-গুরু গরগর ডম্বরুনাদ আর কোথায়ও এমন সার্থক হইয়া উঠে নাই। শব্দের এই ঘনঘটা যেখানেই একটু নরম হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই—

হাওয়ার মুখে ছুটলো ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদী ডাকাতের মতো—

অথবা

চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।

—ভাষা এমনই ভব্য, এবং উপমা এমনই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে!—'কারণ, 'চাঁদের পেয়ালা' অপেক্ষা 'চায়ের পেয়ালা' শুনিতে অনেক ভাল, এবং 'স্বর্গীয় মদের ফেনা' বাংলাভাষার বস্ত্রহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ভাঙা কুঁড়ের চাল' 'হাওয়ার মুখে' উড়িবার মত হালকা হইতে পারে, কিন্তু 'কয়েদী ডাকাতের মত' জোয়ান সে নয়, এবং ছিঁড়িবার মত শিকল তাহার দেহের কোথায়ও শক্ত করিয়া বাঁধা থাকে না। এই কবিতার আর একটি চিত্র এইরূপ—

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখীর মত তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে'
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে—

কালবৈশাখীর ঝড়ের ছবি,—কিন্তু কোনও একটা রূপ স্পষ্ট হইতে পারে নাই। আকাশটা কেশর-ফোলা সিংহ, ঝড় হইয়াছে শ্যেনপাখী, এবং দিগন্ত—বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ একটা কিছু; চিত্রের অংশগুলি সামঞ্জস্য-হীন। কিন্তু ভাষার এই ঘনঘটা সত্ত্বেও ভাবের মহত্ত্ব কুত্রাপি নাই। কালবৈশাখীর ভীষণতা উপলব্ধি করিতে হইবে কেবল বাক্যের ঘনঘটায়, শব্দের ঝড়ে; অর্থাৎ ইহা বিশুদ্ধ Onomatopœia। নতুবা, ঝড়ের সঙ্গে শ্যেনপাখীর তুলনা! আকাশজোড়া কালো মেঘ আর একটা বড় চিল!—তার চঞ্চু হইল বিদ্যুৎ! ছোটকে বড়র উপমান করিলে বড়ই ছোট হইয়া যায়; এরূপ কল্পনাকে সুস্থ বলা যায় না। আদিম যুগের কাব্যে এইরূপ উপমাই আমরা বেশি দেখিতে পাই, তাহাতে কবিকল্পনার শৈশব-সারল্য ও প্রাবল্যই প্রকাশ পায়; আধুনিক কবির পক্ষে সে কৈফিয়ৎ খাটে না।

এই কবিতার ভাষাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। অতি-আধুনিক কাব্যে বাণীর বাণীত্ব নাই—ছন্দ অনাবশ্যক হইয়াছে সেইজন্যই। এখানেও শব্দের ঝড় বহাইতে গিয়া কবি শব্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই 'আধ-পোষা নাগ-দানবে'র 'আধ-পোষা' অভিপ্রেত অর্থ বহন করে না; 'ডাল-পালা আলুথালু করে'র মত ইডিয়ম-বিরুদ্ধ প্রয়োগ আর্ষপ্রয়োগ হইয়া দাঁড়ায়। 'অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ পুঞ্জিত তার ধূলায়' এবং 'বনের মৃদু মর্ম্মর উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে অধীর কলকল্লোলে,'—প্রভৃতিতে, আওয়াজের খাতিরে যেমন 'ধূলো'র বদলে 'ধূলায়' লিখিতে বাধে নাই, তেমনই 'উঠেছে'র সঙ্গে 'উচ্ছসিয়া'র মত সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে কবি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কোনখানে 'আঁকড়ে' আবার কোথায়ও 'উপ্‌চিয়ে' ('উপচে' নয়)—ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরঙ্কুশ কবি বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও হইতে পারেন নাই। 'আতপ্ত দক্ষিণে-হাওয়া ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহ-মিলনের স্বগত প্রলাপ আম্রমুকুলের গন্ধে'—ইহা স্বগত প্রলাপ হইতে পারে, কিন্তু কাব্য নয়,—শব্দসমষ্টি মাত্র। রেখা ও রঙের জাল-বোনা—চিত্ররচনা হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ কথার জাল-বোনাও কি কাব্যকলা? 'তোমার স্বভাবের গর্ত্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকে বেঁকে'—বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাষা কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে! 'তার ত্রুটির পূর্ণ মূল্য শোধ হয়েছে বিনাশে', 'সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যূষে',

'জীবনের কোনও একটি ফলবান খণ্ড'—এ সকল শব্দযোজনা কি বাংলা? শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তিনি স্বীকার করেন না, অট্টহাস্যের স্থলে 'অট্ট বিদ্রূপ' শুনিতে নূতন, এবং সেজন্য জোরালো বলিয়া মনে হয়; কিন্তু হাস্যের আওয়াজ আছে—বিদ্রূপের তো আওয়াজ নাই; তাহা হইলে 'অট্ট-বিদ্রূপ' হয় কেমন করিয়া? 'বিদ্রূপ' অর্থে নিশ্চয়ই 'হাস্য' নয়! রচনার সব চেয়ে বড় দোষ—অকারণ বাগ্‌বাহুল্য, তাহাও ইহাতে আছে, যথা—

তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য্য-প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি
উন্মীলিত নিমীলিত হ'তে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো এক আসনের
সত্য মূল্য যদি দিয়ে থাকি—

—ইহাতে ভূগোল, গণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র মিলিয়া কালকে যেরূপ অসীম করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কাব্যরসের উপযোগী বটে; কিন্তু 'বিপুল নিমেষে'র ক্ষুদ্র অংশ তো ক্ষুদ্র নয়, অন্তত দশ হাজার বৎসর হইবে। তার পর—'আসনের সত্য মূল্য'; এই কবিতারই আর এক স্থানে আছে—'ত্রুটির পূর্ণ মূল্য শোধ হয়েছে বিনাশে'; এ ভাষা মূল্যবান বটে।

৪

রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'রিদ্‌মিক প্রোজ'-এর একটি বিশিষ্ট নমুনা এইরূপ। স্বীকার করি, ইহাতে একটা ধ্বনিস্রোত রহিয়াছে,—এবং তাহা কাব্যচ্ছন্দকে বর্জ্জন করিয়া। কিন্তু প্রশ্ন এই, ইহা কি কবিতা হইয়াছে? এই রচনার আগাগোড়া একটা আতিশয্য বা জবরদস্তি—'এফেক্ট্'-সৃষ্টির প্রাণপণ প্রয়াস—থাকাতে সত্যকার কাব্যপ্রেরণা কোথায়ও স্ফূর্ত্তি পায় নাই। ইহাতে আছে কতকগুলা কথা, কথা, আর কথা। এমনতর কথা আরও সহজ ভঙ্গিতে, বিশুদ্ধতর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলে আরও সরল ও কৃত্রিমতাশূন্য হইত। রবীন্দ্রনাথের মত ভাবুকের চিন্তাগভীর ভাবরাশি অর্থপূর্ণ হইবেই—অর্থগৌরবকে কাব্যগৌরব দান করিবার জন্য কতকগুলি কষ্টকল্পিত তাক্-লাগানো উপমার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। এ সকল বস্তু যে কাব্যবস্তু নয়, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানেন। ভাষা ও সাহিত্যের এই দুর্গতির দিনে কেবলমাত্র ভঙ্গি-চাতুর্য্যের লোভে রবীন্দ্রনাথের মত

ঋষিকল্প রসস্রষ্টার এই আধুনিকত্বের মোহ কেন? বাংলা ভাষা ও ছন্দ লইয়া যে কারিগরি তিনি করিয়াছেন তাহা বাঙালীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অসামান্য গীতি-প্রতিভা বলে তিনি বাংলা ভাষাকে রূপ-যৌবনের লাস্যলীলায় উর্ব্বশীর মতই মনোহারিণী করিয়াছেন। কিন্তু শেষ বয়সে যখন যৌবন-প্রতিভা আর নাই, তখন তাঁহার কাব্য-অপ্সরী রূপের পরিবর্ত্তে অপ-রূপের সাধনা করিতেছে। ভাব-অর্থ-নিরপেক্ষ চিত্রকলার রেখা-লেখ-বিলাসের মত, অতিশয় তুচ্ছ ও সামান্য বস্তুকে—জীর্ণ ভাব ও জরাগ্রস্ত কল্পনাকে—কেবল ভঙ্গিমার সাহায্যে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা কবিকর্ম্ম নহে। এ সকল রচনায় যে 'রিদ্‌ম্‌' আছে, তাহার কোনও বিশিষ্ট গৌরব নাই; টানা সহজ গদ্যে সেটুকু অনায়াসে চলিতে পারে, তার জন্য নূতন পংক্তি-প্রথার প্রয়োজন নাই। হসন্ত ও যুক্তবর্ণের সুবিধা যতই থাকুক, বাংলা ভাষায় 'রিদ্‌ম্‌'কে শ্রুতিগম্য ও সুখশ্রাব্য করিতে হইলে, ছন্দের দৃঢ়বন্ধন চাই। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দেই এই 'রিদ্‌ম্‌'-রহস্য প্রথম ধরা পড়িয়াছিল—এক দিকে যেমন যতিস্থাপনের স্বাধীনতা, অপর দিকে তেমনই পদ্যের পদবন্ধনকে স্বীকার করিয়া, তিনি বাংলা কাব্যে 'রিদ্‌ম্‌'-এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই 'পৃথিবী' কবিতায় যাহা করিয়াছেন তাহা একটা *tour de force* বা 'পালোয়ানী প্যাঁচ' বলিয়া গণ্য হইতে পারে—তাহার অতিরিক্ত আর কিছু দাবী ইহার নাই।

রবীন্দ্রনাথ জন্ম-মৃত্যুর ঊর্দ্ধে, তাই একই জীবনে বহু জন্মের সাধনা তিনি করিলেন। এই জীবনেরই কোনও এক পূর্ব্বজন্মে তিনি ভাষা ও ছন্দের যে সাধনা করিয়াছিলেন আজ তাহাকে পায়ের ধূলার মত ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন। একদিন তিনিই লিখিয়াছিলেন—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি একেবারে উর্দ্ধমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বচ্ছন্দে
মেলি' দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজসম
উদ্দাম সুন্দর গতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।

—সেদিনের সে আশ্বাস আজ আর নাই। পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাইবার বিধি তিনি অন্যভাবে পালন করিতেছেন। বাংলা-সাহিত্যই অরণ্য হইয়া উঠিয়াছে, তিনি সেই অরণ্যে পরমসুখে বাস করিয়া তাহারই বৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। আমরা সেই অরণ্যে বৃথাই রোদন করিতেছি।

[অগ্রহায়ণ ১৩৪৩]

মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ অবশেষে এই মর্ত্ত্যের মলিনতামুক্ত হইয়া সেই লোকে প্রস্থান করিলেন—'বাচো যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'; যেখানে চন্দ্রতারকার ভাতিও ম্লান, বিদ্যুৎ দ্যুতিহীন, অগ্নির তো কথাই নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে মর্ত্ত্য-মমতার কথা আমরা জানি, তাঁহার উদয়কালের সেই 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' হইতে অস্তকালের—

একদা কোন্ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে—

—পর্য্যন্ত, প্রাণের আকুতি ও দীর্ঘশ্বাসের গীতি স্মরণ করিলে, আমরাও যেমন সেই জ্যোতির্ম্ময় পরপারের দিব্যস্বপ্নে আশ্বস্ত বোধ করি না, তেমনই খেয়াপারের সেই ক্ষণটিতে রবীন্দ্রনাথও কেমন বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিতে ইচ্ছা হয়। এ ভাবনা দুর্ব্বল মানবচিত্তের ভাবনা; মানুষ আমরা, এবং এতকাল রবীন্দ্রনাথের অতি গভীর মানবতার কাব্যদুগ্ধধারে আমাদের প্রাণ পুষ্ট হইয়াছে, তাই, আজ মৃত্যুর আলোকে সেই মহামানবের মূর্ত্তি একবার আমাদের চোখ দিয়া দেখিতে চাই। আমরা জানি, মৃত্যুর দ্বারপথে রবীন্দ্রনাথ কোন নূতন পথে প্রবেশ করিলেন না—চিররাত্রির সেই তিমিরাবরণ তিনি অনেক আগেই ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি এই পারে থাকিতেই তমসার ওপার পর্য্যন্ত সেতু রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জানার ভিতর দিয়া তিনি যে অজানাকে জানিয়াছিলেন, মৃত্যুর আবির্ভাবে যখন সেই অজানাকে তাহার সাক্ষাৎরূপে জানিলেন, তখন তাঁহার প্রাণ কি একটুও চমকিত হয় নাই? তিনি অরূপ-অসীমকে রূপের সীমায় দেখিবার সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সকল দেখাই রূপরঞ্জিত ছিল; এক্ষণে তিনি সেই অরূপকে সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত অবস্থায় কিরূপ দেখিলেন? মৃত্যুর সে রূপ কি একটুও ভিন্ন নহে? রবীন্দ্র-কাব্যে, জীবন ও মৃত্যুর সারূপ্য-সাধনার যে অপূর্ব্ব গীতিসুর বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিঃশ্বসিত হইয়াছে, আজ সেই সুর আমাদের প্রাণে নূতন করিয়া আরও গভীরভাবে বাজিয়া

উঠিতেছে; আজ রবীন্দ্রনাথ যে-মৃত্যুকে বরণ করিলেন, সে-মৃত্যু কি সেই জীবনের দাবীও স্বীকার করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রাণ কি সেই ভাবের শরীরে শরীরী হইয়াই দিব্যধামে পৌঁছিয়াছে? এ প্রশ্ন হয়তো অন্য সময়ে অবান্তর, এমন কি অশোভন,—তাঁহার একান্ত নিজস্ব আত্মিক উপলব্ধির সম্বন্ধে আমাদের কোনও কৌতূহল যেমন অনাবশ্যক, তেমনই নিরর্থক; রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তির ব্যক্তিচেতনার সেই অপর পৃষ্ঠে—তাহার গূঢ়তম সত্তায়—কোন্ বিশ্বাস, কোন্ ধ্রুব-জ্ঞান কি ভাবে বিদ্যমান ও বিকাশমান ছিল, সেই অপ্রকাশকে জানিবার শক্তি আমাদের নাই—অধিকারও নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার জীবনের যে প্রকাশের দিকটি দেখিয়াছি, যাহা আমাদের এই মর্ত্ত্যসংস্কার-মলিন প্রাণকেই আশ্বস্ত ও উজ্জীবিত করিয়াছে, তাহার অবসান ও পরপারের সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে প্রবেশ, এই দুইয়ের মধ্যে—লোকান্তরের মত—ব্যক্তিত্বেরও একটা রূপান্তর কল্পনা করিয়া, মর্ত্ত্যের সহিত অমর্ত্ত্যের ব্যবধান বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না; সেই মৃত্যুর ছায়া, রবীন্দ্র-কাব্যের আলোকে আলোকিত আমাদের চিত্তপ্রাঙ্গণে পড়িয়া, যে ভাবের উদ্রেক করিতেছে—আজ তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

২

সেদিন কবির শ্রাদ্ধবাসরে যখন সেই ঋষিমন্ত্র পাঠ হইতেছিল—'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—তখন কবির নিজের রচিত আর একটি মন্ত্র আমাদের প্রাণে আর এক ভাবের উদ্রেক করিতেছিল—

ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার হউক অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়,
তোমারি হউক জয়॥

—এখানে, পৃথিবীর মলিন আলোক অপসারিত করিয়া, অপ্রকাশের তিমির-তোরণ ভেদ করিয়া যাহার প্রকাশকে কবি বন্দনা করিতেছেন, তাহা যে এই বায়ু, জল, ওষধি ও পার্থিব রজঃ প্রভৃতিকে মধুমৎ করিয়া তুলিবার সেই একই অমৃত-আলোক-ধারা—এ আশ্বাস আমাদের প্রাণে জাগে না। এ গান শুনিয়া মনে হয়, জীবনের কক্ষে শতদীপ জ্বালিয়া আমরা বাহিরের অন্ধকার রাত্রিকে যতই ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করি না কেন, জীবনের সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণের পথে, সেই মৃত্যুই দুর্জ্ঞেয় রহস্যপুরীর প্রাকারতলে, নক্ষত্রশলাকাখচিত বিরাট তোরণদ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন যে তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়ের প্রার্থনা আত্মার আর্ত্তরবের মতই উত্থিত হয়—'মৃত্যুর হোক লয়' বলিয়া মৃত্যুর যে রূপকে স্বীকার করিতে হয়—মনে হয়, তাহা হইতে ঋষি অথবা কবি কাহারও নিষ্কৃতি নাই। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থান-গীতিও চিরযুগের মৃত্যুভয়-পীড়িত মানুষের অন্তিম আকুতি-স্বরে ভরিয়া উঠিয়াছে। জীবনের যে উৎসবশালায় তিনি স্বহস্তে অসংখ্য দীপ জ্বালিয়াছেন, স্বরচিত বিচিত্র কুসুমমাল্যে আমাদের ললাট ভূষিত করিয়াছেন, সেই উৎসবশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন তিনি বাহিরের অন্ধকারে পদক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার দূরাগত কণ্ঠের আর এক গীত আমরা এখানে বসিয়া শুনিলাম—

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী
লও লও ক্রোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকার॥
হয় যেন মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥

—তাহাতে আমাদের উৎসবশালার এই দীপাবলী আর তেমন উজ্জ্বল বোধ হয় না। তখন আমাদের সেই উৎসব-নায়ক রবীন্দ্রনাথকে সেই মহা-অজানার সম্মুখে যে-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অন্তরের অভয় কামনা করিতে শুনি, তাহাতে মনে হয়, জীবনেই মৃত্যুকে জয় করিবার যে সাধনাই করি না কেন, জীবিতের চক্ষে

মৃত্যুর আবরণ ঘোচে না—মৃত্যুর সেই জলজটাকলাপ জীবনের আলোককে উপহাস করিয়া, আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়া, অন্ধকারকেই অন্ধতর করিয়া তোলে; মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয় না হইলে, অসীমের পথে সেই অন্ধকার পার হইবার ধ্রুবতারাটির সন্ধান মেলে না। কবি যে 'বন্ধন-ক্ষয়ে'র কামনা করিলেন, তাহাতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, দেহের ইন্দ্রিয়-বেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার মনের সেই মণিপদ্ম, রূপ-রস-স্পর্শের—বর্ণ, গন্ধ ও মধুর যে অশেষ আনন্দে দলে দলে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সকল সংস্কার, মৃত্যুর সহিত মুখামুখী হইবার কালে, তিনি মোচন করিতেই চাহিয়াছিলেন? একদিন যে গাহিয়াছিলেন—

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ,
তার অণু পরমাণু পেলো কত আলোর সঙ্গ।
আছে কত সুরের সোহাগ তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হ'ল মগ্ন।
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েছে বরমালা,
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বাললো॥

—আজ এই মুহূর্ত্তে সে কথা কি তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন! কবির প্রাণ কি তখন 'কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনে'র সকল মোহ দূর করিয়া —নিজের সেই অপরিমেয় প্রাণ-বহ্নির নির্ব্বাণ কামনা করিয়া—স্নিগ্ধ শীতল শান্তি-পারাবারে তরী ভাসাইবার জন্য, মুক্তিদাতা কর্ণধারকে ডাক দিল—তাহারই ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা করিল! এত সাধ ও সাধের জীবন পিছনে পড়িয়া রহিল; যে কণ্ঠ অন্ধকারের বক্ষ চিরিয়া গানে গানে আলোকের উৎস অবারিত করিয়াছিল, সে কণ্ঠ শুধুই নীরব হইল না—গানের সেই সুরও ভুলিয়া গেল!

রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে গম্ভীর বেদগাথার মতই উদ্গীত তাঁহার সেই স্বরচিত গানগুলির মধ্যে, অনন্তের পথে সেই দেহমুক্ত আত্মার যে যাত্রী-বেশ মানসচক্ষে দেখিতে পাইলাম, তাহা জীবনের নিকট বিদায় লওয়ার বেশ; মহাভারতকার যুধিষ্ঠিরাদির যে মহাপ্রস্থান-বেশ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাও সেই বেশ। এই মহাযাত্রার পথে পশ্চাতের আকর্ষণ এতটুকু থাকিবার যো নাই—সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে হয়; সকল মমতা, সকল মোহ জয় করিতে হয়।

কবি এইখানে থাকিতে যে আলো দুই চক্ষে ভরিয়া লইয়াছিলেন, সে আলোকে মৃত্যুর পথ আলোকিত হইল না; গানের সহস্র ফুলে যে মালা গাঁথিয়াছিলেন, সেই মালার কথাও মনে রহিল না; পৃথিবীর আর কোন কবির জীবনে যে আনন্দ এমন নিরবচ্ছিন্ন গীতময় হইয়া উঠে নাই, সেই আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডারও খেয়াপারের কড়ি যোগাইল না। যখন সেই চরম মুহূর্ত্তে, কবির মুখ হইতে, সকল যুগের সকল মানবের সেই এক আর্ত্ত আবেদন, কম্পিত কণ্ঠে, নিরাভরণা বাণীর বেশে, বাহির হইয়া আসিল—

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

তখন, শোকস্তব্ধ হৃদয়কে বারবার কেবল এই কথাই বলিলাম—

সকল অভ্যাসহারা সর্ব্ব আবরণ ছাড়া
সদ্য শিশুসম
নগ্ন-মূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম'।

৩

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-সাধনায় মৃত্যুকে কখনও ভোলেন নাই, বরং জীবন ও মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইবার সাধনাই তাঁহার কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। মানুষ যাহার কথা চিন্তা করিতে ভয় পায়, আমাদের যাবতীয় মর্ত্ত্যসংস্কার যাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে,—যাহার বর্ণনায় সকল কালের কবির কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, এবং গান রোদন হইয়া উঠিয়াছে,—রবীন্দ্রনাথ সেই মৃত্যুকে বারংবার যে সঙ্গীতে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে ব্যথাও সুখ হইয়া উঠে, হর্ষ ও বিষাদ একই অশ্রুজলে বিগলিত হয়। কবি জীবনকে ভালবাসিতেন বলিয়াই—যে-মৃত্যু সেই জীবনেরই পরিণাম, তাহাকে একটা সর্ব্বনাশ বা মহাশূন্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, করিলে জীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে। জীবনকে শুধুই ভোগ করা নয়—সেই ভোগ যে একটা মোহ, তাহার মূলে যে কেবল অন্ধ ইন্দ্রিয়-চেতনাই আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে বাধিত বলিয়াই তিনি জীবনের সহিত মৃত্যুর সঙ্গতি-সাধনে এমন উৎসুক ছিলেন। এই ভাব-সাধনায়

তিনি জীবন ও মৃত্যুর অভেদ উপলব্ধি করিতেই প্রয়াস পাইতেন ; কখনও বা, জীবন হইতে জীবনে আত্মার প্রয়াণ-লীলায় মৃত্যু একটা ক্ষণচ্ছেদ মাত্র, ইহাই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইতেন। জীবনের দেবতা যিনি, মরণের দেবতাও তিনি —ইহা না হইয়া পারে না ; অতএব জীবনে যিনি এত স্নেহময়, এত সুন্দর, মরণে তিনি অন্যরূপ হইবেন কেমন করিয়া ?—

যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে
যবে পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

কিংবা—

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো অন্ধকারের তীরে,
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।

অথবা—

জীবনে ফুল-ফোটা হ'লে মরণে ফল ফল্‌বে

এবং—

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণ-পুটে,
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে—
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

—এত বড় আশ্বাস ও বিশ্বাস যাহার, মৃত্যু তাহাকে বিচলিত করিবে কেমন করিয়া ? যদি বা তাহার সেই আঘাত, দেহ-বিচ্ছেদের সেই যাতনাও স্বীকার করিতে হয়, তাহাও ক্ষণিক—

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে কবির এই যে মনোভাব, ইহার কারণও খুব স্পষ্ট। অতি

গূঢ় ও গভীর জীবন-রস-পিপাসাই এই মনোভাবের কারণ। কবির নিকটে মৃত্যুর কোন পৃথক সত্তা নাই এইজন্য যে, আত্মার অমরত্ব—জীবনের বাহিরে, মৃত্যু নামক কোন সীমানার অপর পারেই—আরম্ভ হয় না। যে-চেতনা অমরত্বের অনুষঙ্গী তাহা কোন নির্ব্বিকল্প কৈবল্যের অবস্থা নয়, সীমা ও অসীমার মিলন-ভূমি—এই অপরূপের নাট্যশালায় সেই অমরত্বের নিত্য-আস্বাদন হইয়া থাকে; আত্মা অমর এই অর্থে যে, সে—রূপ হইতে রূপান্তরে—সেই রস-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইবে না। সেইজন্যই জীবনের শেষ নাই; এই রূপের খেলাও যেমন অনন্তকাল চলিতে থাকিবে, তেমনই, সেই খেলার সঙ্গী বা চেতন সহচররূপেই আত্মার আত্ম-চেতনার কখনও লয় হইবে না। ইহার কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা না করিয়া, একটা স্থূল অর্থ করিলেই চলিবে—এবং সহজ মানবতার দিক দিয়া তাহা সত্যও বটে। সে অর্থ এই যে, কবি এই জগৎ-দৃশ্যের বাহিরে কোন অস্তিত্বের কামনা করিতেন না—সেইজন্য, সেই কামনারই রঙে রঙিন হইয়া মৃত্যুও তাঁহার নিকটে মনোহর হইয়াছিল। জগতের রস-রূপ এতই মনোহর যে, এ রূপের সঙ্গ ত্যাগ করিতে কখনও তাঁহার মন সরে নাই। যে ব্যক্তিত্বের বৃন্তবন্ধনে রূপের এই মধুসৌরভময় সহস্রদল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই ব্যক্তিত্বের লয় যদিও বা মনে উদিত হইত—মহানির্ব্বাণের বর্ণহীন তাপহীন জ্যোতিঃসমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার ইচ্ছা হইত,—তথাপি, তখনও সেই অকূল পারাবার অপেক্ষা জীবনের এই তটভূমি, এই জগৎ সুন্দরতম বলিয়া বোধ হইত, এবং মৃত্যুকেও জীবনের সুহৃদ বলিয়া মনে করিতে বাধিত না। যখন—

> আমি বলে, মিলাই আমি
> আর কিছু না চাই,

তখন—

> ভুবন বলে তোমার তরে
> আছে বরণ-মালা,
> গগন বলে, তোমার তরে
> লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
> প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
> তোমার লাগি আছি জেগে,
> মরণ বলে, আমি তোমার
> জীবন-তরী বাই॥

এই কামনাকে, এই প্রেমকেও, তিনি শোধন করিয়া লইয়াছেন—পরমার্থ-লাভের সহায়রূপে; এই রূপরসচর্য্যাকেই তিনি আত্মার সহিত মিলন বা আত্মোপলব্ধির একমাত্র পন্থা বলিয়া বার বার নিজেকে আশ্বস্ত করিয়াছেন—

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন-তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির-স্বয়ম্বরা।

অতএব, যে প্রবল কামনা মৃত্যুকেও জয় করিতে চাহিয়াছে—সে কামনা জগতেরই এই রূপরস-সম্ভোগের কামনা। মৃত্যুও সেই কামনার জোরে অমৃত হইয়া উঠিয়াছে। আর একটি গানে কবির সেই কামনা, ব্যর্থতার করুণ সুরকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায়, যে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাতে প্রাণ যেন মৃত্যুকে স্বীকার করিয়াও করিবে না। পৃথিবী হইতে বিদায় লওয়ার—একেবারে গত হওয়ার—যে বেদনা, তাহাই আকাশ ও পৃথিবীর শোভাকে যেমন মমতায় মেদুর করিয়া তুলিয়াছে, তেমনই, সেই বেদনাই শান্তিলাভ করিতে চায় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন-কল্পনায়;—

যখন পড়বে না মোর চরণ-চিহ্ন এই বাটে,
বাইবো না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
* * * *
ঘাটে ঘাটে খেয়াতরী
এম্‌নি সেদিন উঠবে ভরি,
চরবে গোরু, খেলবে রাখাল ঐ মাঠে।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে।

—এই গানের ঐ শেষ তিনটি পংক্তিতে যে দীর্ঘনিশ্বাস জমাট হইয়া আছে, তাহাই ইহার মূল সুর; ঐ তিনটি পংক্তিই ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদেরও হৃদয়ের তন্ত্রীতে যেরূপ আঘাত করে, তাহাতে বিদায়ের ব্যথাই তীব্রতর হইয়া উঠে; উহার মধ্যে সেই ব্যথাকে অগ্রাহ্য করিবার যে ভাব আছে, তাহা নিতান্তই গৌণ বলিয়া মনে হয়। কবি যখন সান্ত্বনার ছলে বলেন—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি।

—তখন সে আশ্বাস, সেই ব্যথার তুলনায়, অতিশয় অবাস্তব বুলিয়া মনে হয়। কারণ, যে-প্রাণ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার সময়ে এমন বিদায়-বিধুর হয়, সে প্রাণের পক্ষে এ আশ্বাস সত্য নয়। মৃত্যুতে যদি ব্যক্তিত্বের লোপ হয়—তাহাই যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে এই প্রাণও মরিয়া যাইবে; তখন 'কান্না-হাসির এই দোল-দোলানি'—এই "pleasing anxious being"-ও যে আর থাকিবে না! সেই ভয়ই যে সব চেয়ে বড় ভয়—সেই ক্ষতিই যে সব চেয়ে বড় ক্ষতি! তাহার বদলে, ঐ যে ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্বের চেতনা—সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষে ব্যাপ্ত হওয়ার আনন্দ—তাহা কি সত্যই একটা সান্ত্বনা! কবি এখানে এই যে 'চিরদিনের সেই আমি'র অমরত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাতে একটা তত্ত্বজ্ঞানের আনন্দ হয়তো আছে, কিন্তু প্রাণের আশ্রয় ইহাতে কোথায়? যে-আমি সকল খেলায় খেলা করে—সে আমি একটি সুন্দর কল্পনা মাত্র; তাহাতে একটা ভাবের সৌন্দর্য্যই আছে, প্রাণের ক্ষুধার বস্তু সে নয়—সে একটা মনের বিলাসের সামগ্রী। এইরূপ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় আছে, তাঁহার 'শিশু' বিদায় লইবার কালে তাহার মাকে বলিতেছে—

বাদ্‌লা যখন পড়বে ঝরে'
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গা'ব ঐ বনে।
জান্‌লা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক দিয়ে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে?
খোকার লাগি' তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হ'য়ে বলব তোমায় 'ঘুমো',

তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুক্‌ব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো ॥

—ইহাও কবিতা-হিসাবেই উপভোগ্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গানটির মধ্যে এই কল্পনাই একটি তত্ত্বরূপে উঁকি দিয়াছে। কবি, মৃত্যু হইতে মুক্তি, বা ব্যক্তির অমরত্বের যে আশ্বাস সেখানে ঘোষণা করিতেছেন, তাহা একটা তত্ত্বগত আশ্বাস মাত্র; অথচ সেই তত্ত্বজ্ঞান ও প্রাণের কামনার মধ্যে একটা বিরোধ রহিয়াছে। তাহাতে ব্যক্তি-চেতনাও যেন লোপ পাইতেছে না, বিশ্ব-চেতনার মধ্যেই তাহা জাগিয়া থাকিতে চায়; যে রূপরস-সম্ভোগ ব্যক্তি-দেহে ব্যক্তির চেতনাতেই সম্ভব, তাহাকেই দেহহীন নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় ভোগ করিতে চায়। জীবনের প্রতি এই অতি-গভীর ও দুশ্ছেদ্য মমতার বশে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কখনই একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেন নাই, তাহাকে বার বার দূরে রাখিতে চাহিয়াছেন। যৌবনে একদা তিনি মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া এই যে বলিয়াছিলেন—

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী' পরে
মুহূর্ত্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখী, এই সব দেখা-শোনা
ক্ষণিকের মেলা;
* * *
তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহা পরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম;
তবে মৃত্যু দূরে যাও, এখনি দিয়োনা ভেঙে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আমার দু'দিন হ'তে
করিয়ো না চুরি।

—ইহাই তাঁহার প্রাণের অকপট উক্তি, এই মনোভাবই মৃত্যুসম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব। ইহারই বশে, মৃত্যুকে দূরে রাখিবার আকুল আগ্রহে তিনি কত ভাবেই না জীবনের অমৃত-রূপ ধ্যান করিয়াছেন!

৪

তথাপি মনে হয়, আমরা তাঁহার যে-জীবন কাব্যের চলচ্চিত্র-পটে নানা বর্ণে বিলসিত হইতে দেখিয়াছি, তাহার অন্তরালে আত্মার যে নিশ্চল নিষ্কম্প জ্যোতিঃ-শিখা 'ঘূর্ণির মাঝখানে একটি বিন্দু'র মত স্থির হইয়া বিরাজ করিতেছিল—তাহার সন্ধান কখনও পাই নাই। যে-পুরুষ জীবনের এই নাট্যশালায় অজস্র ফুল ও অফুরন্ত আলোর আয়োজন আপনিই করিয়া লইয়াছিলেন—তিনি যে অন্ধকারকে কখনও ভোলেন নাই, তাহা আমরা দেখিয়াছি ; কিন্তু এত মমতা, এত মোহের মধ্যেও, যে বিশ্বাস তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে চিরদিন অটুট ছিল, যাহার বলে তিনি সকলই জানিয়া শুনিয়া এই অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন—সে কথা তিনিই জানিতেন, আমরা জানিতাম না। তাই মৃত্যুর তরণীতে পা দিবার সময়ে তিনি যখন সেই অনিত্য-লীলার নটবেশ ত্যাগ করিয়া নিত্যের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, তখন আমাদের চমকিত হইবার কারণ থাকিলেও, কবির আত্মা চমকিত হয় নাই ; তিনি তখন অতি ধীর গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠেই তাঁহার আত্মার সেই অভয়মন্ত্র ঘোষণা করিলেন। মৃত্যুর বিভীষিকা যেমন তাঁহাকে জীবনের প্রতি বিমুখ করিতে পারে নাই, তেমনই জীবনের হাসি-কান্নায় নিজের প্রাণকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াও, তিনি মৃত্যুকে কখনও বিস্মৃত হন নাই, যথা-সময়ে তাহার দাবী মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। মৃত্যুর উৎসঙ্গে বসিয়াই তিনি নিজের অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির বলে জীবনকে একটি উৎসবশালায় পরিণত করিয়া-ছিলেন—মৃত্যুকে জয় করিবার ভাবনাই যেন তাঁহার ছিল না। আমরা কবির সেই প্রাণের লীলাকে তাঁহার কবিতার মধ্যে যে রূপে প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি—কবি হয়তো নিজে কখনও তাহাকে সেইরূপে দেখেন নাই ; আমাদের নিকটে তাহা যেমন ছিল, কবির নিকটে তেমন ছিল না। সেই একান্ত একক আত্মসাক্ষাৎ-কারের দিককে কবি তাঁহার কাব্য-সাধনাতেও পৃথক রাখিয়াছিলেন—সেই দিকটি আমাদের চোখে পড়িবার নয় বলিয়াই কখনও পড়ে নাই। এই জীবন-রঙ্গভূমির নেপথ্য-অন্তঃপুরে—যেখানে কোন দর্শক নাই, শ্রোতা নাই, যেখানে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শের বিচিত্র বেশ-বিলাস, আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল সরিয়া মুছিয়া যায়, সেখানে রূপশিল্পী নিজেকে নিজের সৃষ্টি হইতে পৃথক করিয়া দেখে, সেখানে যে আত্মসাক্ষাৎকার অনিবার্য্য—রবীন্দ্রনাথ, রূপের ভাষাতেই অপরূপের সুর যোজনা

করিয়া, তাঁহার গানগুলিতে, নিজের সেই ব্যক্তি-চেতনার শেষ স্বাক্ষর দিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন ; কারণ, প্রাণের সেই গভীরতম আকুতি ও আশ্বাস—সেই অতিশয় আত্মগত অনুভূতি—জাগ্রত ব্যক্তি-চেতনাকেও অতিক্রম করে, তাহা অনির্ব্বচনীয় ; তাই তাহাকে গানের সুরেই কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যায়। সে সুরও যেন নিজের সঙ্গে নিজেরই আলাপন—অন্যের নিকট তাহা স্পষ্ট হইবার নয়,—

আমার একটী কথা বাঁশী জানে,
বাঁশীই জানে।
ভরে রৈল বুকের তলা,
কারো কাছে হয়নি বলা,
কেবল ব'লে গেলেম বাঁশীর
কানে কানে।

কিংবা—

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে—
প্রিয়তম হে জাগো, জাগো, জাগো।
জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি'
নীরব রেখোনা তোমার বীণার বাণী—
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো।

অথবা—

নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশীতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়ন-জলে।

ইহা হইতেই, তাঁহার গান যে কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই গানের ভিতর দিয়াই কবি নিজের গভীরতম বেদনা, কামনা, বাসনা, আশা ও বিশ্বাস—প্রাণের অতিশয় নিভৃত নির্জ্জনে যেন সকলের অগোচরে যে-দেবতার নিকটে নিবেদন করিয়াছিলেন, সে দেবতা কি শুধুই জীবনের দেবতা, না শুধুই মৃত্যুর ? যখন শুনি—

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে
লুকানো রবে না মধু চিরদিন তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি',
কিছুই সেদিন কিছুই রবেনা বাকি,
পরম মরণ লভিব চরণ-তলে॥

—তখন কোন প্রশ্নই আর থাকে না।

এই যে আর এক প্রকার পরম আশ্বাসের অনুভূতি, ইহা আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলার—একটি চরম পূর্ণতার মধ্যে আপনাকে পূর্ণ করিয়া দেওয়ার—যে 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি', তাহারই পূর্ব্বাস্বাদ। এই যে মৃত্যু—এ মৃত্যু রূপপিপাসার গুঞ্জরণ-শেষে মধুপানে নীরব হওয়ার মৃত্যু। এ অবস্থা মানুষের সাধারণ অনুভূতির অতীত, ইহাকে বাক্যের দ্বারা বোধগম্য করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এখানে কবি নন—মিস্টিক রসের সাধক। এ অবস্থায় জীবনের প্রতি মমতা, এবং তাহারই ফলে মৃত্যুকে আড়ালে রাখিবার কোন প্রয়োজনই আর নাই; এমনও বলা যাইতে পারে যে, এ অবস্থায় পৌছিলে জীবন ও মৃত্যু দুইয়েরই কোন সাক্ষাৎ চেতনা আর থাকে না। অতএব, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সেই অপর ও প্রায় সর্ব্বকালীন যে ভাব-কল্পনা—যাহাতে মৃত্যুর সঙ্গে লুকাচুরি খেলার একটি নূতন রসে তিনি আমাদের মনকে আকুল, এবং জীবনেরই পূজায় উন্মুখ করিয়া দেন,—তাহাই কবির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের নিদান।

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

—এই যে আশ্বাস, ইহাই মানব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এক দিকে জীবন-বিরহ, ও অপর দিকে মৃত্যু-মিলন—এই উভয়েরই গান তিনি কত ছন্দে কত সুরে গাহিয়াছেন, কিন্তু তথাপি, মৃত্যুর সহিত মিলনের সুখ নয়—জীবনের বিরহ-ভয়ই তাঁহার কাব্যে জীবনকে যে দুর্ল্লভতার গৌরব দান করিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে চরিতার্থ করে। কবি রবীন্দ্রনাথের সাধনায় নানা স্তর আছে, সোপান-পরম্পরাও হয়তো আছে,—একই মন্ত্রের সাধনায় তিনি হয়তো আসন

পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, কিংবা যেখানে পৌছিয়াছেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; তাহাতে কখনও প্রেমের অতৃপ্তি-সুখ, কখনও ভক্তির আত্মসমর্পণ, কখনও জ্ঞানের দৃঢ় প্রত্যয় আছে—কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি জীবনকে লেশমাত্র অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করেন নাই। এই জগৎ ও জীবনের প্রতি যে আসক্তি তাহা যদি একটা মোহমাত্রই হয়, তথাপি সেই মোহই মুক্তিরূপে জ্বলিয়া উঠিবে—একদা তাঁহার কবিচিত্তে এই যে প্রত্যয় জাগিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে এক সুগভীর উপলব্ধি ছিল ; সেই উপলব্ধিও অতি উৎকৃষ্ট বাণীতে প্রকাশ পাইয়াছিল, তেমন আশ্বাসবাণী তাঁহার কাব্যে আর কোথাও তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সে বাণী যেন একটি প্রকাশ—একটি Revelation ; তাহাতে ভাব-কল্পনার সম্পূর্ণ প্রভাব থাকিলেও, সে বাণী যেন এক অপৌরুষেয় প্রজ্ঞার আলোকে সমুজ্জ্বল। আমি এখানে কবির সেই উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা ;
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা !

এবং—

চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ,
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।

* * *

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও,
বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে করো কে বা জানে !

* * *

এই মত চলে চিরকাল গো,
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।
চিরদিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।
আছে ত' যেমন যা' ছিল,
হারায়নি কিছু, ফুরায়নি কিছু—
যে মরিল যে বা বাঁচিল।...
আছে সেই আলো, আছে সেই গান
আছে সেই ভালবাসা।
এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

—মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের বাণী ইহার পরে আর কোথাও পূর্ণতর বা স্ফুটতর হইয়া উঠে নাই, ইহার নিকটে—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।

—এক প্রকার তত্ত্বরসের কুহক-সৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়।

৫

কিন্তু কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলাম এই বলিয়া যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনকে ও সেই জীবনের সাধনাকে আমরা এতকাল যে ভাবে যেরূপে বুঝিয়াছিলাম, আজ তাঁহার মৃত্যুসংক্রান্ত কতকগুলি ব্যাপারে সেই জীবন ও সেই সাধনার সম্পর্কে আমাদের মনে একটা সংশয়-ব্যাকুলতার সৃষ্টি হইয়াছে। জীবনকে নূতন করিয়া দেখিবার জন্য যে আলোক তিনি জ্বালিয়াছিলেন—উপনিষদের সেই ঋষিমন্ত্র, সেই "মধুবাতা ঋতায়তে"-মন্ত্রের যে কবি-ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে, আমাদের বহুকালের অভ্যস্ত সংস্কার—জীবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে যে পরলোক ও মৃত্যুর অন্ধকার যুগ যুগ ধরিয়া ঘনাইয়া উঠিয়াছিল—তাহার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার স্বরচিত ও অভিপ্রেত যে মন্ত্রগান সহকারে তাঁহার আভ্যুদয়িক সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে—মৃত্যুর সেই রহস্যান্ধকার জীবনের উপরে আবার

তেমনই ভাবে নামিয়া আসিয়াছে, জীবন যেন নিতান্তই ক্ষুদ্র তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। আমার চিত্তে এই যে ভাবান্তর ঘটিয়াছে, ইহার আরও প্রকৃষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু যখন আসন্ন, এবং আরও পরে যখন কবি তাহার প্রায় সাক্ষাৎ-মূর্তি দেখিলেন, তখন তিনি যে দুই কবিতায় তাহার চরম বাণী লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহাও কম অর্থপূর্ণ নয়; আমি তাহাই স্মরণ করিয়া প্রসঙ্গের আরম্ভে, কবির আজন্ম-সাধনায় মৃত্যুকে জয় করিবার সেই প্রয়াসকে আর এক চক্ষে দেখিয়াছি। হয়তো সে দেখাও ঠিক নহে,—গূঢ়তর তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে কবির সেই সাধনাকে একটি নির্দ্বন্দ্ব-ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত করা খুব সহজ, অথবা সম্ভব। কিন্তু আজ কোনরূপ তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিবার মত প্রাণের অবস্থা নয়; তাহার উপর, কবির সেই চরম বাণী প্রাণ-মন বিকল করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই কবিতা দুইটি হইতে কয়েকটি বিশেষ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া, তাহাদের অর্থ যেমন বুঝিয়াছি, তাহাই বলিব।—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।···
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

এবং—

দুঃখের আঁধার রাত্রি বার বার
এসেছে আমার দ্বারে।···
যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস,
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের এ মিথ্যা কুহক,
···দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

—এখানে জীবন ও মৃত্যু দুয়েরই এক মূর্ত্তি; জীবন সরল-বিশ্বাসীকে মিথ্যার ফাঁদে ফেলিবার জন্য সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ করিয়াছে, এবং মৃত্যুও আঁধারে তাহার নিপুণ শিল্প—'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি'—ছড়াইয়া রাখিয়াছে, ইহাও জীবনেরই মিথ্যা কুহক—'দুঃখের পরিহাসে ভরা'। একদিকে ছলনা, আর একদিকে ভয়—জীবন ও মৃত্যু কেহই সত্য, শিব, বা সুন্দর নয়। কিন্তু কবি এই প্রবঞ্চনাকেও মূল্যহীন মনে করেন নাই, কারণ, যে মহৎ—যে আপনার অন্তরের চিরস্বচ্ছ, ঋজু, বিশ্বাস-সমুজ্জ্বল পথে এই কুটিলকে জয় করে, ইহাকে সহ্য করিয়াই—

সত্যেরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত
অন্তর-অন্তরে,

—অর্থাৎ, যে ইহাকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই—'লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত'; কিন্তু, এই ছলনাকেই অনায়াসে সহিয়া—

সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এই উক্তি আরও গভীর গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে ইহার শিথিল বাক্যযোজনায়; ভাষা যেন সেই মর্ম্মান্তবিদারী চরম অভিজ্ঞতার অর্থ বহন করিতে না পারিয়া, একপ্রকার মন্ত্রচ্ছন্দের বাণীরূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক; কারণ, ইহা সেই সময়ের উক্তি—যখন এক অতি-তীক্ষ্ণ দেহচেতনা-কাতর আত্মার শেষ মর্ত্ত্যবন্ধন খসিয়া যাইতেছে; ইহাতে কেবল এক প্রাণান্তিক বিশ্বাসের ঘোষণাই আছে—যাহাকে সম্বল করিয়া সেই জীবন-ক্লান্ত পথিক অবশেষে অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন।

তথাপি, ইহাতেও—জীবনের ছলনা, মৃত্যুর নিপুণ শিল্প, প্রভৃতির—অর্থ খুব স্পষ্ট। সে অর্থ এই যে, শেষ পর্য্যন্ত আত্মাই আত্মার পরম নির্ভর; আত্মার বাহিরে যাহা কিছু, তাহার একটা নেতি-মূলক (negative) মূল্যই আছে; জীবন ও মৃত্যু—দুইয়েরই বন্ধনপাশ এই হিসাবে তুচ্ছ নয় যে, তাহাকে কাটিয়া বাহির হইবার শক্তিই আত্মার মহত্ত্ব প্রমাণ করে। এই মিথ্যা—সুন্দর কিম্বা ভয়ঙ্কর হইয়াও—আত্মার কোন ক্ষতি করিতে পারে না; কারণ, আত্মার অন্তরের আলোকে সত্যই ধৌত হইয়া উঠে।

ইহাই কবির শেষ বাণী। এ বাণী একদিকে যেমন সত্য-স্বীকারের বাণী—আত্মার অভয়-ঘোষণার বাণী, তেমনই, আর একদিকে ইহা জীবনকে বিদায় দেওয়ার—জীবনের সহিত সকল সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলার—বাণী। কবির আত্মা যেন জীবনের সকল দেনা শোধ করিয়া মৃত্যুস্নানে নির্ম্মল ও শুচি হইয়া উঠিয়াছে। কবি এতদিনে জীবনের যে পরিণামকে বরণ করিলেন, সে পরিণাম পূর্ব্বেও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, কারণ, তাঁহাকেই আমরা গাহিতে শুনিয়াছি—

চোখের আলোয় দেখেছিলাম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলাম
খেলার ঘরেতে,
খেলার পুতুল ভেঙ্গে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে,…

অতএব, এই মনোভাব—এই বৈরাগ্যের সুর—অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, প্রাণের মোহের উপরে এই আধ্যাত্মিক মুক্তি-পিপাসা জয়ী হইয়া উঠিতেছিল। আজ তাঁহার এই শেষের বাণী শুনিয়া আমরা চমকিত হইয়াছি বটে, মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের সেই দুর্দ্ধর্ষ মানবতাও অবশেষে আধ্যাত্মিকতার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে; তিনি জীবনের মধ্যেই, 'সহস্র বন্ধনমাঝে মুক্তির স্বাদ' লাভ করিতে পারিলেন না; শেষ পর্য্যন্ত সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়াই তাঁহাকে আত্মার মুক্তি বা অভয় প্রার্থনা করিতে হইল। কিন্তু হয়তো আমরাই ভুল বুঝিয়াছিলাম; এতদিন জীবনের বহিরাবরণে বিচ্ছুরিত কবি-শিল্পীর সেই অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার রশ্মিচ্ছটাই আমরা দেখিয়াছি, সেই শিখার অন্তস্থলের স্থিররশ্মি দেখি নাই। জীবনকে যে বাহিরের দৃষ্টিতে তিনি দেখিয়াছিলেন, সে

দৃষ্টি তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন ; যাহা শুধু বাণীতেই ধরা যায় শুধু তাহাই নয়,—যাহাকে বাণীতেও ধরা যায় না, তাহাকেও তিনি সুরে ধরিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু যাহা বাণী ও সুর দুইয়েরই অতীত, তাহাকে তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন—তাঁহার মৃত্যুকালীন মুখ-জ্যোতি তাহার আভাসমাত্র দিয়াছে। সেই আভাসের সাহায্যেই রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-কাব্য আর একবার ভাল করিয়া আদ্যোপান্ত বুঝিয়া লইতে হইবে।

[আশ্বিন, ১৩৪৮]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আমার বয়স যখন সতেরো কি আঠারো, সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়; দ্বিজেন্দ্রলালের একখানি নাটক 'রাণা প্রতাপ' হঠাৎ কেমন করিয়া আমার হাতে আসিয়া পড়ে—অভিনয় দেখি নাই, কেবল কাব্যহিসাবে তাহা পাঠ করিয়া, সেই কালেই তাঁহার রচনা-ভঙ্গি—ভাষার রূপ ও গানের গীতিকৌশল—আমার অপ্রবুদ্ধ চিত্তে একটি নূতনতর রসের সঞ্চার করিয়াছিল। তখন সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্পগুলির সহিত পরিচয় হইয়াছে এবং তাহার ফলে এক অপূর্ব্ব সাহিত্যিক উন্মাদনা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু সে কাব্যের সেই খরতর আলোকেও আর একটি আলোকের আভা আমার মানস-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—আজ তাহা স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারি। তার পর স্বদেশী-আন্দোলনের সেই উদ্দাম আবেগ সে কালের যুব-সম্প্রদায়কে যেরূপ অধীর করিয়াছিল, তাহাতে কাব্য-সাহিত্যকে ছাপাইয়া অসংখ্য বাগ্মীর বক্তৃতার ঘনঘটা যখন একমাত্র হৃদ্য বস্তু হইয়া উঠিল—যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও গানে, আমাদের জাতীয় জীবনের সেই অকাল-বসন্তকে অফুরন্ত রূপে-রঙে, ভাব-স্বপ্নে, স্ফূর্ত্ত ও মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, সেই সময়ে এক বিরাট সভায় সহসা একটি সদ্য-মুদ্রিত গান বিতরিত ও গীত হইবার কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। উচ্চকিত চমকিত হইয়া সেই গান শুনিয়াছিলাম; সেই স্থান ও কালের নাটকীয় সংস্থানে, সে গানের ভাব ও সুর প্রাণে যে অননুভূতপূর্ব্ব আবেগ সঞ্চার করিয়াছিল, আর কখনও অনুরূপ অবস্থায় তেমন হয় নাই। সেদিন সার্কুলার রোডের সেই ভাবী মিলন-মন্দিরের শূন্য প্রাঙ্গণে, বিপুল জনসভায়, বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিতেছিলেন; সেই বক্তৃতার পূর্ব্বাহ্ণে মুদ্রিত গানটি বিতরিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে—'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ'—যে অপূর্ব্ব সুরে, উদাত্ত মধুর দৃপ্ত স্বর-সংযোগে গীত হইতে লাগিল, এবং সেই বিশাল জনমণ্ডলীর হৃদয়ে তাহার নীরব প্রতিধ্বনি বায়ুমণ্ডলে যে তাড়িত সঞ্চার করিতেছিল, আজও যেন তাহা শুনিতেছি ও অনুভব করিতেছি—সেই আকাশ বাতাস যেন আমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে! সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার পরিচয় আরও নিঃসংশয়রূপে পাইলাম।

ইহার পূর্ব্বে তাঁহার হাসির গানের হাসিতে সারা বাংলাদেশ সাড়া দিয়াছিল, আমার প্রাণও সেই হাসি হাসিতে শিখিয়াছিল; কিন্তু সেদিনের সে পরিচয় অন্যরূপ।

ক্রমে দেশের সেই ভাবপ্লাবন আর এক রূপ ধারণ করিল—১৯০৪।৫ হইতে ১৯০৮।৯-এর মধ্যেই সেই ভাবাবেগ বিপ্লবের গোপন কুটিল পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। নিছক ভাবের উদ্দীপনায় তখন ক্লান্তি আসিয়াছে, তাই একদিকে সেই অতি-স্ফীত ভাব-বাষ্পরাশিকে কোন কর্ম্মপন্থায় শক্তিরূপে সার্থক করিবার উদ্যম যেমন চলিতেছে, তেমনই আর একদিকে, গান ও বক্তৃতার ভূরি-ভোজের পরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রসচর্চ্চার আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং ততদিনে সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে পক্ষে প্রেরণার অভাব হইল না। জীবন হইতে একটু দূরে সরিয়া বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রসচর্চ্চাকেই বরণীয় মনে করিয়া একটি সাহিত্যিক সমাজ ধীরে ধীরে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল; রবীন্দ্র-প্রতিভার যাহা শ্রেষ্ঠ দান তাহাকেই আদর্শ করিয়া—আমরা সেকালের অধিকাংশ তরুণ সাহিত্যিক—একটা উন্নত ভাবজীবনের আরাধনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলাম। ঠিক এইকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এক নূতন ব্রতে ব্রতী হইলেন—তিনি জাতি ও সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর যোগ রক্ষা করিয়া—প্রেমকেই সাহিত্যের প্রেরণা করিয়া, সূক্ষ্ম-ভাবরস-বঞ্চিত মূঢ় মূক জনগণের প্রাণমন জাগ্রত করিবার জন্য ভিন্ন আদর্শের পক্ষপাতী হইলেন। সেদিন আমরাও ইহা বুঝি নাই; সাহিত্যের অতি বিশুদ্ধ আদর্শ নয়, জাতির জীবন-মরণের সমস্যার উপরে ব্যক্তি বা দলগত ভাববিলাসকেই স্থান দেওয়ার প্রবৃত্তি নয়—দ্বিজেন্দ্রলাল চাহিয়াছিলেন জাতির কল্যাণ, সাহিত্যকেও মানবসাধারণের ভাবভূমিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিতে। যাহা সর্ব্বজনহৃদয়বেদ্য, যাহা সবল সুস্থ চিত্তের পথ্য, যাহা মনের মোহ সৃষ্টি না করিয়া প্রাণে আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার করে, যাহার রস রামায়ণ মহাভারতের কাব্যরসের মত লোকায়ত—দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকেই শ্রেষ্ঠ কাব্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আদর্শ বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করিয়াছিলেন এবং নিজ হৃদয়ের সেই দৃঢ় বিশ্বাসবশে তিনি সেকালে যে ভাবে তাহার সেই আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার দুই দিকই তাঁহার পক্ষে অতিশয় যথার্থ হইয়াছিল। একদিকে তিনি সেই অত্যুচ্চ সাহিত্যিক অভিযানের বিরুদ্ধে নিজ মত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—তজ্জন্য রবীন্দ্র-বিদ্বেষী [illegible]

যৎপরোনাস্তি গঞ্জনা করিয়াছিলেন। সে ঘটনা আমার মনে আর সকল স্মৃতি অপেক্ষা গভীরতর ভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে—কারণ তখন সেই সাহিত্যিক যুদ্ধে যোগ দিবার মত সাবালকত্ব লাভ না করিলেও, আমি সেই বিরুদ্ধ দলেরই শিবির-সহচর ছিলাম। আমার মনেও যে সেই মসীযুদ্ধের কলঙ্ক একটুও লাগে নাই তাহা নহে, কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে অস্ত্র-নির্ম্মাণ বা অস্ত্র-নিক্ষেপ—কোনটাতেই আমার ডাক পড়ে নাই, এবং আমিও নম্রতাক্রমে সেই সকল রথী ও সারথিগণের পশ্চাতে অবস্থান করিয়াছিলাম। আজ যখন সেই কথা মনে পড়ে, তখন ভাবি—প্রথম হইতেই আমরা কি ভুলই করিয়াছিলাম! জীবনে ও সাহিত্যে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ও নব শিক্ষাবিধির প্রণয়নে—ভাবে ও চিন্তায়, মন্ত্রে ও তন্ত্রে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে—সে বিরোধ আজিও ঘুচিল না! সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ সম্বন্ধে আমি আজিও দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সকল বিষয়ে এক মত নহি; কিন্তু আমাদের সমাজের তৎকালীন অবস্থায়, সাহিত্যের নীতি-নিরূপণে তিনি যে প্রেম ও বাস্তববুদ্ধি, সুস্থ চিত্তবৃত্তি ও লিপি-সংযমের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে আজিও সত্য। অপর দিকে, দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবকে কেবল রসচর্চ্চার বিষয় না করিয়া—ভাবের জীবনোত্তম-সুলভ রূপ দেখাইবার জন্য, অতঃপর নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহার দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাট্যাদর্শ—তাহার এক দিকের সেই দুর্নীতি-মধুর লঘু-লাস্যের স্রোত এবং অপর দিকের সেই জীবনাবেগবর্জ্জিত মধ্যযুগীয় ভক্তিবিহ্বলতা ও পাপপুণ্য-সংস্কারের তামসিক আদর্শ—সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। নাট্যশিল্পের আদর্শ উন্নত ও রুচি মার্জ্জিত করিয়া এবং নাটকরচনায় কাব্যসঙ্গত কারুকলার দ্বারা শিক্ষিত সমাজকে নাট্যানুরাগী করিয়া, তিনি সেই যুগের অবোধ ভাবাতিরেককে পৌরুষ ও মনুষ্যত্বসাধনার পথে প্রেরিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—জাতির প্রাণে যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা জানি।

আমি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যশিল্প অথবা তাঁহার কাব্যকীর্ত্তির সম্বন্ধে কোন আলোচনা এ সভায় করিব না—এ উপলক্ষে সে অবকাশও নাই; কেবল তাঁহার প্রতিভার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তির সম্বন্ধে বহু রসিক ও মনস্বী তাঁহাদের মতামত বহু পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন; আমি আমার ধারণামত তাঁহাদেরই কোন কোন কথার পুনরুল্লেখ করিব মাত্র।

আমার মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা ও রচনাশক্তির সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা—বাংলা কবিতার ছন্দে ও বাংলা গানের সুরে তাঁহার ভঙ্গির অভিনবত্ব। 'হাসির গান'-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাহার ভাষা ও ছন্দ—এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহার ব্যক্তিত্ব, ইহাই তাঁহার স্টাইল, এবং ইহা তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনাতেই লক্ষ্য করা যাইবে। ইহার মূলে আছে একটি নূতন সুর—বিলাতী ও দেশীয় সুরের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সেই সুর জন্মলাভ করিয়াছিল। 'হাসির গান'-এর অধিকাংশে যেমন, তেমনই 'মেবার পাহাড়', 'আমার দেশ', 'আমার জন্মভূমি' প্রভৃতি বিখ্যাত গীতগুলিতেও এই মিশ্র সুর, বাংলা ভাষায় এক নূতন ভাবানুভূতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, আমাদের হৃদয়বীণায় এক নূতন তন্ত্রী যুক্ত করিয়াছে। এই সুরকেই তাঁহার স্টাইল বলিয়াছি, তার কারণ ইহাই তাঁহার কবিমানসের প্রতিকৃতি—এই সুরের ছাঁচেই তাঁহার ভাষাও গড়িয়া উঠিয়াছে; এজন্য দ্বিজেন্দ্রলালকে মুখ্যত বাণীশিল্পী না বলিয়া বিশিষ্ট সুরশিল্পী বলাই অধিকতর সঙ্গত। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার যে স্বতন্ত্র ভঙ্গী সহসা একটা ম্যানারিজ্‌ম্ বলিয়া মনে হয়—আসলে তাহা ঐ সুরেরই বাক্-ভঙ্গি। এই সুরকে বুঝিতে পারিলেই তাঁহার ব্যক্তি-স্বভাব ও কবি-প্রকৃতিকে বুঝিতে পারা যাইবে। জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে যে একটি ঋজুতা ও পৌরুষ তাঁহার উপাস্য ছিল—যে সবল হৃদয়াবেগ ও আত্মপ্রত্যয়মূলক আদর্শপ্রীতি তাঁহার একান্ত স্বধর্ম্ম ছিল—তাহারই প্রকাশ হইয়াছিল ঐ সুরে। ভাবের স্পষ্টতা এবং তাহার অকপট প্রকাশ যেমন তাঁহার কাম্য ছিল, তেমনই সেই বাণী-রচনার ছন্দে ও সুরে, সুস্থ ও দৃপ্ত জীবনাবেগের উৎসার তিনি বড়ই পছন্দ করিতেন। ইংরেজী ছন্দ ও ইংরেজী সুর—এই জন্যই তাঁহার স্বভাবের বড় অনুকূল হইয়াছিল এবং সেই সুর তিনি যে এমন করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অসাধারণ গীতি-প্রতিভার নিদর্শন। মধুসূদন যেমন বিজাতির সাহিত্যিক আদর্শ নিজের আত্মায় আত্মসাৎ করিয়া বাংলা কাব্যকে নব-কলেবর দান করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও, আর এক ক্ষেত্রে, সেই ধরণের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন—বিলাতী গীতি-সুর নিজ প্রাণে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বাংলা ছন্দে ও বাংলা সঙ্গীতে রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুরের সেই অভিনবত্বই বাংলা ভাষায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান।

এই সুর তাঁহার হাসির গানের ভাষায় ও ছন্দে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। মন

ও প্রাণের যে স্বাস্থ্য ও স্বভাবের যে ঋজুতা থাকিলে—ভণ্ডামি, ভীরুতা ও নানা কুসংস্কার বিরক্তি উদ্রেক করিলেও, তাহা দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির নিরতিশয় দুর্ব্বলতা ও অক্ষমের নিষ্ফল আত্মাভিমানপ্রসূত বলিয়া, আক্রোশ বা ঘৃণার পরিবর্ত্তে অনুকম্পা, এমন কি, সহানুভূতির উদ্রেক হয়—সেই বিচারশীল সহানুভূতি ও মুক্ত মনের রসপ্রবণতা হইতেই এমন নির্ম্মল উচ্ছল হাস্যাবেগ উৎসারিত হইয়াছিল। ঠিক এইরূপ প্রাণ এমন সাহিত্যিক প্রতিভার সহিত পূর্ব্বে কখনও যুক্ত হয় নাই; আবার, সেই প্রাণে অপর এক প্রাণবন্ত জাতির সহজ স্বাধীন অকপট পৌরুষের সুর এমন করিয়া প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই আমাদের সাহিত্যে ঠিক এই ধরণের হাস্যরস ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও বিকাশ লাভ করে নাই। এমনই দরাজ প্রাণের দরাজ হাসি লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার স্বজাতিকে প্রথম সাহিত্যিক সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। তারপর, সেই প্রাণ ও সেই প্রেম, নিজস্ব সুরে ও নিজস্ব ভাষায় নব-মনুষ্যত্বের গান গাহিয়াছিল; ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই নব আদর্শে—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত সেই একই সাধনার ধারায়—পাশ্চাত্য আদর্শকে স্বকীয় আদর্শে আত্মসাৎ করিয়া, সেই নবধর্ম্মের দীক্ষামন্ত্রে তাহা একটি নূতন সুর যোজনা করিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকেও আমি তাঁহার সেই এক সুরেরই অন্যতর বাণীরূপ বলিয়া মনে করি। নিছক আর্ট বা নাট্যশিল্পের দিক দিয়া তাহাদের বিচার যেমনই হোক, তিনি সেগুলির মধ্যে জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ব-সাধনার যে আকুল উৎকণ্ঠা সঞ্চারিত করিয়াছিলেন—যে-কণ্ঠে তিনি 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া বাঙালীকে ডাকিয়াছিলেন, তাহাতে ভাবের এমন পৌরুষ ও আবেগের এমন আন্তরিকতা ছিল যে, সকলে তাঁহার সেই বাণী মুগ্ধ ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছিল। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সহজ পৌরুষ ও প্রাণশক্তির সুর তাঁহার কণ্ঠে বাজিয়াছিল, তাহাই বাংলা ভাষায় ও বাঙালীর গানে দ্বিজেন্দ্রলালের অবিনশ্বর বাণী-মূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছে।*

[ভাদ্র, ১৩৪৮]

* নদীয়া-সম্মেলনের উদ্যোগে আশুতোষ কলেজ-হলে অনুষ্ঠিত স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

শরৎ-পরিচয়

১

তখন বোধ হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ—শরৎচন্দ্রের নাম তখন আমাদের তরুণ সাহিত্যিক-সমাজে অজ্ঞাত, যদিও ইতিমধ্যে তাঁহার কয়েকটি গল্প একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পর তখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ই প্রসিদ্ধ গল্পলেখক, আর দুই-চারিজন যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যে কিঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর আমার তেমন শ্রদ্ধা বা আশা-ভরসা ছিল না—আমার সাহিত্যিক আদর্শ বরাবরই কিছু স্পর্দ্ধা-পূর্ণ। এমন অবস্থায় তখনকার একখানি ক্ষুদ্র মাসিক-পত্রিকা 'যমুনা'য় যে কোন সত্যকার বড় প্রতিভার আবির্ভাব হইতে পারে, সে বিশ্বাসের কারণ ছিল না। অতএব 'যমুনা'-সম্পাদক সাহিত্যিক-বন্ধু স্বর্গীয় ফণীন্দ্র পাল যখন দেখা হইলেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক কোন এক সম্পূর্ণ অখ্যাতনামা লেখকের গল্প তাঁহার 'যমুনা' পত্রিকায় পড়িবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেন, তখন নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে তাহাতে সম্মতি জানাইতাম, কিন্তু দুই তিন মাসেও তাহা পড়িবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি হইত না। লেখকের নাম যেমন অপরিচিত, গল্পের নামও তেমনই সুসভ্য বা সুশ্রী নয়—'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'—শুনিলে কিছুমাত্র ভক্তির উদ্রেক হয় না। অতএব 'যমুনা'-সম্পাদকের এই প্রশংসার মূলে যে তাঁহার সম্পাদকীয় আত্মপ্রসাদ ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহাই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু একদিন পুনর্ব্বার সাক্ষাতে সেই একই প্রসঙ্গে ফণীবাবু যখন বলিলেন—একবার 'কুন্তলীন'-পুরস্কারের গল্পগুলির মধ্যে 'মন্দির' নামে যে গল্পটি প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল, তাহার লেখক এই শরৎচন্দ্রই, তখন আর উপায় রহিল না। ঐ গল্পটি আমি ভুলি নাই, যাঁহার নামে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল, এতদিনে তাঁহার প্রতিভার আর কোন প্রমাণ না পাইয়া একটু আশ্চর্য্যই হইয়াছিলাম। ফণীবাবুর এই একটি কথায় তদ্দণ্ডেই আমার মনোভাব বদলাইয়া গেল—'যমুনা'র গল্পগুলি সম্বন্ধে কৌতূহল দুর্দ্দমনীয়

হইয়া উঠিল। ঘরে আসিয়া প্রথমেই হাতে পড়িল—'যমুনা' নয়, একখণ্ড 'ভারতবর্ষ'; বেশ মনে আছে, সেখানি সে বৎসরের মাঘ-সংখ্যা, তাহাতে সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামধারী অখ্যাতনামা লেখকেরই 'বিরাজ বৌ' নামে একটি গল্প শেষ হইয়াছে—পৌষ-সংখ্যায় তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি এ পর্য্যন্ত তাহা পড়ি নাই; বাজে গল্প ত কতই বাহির হয়, বাংলা মাসিকের তাহাই প্রধান উপজীব্য। ভাগ্যে গল্পটি সমাপ্ত হইয়াছিল, তাই 'ভারতবর্ষের' সেই গল্পটিই পড়িতে বসিলাম। পড়িবার কালে ও পড়া শেষ হইলে, আমার মনের অবস্থা যাহা হইয়াছিল, তাহা আপনারা কোনমতেই কল্পনা করিতে পারিবেন না; কারণ আপনাদের সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় এমন অবস্থায় এভাবে হয় নাই। তথাপি আপনারা ভাবিয়া দেখুন, এত বড় সুগভীর অনুভূতিসম্পন্ন একজন লেখক—তাঁহার সেই অনবদ্য লিপিকৌশল লইয়া অকস্মাৎ বাংলা সাহিত্যের সেই প্রায়-গতানুগতিকতা-ক্লিষ্ট সমতলপথে সহসা আবির্ভূত হইলেন! ইহার পূর্ব্বে সেই আবির্ভাবের কিছুমাত্র সূচনা বা প্রত্যাশা ছিল না; এমন ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই। এই কারণ ছাড়া বিস্ময়ের অন্য কারণও ছিল। 'বিরাজ বৌ' পড়িয়া সেই প্রথম উপলব্ধি করিলাম যে, কাব্যের উৎকর্ষের জন্য বাস্তবকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে হয় না—বুঝিলাম যে, হৃদয়বৃত্তির সহিত যদি কবি-শক্তির মিলন হয়, তবে উৎকৃষ্ট কাব্যরস আস্বাদনের জন্য এই মানব-মানবীর সংসার হইতে দূরে কোনও ভাব-বৃন্দাবন গড়িয়া লইতে হয় না। কিন্তু কেবল সাহিত্যিক তত্ত্বই নয়, আর একটা সত্য তখন আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম; আমাদের সংসারে, বাঙালীর ঘরে, নারীর যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা একই কালে অপূর্ব্ব ও অতি-পরিচিত বলিয়া মনে হইল। আজন্ম যাহাদিগের সহিত নানা সম্পর্কে, নানা ব্যবহারে নিত্য-পরিচয়ের একটা অভ্যস্ত সংস্কারমাত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, নারীর যে প্রকৃতি সম্বন্ধে কাব্যে উপন্যাসে ছাড়া আর কোথাও চিত্তচমৎকারের প্রশ্রয় দিই নাই, আজ তাহার সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন হইয়া উঠিলাম। রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্যে কতকটা অলৌকিক ও অতিমানুষ পরিবেশের মধ্যে, যে দুই চারিটি নারীচরিত্রের বিস্ময়জনক চিত্র, অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসে ভারতীয় নারী-প্রকৃতির ক্ষণস্ফূর্ত্ত মহিমার যে প্রকাশ ক্বচিৎ চিত্তগোচর হইয়াছে, তাহাই বাংলার পল্লীগৃহে, সমাজে ও পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এমন শক্তির আধার হইয়া বিরাজ

করিতেছে, তাহা এমন করিয়া দেখানো এবং বিশ্বাস করানো ইতিপূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে ঘটে নাই। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' পড়িয়াই শরৎ-প্রতিভার সহিত আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাই শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে 'বিরাজ বৌ' আমার মনে একটু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বাঙালীর দাম্পত্য-প্রেমকে,—আমাদের সেই হিন্দু আচার ও সংস্কার-বন্ধনের মধ্যেই ব্যক্তি-চেতনার এক অতি প্রবল গভীর উন্মেষকে, মানবভাগ্যের এমন মহনীয় ট্র্যাজেডির দ্বারা মণ্ডিত করা—বাঙালী-প্রাণের বৃন্দাবনী গাথায় এমন আকাশভাঙা বজ্রঝঞ্ঝা-ধ্বনি মিলাইয়া দেওয়া, আমার নিজস্ব রসবোধ ও কাব্যসংস্কারকে চরিতার্থ করিয়াছিল।

ইহার পর 'যমুনা'য় প্রকাশিত গল্পগুলি পড়িলাম, পরিচয় আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠিল; এবং লেখার মধ্যে লেখকের যে আন্তরিকতা সংক্রামক হইয়া পাঠককে আচ্ছন্ন করে, শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির সেই ব্যক্তিগত আকর্ষণ আমাকে লেখকের ব্যক্তি-পরিচয় পাইবার জন্য অধীর করিয়া তুলিল। আমি শরৎচন্দ্রের জীবনেতিহাস জানিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

এই সময়ে সেকালের একজন পুণ্যচরিত সাধকপ্রকৃতি সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়—তাঁহার নাম কুমুদনাথ লাহিড়ী। তিনি বলিলেন, রেঙ্গুনে অবস্থানকালে তিনি শরৎচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু শরৎচন্দ্রের সে পরিচয় আমার স্বপ্ন সফল করিবে না, হয়তো আমাকে আঘাত করিবে, আমার সাহিত্যিক আবেগ ও উৎসাহ তাহাতে বাধা পাইতে পারে; কারণ, আমার বয়স ও অভিজ্ঞতা অল্প—মানুষকে ঠিকমত বিচার করিবার বুদ্ধি তখনও আমার না হইবারই কথা। তথাপি নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া তিনি যেটুকু সংবাদ দিলেন, তাহাতে ইহাই বুঝিলাম যে, এ মানুষ যদি শক্তিমান হয়, তবে সাধারণ চরিত্র-নীতি বা সমাজ-নীতির মানদণ্ডে ইহাকে মাপিয়া লওয়া যাইবে না। সংস্কারে আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু বিশ্বাস হারাইলাম না, মনে একটা বিস্ময়বোধ রহিয়া গেল।

ইহার পর সরকারী চাকুরি উপলক্ষ্যে আমি কিছুকাল কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম—সাহিত্যিক-সমাজও তাহার নিত্যকার সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। তথাপি শরৎচন্দ্রই সে সময়ে আমার সাহিত্যিক মনের অনেকখানি অধিকার করিয়া রহিলেন। অতঃপর রেঙ্গুন-প্রবাসী আমার এক বন্ধুকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরে যাহা পাইলাম, তাহা এই।— রেঙ্গুনের

বাঙালী-সমাজে শরৎচন্দ্র অপরিচিত নহেন, কিন্তু সাহিত্যিক বলিয়া কোন খ্যাতি তাঁহার নাই। আমার বন্ধুর এক দাদা সেখানে ডাক্তারি করেন, শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে, সেই পরিচয়সূত্রে আমার বন্ধু এইটুকু মাত্র জানেন যে, শরৎচন্দ্র একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, সাধারণ গৃহস্থ লোক নহেন—পশুপক্ষী লইয়াই তাঁহার সংসার। আমার 'হিরো'র সম্বন্ধে একটা খবর এই যে, একদা তাঁহার একটা পোষা পাখি যখন মরিয়া যায়, তখন তাঁহার এমনই শোক হইয়াছিল যে তাহার পায়ে যে সোনার শিকলি ছিল, অন্ত্যেষ্টিকালে তাহা তিনি খুলিয়া লইতে পারেন নাই।

ইহার পর শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' পড়িলাম, এবং পাঠকালে এমন এক রসিক সহপাঠী পাইয়াছিলাম যে, পাঠের আনন্দ ও রসাস্বাদনে উভয়ের সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজও ভুলি নাই। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের কাছারি-সংশ্লিষ্ট ডাক্তারখানার ডাক্তার—নাম, অঘোরলাল মজুমদার। বাঙালী অনেক ডাক্তার শুধু সাহিত্য-রসিক নয়, সাহিত্যরসের স্রষ্টাহিসাবেও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের যে বিশেষ রস, যাহার জন্য সাহিত্যজ্ঞান অপেক্ষা গভীর হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন, তাহা এই ব্যক্তির মধ্যে যেমন আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহা হয়তো অনেকেরই আছে, কিন্তু সাহিত্যিক-সমাজে সকলের তাহা আছে বলিয়া মনে হয় না; আমি অন্তত সে বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলাম। ভদ্রলোক বাংলা কবিতার উৎকৃষ্ট পংক্তি যেমন আবৃত্তি করিতে পারিতেন, তেমনই গল্প-উপন্যাসের রসবোধও তাঁহার অভ্রান্ত ছিল। তিনিও শরৎচন্দ্রের নাম শুনেন নাই, আমার প্রশংসা অতিরিক্ত মনে করিয়া তাহা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য 'পল্লীসমাজ' পড়িতে বসিলেন। রাত্রে দুইজনে এক ঘরে শুইয়াছি—বাহিরে অনতিদূরে বাতাসে পদ্মার জলোচ্ছ্বাস শোনা যাইতেছে। আমি বইখানি আগেই পড়িয়াছিলাম, পাশের খাটে শিয়রে বাতি জ্বালাইয়া তিনি নীরবে পাতা উল্টাইতেছেন, আমি তাঁহার ভাবখানা লক্ষ্য করিতেছি—যেন জেদ করিয়া একটা অবজ্ঞার ভাব রক্ষা করিতে হইবে, দুই একটি মন্তব্যও হইতেছে, কিন্তু শেষে একেবারে মগ্নভাব—বাক্যস্ফূর্ত্তির আর অবকাশ নাই। আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম। এক সময় গভীর রাত্রে তিনি আমার শয্যাপার্শ্বে কি একটা খুঁজিবার অছিলায় আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলেন। দেখিলাম, বই বন্ধ করিয়াছেন—অন্তরের ভাবাবেগ

একটু প্রকাশ না করিয়া আর যেন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিলেন না, কিছুক্ষণ পরে আবার পড়িতে লাগিলেন। সকালে উঠিয়া শুনিলাম, প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বইখানি শেষ করিয়াছেন ; তারপর আমার সঙ্গে সে কি আলোচনা! এমন করিয়া সাহিত্যরস ভাগ করিয়া ভোগ, আমি জীবনে আর কখনও করি নাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে বিশেষ রস আছে, তাহা কত অরসিককেও রসিক করিয়া তুলিয়াছে—রসিকের ত কথাই নাই। সাহিত্যরসের আস্বাদনে সেই যে সমপ্রাণতার আনন্দ পাইয়াছিলাম, এবং সাহিত্যিক অভিমানবর্জ্জিত একজন সহজ-রসিকের নিকটে সেদিন মনে মনে যে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহী যে সাহিত্য তাহার বিচারে কেবল মার্জ্জিত মনোবৃত্তি বা আর্টের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়—সহজ ও স্বাভাবিক রস-সংস্কারেরও প্রয়োজন আছে। ইহাকেই আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে 'প্রাক্তন সংস্কার' বা 'বাসনা' নাম দেওয়া হইয়াছে।

২

ইহার কিছুদিন পরে একবার ছুটীতে কলিকাতায় অবস্থানকালে হঠাৎ শরৎচন্দ্রকে দেখিলাম। সেই প্রথম সাক্ষাতের সব কথাই মনে আছে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটা দোকানঘরের উপরে তখন 'যমুনা'-আফিস, একখানি ঘর ও তাহার কোলেই একটু ছাদ—উপরতলার এই ক্ষুদ্র অংশমাত্র 'যমুনা'র অধিকারে ছিল ; ঘরে আফিস, ও বাহিরে ছাদে ফরাস পাতিয়া বৈঠক বসিত। সেদিন বেলা দুই-তিনটার সময়েই শরৎচন্দ্র আসিয়াছিলেন, আমিও সংবাদ পাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র একখানি চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছেন, একটু রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি—খাঁটি দেশী চেহারা। কিছু পরে রাস্তার ওপারের দোকান হইতে চা ও চপ আসিল। দেখিলাম, একটি কুকুর শরৎচন্দ্রের হাঁটুর উপরে দুই পা রাখিয়া তাঁহার হাতের ডিশ হইতে সেই চা খাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে চপের টুক্‌রাও সাগ্রহে ভোজন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে 'ভারতী'-সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়াছেন—তিনি কুকুরকে এরূপ ঘৃতপক্ক আহার্য্য দেওয়ার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার কুকুরের এই কুপথ্য-প্রীতির অপরাধ গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন না। সস্নেহে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"ও বড় একা বোধ করে, ওর জন্মে একটি ভাল সঙ্গিনী খুঁজিতেছি—একটা পাওয়া যায় না?" বেলা পড়িয়া আসিলে বাহিরের ছাদে ফরাস পাতিয়া বৈঠক বসিল, আরও দুই চারিজন আসিলেন। একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শরৎচন্দ্র গল্প করিতে লাগিলেন। সাহিত্যের আলোচনা চলিল। 'সবুজ পত্রে' সম্ভপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প—'শেষের রাত্রি' সম্বন্ধে, মণিলাল বাবুর সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হইল, তিনি ওই গল্পের নায়িকার চরিত্র কিছুতেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিলেন না; বাঙালীর মেয়ে ঐ বয়সেও এরূপ হৃদয়হীনা হইতে পারে না, ইহা তিনি জোর করিয়া বলিলেন—উহাতে বিশুদ্ধ ভাব-কল্পনার আর্ট যতই থাকুক, জীবনের সত্য নাই। আমি এই মন্তব্যের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরণার বৈশিষ্ট্য অতিশয় কৌতূহল সহকারে লক্ষ্য করিলাম। গল্প চলিতেছে, এমন সময় একটা মহাবিভ্রাট ঘটিয়া গেল। বাড়ির ভিতরকার উঠান হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ছাদে আসিবার পথটি বড়ই সঙ্কীর্ণ; সরু বারান্দা, তাহাতে রেলিং নাই—সাবধানে চলিতে হয়; তখন একটু অন্ধকার হইয়াছে, সেই অন্ধকারে সেইখান হইতে একটা আতঙ্কের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। এক ব্যক্তি সেই পথ দিয়া আসিবার কালে অস্পষ্ট আলোকে হঠাৎ একটি জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রায় নীচে পড়িয়া যাইতে যাইতে কোনক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে। জন্তুটি আর কেহ নয়, শরৎচন্দ্রের সেই কুকুর—সে সহসা সেই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথে আবির্ভূত হইয়া, দুই পায়ের উপরে দাঁড়াইয়া, আগন্তুককে অপর দুই পায়ের দ্বারা আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিল—তাহাতেই এই বিভ্রাট। শরৎচন্দ্র ক্রোধভরে (ক্রোধটা নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির উপরে) কুকুরকে একটি চপেটাঘাত করিলেন, সে দূরে এক কোণে ম্লানমুখে বসিয়া রহিল। শরৎচন্দ্রও তারপর একেবারে মৌন অবলম্বন করিলেন। গল্প আর জমিল না; শেষে হাওয়াটা একটু হালকা হইল মাত্র। কিছুক্ষণ পরে অভিমানী কুকুরকে ডাকিয়া তাহার গালে পিঠে হাত বুলাইয়া বড়ই দুঃখভরে শরৎচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "কেন অমন করিস বল্ দেখি? রীতের দোষেই ত' মার খাস!" সে কোলের কাছে আরও ঘেঁসিয়া আসিল, শরৎচন্দ্র যেন কিছু সুস্থবোধ করিলেন।

ইহার পর অনেকবার তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে—পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। 'ভারতী'র বৈঠকে তিনি প্রায় আসিতেন। সেইখানে তাঁহার কথা

শুনিবার ও নানাবিষয়ে তাঁহার মতামত ও মনোভাব জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। তাঁহার কথাবার্ত্তায় যে জিনিষটি বিশেষ করিয়া মনকে স্পর্শ করিত, তাহা পাণ্ডিত্য বা সূক্ষ্ম বিচারশক্তি নয়—জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতার ফলে একটা অতিশয় সহজ ও সুদৃঢ় প্রত্যয়; তিনি যাহা বলিতেন, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার নির্য্যাস নয়, প্রত্যক্ষদর্শনের নিঃসংশয় ধারণা। তাঁহার কণ্ঠস্বর এমন মৃদু অথচ দৃঢ় ছিল, এবং কথার ভাষা এমন পরিচ্ছন্ন পরিস্ফুট ও প্রাণময় ছিল যে, তাহা আর কোন ভাষায় উদ্ধৃত করা যায় না। তাঁহার উপন্যাসের ভাষায় যে যত্নকৃত পারিপাট্য—ভাবের অব্যর্থপ্রকাশের দিকে যে সতর্ক দৃষ্টি আছে, যাহার জন্য তাঁহার রচনা এত হৃদয়গ্রাহী, তাহা হইতেও স্বতন্ত্র একটি গুণ তাঁহার মৌখিক আলাপ-আলোচনায়, গল্প বলিবার ভঙ্গিতে বিদ্যমান ছিল। যেন লেখার মধ্যে আর্টের সূক্ষ্ম আবরণে মানুষটির একটি পরিচয় পাই; কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপের উপযুক্ত অবসরে, কোনও গুরুতর প্রসঙ্গের অবতারণায়, তাঁহার অন্তরের পরিচয় আরও স্বচ্ছ হইয়া উঠে; এবং সেই কারণে, তাঁহার রচনাবলীর ভাষ্যরূপে তাহা যেন শ্রোতার পক্ষে আরও মূল্যবান। সেই সকল আলাপের যতটুকু শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল—সে ভাষা ও ভঙ্গি অনুকরণ করা দুঃসাধ্য হইলেও—আমি আজ তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'ভারতী'র বৈঠকে শরৎচন্দ্রের আলাপ শুনিয়াছি; আবার পৃথক একা অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ একাধিকবার ঘটিয়াছে। বৈঠকী আলাপে বাহিরের মানুষটিকে একরূপ দেখিবার ও চিনিবার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ভিতরের মানুষকে খুব অন্তরঙ্গভাবে জানিবার সুযোগ হয় না। তথাপি, 'ভারতী'র বন্ধুসভায় একবার তাঁহার মুখে যে কয়েকটি কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা শরৎচন্দ্রের রচনাগুলির একটি প্রধান প্রেরণা সম্বন্ধে খুবই মূল্যবান। কথা হইতেছিল মেয়েদের লইয়া। এক সময় মণিলাল সেই আলোচনায় যোগ দিয়া নারীদের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও কোমলতা সম্বন্ধে একটা কি মন্তব্য করিলেন। শরৎচন্দ্র এতক্ষণ একখানি শোয়া-চেয়ারে অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে পড়িয়া ছিলেন—হঠাৎ সকলকে চমকাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্লে মণিলাল? মেয়েরা বড় দুর্ব্বল? তোমরা ত মেয়েদের আসল মূর্ত্তি দেখনি, শহরের বাবু-মেয়েই দেখেছ। একটা মেয়েমানুষ যে পরিমাণ মার খেয়ে হজম করতে পারে, পুরুষমানুষ তার সিকিও

হজম করতে পারে না।" তারপর, তিনি মেয়েদের সঙ্গে অন্য অনেক বিষয়ে পাল্লা দিয়া হারিয়া যাওয়ার কথা বলিলেন, তাহার সব ভদ্রসমাজে বলিবার মত সাহস আমার নাই। শেষে যাহা বলিলেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেকালের বাঙালীর মেয়ে যে-বয়সে শ্বশুরঘর করিতে যাইত, এবং সেখানে সেই অপরিচিত পরিবারের মধ্যে, অনেক সময় স্নেহলেশহীন ব্যবহার সহ্য করিয়া, তাহাকে যে ভাবে সেই সংসারে নিজের স্থান করিয়া লইতে হইত, তাহা ভাবিতেও সেই বয়সের কোনও বালকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। আজিও যাহারা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারে বহুসন্তানবতী জননী, তাঁহারা দিনে বিশ্রাম ও রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া—সারা বৎসর ঘরের নিত্যকর্ম্ম, শিশুপালন ও রোগীর সেবা ভগ্নদেহে অর্দ্ধাহারে করিয়া চলিতে থাকেন; একদিন ছুটি নাই, একটা রবিবারও নাই। মোটের উপর, মেয়েদের সম্বন্ধে একটা অতিশয় সত্যকথা—নিত্য-অভিজ্ঞতার বাহিরে ও ভিতরে—দুইরূপেই, তিনি এমন করিয়া আমাদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন, যাহা আমরা উচ্চসাহিত্যের ভাবমার্গে বিচরণ করিয়া সর্ব্বদা বিস্মৃত হইয়া থাকি। আমার মনে আছে—এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে আমার একটি পুঁথি-পড়া বাক্য মনে পড়িয়াছিল। আমি সেই সভায় তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। কথাটি এই—"Woman pays the debt of life not by what she does but by what she suffers."। সেদিনের শরৎচন্দ্রের মধ্যে 'বিরাজ বৌ'-এর লেখককে দেখিয়াছিলাম।

সেই দিন, কি আর এক দিন, মনে নাই, শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বচনভঙ্গি সহকারে একটা সামান্য কথার উপলক্ষ্যে এমন একটি সত্যের ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে তাঁহার নিজের সমগ্র জীবনের আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মণিলাল নিতান্ত লঘুভাবে বলিতেছিলেন যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি খাঁটি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে পারিলেন না; অর্থাৎ সমাজ ও পরিবারের সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জীবনকে একেবারে ব্যর্থ করিয়া তুলিতে পারিলেন না। শরৎচন্দ্র তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "তুমি কি মনে কর, সেটা এতই সহজ, মণিলাল! তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে—যা চারিদিকে ঘটছে, যা হবার জন্যে কোন চেষ্টাই করতে হয় না, বরং যার থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই মানুষকে কত শাসন মেনে চল্‌তে হয়—তুমি তাই চেষ্টা করেও হতে পারনি, তাই বড় আশ্চর্য্য হয়েছ?

কিন্তু একটি কথা জেনে রেখো, সত্যিকার ব'খে যেতে পারা যার-তার সাধ্য নয় —সে শক্তি খুব কম লোকেরই আছে, সে বড় ভাগ্যের কথা।" সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা সুরক্ষিত, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও আভিজাত্য-মর্য্যাদার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত অতিশয় ভদ্র ও সভ্য যে জীবন, তাহার তুলনায় তাহারই বিপরীত এই যে আর এক জীবন, যাহার সম্বন্ধে ভাবিতেও আমরা শিহরিয়া উঠি—আমাদের আজন্ম বা জন্মান্তরীণ সংস্কার বিদ্রোহ করে, তাহারই আদর্শকে শরৎচন্দ্র কোন্ অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার বলে এত উচ্চে তুলিয়া ধরিলেন? সেও যেন একটা সাধনা, তাহাতেও সিদ্ধিলাভ একটা বড় পুরুষার্থ। এ যেন আমাদের দেশের তান্ত্রিক সাধকের কথা। সেদিন সেই ক্ষুদ্র আলোচনার অবকাশে আমি চকিতে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যিক সাধনার মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলাম—বুঝিয়াছিলাম, এই প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছে একপ্রকার তান্ত্রিক চিত্তবৃত্তির বশে; শরৎ-সাহিত্যে যে খাঁটি বাঙালী-প্রতিভার একটি দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহাতে বাঙালী জাতির হৃদয়যন্ত্রের একটা বড় তার বাজিয়া উঠিয়াছে, সে প্রতিভার মূল অতি গভীর; তাহা বাঙালীর একটা রক্তগত সংস্কারের ফল। জাতীয় সাধনার সে ইতিহাস আজ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই, শরৎ-সাহিত্যের বিচারে অতি-আধুনিক বিদেশী সমাজতন্ত্রের অতিশয় অগভীর দুই একটা তত্ত্বের আশ্রয় লইয়া থাকি। কিন্তু এ কথা পরে।

ইহার পর একবার শিবপুরের বাসাবাড়িতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার কথা মনে আছে। তখন সাহিত্যের আদর্শ লইয়া সাময়িক সাহিত্যে একটা বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছিল; রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ নব্যদলের দলপতিগণের ভাল লাগে নাই। শরৎচন্দ্রও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত একমত হইতে না পারা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও, তিনি বিচারশক্তি অপেক্ষা ভাবানুভূতির উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। এই বাদ প্রতিবাদ হইতে দূরে থাকিলেও, আমি এই সময়ে তখনকার এক প্রধান সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিছু লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্রের সহিত আলাপে আমি তাঁহার লিখিত প্রতিবাদ সম্বন্ধে খোলাখুলি আমার মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবং ইহাও বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা সমালোচনা-শক্তির অনুকূল নয়; অনুভূতির দিক দিয়া তিনি সাহিত্যের বিষয় ও প্রেরণা সম্বন্ধে খুব সত্য ও গভীর

কথা—সূক্ষ্ম যুক্তি-বিচার না মানিয়াও বলিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা কবিরই মত, সমালোচকের মত নয়; এজন্য কোনরূপ রীতিমত বিতর্কে পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া কিছু বলিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমি এ কথা তাঁহাকে নিঃসংকোচে বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কোন প্রতিবাদ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। আমার বেশ মনে আছে, ঐ আলোচনার প্রসঙ্গেই তিনি এমন দুই-একজন লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁহার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—এমন কি, একজনকে তাঁহার অপেক্ষা বড় লেখক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। আপনাকে আপনি দেখিবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না; তাঁহার সৃষ্ট মানব-মানবী সম্বন্ধেও তাঁহার যেমন কোন সংশয় ছিলনা, তেমনই, তাহাদের স্রষ্টার সম্বন্ধে তাঁহার কোন সুদৃঢ় ধারণা ছিল না, নিজের সাহিত্যিক প্রতিভাসম্বন্ধে তিনি আত্মসচেতন ছিলেন না; তাই নানা ভক্তের দল তাঁহাকে অনায়াসে বশীভূত করিতে পারিত। তিনি জীবনকে যেমন বুঝিতেন, আর্টকে তেমন বুঝিতেন না—নিজে বড় আর্টিষ্ট ছিলেন, নিজের রচনাকার্য্য সম্বন্ধে সদা সচেতন ছিলেন—কিন্তু ক্রিটিক ছিলেন না, আপনার দেখা বস্তুকে রূপ দিতে পারিতেন, কিন্তু পরের দেখা বস্তুর রূপ অর্থাৎ পরের রচনা সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সজাগ ছিল না। তাঁহার সাহিত্যিক প্রকৃতির পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক বটে, তথাপি চিত্তের গঠনে এই ত্রুটি থাকায় তাঁহার সাহিত্যিক জীবনে কিছু ক্ষতিও হইয়াছিল।

৩

ইহার পর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎকালে তাঁহার মুখে প্রসঙ্গক্রমে যে একটি কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা অনেকের পক্ষে চমকপ্রদ মনে হইবে—তৎকালে আমারও হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, নারীজাতির প্রতি তাঁহার কি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল—তাঁহার উপন্যাসে এই নারীই বাঙালীর চক্ষে এক নূতনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেদিন, স্ত্রী-পুরুষঘটিত ব্যভিচারের একটি কাহিনী শুনিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার নয়। পূর্ব্বে নারীর শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছি, এবারে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা সেই পূর্ব্বের উক্তির বিরোধী

বলিয়াই সহসা মনে হইবে; অথবা, তাহাকে সেই উক্তির পরিপূরক বলিয়াই বুঝিয়া লওয়া উচিত। সেই কাহিনী শুনিয়া তিনি অতিশয় অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ও জাত সব পারে, উহার পক্ষে অসাধ্য বা অসম্ভব কিছু নাই।"—বলিয়া তাঁহার নিজের দেখা একটা ঘটনা বিবৃত করিলেন, একবার কোন একটি ভদ্রবংশের বয়স্ক মহিলা অতিশয় নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়পারবশ্যের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই সবিস্তারে বলিলেন—সেই গল্পটি প্রকাশ করায় বাধা আছে বলিয়াই করিতে পারিলাম না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহা সাধারণ দুশ্চরিত্রতার কথা নয়—যে অবস্থায়ও যে ভাবে এই স্ত্রীলোক অতিশয় প্রকাশ্যে আপনার সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তাহার জাতি, কুল, নারীত্ব ও মাতৃত্ব—সকল সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা শুনিলে এই প্রশ্নই জাগে যে, জীবপ্রসূতি সর্ব্বংসহা যে নারী, তাহার পক্ষে ইহাও সম্ভব হয় কি করিয়া? যেন সৃষ্টির একটা অতিদুর্ব্বোধ্য ও ভীতিপ্রদ নিয়মের লীলা, এইরূপ নারী-চরিত্রে ক্বচিৎ কখনও উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। এই গল্প বলিবার সময়ে শরৎচন্দ্রকে অতিশয় নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি যেন অকম্পিত হৃদয়ে দৃঢ়দৃষ্টিতে একটা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—তাঁহার কোন ভয় নাই, দুঃখ নাই। আবার তাঁহার মধ্যে সেই শবসাধক তান্ত্রিকের বংশধরকে দেখিলাম। সেদিন যাহা ভাল করিয়া বুঝি নাই, আজ তাহা বুঝিতে পারি। এই মানুষ আমাদের এই সমাজ ও জীবনের গণ্ডিতেই সর্ব্বসংস্কারমুক্তির সাধনা করিয়াছিলেন—এ সমাজের সংস্কারবন্ধন বড় দৃঢ় বলিয়াই সেই সাধনায় শক্তিবিকাশের সুবিধা হইয়াছিল। তান্ত্রিক শক্তিকে উপলব্ধি করিতে চায় ভীষণের মধ্যে, মথিত হৃৎপিণ্ডের উপরেই শক্তির পদ্মাসন গড়িয়া তোলে। আমাদের এই হীনবীর্য্য পুরুষের সমাজে নারীই শক্তির আধার হইতে বাধ্য। ক্ষীণ বলিয়াই নিষ্করুণ যে নর, তাহার অত্যাচারে আমাদের দেশের মেয়েদের দেহে মনে ও প্রাণে এমন একটা সংযম-সহিষ্ণুতার বিকাশ হয়, যাহা অবস্থা বিশেষে অমানুষী শক্তির আকার ধারণ করে। নারীর মধ্যে এই শক্তির নানারূপ তিনি দেখিয়াছিলেন—সাহিত্যে তাহার সব প্রকাশযোগ্য নয়; জীবনের সত্য ও আর্টের সঙ্গতি—এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিবেই। এই অস্বাভাবিক অবস্থার পীড়নে নারী ক্রমাগত আত্মসঙ্কোচ করে—সেই আত্মসঙ্কোচের দ্বারাই তাহার সকল স্ফূর্ত্তি একমুখী হইয়া যে বজ্রগর্ভ তাড়িৎ উৎপাদন করে,

তাহার আঘাতে মৃত্যু, ও আলোকে অমৃত লাভ হয়। একদিকে সেই শক্তিই যেমন সৃষ্টিকে রক্ষা করে—তাহাকে পূর্ণ করিয়া তোলে, তেমনই, অপরদিকে তাহাকে শূন্য করিয়া দেয়। নারীর সেই শক্তি যেন একটা অবোধ প্রাণশক্তি—তাহার সেই চরম স্ফূর্তির অবস্থায়—ত্যাগে ও ভোগে, প্রেমে ও অপ্রেমে—মনের কোন হিসাব-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। সে যেন একটা elemental বা অন্ধজড়শক্তির লীলা, তাই বুদ্ধিজীবী পুরুষ তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। কিন্তু সেই শক্তির একদিক—আত্মত্যাগের দিক—সৃষ্টির সহায়তা করে বলিয়া, সমাজের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর বলিয়া, পুরুষচিত্ত মুগ্ধ হয়; তাহার জীবনের সেই ট্র্যাজেডি আমাদের মনে এক অপরূপ মহিমাবোধ উদ্রিক্ত করে। শরৎচন্দ্রের হৃদয় স্বভাবত এই দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। তথাপি অতিগভীর সহানুভূতি ও অপরিসীম সাহসের বলে তিনি নারী-চরিত্রে এই শক্তির মূলটাকেও লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাহা একদিকে অমানুষী কাম, ও অপরদিকে অমানুষী প্রেমরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা যে মূলে একই—যে প্রেম বিনা চিন্তায় আত্মবিসর্জ্জন করে, এবং যে কাম ঘৃণা লজ্জা ভয় স্নেহ মমতা প্রভৃতি সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত—সেই উভয়ের মূলে যে একই তত্ত্ব আছে, তান্ত্রিক সাধক তাহাকে উপলব্ধি করিয়া অভয় হইতে চায়। শরৎচন্দ্রও যে পথে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই তত্ত্বের আভাস তিনিও পাইয়াছিলেন—তাই নারীচরিত্রের অন্তস্থলে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। কিন্তু তান্ত্রিকের শক্তিসাধনার যে আদর্শ, তাঁহার অতিকোমল স্পর্শকাতর হৃদয় তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল—সেই তত্ত্বকে স্বীকার করিলেও এবং তদ্দ্বারা নারী-চরিত্র সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ হইলেও, সেই জ্ঞান তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

তাই যখন সেই নারীজাতির সম্বন্ধে তাঁহার মুখে শুনিলাম, "ও জাতের কথা ব'ল না, ওরা পারে না এমন কাজ জগতে নেই!"—তখন তাঁহার মত নারী-মহিমার উপাসক এই কথায় নারীকে গালি দিতেছিলেন, না, শক্তিসাধক তাহার ইষ্ট-দেবতার স্বরূপ-দর্শন করিয়া দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যে আর্ত্ত চীৎকার করে, শরৎচন্দ্রও এখানে তাহাই করিতেছিলেন? সেদিন তাঁহার মুখে যে কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, আজ তাহার গভীরতর কারণ সন্ধান করিয়া সেই বিরোধের সমাধান করিতে চাই। মনে হয়, তিনি মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে যে দিক দিয়া অনুধাবন

করিয়াছিলেন, এবং আমাদের সমাজে তাহার যে চূড়ান্ত লীলা দেখিয়াছিলেন নারীর জীবনে—তাহার পরে আর অগ্রসর হইতে সাহস পান নাই। তাঁহার সাধনায় তান্ত্রিকের মনোভাব থাকিলেও তাহা প্রেমের সাধনা—জ্ঞানের নয়; এই দুইকে যদি তিনি সাহিত্যসাধনায় মিলাইতে পারিতেন—আর কিছু না হউক, যদি তাঁহার সেই আশ্চর্য্য ভাবকল্পনা ও অনুভূতিশক্তির উপরে জ্ঞানের কঠোর শাসন কিছু থাকিত, তবে বাংলা সাহিত্যে খুব বড় ও পূর্ণতর বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু তাহা ছিলনা বলিয়া আমরা আর্টিষ্ট শরৎচন্দ্র অপেক্ষা মানুষ শরৎচন্দ্রের দ্বারা অধিকতর আকৃষ্ট হই, এবং তাঁহার রচিত সাহিত্যের রসসৌন্দর্য্যের মূলে একটা মানুষের জাগ্রত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনধ্বনি শুনিয়া আশ্বস্ত ও পুলকিত হই। এই জ্ঞানের দিক—তান্ত্রিক সাধনার সেই তত্ত্বদৃষ্টি—তাঁহার বুদ্ধিকে যে এড়ায় নাই, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; বরং ইহাই যে শেষে তাঁহার উপরে কতক পরিমাণে আধিপত্য করিয়া করিয়াছিল—তাঁহার ভাবজীবন বা কবিজীবনকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার 'শেষ প্রশ্ন' নামক উপন্যাসে স্পষ্ট পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেখানে ভাবদৃষ্টির ও জ্ঞানদৃষ্টির সমন্বয় হয় নাই—সাহিত্যসৃষ্টিতে তাহা সার্থক হইয়া উঠে নাই।

শরৎচন্দ্রের হৃদয় যে কত কোমল—তাঁহার অনুভূতিশক্তি যে কত অসাধারণ ছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনাগুলিতে সর্ব্বত্র উজ্জ্বল হইয়া আছে। শরৎচন্দ্র চিন্তা করিতেন হৃদয় দিয়া—মস্তিষ্ক দিয়া নহে; যাহাকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলা যায়, তাহাই ছিল তাঁহার কল্পনা ও জ্ঞানবৃত্তির সহায়। সেই প্রবল সেন্টিমেণ্টযুক্ত সহানুভূতিই যেমন একদিকে তাঁহার প্রতিভার শক্তি, তেমনই অপরদিকে তাঁহার অশক্তির কারণও তাহাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আসিয়াছিল যে মানবতার প্রেরণায়—তাহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস হইতেই মানুষের জীবনকে এক নূতন আদর্শবাদের দ্বারা মণ্ডিত করা হইয়াছিল। সেই আদর্শবাদ ভাবকল্পনার রসেই পুষ্ট হইয়াছিল, তাহা বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের সত্যকেই ধরিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ভাব বা আইডিয়া হইতে নামিয়া মানুষের বুকে কাণ রাখিয়া তাহার বাস্তব হৃদয়স্পন্দন শুনিবার কৌতূহল সে যুগে কাহারও হয় নাই—মানবতার সেই একান্ত স্নায়ুশিরাশোণিতময় অনুভূতি কাহারও সাধনার বস্তু হয় নাই। মানুষকে—কোন তত্ত্ব, ধর্ম্ম, বা নীতিসংস্কারের দ্বারা নয়—কেবল-

মাত্র নিজহৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার প্রাণের আকুতিকেই আর সকল সত্য অপেক্ষা বড় বলিয়া ঘোষণা করার যে মানবতা, বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এই মানবতার সাধনা তাঁহার জীবনেই হইয়াছিল—ভাব বা কল্পনাযোগে নয়; সেইজন্যই তাঁহার সাধনাকে তান্ত্রিক সাধনা বলিয়াছি। রক্ত-মাংস-শিরা-শোণিতের মধ্য দিয়া যে উপলব্ধি, তাহাই তান্ত্রিক সাধনা—অপর সাধনার নাম যোগ-সাধনা, তাহা অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয়, অতি সূক্ষ্ম মানস-সাধনাও তাহাই। এইজন্য যোগী ও তান্ত্রিকের মধ্যে এত বিরোধ। এই যে দেহ দিয়া, বাস্তব হৃদয়বেদনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি, ইহার জন্য দেহের শক্তি চাই—স্নায়ুশিরার অসহ্য পীড়ন সহ্য করা চাই। শরৎচন্দ্রের এই অবস্থা একবার দেখিয়াছিলাম এবং তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, সাহিত্যে তিনি যাহা রচনা করিতেছেন, তাঁহার জীবনে তাহার উপলব্ধি হয় কোন্ প্রণালীতে। সেবার কোন এক প্রয়োজনে তাঁহার সামতাবেড়ের বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। শরৎচন্দ্রের সেই বাসস্থান দেখিলে মনে হইবে, তিনি এত দিনে মনের মত জীবন যাপন করিতেছেন। ভিতরের দিকে গৃহসংলগ্ন উদ্যানে অসংখ্য গোলাপ ফুটিতেছে, বাহিরে বাঁধের অনতিদূরে রূপনারায়ণের অকূল বিস্তার। অতিশয় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটীরূপে সাজানো ঘরখানিতে গৃহস্বামীকে দেখিয়া সানন্দে অভিবাদন করিলাম। অনেক কথা হইল, কিন্তু কিছুর মধ্যেই যেন আগ্রহ নাই—সকলের মধ্যেই একটা গভীর অবসাদ বা নৈরাশ্যের ভাব। শেষে কারণ বুঝিলাম। সম্প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবিয়োগ হইয়াছে—নিজেই বলিলেন, না বলিয়া পারিলেন না। কিন্তু সে ব্যথা যে ভাষায়, যে স্বরে প্রকাশ করিলেন, তাহাতে মানুষের যন্ত্রণাকে যেন চাক্ষুষ করিলাম। তাঁহার এই ভাই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন, শরৎ-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ কম হইত। কিন্তু এইবার তিনি যেন মৃত্যু আসন্ন জানিয়াই শরৎচন্দ্রের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র বলিলেন, "বাঁচিয়া থাকিতে আমাকে তাহার প্রয়োজন হয় নাই, শেষে মরিবার জন্য আমার কোলে ফিরিয়া আসিল। তাহার সেই মৃত্যুযন্ত্রণা আমি ভুলিতে পারিব না। দুইহাতে তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়া দিন ও রাত কাটাইয়াছি—আমার বুকে মাথা রাখিয়া তাহার সেকি কান্না! সে যাতনার কিছুমাত্র উপশম করিতে পারি নাই, কেবল নিরুপায় ভাবে তাহাকে বুকে ধরিয়া বসিয়াছিলাম, সেই একই অবস্থায়

তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল!" ঠিক সেই কথা ও সেই কণ্ঠস্বর উদ্ধৃত করা অসম্ভব, আমি আমারই ভাষায় তাহার ভাবার্থ জ্ঞাপন করিলাম মাত্র। সেদিন সেই কয়টি কথার মধ্যে, এবং সেই শোককাতর মূর্ত্তিতে, মানুষের দেহ-প্রাণের নিয়তি-নির্য্যাতন—মনুষ্য-জন্মের অপরিহার্য্য দুঃখের স্বরূপকে যেন সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলাম, শরৎ-সাহিত্যের মানবতার মূল উৎসের সন্ধান পাইলাম। এই মানুষের জীবন-সাধনায় তান্ত্রিকের আচার লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু যাহার হৃদয় এত দুর্ব্বল, যে জীবনকে জয় করিবার জন্য—যূপবদ্ধ পশু বা মানুষের যন্ত্রণা নির্ব্বিকারভাবে দেখা দূরে থাক্,—সেই যূপকাষ্ঠে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণার পরিধি নির্ণয় করে, সে তান্ত্রিক হইলেও মানবতার তান্ত্রিক, সে শ্মশানকে গৃহপ্রাঙ্গণে আনিয়া মৃত্যুর আলোকে জীবনকেই ভাস্বর করিয়া তোলে।

৪

শরৎচন্দ্রকে শেষ দেখি ঢাকায়, ১৩৪৩ সালে। অনেকদিন পরে দেখা—ইতি-মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের স্রোতোধারায় কত আবিলতা, কত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখা গিয়াছে—শরৎচন্দ্রকেও একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দেয় নাই। শরৎচন্দ্রের নূতনতর রচনা, ও নূতন নূতন ভক্ত-সম্প্রদায়ের জয়ধ্বনি তাঁহার ব্যক্তি-পরিচয় ও সাহিত্যিক প্রতিভাকে আমার চক্ষে একটু ভিন্নরূপ করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্রের মন ও প্রাণ তাহার প্রভাবে কতখানি প্রভাবিত হইয়াছে, তাহাও জানি না; কেবল এইমাত্র জানি যে, আমাকে তিনি ভুলিয়া যান নাই—না ভুলিবার কারণও ছিল। তাই তাঁহার আহ্বানের অপেক্ষা না রাখিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় অতিথি—তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-দান ব্যাপার শেষ হইয়াছে, শরীর অসুস্থ বলিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন—ঢাকা ত্যাগ করিবার তারিখ একটু পিছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে একটু একা পাওয়া অসম্ভব, ভিড় কিছুতেই কমে না। যেদিন কলিকাতায় ফিরিবেন, ঠিক তাহার আগের দিন সন্ধ্যায় আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কথাবার্ত্তার কোন অবকাশই পাইলাম না—কেবল দেখিলাম, নানা জন যাইতেছে ও আসিতেছে, সামাজিকতার দাবি মিটাইতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গলার বেদনা ও জ্বর তখনও আছে—পাশের টেবিলে

নানা আকারের শিশি ও যন্ত্রাদি সাজানো রহিয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, প্রকাশিতপ্রায় আমার একখানি বই প্রথম তাঁহার হাতেই উপহার দিই, কিন্তু তাহা দপ্তরীর ঘর হইতে বাহির হইতে তখনও একটু বিলম্ব আছে। আমি তাড়াতাড়ি একখণ্ডমাত্র বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছিলাম—পরদিন প্রাতঃকালে তাহা পাইবার কথা। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, পরদিন কোন্ সময় আসিলে অসুবিধা হইবে না। তিনি অতিশয় আগ্রহ করিয়া আমাকে যে-কোন সময় আসিতে বলিলেন—যাত্রা-কালের পূর্ব্বে হইলেই চলিবে। পরদিন বেলা ৮৷৮৷৷ টার সময়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাঁহার ঘরখানি জনবিরল; চারুবাবু সকল দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন—সকলেই বিদায় লইয়া গিয়াছে। আমি বইখানি হাতে দিয়া বসিতেই আলাপ সুরু হইল।

প্রথমেই তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা তুলিলাম। সে কথায় অতিশয় ক্লান্ত, এবং মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "মোহিত, আমি মৃত্যু কামনা করি, আমার আর এতটুকু বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।" কথাটা যেন কেমন বোধ হইল, আমি প্রতিবাদ করিলাম—মনে করিয়াছিলাম, জীবন কোন কারণে অসহ্য হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তিনি মৃত্যু কামনা করিতেছেন; তাই বলিলাম, নিজের মৃত্যু কামনা করা আর আত্মহত্যা করা একই কাজ—তাঁহার মত লোকের মুখে এমন কথা বাহির হওয়া উচিত নয়। শুনিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, "না, তোমার বয়সে তুমি ইহা বুঝিবে না; মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সুখ-দুঃখ সকল চেতনাই মন হইতে খসিয়া যায়, এবং জীবনকে আর তিলার্দ্ধ সহ্য করিতে পারে না। আমার তাহাই হইয়াছে, আমি দুঃখ বা সুখের কথা ভাবিতেছি না—আমি জীবন হইতে অব্যাহতি চাই মাত্র; তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? আমি অন্যেরও এমন অবস্থা হইতে দেখিয়াছি। ছেলেবেলায় আমি আমার এক দিদির কাছে থাকিতাম। তাঁহার বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী তখন বাঁচিয়া ছিলেন; তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; শেষে কিছুকাল রোগভোগ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় রোগমুক্তি অথবা শীঘ্র মৃত্যুর আশায় হিন্দু যাহা করে, গ্রামের সকলে তাহাই করিতে পরামর্শ দিল, বলিল, "প্রাচিত্তিরটা করিয়ে দাও, এমনভাবে রাখা ঠিক নয়।" প্রায়শ্চিত্ত করিতে বৃদ্ধার কি আনন্দ! যেন কত আশা! প্রায়শ্চিত্তের পরে কবিরাজ একদিন তাঁহার নাড়ী দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—তাঁহার জ্বর আর নাই,

তিনি এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। শুনিয়া বৃদ্ধার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, একটি কথা কহিলেন না। সেদিন রাত্রে একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—আমি বাহিরের ঘরে শুইতাম, ভিতরে উঠানের দিকে বার বার একটা কিসের শব্দ হইতেছে। দরজা খুলিয়া উঠানে নামিয়া শব্দের নিকটে আসিয়া দেখি—উঠানের মাঝখানে যে ঠাকুরঘর আছে, তাহারই দুয়ারের পৈঠায় সেই বৃদ্ধা পাগলের মত আপনার মাথা ঠুকিতেছে আর বলিতেছে, "তুমি আমাকে নেবে না—এত ক'রে ডাকছি, তবু তোমার দয়া নেই!" স্থানটা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, রাত্রে সকলে ঘুমাইলে পর সেই চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধা আপনার দেহটাকে এতদূর টানিয়া আনিয়াছে—বড় আশায় হতাশ হইয়া তাঁহার দেহের শেষ শক্তিটুকু দিয়া তিনি এই কাজ করিয়াছেন। সকলকে ডাকিয়া তাঁহাকে ধুইয়া মুছিয়া ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। ইহার পর তিনি আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। সেদিন যাহা বুঝি নাই, আজ তাহা বুঝি। আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে।" ইহার পর, দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আমার বইখানির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন—যেখানে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছি, সেইখানে চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "দেখ, লোকে বলে আমি বঙ্কিমের অনুরাগী নই—আমার যেন বঙ্কিমের প্রতি একটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে।" আমি বলিলাম, আপনার নিজের স্বাধীন মতামতপ্রকাশে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই—সমালোচক-হিসাবে আপনার মতামতের মূল্য যেমনই হউক, আপনাকে বুঝিবার জন্যই আপনার সরল অকপট উক্তির একটা পৃথক্ মূল্য আছে। অতএব বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত ধারণাই আমরা জানিতে চাই—সাহিত্যিক সমালোচনা হিসাবে নয়। আমি জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কবি-কল্পনার যে ধর্ম্মভ্রষ্টতা আছে, তাহার একটা বড় দৃষ্টান্ত স্বরূপ আপনি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী-চরিত্রের পরিণাম বঙ্কিমচন্দ্র যেমন চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই কথা বলিবামাত্র তিনি যেন পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিলেন—আমাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন, "দেখ, জীবনের সত্যকে, যত বড় কবিই হউক, লঙ্ঘন করিতে পারেন না; নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের সমাজে সংস্কারের মত বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা যে কত মিথ্যা, তাহা আমি জানি বলিয়াই কোন কবি, বিশেষ করিয়া যিনি খুব বড় কবি বলিয়াই

সম্মান পাইয়া থাকেন, তাঁহার লেখায় দায়িত্বহীন কল্পনার অবিচার আমি সহ্য করিতে পারি না। ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুরোধে মানুষের প্রাণকে ছোট করিয়া দেখিতে হইবে—নারীজীবনের যেটা সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, তাহাকেই একটা কুৎসিত কলঙ্করূপে প্রকাশ করিতে হইবে—ইহাতে কবিপ্রাণের মহত্ত্ব বা কবি-কল্পনার গৌরব কোথায়? আমাদের সমাজে যে নিদারুণ অবিচার প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, সাহিত্যে যদি তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখি, তবে মানুষহিসাবে মানুষের মূল্য স্বীকার করা সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোহিণীর দুর্গতির কথা যখন ভাবি, তখন আমার নিরুদিদির কথা মনে হয়। সে গল্প তোমাকে বলি। নিরুদিদি ছিলেন ব্রাহ্মণের মেয়ে বালবিধবা। বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। গ্রামে এমন সুশীলা, ধর্ম্মমতি, পরোপকারিণী, শ্রমশীলা ও কর্ম্মিষ্ঠা আর কেহ ছিল না; রোগে সেবা, দুঃখে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য, এমন কি অসময়ে দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা, তাঁহার নিকটে পায় নাই এমন পরিবার বোধ হয় সে গ্রামে একটিও ছিল না। আমার বয়স তখন অল্প, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া আমার একটা বড় উপকার হইয়াছিল—আমি একটা বড় হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এতকাল পরে, সেই বত্রিশ বৎসর বয়সে নিরুদিদির পদস্খলন হইল। গ্রামের ষ্টেশনের এক বিদেশী রেল-বাবু সেই আজন্ম ব্রহ্মচারিণীর কুমারীহৃদয় যে কি মন্ত্রে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাই সেই পাষণ্ডই জানে—যে শেষে তাঁহাকে কলঙ্কের প্রকাশ্য অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। সে অবস্থায় সচরাচর যে একমাত্র উপায়, নিরুদিদিকেই তাহাই করিতে হইল। ইহার পরে, এমন যে স্বাস্থ্য তাহাও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবশেষে তিনি মরণাপন্ন হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, মুখে একটু জল দেওয়া ত' পরের কথা, কেহ তাঁহার দুয়ার মাড়াইত না। যে সকলের সেবা করিয়াছে, যাহার যত্নে শুশ্রূষায় কত লোক মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়াছে, সে আজ একটা গৃহপালিত পশুর অধিকারেও বঞ্চিত হইল। আমাদের বাড়ীতেও কড়া হুকুম ছিল, তাঁহার কাছে কাহারও যাইবার জো ছিল না। আমি লুকাইয়া যাইতাম—মাথায় পায়ে একটু হাত বুলাইয়া দেওয়া, দুই একটা ফল সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া আসা,—আমার নিজের অসুখ হইলে, রোগীর পথ্যরূপে যাহা পাইতাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ তাঁহার জন্য লইয়া যাওয়া—ইহাই ছিল আমার যথাসাধ্য সেবা। কিন্তু সেই অবস্থাতেও, মানুষের

হাতে এই পৈশাচিক শাস্তি পাইয়াও, তাঁহার মুখে কোনও অভিযোগ অনুযোগ শুনি নাই ; তাঁহার নিজেরই লজ্জা ও সঙ্কোচের অবধি ছিল না,—যেন তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহার কোনও শাস্তিই অতিরিক্ত হইতে পারে না। সেদিন তাহাই দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, পরে বুঝিয়াছি, আপনার অপরাধের শাস্তি তিনি আপনিই আপনাকে দিয়াছেন—পর যেন উপলক্ষ্য মাত্র ; মানুষকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন, আপনাকে ক্ষমা করেন নাই। ইহাতেও তাঁহার শাস্তির শেষ হয় নাই—তিনি যখন মরিয়া গেলেন তখন তাঁহার শবদেহ কেহ স্পর্শ করিল না, ডোমের সাহায্যে তাহা নদীতীরের এক জঙ্গলে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল, শিয়াল কুকুরে তাহা ছিঁড়িয়া খাইল।” শরৎচন্দ্র চুপ করিলেন, ইহার পরে কয়েক মিনিট তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছে, আমরা এমন করিয়াই তাহার অপমান করি। রোহিণীর কলঙ্ক ও তাহার শাস্তিও এই পর্য্যায়ের, এমন একটা নারীচরিত্রের কি দুর্গতিই বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন !”

৫

গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম—শুধু গল্প নয়—গল্প বলিবার আশ্চর্য্য ভঙ্গিতেও। সকল কবি কবিতা আবৃত্তি করিতে পারেন না—তাঁহাদের যে রচনা নিজে পড়িয়া ভাল লাগে, তাহাই তাঁহাদের মুখে অনেক সময় ভাল শোনায় না। শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার অনুপ্রেরণা আর এক ধরণের—তাহাতে ভাবের সংক্রামতা আরও অব্যর্থ। কিন্তু রোহিণীর কথার পুনরুল্লেখে আমি নিজেকে সামলাইয়া লইলাম—একটু শক্ত হইয়াই বলিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার মত একটু স্বতন্ত্র, তাহা বোধ হয় আপনিও জানেন। ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’ বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের বা রচনাকৌশলের ত্রুটি আছে—অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টি ঠিক থাকিলেও সৃষ্টিতে তাহা পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। রোহিণী-চরিত্রের বিকাশে যে অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। পাঠকের বিচার ও কল্পনাশক্তি যদি লেখকের সহিত সহানুভূতিযুক্ত হয়, তবে এই অসঙ্গতির সঙ্গতি হইতে পারে। আপনার ‘বিরাজ বৌয়ের আচরণেও অসঙ্গতি আছে বলিয়া পাঠক সাধারণ

আপত্তি করিয়া থাকে—সে অসঙ্গতিও তাহাদের সংস্কারে অল্প আঘাত করে না। অতএব কোন নাটকীয় কল্পনার কাব্যে বা উপন্যাসে যদি প্রতিভার নিঃসংশয় প্রমাণ থাকে, তবে সেই কল্পনার ত্রুটির বিচার করিতে হইলে, ব্যক্তিগত মনোভাব বাদ দিয়া, কেবল স্বষ্ট-চরিত্রের পরিচয়টি ও বাহির-অন্তরের সকল অবস্থার হিসাব ভাল করিয়া লইতে হইবে। রোহিণী-চরিত্রের পরিণাম চিত্রিত করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে দোষ হইয়াছে—তিনি সেই পরিণামকে বড় আকস্মিক করিয়া দেখাইয়াছেন। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে কবিকল্পনার যে ভারকেন্দ্র ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা স্থানচ্যুত হইয়াছে—রোহিণী-চরিত্রের প্রতি লেখকের আর সে মনোযোগই নাই—কল্পনার ধারাই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডে ভ্রমরই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে—রোহিণীর মূর্ত্তি যেন চিত্রশালার এক অন্ধকার কোণে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আর্টিষ্টের পক্ষে এ ত্রুটি অমার্জ্জনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া রোহিণীর পরিণাম যে এইরূপ হইতে পারে না, তাহা যে মানবচরিত্র-জ্ঞানের বিরোধী, একথা বলিলে ভুল হইবে। কোন সংস্কারের বা সেন্টিমেণ্টের কথা নয়—কোন সামাজিক ন্যায়-অন্যায়-বিচারের কথা নয়—বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক কল্পনাও যে কবিদৃষ্টির গুণে এমন অসাধারণ সৃষ্টিশক্তির সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে আর দুই চারিটি দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হইলে রোহিণীর জীবনে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসই অতিশয় যথার্থভাবে ফুটিয়া উঠিত। রোহিণীর প্রতি আপনার যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি, তাহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে সাধারণ নারীরূপে কল্পনা করেন নাই—আপনার নিরুদিদির মতই সে চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এইটুকু মহিমা বঙ্কিমচন্দ্রই তাহাকে দিয়াছেন, না দিলে আপনিও তাহার জন্য এত ক্ষুব্ধ হইতেন না। অতএব এজন্য প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। রোহিণীর সেই বুদ্ধি ও চরিত্রশক্তি এবং তৎসহ তাহার প্রাণের সেই নির্দ্দোষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যদি আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া থাকি, তবেই রোহিণীর পরিণাম সত্যকার ট্র্যাজেডির উপযোগী হইতে পারে। হইয়াছেও তাহাই, কেবল একটু অনবধানতার জন্য সেই ট্র্যাজেডি কতকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে—তাহা করুণ না হইয়া বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

রোহিণী-চরিত্রের মূল ভিত্তি একটু পরীক্ষা করা দরকার। যে হরলালকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহার যেমন হউক একটা ধর্ম্মবিশ্বাস ও

আত্মমর্য্যাদাবোধ ছিল। গোবিন্দলালকে সে হৃদয়বান ও শক্তিমান আদর্শ পুরুষ-রূপেই আশ্রয় করিয়াছিল। ভ্রমরের প্রতি তাহার যে ঈর্ষা, অথবা ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব, তাহা নিশ্চয়ই কুন্দ বা সূর্য্যমুখীর প্রতি হীরার ঈর্ষার মত নয়। ইংরেজীতে যাহাকে 'grand passion' বলে, সেই grand passion বা আত্মধ্বংসকারী প্রেম তাহাকে কতকটা নীতিভ্রষ্ট করিয়াছে সত্য—তথাপি তাহার চরিত্রের জন্মগত আত্মমর্য্যাদাবোধ তো মুছিয়া যাইবার নয়। তাহার প্রেমের মূলে সেই বিশ্বাস আছে—যে বিশ্বাসের বলে সে এত বড় সামাজিক সংস্কারকে লঙ্ঘন করিয়াছে। সেই grand passion, ও মনের এই বিশ্বাস, এই তুইয়ের বশে সে অকূলে ভাসিয়াছে, মোহের মধ্যেও সে অন্তরের সত্যকে হারাইতে রাজি নয়,—কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে, "Her honour rooted in dishonour stood"। গোবিন্দলালের উপর তাহার বিশ্বাস এমনই যে, তাহাতে সে যদি ভুল করিয়া থাকে, তবে তাহার আর কোন আশ্রয় থাকিবে না; সে বিশ্বাস নষ্ট হইলে, তাহার জগৎ একেবারে অন্ধ হইয়া যাইবে—দর্পণের পারাটুকু মুছিয়া যাইবে, সে দর্পণে কোন ছায়া আর পড়িবে না; ঘোরতর আস্তিক নাস্তিক হইলে যাহা হয়, তাহাই হইবে। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, রোহিণী মানুষ-হিসাবে ও নারী-হিসাবে জীবনে তাহার যে অধিকার চাহিয়াছিল—সে অধিকার সম্বন্ধে তাহার মনের জোর যতই থাকুক, হিন্দুর ঘরের ব্রাহ্মণের মেয়ের পক্ষে বৈধব্য-আদর্শের রক্তগত সংস্কার দমন করিতেই পারা যায়—উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। যদি কোন কারণে সেই বিশ্বাসের শক্তি আর না থাকে, গোবিন্দলালের মত পুরুষের দুর্ব্বলতায় তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যায়—তবে সেই রক্তগত সংস্কারই একটা প্রবল পাপবোধের সৃষ্টি করিয়া এ চরিত্রের শেষ-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। এই সংস্কার আপনার নিরুদিদির ছিল, কিন্তু সেখানে পুরুষের প্রতি বিশ্বাসের এমন কারণ না থাকায় এবং নিরুদিদির প্রকৃতিই সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া, এই পাপবোধ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এবং তিনি অতি সহজভাবেই তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—সেখানে এমন ট্র্যাজেডির অবকাশ ঘটে নাই। রোহিণীর স্বপ্ন ভাঙিতে বিলম্ব হয় নাই—কিন্তু সে কি স্বপ্নভঙ্গ! যাহার ভরসায় সে নিজের ভাগ্যবিধাতাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল—সমাজের অন্যায়কে নিজহৃদয়ের ন্যায়সঙ্গত প্রবৃত্তির বলে সংশোধন করিতে চাহিয়াছিল—তাহারই অতিদুর্ব্বল লালসাহত প্রাণের

বীভৎস মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। সে দেখিল, গোবিন্দলাল তাহাকে ভোগের সহচরী করিয়া তাহার নারীত্বকে অপমান করিয়াছে, সে যেন তাহার নিকটে মদ্যপের পানপাত্র—তাহার দহনজ্বালা যেমন অসহ্য, তাহাকে ত্যাগ করাও তেমনই দুষ্কর। গোবিন্দলাল দিবারাত্রি তাহারই সহবাসে ভ্রমরের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে, যেন নরকে নিমগ্ন থাকিয়া নষ্টস্বর্গের অনুশোচনায় অধীর হইয়াছে। রোহিণী কি ইহারই জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিল? রোহিণী-চরিত্রের যে পরিচয় আমরা এই উপন্যাসের প্রথম অর্দ্ধে পাই, তাহা মনে রাখিলে, সে চরিত্রের পক্ষে এইরূপ মোহভঙ্গ যে কত বড় সর্ব্বনাশ, তাহা বুঝিতে পারি। সে নিজের দুর্দ্দমনীয় নিষ্ফল বাসনা হইতে মুক্তিলাভের জন্য, নিজ আত্মার মর্য্যাদারক্ষার জন্য একবার আত্মহত্যা করিয়াছিল; এই গোবিন্দলালই তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। আজ সেই গোবিন্দলালই তাহাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার দেহকে বাঁচাইয়া আত্মাকে বিনাশ করিয়াছে—তাহার হৃদয়ের মূলগ্রন্থি ছিঁড়িয়া দিয়াছে; তাই আজ আর ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, মান-অপমান, প্রেম-অপ্রেম—কোন সংস্কারই তাহার নাই; যাহাকে তাহার ত্রিভুবনের এক দেবতা বলিয়া সে বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহার মধ্যেও নারীমাংসলোলুপ অতিশয় সাধারণ দুশ্চরিত্র লম্পটকেই সে দেখিয়াছে। তাই বারুণী-পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া গভীর জলতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যে রোহিণী একদিন জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকে শীতল মনে করিয়াছিল—আজ যে সেই রোহিণী কুক্কুরীর মত হইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে চায়, ইহাতেই বুঝিতে পারি, গোবিন্দলাল কত বড় পাপ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর সেই দগ্ধ অঙ্গার-মূর্ত্তিই দেখাইয়াছেন—দহ্যমান অবস্থা দেখান নাই, শেষে তাহারই এক মুষ্টি ভস্মাবশেষ ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য তখন গোবিন্দলাল, রোহিণী উপলক্ষ্য মাত্র। কল্পনার এই কেন্দ্র-পরিবর্ত্তনের কথা আগে বলিয়াছি—ইহাই রচনাহিসাবে এ গ্রন্থের গুরুতর ত্রুটি। তথাপি রোহিণীকে হত্যা করিবার সময় গোবিন্দলালের মুখে যখন শুনি—"তুমি কে রোহিণী, যে তোমার জন্য" ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন এই নিতান্ত থিয়েটারী বক্তৃতার মধ্যে গোবিন্দলালের মিথ্যাবাদই উচ্চরব করিয়া উঠে; যাহাকে সে এতটুকু স্নেহ করে নাই, যাহার প্রতি সে-ই বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত করিয়াছে, যাহার কৃতজ্ঞতার প্রতি তাহার এতটুকু দাবি নাই, তাহাকেই বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া আপনার পাপ

তাহার উপরে চাপাইয়া, সে তাহার দণ্ডদাতা হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসে, নায়কস্থানীয় পুরুষ-চরিত্রের এত বড় অধঃপতন—এত বড় আত্মঘাতী প্রমত্ততা ও তাহার এমন নিদারুণ পরিণাম চিত্রিত হয় নাই। আমার মনে হয়, কল্পনার এই উগ্র একাগ্রতায় কবিরও কিঞ্চিৎ বিভ্রম ঘটিয়াছে, তাই রোহিণীর পরিণাম ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ মেলে নাই। তথাপি কবির সেই কল্পনার ফাঁক একটু পূরণ করিয়া লইলে, রোহিণীর ওই পরিণাম—চরিত্র ও ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে—ওইরূপ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, রোহিণী আজিকার মত সংস্কারমুক্ত নারী নয়, সে নিতান্তই নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীব—দেহপ্রাণের আদিম প্রবৃত্তি ও মনের অভ্যস্ত সংস্কার, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তাহার জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাইকলজিক্যাল নভেল বা প্রব্লেম-নভেল নয়। তাঁহার জীবন-দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তিনি মানুষের মনের অহং-চেতনা অপেক্ষা, তাহার দেহের নিয়তি ও প্রাণের রহস্যময় চেতনাকে তাঁহার কবিদৃষ্টির লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলির সমালোচনা ও সুবিচার করিতে হইলে খাঁটি কবিকল্পনার অনুসরণ করিতে হইবে; আত্মবুদ্ধির মতবাদ, আত্মভাবের পক্ষপাত—মন হইতে দূর করিতে হইবে; জীবনকে কবি যে ভাবে ভাবনা করিয়াছেন, সেই ভাবদৃষ্টির অনুগামী হইয়াই কাব্যের দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ অপর কোনও কবির ধারণার সহিত মেলে না বলিয়াই সে জগৎ মিথ্যা নহে—রসসৃষ্টিতে সত্যমিথ্যার নিরিখ কোনও একটা বিশেষ তত্ত্ব বা যুক্তিমার্গের অধীন নয়; কারণ, সে সৃষ্টিতে জীবনের কোন তত্ত্ব নয়—সুগভীর রহস্যই প্রতিফলিত হয়। অতএব, সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে কোনও মতবাদ বা ব্যক্তিগত ভাবতন্ত্রের শাসন সর্ব্বদা পরিহার করা উচিত।

আজ আমি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীচরিত্র-ঘটিত বাদবিতর্কের প্রসঙ্গে উপরে যাহা লিখিলাম—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় এত কথা এমন ভাবে বলি নাই। তাহা ছাড়া, সেদিন সে উপলক্ষ্যে মুখে যাহা বলিয়াছিলাম, আজ তাহা লিখিতে গিয়া—প্রসঙ্গের গুরুত্ব বিবেচনায় কথাগুলিকে আরও সুবিন্যস্ত করিয়াছি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিকটে আমার মূল বক্তব্য ছিল ইহাই, কতখানি গুছাইয়া বলিতে পারিয়াছিলাম জানি না—কিন্তু তাহাতেই ফল হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র অতিশয়

নিবিষ্টমনে আমার মতামত শুনিলেন, শুধু তাহাই নয়, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তিনি বিনা দ্বিধায় আমার প্রতিবাদের সারবত্তা স্বীকার করিলেন। তাহার প্রমাণ পাইলাম তাঁহার কয়েকটি মাত্র কথায়। প্রথমে তিনি অকপটে স্বীকার করিলেন যে, তিনি সত্যই এদিক দিয়া কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই—সেজন্য যেন লজ্জিত ও দুঃখিত। শরৎ-চরিত্রের এই অকপট সারল্য ও নিরভিমান সত্যানুরাগ, তাঁহার সুগভীর মনুষ্যত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। সর্ব্বশেষে তিনি কতকটা আক্ষেপের সহিত যাহা বলিলেন, তাহা আমি কখনও আশা করি নাই—আমার প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা আমি কখনও দাবি করিতাম না। সেই তাঁহার শেষ কথা। তিনি বলিলেন, "মোহিত, তোমার সঙ্গে এইরূপ আলাপ-আলোচনার সুযোগ যদি হইত, তাহা হইলে তোমার ও আমার দুইজনেরই উপকার হইত।" শরৎচন্দ্রের মুখ হইতে এমন কথা বাহির হওয়া হয়তো আশ্চর্য্য নয়—তিনি অল্পেই মুগ্ধ হইতেন, এবং অনেকের সম্বন্ধেই নির্ব্বিচার প্রশংসা করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ ছিল না। অতএব, ইহাতে আমার কোন আত্মপ্রসাদের কারণ নাই; তথাপি শরৎচন্দ্রের এই সখেদ উক্তি আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল—আমি আমার নিজের ক্ষতির কথাই ভাবিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত এইরূপ আলাপ-আলোচনায় আমার যে লাভের কথাও তিনি বলিলেন, তাহা সত্য; কারণ জীবন সম্বন্ধে প্রাণময় অভিজ্ঞতার সেই সব কাহিনী কোন কাব্যে বা সমালোচনা-গ্রন্থে আমি এমন সাক্ষাৎভাবে পাইতাম না। আমার পক্ষে সেইরূপ পাওয়ার যে প্রয়োজন আছে—তাঁহার এই বিশ্বাসকেই, আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৬

ইহাই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ আলাপ, এইখানেই তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সমাপ্তি। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক পরিচয়ের ত শেষ নাই। সেই পরিচয়ের পথ কতকটা সুগম করিয়াছে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-সংস্পর্শের এই কয়েকটি আলোক-বর্ত্তি, আমি আজ তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। এ বিবরণ হয়তো শরৎ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সমালোচকের কিঞ্চিৎ কাজে লাগিবে, আমারও কিছু লাগিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি শরৎ-সাহিত্যকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, তাহাও যেমন আমারই দৃষ্টি, তেমনই শরৎচন্দ্রকে যে দৃষ্টিতে

দেখিয়াছি তাহাও আমারই—আমার দাবি কোনও অভ্রান্ত সত্যদৃষ্টির দাবি নয়। কোনও মানুষকে কেহ কখনও পূর্ণ-দেখা দেখে নাই, অন্তরঙ্গ আত্মীয়কেও নয়। কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির দিব্য-আবেশে, এক পরম ক্ষণে, মানুষ আপনাকে দেখার মতই পরকে দেখে। সাহিত্যে সে দৃষ্টিও আজ লুপ্ত হইয়াছে, আজিকার দর্শনশাস্ত্রও আর সেই সমগ্রদৃষ্টিতে বিশ্বাস করে না। অতএব আমার দৃষ্টির খণ্ডতা যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই তাহা লজ্জার বিষয় নহে। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে, যেমন হউক—একটা সমগ্রতাবোধের প্রয়োজন আছে, নতুবা রসোপলব্ধি হয় না ; এবং এইরূপ সমগ্রতাবোধের কিছু সাহায্য হয় কবিচিত্ত ও কবিজীবনের পরিচয় হইতে। শরৎচন্দ্রের বিষয়ে আমার সেই পরিচয় খুব বেশি নয়, তথাপি আমার পক্ষে সেইটুকুই বরাবর কাজে লাগিয়াছে।

শরৎচন্দ্র জীবনকে একটা ক্ষেত্রে মুখামুখি দেখিয়াছিলেন—সেই দেখারও একটি ব্যক্তিগত ভঙ্গী আছে। যে প্রবুদ্ধ কল্পনাশক্তি কবিকে নৈর্ব্যক্তিক করিয়া তোলে, শরৎচন্দ্রের তাহা ছিল না,—কল্পনা অপেক্ষা অনুভূতির প্রখরতাই ছিল তাঁহার অধিক, তাই তাঁহার সৃষ্টির ভাব-রূপ যত পরিস্ফুট, তাহার পরিধি তেমন বিস্তৃত নয়। শূলবিদ্ধ বৃশ্চিক যেমন যন্ত্রণায় আপনার দেহ আপনি দংশন করে, সে দংশনে আত্মমমতাই প্রবল—শরৎচন্দ্রও তেমনই আমাদের এই সমাজের সহিত একাত্ম হইয়াই তাহার যন্ত্রণা পরম মমতার সহিত নিজদেহে ভোগ করিয়াছেন। তিনি বিচারক নহেন, সংস্কারকও নহেন—তিনি কেবল এই ব্যথার কাব্যকার। তিনি আগামী সভ্যতা ও সমাজনীতির ভাবনা তেমন ভাবেন নাই, যেমন ভাবিয়াছেন—এক যুগের সমাজ-ব্যবস্থার ফলে এক শ্রেণীর মানব-মানবীর অন্তর-মন্থিত অমৃত-গরলের কথা। সেই সমাজ-ব্যবস্থার দোষ ও গুণ তিনি সমভাবে গ্রহণ করিয়াছেন—সকল ত্রুটি সত্ত্বেও তাহার প্রতি অসীম মমতার ফলে, তিনি বাংলা সাহিত্যে সেই বাঙালী-জীবনের চারণ-কবি হইতে পারিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের অন্তর্নিহিত যে রূপ, যাহা বাংলার প্রাচীনতর শাক্ত ও বৈষ্ণব-সাধনার যুগ্ম-ধারায় সিঞ্চিত, ও রঘুনন্দনের শাসনে দৃঢ়-গঠিত, শরৎচন্দ্র তাহাকেই সাহিত্যে একটি রস-রূপ দান করিয়াছেন। তিনি ইহার দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করেন নাই, অতিশয় অপরোক্ষভাবে ইহাকে অনুভব করিয়াছেন, এবং সেই অনুভূতির মধ্যে, যেন তাঁহারও অজ্ঞাতসারে, ইহার প্রতি

এক সুগভীর মমত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎ-সাহিত্যের যাহা উৎকৃষ্ট অংশ, যাহা খাঁটি সৃষ্টিধর্ম্মী, তাহা একটা বিশেষ যুগের বিশেষ কাল্‌চারের প্রেরণা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে, তাঁহার দৃষ্টি সেই কাল্‌চারেরই ফল। আধুনিক সভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষার আঘাতে এই কাল্‌চারেরই একটা আত্মিক শক্তি তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর চরিত্র ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে যে সকল সমস্যার আবির্ভাব দেখা যায়, সমস্যা-হিসাবে আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাহাদের মূল্য স্বতন্ত্র। এই সকল সমস্যার দ্বারা সেই প্রাচীন প্রাণ-মনের তলদেশ যেভাবে আড়োলিত হইয়াছে—প্রতিক্রিয়ার মুখে তাহার যে শক্তি ও সম্পদ প্রকাশ পাইয়াছে, শরৎচন্দ্র তাহারই আরতি করিয়াছেন। ইহাই সে সাহিত্যের রস। যাঁহারা সে রসের রসিক নহেন, এবং যাঁহারা বাঙালী-জীবনের সেই ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা এই একান্ত বাঙালী-প্রাণ ও বাঙালী-প্রতিভার গৌরব নির্দ্ধারণ করেন বিদেশী সংস্কার ও বিদেশী চিন্তাপদ্ধতির আদর্শে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যাহাকে প্রাচীন সংস্কারের মোহ ও দুর্ব্বলতা বলিয়া তাঁহারা নাসাকুঞ্চিত করেন, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকার চরিত্র-মহিমার মূলে আছে সেই সংস্কারের দুর্ল্লঙ্ঘ্য শাসন। সকল জাতির মানুষের পক্ষেই সামাজিক বা নৈতিক সমস্যার একটা সাধারণ রূপ আছে; কিন্তু চিন্তা বা জ্ঞানের দিক দিয়া যাহা সার্ব্বভৌমিক, প্রাণের দিক দিয়া তাহা এক নহে। এই প্রাণের দিকই সাহিত্যের দিক, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নরনারী সমস্যা-পীড়িত আন্তর্জ্জাতিক নরনারী নয়; তাহা যদি হয়, তবে তিনি সাহিত্য রচনা করেন নাই—সমাজতত্ত্ব লিখিয়াছেন; এজন্য যাঁহারা Karl Marx ও Bertrand Russel, Bernard Shaw ও Aldous Huxley-র নামাঙ্কিত শীলমোহরের ছাপ দিয়া শরৎ-সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করেন, তাঁহারা শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়াই তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বক্তব্য ইহাও নহে; বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমি এই একটি কথাই বলিতে চাই যে, আধুনিক যুগসঙ্কটের ছায়ায় গত যুগের বাঙালী-সমাজের একটি প্রাণগত পরিচয় শরৎ-সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্র প্রাণে-মনে সেই গত যুগেরই বংশধর; তাঁহার রচিত সাহিত্যে আমরা একটা বিলীয়মান যুগের বাঙালী-সভ্যতা, বাঙালী-সমাজ এবং সেই সমাজের শক্তি ও অশক্তির যে মর্ম্মান্তিক লিপিচিত্র পাইয়াছি, তাহাই বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

সাহিত্যিকের অন্তর্জীবনের উপর বাহিরের জীবনযাত্রার প্রভাব যে আছে, তাহা আমরা জানি ; কিন্তু সেই প্রভাব যে কত বেশি হইতে পারে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবনের শেষভাগে তাহার স্পষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়াছি। শরৎচন্দ্র কখনও পুঁথিবিদ্যা, তত্ত্ব ও মতবাদের—এক কথায় পাণ্ডিত্যজীবী—মানুষ ছিলেন না ; তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার উন্মেষ ও পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল—আমি তাহাকে বলিয়াছি তান্ত্রিক সাধনা,—জীবনেরই ঘাটে বাটে, প্রান্তরে শ্মশানে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সাধনায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মন তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই, নিজের অনুভূতিশক্তির ঐকান্তিকতার জন্যই, তিনি যেন তাহার বিপরীত সাধনার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন। এইজন্য যখন তাঁহার জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, জীবন হইতে পুঁথির জগতে প্রবেশ করিবার সুযোগ বাড়িল, তখন হইতেই তাঁহার স্বকীয় সাধনার আসন বিচলিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভার খ্যাতিই তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে যে পণ্ডিত ও পণ্ডিতম্মন্য কেতাবী ভক্তের দল সৃষ্টি করিল, তাহাদের সঙ্গে তাঁহার সেই প্রতিভাই তাল রক্ষা করিতে গিয়া নিজের ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়াছে। যে সহজাত প্রত্যক্ষ-দৃষ্টির ফলে কবিগণ পণ্ডিতের গুরুস্থানীয় হন, শরৎচন্দ্র যেন সেই গুরুর অধিকার ত্যাগ করিয়া পণ্ডিতের শিষ্যত্বকামী হইয়া উঠিলেন। তাহার ফলে, তাঁহার শেষ রচনাগুলিতে জীবনের সম্বন্ধে সেই সহজদৃষ্টি আর নাই, সমাজবিজ্ঞান এবং ব্যক্তিধর্ম্মের নানা কূট-কঠিন প্রশ্ন-মীমাংসায় তাঁহার অনুভূতি-কল্পনা নিয়োজিত হইয়াছে—তাঁহার সম্মুখে নারীশক্তির প্রতীক সেই অন্নদাদিদির চিরন্তনী জীবনরহস্যময়ী মূর্ত্তি আর নাই ; তাহার স্থানে সকল হৃদয়-রহস্যের প্রতিবাদ-স্বরূপিণী, কেতাবী-বিদ্যার নির্য্যাসভাষিণী আধুনিক ছিন্নমস্তার রূপ বিরাজ করিতেছে। শরৎচন্দ্রের সেই লিপিকুশলতাও তখনও আছে—এ সকল রচনাতেও প্রতিভার সেই স্বাক্ষর মুছিয়া যায় নাই ; কিন্তু এ শরৎচন্দ্র সে শরৎচন্দ্র নয়, জীবন-সাধক তান্ত্রিক এখন ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছেন। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের প্রতিভার এই নিবর্ত্তনকে পূর্ণতর বিকাশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই ; আমি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার সম্বন্ধে বলিতেছি——অন্যবিধ শক্তির সম্বন্ধে নয়। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতর সাহিত্যিক কীর্ত্তি কোন্‌গুলি, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনও রসিক-সমাজেই সন্দেহের অবকাশ নাই, ও

থাকিবে না। জর্জ এলিয়টের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে যে কথা সর্ব্ববাদিসম্মত, শরৎচন্দ্রের বইগুলির সম্বন্ধে তাহা আরও সত্য।

তথাপি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি ক্রমে মন্দীভূত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার রচনাশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন ধন্য বলিতে হইবে। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব এই দুইয়েরই মধ্যে একটি সার্থক নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিক জীবনই ছিল; তিনি যেমন আমাদের জন্য একেবারে প্রস্তুত অন্ন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনই সেই অন্নের শেষ কণাটি বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লইয়াছেন। এমন পুণ্যবান সাহিত্যিক আমরা অল্পই দেখিয়াছি।

[জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭]

কবি করুণানিধানের কবিতা

কবি করুণানিধানের কাব্য আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। কিছুকাল হইল কবির কবি-জীবন প্রায় অবসিত হইয়াছে, এজন্য তাঁহার কবিমানস ও কাব্যকীর্ত্তিকে সমগ্রভাবে বুঝিয়া লইবার পক্ষে এখন আর কোন সংশয়ের হেতু নাই। ইতিমধ্যে 'শতনরী' নামে কবির একখানি সুনির্ব্বাচিত কবিতা-সংগ্রহও প্রকাশিত হইয়াছে; এজন্য পাঠক-সাধারণের পক্ষেও এবিষয়ে সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু করুণানিধানের কাব্য-আলোচনার ভূমিকা-স্বরূপ—আমি এইরূপ আলোচনার প্রয়োজন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে—সাধারণভাবে দুইচারি কথা বলিয়া লইতে চাই।

আমাদের দেশে সাহিত্য-সৃষ্টির একটা যুগ শেষ হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার কোনও একটা আদর্শ বা পদ্ধতি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ অবস্থায় সমালোচকের নিজ সমালোচনা-পদ্ধতির একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় অনাবশ্যক হইবে না। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনায় নানা কারণে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। কাব্য বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি, সমালোচনা অর্থেই বা ঠিক কি বুঝায়, তাহার একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা ভালো। কবির নিকটে আমরা ন্যূনতম কি প্রত্যাশা করি—কবি যত বড় বা ছোট কবি হউন, তাঁহার কাব্যে সত্যকার কবিত্ব আছে কি না, তিনি আদৌ কবি কিনা—তাহার নির্ণয় হয় কিসে, এ সম্বন্ধে একটা ভূমিকার প্রয়োজন আমাদের দেশে এখনও আছে। আমাদের দেশে এ যুগে কাব্য ও কবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু কবিতা-লেখক হইলেই কবি হয় না,—বড় কবি, মাঝারি কবি, ছোট কবি বলিয়া একটা শ্রেণীবিভাগ করিয়া এই সকল লেখককে যে-কোনও একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া কবি-নামে অভিহিত করিলেই এ সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, একথা ভুলিলে চলিবে না, কোনও লেখকের পক্ষে কবিপদবাচ্য হওয়াটাই তাঁহার প্রতিভার প্রথম ও প্রধান পরিচয়; এ বিষয়ে যদি ভুল হয়, তবে গোড়ায় গলদ ঘটিবে। আশা করি, করুণানিধানের কাব্য-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি সে ভুল করি নাই।

রসিকসমাজেও কাব্য-রস-আস্বাদনে একটা বিঘ্ন আছে; ব্যক্তিগত রুচি বা মানস-প্রকৃতির পক্ষপাত, বিশিষ্ট চিন্তা বা বিশ্বাসের প্রভাব, কাব্যরস-আস্বাদন কালেও অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকে। কাব্যরস-আস্বাদনে এই ব্যক্তিগত রুচিভেদে হয়ত ত' আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু কাব্য-সমালোচকের পক্ষে উদার ও অসাম্প্রদায়িক রসবোধের বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক কবির কল্পনায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে; তাই বলিয়া যদি কবিবিশেষের এইরূপ বৈশিষ্ট্যের পক্ষপাতী হইতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে—যে সাধারণ রস-প্রমাণ সকল কাব্যেই বিদ্যমান থাকে, সমালোচক সেই বস্তুর সন্ধান রাখেন না। এইখানে কবির কবিত্ব সম্বন্ধে ধারণাটা একটু স্পষ্ট করিয়া তোলা ভালো। কাব্যমাত্রেরই যে সাধারণ রস-প্রমাণের কথা বলিয়াছি—যাহা কোনো বিশেষ কাব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তাহাকে যখন 'কবিত্ব'রূপে উপলব্ধি করি, তখন একটা কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই,—এই রস নির্ব্বিশেষ বলিয়াই, প্রত্যেক কবির কাব্যে ইহা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যই কবিবিশেষের 'কবিত্ব'। অতএব কোনও বিশেষ ধরণের কবিত্বের পক্ষপাতী হইলে, এই রসকেই অস্বীকার করিতে হয়। সত্যকার রসিক ব্যক্তির চিত্তে এই রসজ্ঞান আছে বলিয়াই তিনি সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্যের অনুরাগী। এই দিক দিয়া আর একটু অগ্রসর হইলেই এই 'কবিত্বের' প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িবে। কবির এই যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, ইহাই কাব্যের মৌলিকতার কারণ; এই মৌলিকতাই যে কবি-শক্তির প্রধান লক্ষণ ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই মৌলিকতা অনুভব করিলেও, বিচারকালে আমরা একটা ভুল করিয়া বসি। এ মৌলিকতা কবিতার ভাববস্তুর উপর নির্ভর করে না—ওই ভাবানুভূতির যে ব্যক্তিগত ভঙ্গি, কবিতার ভাষায়, ছন্দে, শব্দযোজনায়—কাব্যের আকারে ও প্রকারে ধরা পড়ে, তাহাই তাঁহার মৌলিকতা। অতি-সাধারণ বহু-পরিচিত ভাব-বস্তুকে আশ্রয় করিয়াও যে একটি বিশিষ্ট প্রাণ-মনের পরিচয়, রঙে ও রূপে, ভাষায় ও ছন্দে মূর্ত্তি ধারণ করে—কাব্যের diction ও technique-এর অন্তর্গত সেই personality, সেই style-ই—কবিত্ব-রস-আস্বাদনের প্রধান সহায়। এই অনুভূতি যে কাব্যে যত গভীর ও ব্যাপক হয়—জীবনের যতখানি একসঙ্গে ধরা দেয় ও তাহার জটিল বিস্তার একটি

ভাবৈকরস বাণীরূপে প্রকাশ পায়—সে কাব্য তত বড়। কিন্তু কবিত্বের আলোচনায় এই বড়ত্বের কথাই প্রথমে আসে না। কারণ অনুভূতি যেমনই হউক, তাহাকে যথাযথ প্রকাশ করিতে পারাই কবি-প্রতিভা; এবং অনুভূতির আবেগ সত্য ও সুগভীর না হইলে ভাষায় ও ছন্দে সেই বস্তু ফুটিয়া উঠে না, যাহাকে আমরা 'কবিত্ব' বলি। যে কাব্যে সেই বাণীরূপ নাই তাহাতে ওই অনুভূতির সত্যও নাই; সে রচনায় যদি কোনও ভাব-চিন্তার সমাবেশ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তাহা লেখকের নিজস্ব নয়; সে ভাববস্তু লেখকের কবিজনোচিত অনুভূতি-প্রসূত নয়। অতএব, কবির ভাব-গৌরব বা চিন্তাশীলতাই কবিত্ব নয়—সে ভাব, সে চিন্তা যত গভীর, সূক্ষ্ম বা উচ্চ হউক, এমন কি, মৌলিক হউক—তাহা কবিত্ব নয়। এই কথাটি বুঝিয়া লইলে, কাব্য-আলোচনায় কোনও অবান্তর আদর্শ প্রশ্রয় পাইবে না। অবান্তর আদর্শের উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, অনেকে যেমন সঙ্গীত উপভোগ করিতে বসিয়া, সুর অপেক্ষা কথার কবিত্ব প্রত্যাশা করেন, তেমনই অনেক তথা-কথিত কাব্য-রসিক কবিতায় ভাবের বাণী-রূপ অপেক্ষা—ভাবের ভাবুকতা, তত্ত্বজ্ঞানের ভাবাবেশ, অথবা সূক্ষ্মচিন্তাশক্তির বাহাদুরী প্রত্যাশা করেন।

কাব্য আস্বাদনের বস্তু, আলোচনার সামগ্রী নয়—একথা সত্য; তথাপি কাব্য-আলোচনা অন্যবিধ আলোচনার মত নয়, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বিদেশী সমালোচকের একটি উপমা কাজে লাগিবে। আকাশে ইন্দ্রধনুর পাশে যেমন আর একটি ছায়া-ইন্দ্রধনু দেখা যায়—তাহা দ্বারা প্রধান ধনুটি দ্বিগুণিত হইয়া যেমন আরও বেশী করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কাব্যের পাশে কাব্য-সমালোচনাও সেইরূপ। কাব্যসৃষ্টির পাশে পাশে সমালোচকের রসবোধ—কাব্যগত কবি-প্রেরণার সাহায্যেই—তাহার যে প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করে, এবং তাহার দ্বারা মূল কাব্যসৃষ্টিকে আরও ভাস্বর করিয়া তোলে—তাহারই নাম কাব্য-সমালোচনা। এইরূপ আলোচনায়, কাব্যে ঠিক যতটুকু যেখানে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অধিক কিছু অনুমান করা—যাহা কবি প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, সমালোচকের নিজ কল্পনাবলে সেটুকু পূরণ করিয়া কবিকে একটা অতিরিক্ত গৌরবের অধিকারী করাও যেমন অন্যায়, তেমনই, কবি যেটুকু যে ভাবে আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন তাহার অধিক রস-প্রেরণা দাবী করাও অসঙ্গত।

করুণানিধানের কাব্যে আমরা তাঁহার সেই কবিত্বের সন্ধান করিব। যে ভাষা ও ছন্দ-সৌষ্ঠবে বাণীর রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, ভাব শরীরী হয়—যাহার অভাবে একের অনুভূতি অপরের নিজস্ব হইয়া উঠে না, করুণানিধানের কাব্যে ভাষা ও ছন্দের সেই অমোঘ সৌষ্ঠব সর্ব্বাগ্রে পাঠকের হৃদয়গোচর হয়। কবি যেন মূর্ত্তিমতী বাগ্‌দেবতার আরাধনায় তন্ময় হইয়া, প্রকৃতির রূপ-ভাণ্ডার হইতে বর্ণালোক আহরণ করিয়া, অতি ধীরে সংযত হস্তে সুনিপুণ তূলিকাক্ষেপে বাগ্‌দেবতার বেদী-পট্ট অলঙ্কৃত করিতেছেন। বাক্য ও ছন্দের এই সৌন্দর্য্যস্পৃহা তাঁহার কবিহৃদয়ের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যানুভূতির পক্ষে যতখানি স্যার্থক হইয়াছে, তাহাই তাঁহার কাব্যের রস-প্রমাণ। আমরা প্রথমেই করুণা-নিধানের এই বাণী-সাধনার পরিচয় দিব। তাঁহার কবিতায়, ভাষার এই নির্ম্মাণ-কৌশলে যেন তিনটি ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে—ফুলের ন্যায় কোমল নির্ম্মল, পরিপক্ক ফলের ন্যায় নিটোল ও রসোচ্ছল, এবং মণিগণের মত দৃঢ়সংহত দীপ্তিমান্। এই তিনেরই কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) স্বপ্নসম তার কাহিনী
আজ্‌কে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে—
নোনা-আতার সোনার গায়ে
রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে ;
দূর্ব্বা-শ্যামল নিম্বতল,
দীপ্ত নভো নীলোজ্জ্বল,
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙে
গাঙের বুকে স্তরে স্তরে !

('দ্বিপ্রহরে'—শতনরী, পৃঃ ২-৩)

মেয়েটি মোর আগ, বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে র'বে দ্বারে,
দোপাটি-ফুল খোঁপায় পরে'
সাঁঝের আঁধিয়ারে ;
কাজল-দেওয়া চক্ষুদুটি
আদর-দোলে উঠবে ফুটি,
'ফণী-মনসা'র বেড়ায়-ঘেরা
'দুর্গাদীঘি'র ধারে।

শিউলি-ফুলের গন্ধে যাবে
সন্ধ্যাখানি ভরে',
জ্যোৎস্নাধারা পড়বে ঝরে'
দূর দেউলের 'পরে ;
অঙ্গ মাজি' দুধের সরে,
ঘাটটি হ'তে ঘটটি ভরে'
সই-এর সাথে গৃহিনী মোর
আসবে ফিরে ঘরে।

('বাসনা'—শতনরী, পৃঃ ৯-১০)

(২) কোটি বন-ফুল অঙ্গে দোদুল,
কত রঙ শোভা আলো ;
দ্বিপ্রহরের ঝিল্লীর তান
শুনিছে পাষাণ কালো!
স্বপন দেখিছে ভূর্জ্জ-বনানী
সবুজ টোপর পরি',
ঝর্ণা-তলায় ঝরিছে কাহার
রতনের শতনরী।



('হিমাদ্রি'—শতনরী, পৃঃ ৯৩)

(৩) কার আলিঙ্গন-আশে অনুরাগ-রসোল্লাসে
হে বরবর্ণিনী,
ধাও রঙ্গে কলস্বরা পারাবার-স্বয়ম্বরা
বিন্ধ্যের নন্দিনী ?
কোথা মাহীষ্মতী পুরী?—মর্ম্মর-সোপানোপরি
রাজ-অঙ্গনার
বিলাসের মৃগমদে দৃপ্ত পদ-কোকনদে
চকিত-ঝঙ্কার!
পৌর্ণমাসী অর্দ্ধরাতে, জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রালসে
অলিন্দের 'পরে—
দ্রাক্ষারসে টলমল স্বর্ণপাত্রে শশি-বিম্ব
চুম্বিত অধরে!

আবর্ত্ত-শোভন নাভি, অলঙ্কৃত কটি-তট
হংস-মেখলায়—
কোথায় রূপসী রেবা, ভুলাইলে কালিদাসে
যৌবন-বিভায় ?

('রেবা' —শতনরী, পৃঃ ১১৬)

উপরে যে বিচ্ছিন্ন শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা দ্বারা, আমি করুণানিধানের ভাষায়—তাঁহার diction-এর মধ্যে—যে শব্দ ও ছন্দ-গত রূপোল্লাস সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যায়, তাহারই আভাস দিয়াছি। এই শ্লোকগুলিকে যে তিনভাগে ভাগ করিয়াছি তাহার সবগুলিতে স্টাইল একই, কিন্তু শব্দ-যোজনার রীতি এক নয়, এবং ছন্দও ত্রিবিধ। কিন্তু সর্ব্বত্র বাণীকে সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রয়াস, এবং বিষয়ভেদে ভাবানুভূতির বিশিষ্ট আবেগকে অনুরূপ ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করিবার প্রেরণা সার্থক হইয়াছে। সকল কাব্যে ইহাই কবিত্বের লক্ষণ; কিন্তু করুণানিধানের কাব্যে ভাষার এই সৌষ্ঠব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কাব্য-পাঠকালে মনে হয়, শব্দের অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত বর্ণে ও গন্ধে তাঁহাকে মুগ্ধ করে। ভাষা সম্বন্ধে এই অতিরিক্ত সচেতনতার জন্য তাঁহার কাব্যে ভাবের প্রাবল্য অপেক্ষা, সৌকুমার্য্য ও কোমলতাই সমধিক সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু কবি এই যে ভাষা নির্ম্মাণ করিয়াছেন—শব্দের বর্ণ, গন্ধ ও স্বর, এই তিন উপাদানকেই তিনি যে কৌশলে বশ করিয়াছেন, তাহা কি কেবল বাণী-চর্য্যার ফল? তাঁহার ভাষার এই অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য—কল্পনা ও আবেগবিরহিত শব্দচাতুরীই নয়; ইহা একরূপ রস-বিলাস হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাব্য-বিরোধী নয়। কারণ, (কোন ভাষাই সুন্দর হইতে পারে না, যদি তাহার মূলে ভাবাবেগ না থাকে; যদি ছন্দই এ ভাষার সর্ব্বস্ব হইত, তবে সে সন্দেহের কারণ থাকিত;) কিন্তু যে-রচনার ছন্দ ও ভাষা এমন সুসঙ্গত, তাহার অন্তরালে যে একটা কবি-মানস আছে—একটা mode of perception আছে, তাহা অস্বীকার করিলে রসবোধকেই সঙ্কুচিত করিতে হয়। করুণানিধানের ভাষার এই অনবদ্য চারুতা তাঁহার কবি-প্রকৃতির কোন্ গুণে ঘটিয়াছে এইবার তাহাই দেখাইব। তাঁহার কাব্যে প্রধানতঃ, কোথাও প্রকৃতির রূপরাশি—শব্দচিত্রে, কোথাও বা সেই রূপ-সম্ভোগের আনন্দ—ছ

উৎসারিত হইয়াছে। প্রথমে ইহারই আলোচনা করিয়া পরে, তাঁহার কাব্যে এই প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া-মূলক যে পরিণতির আভাস আছে, সে সম্বন্ধে বলিব। তাহার কবিতার যে মূল প্রেরণার কথা বলিয়াছি, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(১) যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে
হেথা-হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক,
মাধবীলতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক!
(শতনরী, পৃঃ ১)

(২) নাচিছে দামিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে
(শতনরী, পৃঃ ১৩)

(৩) হের সখি সেই দিনান্ত-তারা
তেমনি জ্বলে—
ডালিম-ফুলের রঙ্‌টি ফলানো
মেঘের কোলে!
(শতনরী, পৃঃ ২৫)

(৪) শ্বেত বিজুলী নিথর হয়ে
ঘুমিয়েছে ওই মূর্ত্তি লয়ে—
শিথানে তার উজল ঢেউএর সারি;
ছাড়িয়ে ঐ উষার তারা
সাম্‌নে নেমে আস্‌ছে কারা?—
কটাক্ষেতে স্ফটিক হ'ল বারি!

* * *

হেরব রূপের নীলাম্বরে
বিরাট শিখী কলাপ ধরে,
তারায় তারায় বরণ-শোভা জাগে!
('কাঞ্চনজঙ্ঘা'—শতনরী, পৃঃ ১০২-৪)

(৫) সাম্‌নে হেরি সুনীল বারি
তালীবনের ফাঁকে,
গেরুয়া-রঙ্‌ ভাঙা মাটি
ঢালু পথের বাঁকে ;
ঝর্ণা-ঝালর পড়ছে ঝরি'
শ্যামল তরু-পর্ণ 'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে
কালো পাথর ঢাকে।
('ওয়ালটেয়ারে'—শতনরী, পৃঃ ১১৯)

—এরূপ অনেক আছে। এ সব পড়িতে পড়িতে কার না মনে হয়, যে এই ভাষা ও ছন্দ কবির অন্তরের আনন্দকে মূর্ত্তি দিবার প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছে? ইহা কেবল বস্তু-বর্ণনা নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর যথাযথ অনুচিত্রণ নয়,—ইহা প্রকৃতি-প্রেমিক কবির প্রিয়া-রূপ-বন্দনা। এক প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচকের ভাষায় —"It is love of this kind that gives true significance to the poetry of nature, for only by its alchemy can the thing seen become the symbol of the thing felt." এই ধরণের প্রকৃতি-প্রেম বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ নূতন। প্রকৃতির রূপ-সম্ভোগে কবির যে আবেগ এই সকল চিত্ররচনা করিয়াছে, সেই আবেগ-মূলক কল্পনা কয়েকটি কবিতায় সৌন্দর্য্যের যে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছে, এখানে তাহারও কিছু পরিচয় আবশ্যক। ('শেফালী'-শীর্ষক কবিতায়, একটি বালিকার মৃত্যুতে কবি যে শোক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও এই প্রকৃতিরই মাধুরী করুণ-সুন্দর হইয়া যে রস সঞ্চার করিয়াছে, তাহা ইংরেজী যে কোনও উৎকৃষ্ট Dirge-কবিতার অনুরূপ।—)

ওই যে ওখানে অভ্র-রজত
স্রোতটি বহিয়া যায়,
উহারি পুলিনে কোথায় শেফালী
লুকায়েছে বালুকায়।
একেকটি করে' তারা জ্বলে জলে,
চাঁদের রূপালি হাসি পড়ে ঢলে',
কাঁদে গো তটিনী ছল-ছল-ছলে
অফুরাণ বেদনায়।
('শেফালী'—শতনরী, পৃঃ ১২)

'স্বপ্নলোকে' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না—

হেথায় তারা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যোৎস্না-মাঝে,
গিরি-দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন-ঝালর
ধূসর পাষাণ-সিঁথির তটে—
অস্ফুট-ভাষে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে।
তাদের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধ হারায় গোলাপ, বেলা—
কে অপ্সরী সারঙ্ বাজায়,
কি অপরূপ সুরের খেলা!
নিদাঘ-রাতে রাখাল-ছেলে
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে,
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের
গুঞ্জরিছে গিরির কোলে;
তন্দ্রা ভেঙে দেখে তাদের—
দূর আকাশে মিলিয়ে যায়,
পাথায় ঝরে সোনার রেণু
জ্যোৎস্না-মাখা মেঘের গায়।

আর একটি কবিতায় করুণানিধানের কবি-প্রেরণার অতি সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে। কবিতাটির নাম 'সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি'। নাম শুনিয়া অনেকেরই ইংরেজ কবি Collins-এর বিখ্যাত Ode to Evening কবিতাটি মনে পড়িবে। কিন্তু করুণানিধানের 'সন্ধ্যালক্ষ্মী' তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীরই প্রতিচ্ছবি; ইহাতে Collins-এর মত কল্পনার প্রসার নাই, সন্ধ্যার বিচিত্র ভাবোদ্বোধনী চিত্র-পরম্পরা ইহাতে নাই। ঊর্দ্ধে সন্ধ্যা-রঙ্গীন নভস্তল, ও নিম্নে ধরণীর কানন-শোভা—ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সন্ধ্যা তাহার 'রঙের ইন্দ্রজালে' কবির নয়ন ভরিয়া দিয়াছে। করুণানিধানের প্রকৃতি-প্রেম ও রূপ-রসাবেশের মধ্যে যে সরল

প্রীতিপিপাসু কবি-প্রাণের আকুতি আছে, এই কবিতার নির্ম্মল গীতি-স্রোতে তাহাই উৎসারিত হইয়াছে। কবিতাটির কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।—

তোমার আলো সব ভুলালো
লো অমরী বালা!
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি,
চুলের তারার মালা।

* * *

অলক-ঢাকা কোমল পলক,
নয়ন গরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার
চুলের সুরভি।
কোহিনুরের টীপটি ভালে,
কাণে রতন-দুল—
বরণ-কালের তরুণ বধূ,
রে দুলালী ফুল!
এস নেমে আমার ঘরে
তালী-বনের তলে,
এস মানস-নন্দিনি মোর,
এস আমার কোলে!

'স্বপ্নলোকে' কবিতাটির গঠন আরও অনবদ্য, তাহাতে ভাবের রূপটি কয়েক পংক্তির মধ্যেই সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ কবিতায় আমরা, ভাবের সূক্ষ্ম তন্তুজালের উপরে, রূপ-লক্ষ্মীর অতিপেলব ক্ষণ-বিলীয়মান বর্ণ-সুষমাকে সন্ধ্যালক্ষ্মীর চুলের তারার মত চঞ্চলিয়া উঠিতে দেখি। এখানে রূপের পরিস্ফুটতা নাই, কিন্তু চিত্রার্পিত আলো-ছায়ার মোহিনী আছে। এই প্রসঙ্গে কবির রূপসন্ধানী দৃষ্টির উদাহরণস্বরূপ সন্ধ্যালক্ষ্মীর 'চেলীর ঝিলিমিলি' লক্ষ্য করিতে বলি। কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

সোনার শলাকা বুনিত গগনে রেশমী বসন স্তর—
অস্ত-তপন মুদিত নয়ন মহুয়া-বীথির 'পর। (শতনরী, পৃঃ ১৪৩)

গোধূলি-আকাশের স্তিমিত অথচ তরলোজ্জ্বল আলোক-নিশান যাঁহাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহারা এই বর্ণনার সূক্ষ্মতা ও যথার্থতা উপলব্ধি করিবেন।

এই সকল কবিতায় কবির অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে সৌন্দর্য্যের যে স্বপ্নাবেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—মনে হয়, তাহাই আর একটু ঘোরালো হইয়া তাঁহার কাব্যে একটা অস্পষ্ট রহস্য-লোকের ছায়াপাত করিয়াছে। সেখানে কবিতার ভাষা স্পষ্ট নয়; কেবল একটা ভাবের সুর আছে—রঙ, রূপ, সব যেন একাকার হইয়া গেছে। সে যেন কবি-প্রাণের নিশুতি-নিশীথের অস্ফুট গুঞ্জরণ; যে প্রকৃতি-প্রেয়সী তাঁহাকে রূপের কুহকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর এক মূর্ত্তি যেন ইন্দ্রিয়-জগতের ওপার হইতে আর এক ভঙ্গিতে তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। এই আলো-ছায়ার পারে, জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত-দেশে, অকূল-অচিহ্নিতের মোহানায় তাহার প্রাণ যেন থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, রূপ-সৌন্দর্য্যের সুস্পষ্ট অনুভূতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়—'পথের জ্যোছনা ভুলায় আমারে, কাঁপে প্রাণ-পারাবত'। উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিলাম।—

এইখানে সে কখন এসে
স্মৃতির লিপি গেছে ফেলে—
অন্ধকারের আল্‌পনাতে
জ্বল্‌জ্বলে তার নয়ন মেলে।
শেষমিনতি শেষ-তৃষাতে
পাইনি নাগাল আকুল হাতে;—
রূপ হারালো রূপের লীলা
বন-পলাশে আলোক ঢেলে।

(শতনরী, পৃঃ ৫৮)

* * *

নেহারিলাম পাষাণ হ'য়ে যায় সে তনু,
নিক্ষেপিছে কটাক্ষ-শর ভুরুর ধনু।
ননী-কোমল বক্ষ গেছে মাণিক হয়ে,
হীরার গুঁড়া পড়ছে ঝরি' কপোল ব'য়ে!
চল্‌তে নারি অচিন-পথে,—তরুর শাখে
জড়িয়ে বসন বাঁধ্‌সু মোরে শতেক পাকে।

(শতনরী, পৃঃ ২২০)

কারা যেন আসে সরে'
অশ্রুকণা বিদ্ধ করে'—
 চোখে পড়ে মুখের আদল ;
নিবন্ত চাঁদের ফালি,
গলে' পড়ে জ্যোৎস্না-কালি,
 প্রহরেরা ছায়ায় পাগল।

* * *

পূর্ণিমার কোন্ পারে
ডাকে যেন কে আমারে
 সুপ্ত অজগর রাত্রি-রূপ ;
মৃত্যু সে চুম্‌কি-প্রায়
ঝিকিমিকি' নিবে যায়,—
 প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চুপ।

—('শেষ'—ধানদূর্ব্বা)

এই সকল কবিতায় কবির স্বভাবসিদ্ধ রূপপিপাসা যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে, একটা প্রশ্ন-কাতর উৎকণ্ঠা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে। ইহাতে মিষ্টিক্-ভাব নাই, বরং প্রাণের একটা জ্ঞান-সঙ্কটের পরিচয় আছে ; করুণানিধানের কবি-প্রকৃতির পক্ষে মিষ্টিক-ভাবাবেশ অসম্ভব বলিয়াই, রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্বে শেষে তাঁহার কাব্য-প্রেরণা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এই কবিতাগুলিতে তাহারই সূচনা আছে। আমি পরে কবিমানসের এই দিকটির আলোচনা করিব।

এইবার করুণানিধানের কাব্য-প্রেরণার যে অপর ভঙ্গি তাহার পরিচয় দিব। এই ভঙ্গি পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহার কবিতার ছন্দ-লীলায়। এখানে কবিতার ভাষা ও ছন্দের কথা কিছু বলিব। সঙ্গীতের ভাব রূপ পায় সুরে ; সঙ্গীত নির্ব্বাক, কাব্যের বাহন ছন্দোবদ্ধ বাণী। কবির আনন্দ গীতিকারের আনন্দ হইতে ভিন্ন ; সঙ্গীতে অতল অসীম অরূপকে ভাবের নিরাকারেই হৃদয়-গোচর করা হয় ; ইন্দ্রিয় সেখানে মন-বুদ্ধির স্পর্শ-শূন্য হইয়াই চরিতার্থ হয়, সুরই রস-সৃষ্টি করে। কাব্যের ছন্দ বাণী হইতে পৃথক নহে ; বর্ণের অন্তরালে আলোকের মত—অনুভূতির মূলে যে আবেগ আছে, বাণীর একটি অঙ্গরূপে ছন্দ তাহারই দ্যোতনা করে।

কাব্য-সরস্বতীর এক চরণ যেমন বাণীর উপরে, অপর চরণ তেমনই ছন্দের উপরে স্থাপিত। এইজন্য সঙ্গীতের সুর এবং কবিতার ছন্দ ঠিক এক নহে ;) সুর আর কিছুর অপেক্ষা রাখে না, ছন্দ বাণীর অনুগত,—ভাবকে রূপ দিবার পক্ষে বাণীর সহায়তা করে। কাব্য ও সঙ্গীতকলার মধ্যে এই পার্থক্য আছে বলিয়াই এমনও দেখা যায় যে, যে-কবি উৎকৃষ্ট ছন্দ-বোধের অধিকারী, সঙ্গীতকলায় তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমাদের মধুসূদন যে ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের চরম বলিলেও হয় ; কিন্তু সঙ্গীতকলায় তাঁহার কোনও অধিকার ছিল বলিয়া আমরা জানি না। ইংরেজ কবি শেলীর মত ছন্দ-প্রতিভা অল্প কবিরই দেখা যায়, কিন্তু শেলীর সঙ্গীত-কলায় অধিকার থাকা দূরের কথা—অনুরাগ-ও ছিল না। অতএব, ছন্দকে যাঁহারা, সঙ্গীতের সুরের মত মনে করিয়া, কাব্য হইতে পৃথক করিয়া তাহার বিচার করেন, অথবা, ছন্দ-গৌরবকেই কাব্য-গৌরব হিসাবে উপভোগ করেন, তাঁহারা এই দুই বিভিন্ন কলার মধ্যে গোল বাধাইয়া কোনটারই মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। ছন্দ কবিতার প্রসাধন বা অলঙ্কার নয়—ছন্দ কাব্যেরই অঙ্গ ; বাণী ও ছন্দ উভয়ে মিলিয়া প্রত্যেক কবিতাকে তাহার ভাবানুযায়ী রূপ-বৈশিষ্ট্য দান করে। ছন্দ যেখানে বাণীর অঙ্গ হইয়া উঠে নাই, সেইখানেই আমরা কাব্যের কৃত্রিমতা অনুভব করি। যেখানে ভাষা ও ছন্দের এই একাত্মতা ঘটে নাই, সেইখানেই সত্যকার কবি-প্রেরণার অভাব ধরা পড়ে। এই দুইএর মিলন না হইলে রচনা 'কাব্য' হইয়া উঠে না।

কিন্তু কাব্যে ছন্দের স্থান এইরূপ নিরূপিত হইলেও, গীতিকাব্যে ছন্দের অধিকার কিছু অধিক হইতে পারে। আবেগ যেখানে অধিক, অনুভূতির মূলে আবেগ যেখানে প্রবল, সেখানে সেই নিছক আবেগ ছন্দ-লীলায় কতকটা মুক্তি পাইতে চায়। ভাব যেখানে গদগদ-কলভাষা আশ্রয় না করিয়া পারে না, সেখানে ভাবের রূপ কিছু অধিক পরিমাণে ছন্দের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সেখানেও দেখা যাইবে যে, শব্দ-যোজনায় ছন্দের আধিপত্য থাকিলেও ভাষাই যেন ছন্দোময় হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখা যাইবে যে, যে ভাবাবস্থা চিন্তালেশহীন প্রীতি-বিহ্বলতার ফল, কেবল সেই ভাবাবস্থাই এইরূপ ছন্দ-লীলায় সার্থক হইতে পারে। এরূপ অনেক কবিতা পাঠকের স্মরণ হইবে, যাহা ছন্দ-হিল্লোলে শ্রুতিমধুর হইলেও চিত্ত জয় করে না ; তার কারণ সে গুলিতে কবির ভাবাবেশ অপেক্ষা ছন্দ-নিষ্ঠাই

প্রবল।) হৃদয় যেখানে ভাবের আবেশে নৃত্য করে, সেখানেই কবিতার এই ছন্দ-লীলা সার্থক হয়।

করুণানিধানের যে কবিপ্রকৃতির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আমরা পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কাব্যে এইরূপ ছন্দলীলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ছন্দের উচ্ছলতা তাঁহার প্রায় সকল কবিতায় আছে, তথাপি কতকগুলি কবিতায় বিশেষ করিয়া এই ছন্দের উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। আমি উপরে গীতি-কবিতার ছন্দ-প্রাধান্য যে হিসাবে সমর্থন করিয়াছি, সেই হিসাবে সর্ব্বত্র এই ছন্দ-লীলা সার্থক না হইলেও, অনেক স্থলে ছন্দই কবির ভাবাবেগের বাহন হইয়াছে—কাব্যলক্ষ্মীই যেন 'আনন্দ-কাঁকন' বাজাইয়াছেন।

(১) আমি, পড়িনু আদি-কাব্যখানি তার সে যাদু-ইঙ্গিতে,
ফোটে স্বর্ণ-ভাতি তার শ্রীমুখের ভঙ্গীতে;
কাঁপে লক্ষ যুগের পদ্ম ফোটা ঠোঁট দুখানি থরথরি'—
সে যে চুম দিল রে পঞ্চশরে জয় করি'!

(শতনরী, পৃঃ ৫৭)

(২) ওরে, খোল্ অর্দ্ধেক উন্মীল চোখ, অঞ্জন আর কাজ নেই,—
ওলো আল্তায় লাল পা'র তল তোর, মঞ্জীর ঠিক বোলবেই।
এল উৎসব-লগ্ন,
আধ'-তন্দ্রায় মগ্ন
জাগে বল্লভ তোর বক্ষের ঠাঁই—ধ্যান-সুন্দর আজ সেই।

(শতনরী, পৃঃ ৪৮)

(৩) দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে
রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে সে—
কল্কা-পেড়ে শাড়ীর কোণা
তর্জ্জনীতে জড়িয়েছে।
একমনে সে শুন্‌ছিল
কানুর গানের অন্তরা—
ব্রজবধূর দীর্ঘশ্বাসে
চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে।

সে যে আমার গানের মধু,
মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী।
কোন্ সে দেশে হাওয়ায় ভেসে
কোথায় সে যে লুকিয়েছে—
কতদিন আর পথের পানে
চাইব দিবা-শর্ব্বরী!

('মনোহারিকা', ঝরাফুল)

(৪) নাগকেশরের গন্ধে পাগল
সান্ধ্য ফাগুন-হাওয়া,
কুণ্ঠিত কেন কণ্ঠ তুহার—
কোন্ সুরে যায় গাওয়া?
বন-পথে আজ ফুল-দোল-লীলা,
কুঙ্কুম ভাঙে রঙ্গন;
'জল-তরঙ্গ'-ঝঙ্কার তুলে'
বাজাও শঙ্খে কঙ্কণ।

(শতনরী—পৃঃ ২৭)

(৫) দোল-দোলনে ঢিলা হ'য়ে সোহাগ-বেণী যাক্ খুলে,
ঢাকা দিয়ে রাখিস্‌নে মুখ, তাকা তোরা চোখ তুলে'।
মনের কোণে রঙ্ ধরেছে,
আকাশ বাতাস বদ্‌লে গেছে,
মল্লী-চাঁপা-যুঁই-বেলাতে দখিন্-হাওয়া যায় বুলে'—
তাকা তোরা চোখ তুলে'।
চৈত্র-রাতি, আকুল রতি ফুল্-শরে!
ঘর ছেড়ে চল্ তমাল-বীথির পথ ধরে'।
কোন্ পুলিনে নীল সলিলে
খেল্‌বি খেলা সবাই মিলে',
মন্ত্র নিবি বন্-বিহারীর মন্তরে—
সে যে বাঁশীর ভাষায় ডাক দিয়েছে নাম ধরে'!

(শতনরী, পৃঃ ৪৪)

এই শেষের কবিতাটিতে কবির ছন্দলীলা কোন কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে নাই; সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ কবি-দরবেশের প্রাণের নৃত্য এই কবিতায় শরীরী হইয়া উঠিয়াছে—ছন্দ এখানে 'বন-বিহারীর মন্তরে' পরিণত হইয়াছে। এই কবিতাটি এই হিসাবে করুণানিধানের একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

করুণানিধানের কাব্যে যে ধরণের রসমাধুরী যতটুকু আছে, তাহার আস্বাদনে আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিলাম। করুণানিধান যে কবি-শিল্পী, নিজ প্রাণের রস-সংবেদনা তিনি যে অনুরূপ ভাষায় ছন্দে প্রকাশ করিতে পারেন, আশা করি, তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। (কোনও কবির নিকটে তাহার অধিক কিছু দাবী করা চলে না। কবিকর্ম্ম পুরুষকার-সাপেক্ষ নয়, তাহা দৈবী প্রেরণার অধীন।) কবির প্রাণে যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত—যাহা তাঁহার ভাব-প্রকৃতির অনুবন্ধী, তিনি তাহাই সৃষ্টি করেন, সমালোচকের ইচ্ছানুরূপ দাবী মিটাইতে পারেন না। প্রত্যেক কবির অনুভূতি-ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, কিন্তু সেই অনুভূতি যখন শব্দে ও ছন্দে রূপ পায়, তখনই বুঝি, কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে; এবং তাহাই যথেষ্ট। করুণানিধানের সেই অনুভূতি-ক্ষেত্র কিরূপ, তাহার সীমাই বা কোথায়—সমালোচক সেইটুকু ধরাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহার বক্তব্য শেষ হয়। আমরা দেখিয়াছি, করুণা-নিধানের কাব্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রূপ-রেখা শব্দ-বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠে, এবং সে চিত্র কবি-চিত্তের মাধুরীতে আলিম্পিত হয়। এই রূপ-মোহ একরূপ ইন্দ্রিয়োল্লাসের আনন্দে কবিকে বিভোর করিয়া তোলে; সেই তড়িৎস্পর্শবৎ রূপরেখাবলী কবি আবিষ্টের মত শব্দপটের উপরে মেলিয়া ধরিয়া ঐকান্তিক তৃপ্তি লাভ করেন; এ জন্য কবির অনুভূতি চিন্তা-গভীর হইতে পায় না। (তাঁহার অনুভূতিক্ষেত্রে রুদ্র কঠিন বীভৎস বস্তুর স্থান নাই; তার কারণ, তাঁহার প্রাণ প্রকৃতির নিকটে মাধুরী-ভিক্ষাই করে,—তাহাকে কল্পনা-বলে জয় করিয়া আত্ম-চেতনার প্রসার কামনা করে না। কবি শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব;) যে নিশ্চিন্ত আত্ম-নিবেদন, অবশ ভাবাতিরেক ও প্রীতিবিহ্বল সৌন্দর্য্য-কল্পনা মানুষকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া, তাহার বিচার-বৃত্তি অলস করিয়া, বৃন্দাবন-স্বপ্নের সহায়তা করে, করুণানিধানের চিত্তে সেই বৈষ্ণব-ভাব প্রবল। এই সূত্র ধরিয়া এইবার তাঁহার কাব্যে ভাবের যেমন আলোচনা করিয়াছি, সেইরূপ অভাবের দিকটাও আলোচনা করিব। কোনও কবির কাব্যে যাহা যে কারণে আছে, যাহা

নাই তাহারও কারণ যে সেই একই,—একথাটা বুঝিয়া না লইলে কাব্য-পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

করুণানিধানের কাব্যে একটা প্রধান অভাব এই যে, কবি তাঁহার অনুভূতি-গুলি লইয়া এতই অধীর যে, সেগুলিকে কবিতায় একটা ভাবের ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া তুলিবার দিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই নাই—সামান্য যত্নে অনায়াসে যাহা করিতে পারিতেন, তাহাও করিতে তিনি যেন পরাঙ্মুখ। 'হিমাদ্রি' কবিতাটিতে এই দোষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট হইয়াছে—এই সুদীর্ঘ কবিতার পংক্তি-বিভাগেও অযত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ তাঁহার কবি-প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে-প্রকৃতিপ্রেমের ফলে তাঁহার রচনায় "the thing seen becomes the thing felt—transformed from a cause into a symbol of delight"—সেই আবেগের ফলেই করুণানিধানের অধীর রূপ-সৃষ্টির আগ্রহ কোনখানে স্থির থাকিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের ভাষায়—"It lacks that endorsement from a centre of disciplined experience which is the mark of the poetic imagination at the highest." উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকল্পনার মধ্যে যে বিচারশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করে, করুণানিধানের কল্পনায় সেই বৃত্তির অভাবই তাহার কারণ। এই জন্যই জীবন ও জগতের বাস্তব-রূপের মধ্যে Ideal ও Real-এর যে দ্বন্দ্ব আছে, তাহাকে তাঁহার বৈষ্ণবভাব-বিভোর প্রাণ একেবারে পাশ কাটাইয়াছে—সে দিকটা তিনি যেন ক্ষণমাত্রও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার কবি-প্রকৃতির এই লক্ষণ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার গাথা-কবিতাগুলিতে। এখানেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রূপস্বপ্নময় কল্পনা কোনও ঘটনা-কাহিনী বা চরিত্রকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এ সকল কবিতায় —বিশেষতঃ 'চণ্ডীদাস', 'জয়দেব' ও 'বাদশাজাদী'তে—কবি তাঁহার ভাষার বর্ণচ্ছটা ও ধ্বনিসম্পদ উজাড় করিয়া দিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে—"There are moments when the emotion seems to rise in a sudden fountain and change the thing he sees into a jewel"; কিন্তু তাহাতে গাথা-কবিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। Keats-এর 'St. Agnes' Eve' অথবা 'Isabella'-র মত কবিতায় কবির চিত্রাঙ্কনী শক্তি ও রূপপিপাসার আবেগ যেমন একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বা কাহিনীকে ঘেরিয়া অখণ্ড রসরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

করুণানিধানের কবিতায় তাহা হয় নাই; তার কারণ, Keats-এর সৃষ্টিকল্পনায় যাহা ছিল, করুণানিধানের তাহা নাই—"endorsement from a centre of disciplined experience"।) করুণানিধানের কল্পনায় ভাবানুভূতির মুহূর্ত্তগুলি (moments of experience) রূপে ও রূপকে মূর্ত্তি গ্রহণ করে; এই মুহূর্ত্তগুলি, কার্য্যকারণ-সূত্রে, একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-পথে প্রবাহিত হয় না। এই জন্যই তাঁহার গাথা-কবিতাগুলি গাথা-হিসাবে সার্থক হয় নাই। 'চণ্ডীদাসে' এইরূপ কতকগুলি মুহূর্ত্ত মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে; সে মুহূর্ত্তগুলি এতই ভাব-ঘন, তাহার বাণীরূপ এতই অপূর্ব্ব, যে মনে হয়, সেগুলিকে চণ্ডীদাসের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত না করিয়া 'রজকিনী রামী'কে মাত্র কেন্দ্র করিয়া, চণ্ডীদাসের প্রেমারতির স্তোত্ররূপে গাথিয়া তুলিলে রসসৃষ্টি আরও সার্থক হইত; আমরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতাম—

ঘিরিল তাহার অলকপ্রান্ত
অপরূপতম জ্যোতি,
তারকা-খচিত আকাশের তলে
দাঁড়ায়ে রহিল সতী।

—ইহার পরের অংশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। 'জয়দেব' কবিতায় কবি-শিল্পীর ভাষা ও চিত্র-রচনা অন্যদিক দিয়া সার্থক হইয়াছে। এ কবিতায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা unity of atmosphere আছে, এবং সে atmosphere সৃষ্টি করিয়াছে—'বিরাট মন্দিরচূড়া ছায়া যার পড়ে না ভূতলে', 'মরুৎ-ডম্বরু-মন্দ্রে উতরোল অম্বুধি-গর্জ্জন'; সমস্ত কাহিনীকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া এক বিরাট গম্ভীর ভাব-দেবতার আরতি-শঙ্খ এই কবিতায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু 'বাদশাজাদী'র কাহিনী রূপ-রসে টলমল করিলেও সুসম্বদ্ধ আকার লাভ করে নাই। তিনটি গাথার মধ্যে এইটির মধ্যেই নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশের অবকাশ ছিল। এ কাহিনীকে চিত্ররূপে আয়ত্ত করা যায় না। ইহার মধ্যে ঘটনা-পরম্পরার গতিবেগ কবির রূপসম্ভোগ-স্পৃহাকে যেন বারবার ব্যাহত করিয়া ছন্দকে আরও বেগবান করিয়াছে। বাদশাজাদীর এই ছন্দ খাঁটি ballad-এর উপযোগী; এই ছন্দের দ্বারাই প্রমাণ হয়, এই কাহিনীর মূল-প্রেরণা কবিচিত্তে ঠিকই ধরা দিয়াছে, তথাপি ইহার গঠনে কবির কল্পনা-শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

এই গাথাগুলির সঙ্গে একটি কবিতা আছে, তাহার নাম 'চিরকুমার' ; এই কবিতাটি পড়িলে করুণানিধানের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিবে,—গাথাই হৌক্ আর যাহাই হৌক, কবিতাটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত করুণানিধানী কাব্যরসের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

করুণানিধানের কাব্যে এই যে অভাবের দিকটার আলোচনা করিলাম, ইহার জন্য তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে দায়ী করি না ; তাঁহার কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য যদি বুঝিয়া থাকি, তবে এ আলোচনায় কবির সেই পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া মনে করি। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কাব্যে যে একটা অস্পষ্ট প্রশ্নকাতর উৎকণ্ঠার সুর আমরা লক্ষ্য করিয়াছি সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। তাঁহার কাব্যের এই ভঙ্গি নিতান্ত হেঁয়ালি-রচনার খেয়াল নয়, এই সুর আর এক ভঙ্গিতে তাঁহার কাব্যে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহার কল্পনার স্বাস্থ্যহানি করিয়াছে। কারণ, আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, করুণানিধানের মত সৌন্দর্য্য-বিভোর রূপরস-পিপাসুর কাব্যবীণায় একটা তার বড় বেসুরা বাজিয়াছে—একটা কাতর ভীতি-বিহ্বল বৈরাগ্যের সুর অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কতকগুলি কবিতায় বার বার দেখা দিয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক বলিলাম এই জন্য যে, যে-কবিতার মূল-প্রেরণাই বৈরাগ্য, সে কবিতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই ; কিন্তু যে সকল কবিতার মূল-প্রেরণাই সৌন্দর্য্য-বিভোরতা—সেখানে সেই অবস্থাতেই এই সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে 'চিরন্তন ধ্রুবে'র নিকটে আত্ম-সমর্পণের ভাব, পৌরাণিক ভক্তিভাবের ঔদাসীন্য, বা আধ্যাত্মিক সত্যপিপাসার বেদনা—এই সকল কবিতার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। 'হরিদ্বার' 'হিমাদ্রি' বা 'শ্রীক্ষেত্রে'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে যতটুকু তীর্থ-মাহাত্ম্য বা পৌরাণিক স্মৃতি জড়িত আছে, এই কবিতাগুলিতে সেই তীর্থ-মাহাত্ম্যই তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতিকে খর্ব্ব করিয়াছে—প্রাকৃতিক শোভায় তন্ময় হইতে গিয়া কবিকে যেন আত্ম-সম্বরণ করিতে হইয়াছে। তাই, 'ওয়ালটেয়ারে'-শীর্ষক কবিতায় কবির যে আশ্চর্য্য প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় পাই, তাহাতেও এই পুরাণ-কথার আকস্মিক অবতারণায় রসভঙ্গ হইয়াছে। কেবল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' কবিতায় কবির রূপ-পিপাসা সকল রূপের সীমায় পৌঁছিতে চাহিয়াই কাঞ্চনজঙ্ঘার অলোক-সম্ভব রূপ-জ্যোতির সম্মান রক্ষা করিয়াছে। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এইরূপ

ভক্তিভাব বা আধ্যাত্মিক পিপাসার বিরোধী; রূপ হইতে অরূপে পৌঁছিবার একটা সহজ মানস-সেতু আছে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সকল কবিতায় যে আধ্যাত্মিকতার প্রয়াস আছে তাহা করুণানিধানের কবি-প্রকৃতির পক্ষে একটা কৃচ্ছ্রসাধন—ইহা তাঁহার কাব্য-প্রেরণার পরিণতি নয়, বরং একরূপ বিপরীত গতি বলিয়াই মনে হয়। "সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি" কবিতায় কবি যাঁহার আবাহন করিয়াছিলেন, এই সকল কবিতায় অংশবিশেষ পড়িবার পর, তাঁহার সেই কাব্যলক্ষ্মীকে বলিতে ইচ্ছা হয়—'বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে!'

করুণানিধানের কবিজীবনে একটা অকাল-বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাঁহার কবিমানস অতি দ্রুত অবসাদ-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ কবির ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ইতিহাসে বোধ হয় মিলিবে। তথাপি যে-কবি বিশেষ করিয়া সৌন্দর্য্যের মোহিনী মায়ার এমন বশীভূত—তাঁহার চিত্তেও এ বৈরাগ্য-পিপাসা কেন? সকল সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা নশ্বরতার ছায়া জড়িত আছে সত্য, এজন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা গভীরতর বেদনার অনুভূতি আছে, তথাপি, সৌন্দর্য্য সর্ব্বজয়ী। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ লেখক যথার্থই বলিয়াছেন—

"The faith in it endures: for the discernment of beauty is a mode of perception that is adequate to all the fates can bring. Disillusion has no power against it; it cannot merely conquer, but make part of itself its regret for its own impotence;...and the lovers of beauty are perhaps more fortunate than the lovers of justice, or love."

কিন্তু সৌন্দর্য্যের এই impotence—এই নশ্বরতার ছায়াই করুণানিধানের সৌন্দর্য্য-মোহকে বিচলিত করিয়াছে; তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—করুণানিধান শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব। সৌন্দর্য্য-পিপাসার সঙ্গে যে ভাবুকতা-শক্তি থাকিলে এই ক্ষণ-সুন্দরকেই চির-সুন্দরের রূপে বরণ করিয়া—

And some win peace who spend
The skill of words to sweeten despair
Of finding consolation where
Life has but one dark end;
Who, in rapt solitude, tell o'er
A tale as lovely as forlore,
Into the midnight air.

—সেই শক্তি তাঁহার নাই ; তাই, বার বার এই ক্ষণ-সুন্দরের মোহই তাঁহাকে চির-সুন্দরের দুয়ারে হাহাকার করাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কবিপ্রাণ সে সান্ত্বনা আজিও পায় নাই—এ দ্বন্দ্বের অবসান ইহজীবনে হইবে না। তাই, মনে হয়, 'উদ্দেশে'-শীর্ষক কবিতায় বিয়োগ-বিধুর কবির সান্ত্বনালাভের প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া অতি নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-দেবতাও হাস্য সম্বরণ করিবে।*

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইংরাজী উক্তিগুলি J. Middleton Murry-প্রণীত 'Countries of the Mind' নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি—লেখক।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

অনেকদিন পূর্ব্বের কথা, এখনও মনে আছে। একদা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার সহিত পরিচয় করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—তিনি আমার কণ্ঠে 'মেঘনাদ-বধ'-কাব্যের আবৃত্তি শুনিতে আসিয়াছেন। বড়ই বিস্ময় বোধ করিলাম—এমন মানুষ আজিকার দিনে এখনও আছে! অবশ্য তিনি 'ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্'-দেরই একজন; অতিশয় ধীর, শান্ত, সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ; পরিচয় আরও বৃদ্ধি পাইলে বুঝিলাম, আমাদের দেশে যাহাকে 'রসিক' বলা হয়, বা এককালে বলা হইত, তিনি একজন খাঁটি সেইশ্রেণীর মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্য ও কিশোর-জীবনের কথায় এইরূপ দুই-একটি রসিক-চরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন। মুগ্ধ হইলাম; মধুসূদনের কাব্য পড়িয়া তাঁহাকেও মুগ্ধ করিলাম কিনা জানি না, তবে বুঝিলাম, তিনি মধুসূদনের ভক্ত—ভক্ত বলিতে যাহা বুঝায়। কিন্তু ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়; যে কারণে আজ তাঁহার কথা স্মরণ হইতেছে তাহা এই যে, আলাপ-পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইলে, তাঁহার সেই কাব্যরসিকতার মধ্যে একটি আশ্চর্য্য বস্তু সেই প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; ভদ্রলোক (নাম করিব না, তিনি এখনও জীবিত আছেন—হয় তো লজ্জা পাইবেন) মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তিমান হইলেও দাশুরায়কেই তাঁহার হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন! আমার মতে ইহা অসম্ভব,—দাশুরায়কে যাহার এত ভাল লাগে, তাহার রবীন্দ্রনাথকে তো দূরের কথা—মধুসূদনকেও ভাল লাগিতে পারে না, যদি লাগে তবে বুঝিতে হইবে, কোথাও একটা গোঁজামিল আছে—সে ব্যক্তি প্রকৃত রসিক নহে। কিন্তু উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়াও তেমন ফাঁকি কোথাও ধরিতে পারিলাম না; সে কালের গ্রাজুয়েট, অর্থাৎ আজিকার মত রবার-ষ্ট্যাম্পের ডিগ্রি নয়; শিক্ষা ও রসবোধ দুই-ই সমমাত্রায় মিলিয়াছে। অতএব, সন্দেহের কোন কারণ রহিল না। কিন্তু দাশুরায় ও মধুসূদন! ঈশ্বরগুপ্ত ও দাশুরায়—এই দুইজনই নব্য বাংলাকাব্যের বহির্ভূত।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও, তাঁহাদের ভাষা ও ভঙ্গিকে খাঁটি বাংলা ও বাঙালীর বলিয়া স্বীকার করিলেও, আমাদের মত নব্যতন্ত্রের কাব্যরসিককে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—ঐ আদর্শ এবং ঐ ভঙ্গি ধরিয়া না থাকাই ভালো ; বাঙালী অতঃপর নবযুগের নূতন জগতে জাগিয়া উঠুক, তাহার কল্পনা ঊর্দ্ধাকাশে পক্ষ বিস্তার করুক।

আমাদের কালে আমরা দাশুরায়কে কিছুমাত্র খাতির করি নাই—দাশুরায় কেন, হেম-নবীনকেও নিতান্ত স্থূল ও তরল বলিয়া মনে হইত। কিন্তু সেদিন এই সত্যকার কাব্যামোদী, এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যের সহিত সুপরিচিত (আজিকার জিনিয়াস-কবি ও কলেজের বাংলা-অধ্যাপকদের মত নয়) মানুষটিরও রুচি—দাশুরায়ের প্রতি সেই অচলা ভক্তি—দেখিয়া মনে বেশ একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল ; যেন একটা নূতন প্রশ্ন আমার সমালোচনা-বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়াছিল। তথাপি, তখন তাহাকে তেমন গুরুত্ব দিই নাই, ভাবিয়া দেখিবার অবকাশও ছিল না, তাই তখনকার মত সেই প্রশ্নটিকে মনের একটা কোণে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম।

আজ কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্য-আলোচনা করিতে বসিয়া, সেই প্রশ্নটিই মনের দেরাজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে,—কেন, তাহাই বলিয়া এই আলোচনার মুখবন্ধ করিব।

'রস'-এর তত্ত্ব যেমনই হউক, তাহার সহিত রস-আস্বাদনের কোন সম্পর্কে নাই—ইহাই সত্য ; যাহারা অতিশয় বেরসিক, জন্মান্তরীণ সাধনা ও সুকৃতির অভাবে যাহাদের সেই সংস্কারই নাই, তাহারাই 'রস'কে ছাড়িয়া 'রস-তত্ত্বে'র নানাবিধ কুস্তি-কৌশল দেখাইয়া, নিজেদের ইজ্জত বাঁচাইতে চায় ; কবি হইতে না পারিয়া, কবিদের মাথায় চড়িয়া বসে—কাব্যের সেবক না হইয়া, গুরু হইতে চায়। 'রস' একটা নির্ব্বিশেষ বস্তু, কিন্তু বিশেষের আধারেই আমরা তাহা পান করিয়া থাকি ; যাঁহারা কাব্য-রসিক, কাব্যের রস-আস্বাদনকালে ঐ-বিশেষের ঐ-পাত্রটাই তাঁহাদের চিত্তের বা সজ্ঞান মানসের সব খানি অধিকার করিয়া থাকে। ঐ বিশেষই যে কাব্যের রস-রূপের সর্ব্বপ্রধান উপাদান, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। হোমার, শেক্‌স্‌পীয়ার, বাল্মীকি ও ব্যাস, দান্তে, কালিদাস ও ফেরদৌসী—ইহাদের কাব্য ও মহাকাব্য নিশ্চয় সেই রসের ধারায়

অভিষিক্ত; কিন্তু তাহাদের রূপ কি এক? এক যদি হইত তবে, তাহা সেই এক রসতত্ত্বের চমৎকার দৃষ্টান্ত হইত, কিন্তু কোনটাই কাব্য হইত না; তাঁহারাও কবি-নামের অযোগ্য হইতেন। কারণ, প্রত্যেক কাব্যের ঐ বিশেষ রূপটাই কবির 'সৃষ্টি', এবং যাহার সেই সৃষ্টি-প্রতিভা যত অধিক, তিনিই তত বড় কবি। এই সৃষ্টিও এমনই বিচিত্র, সেই রূপের রস-কটাক্ষ এমনই অনন্যসদৃশ (Individual, Particular) যে, কোন সাধারণ সূত্র রচনা করিয়া তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না; সেই চেষ্টা তত্ত্বের দিক দিয়া যেমনই হোক, কাব্যের দিক দিয়া সর্ব্বৈব ব্যর্থ। আমি ঐ বিশেষের কথাটা আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলিব। ঐ বিশেষেরও নানা দিক আছে। যাঁহারা বড় কবি তাঁহাদের কাব্যে একটা সমগ্র জাতি ও যুগের বিশেষ রূপটি ধরা দিয়া থাকে। এইরূপ কাব্যকেই এক অর্থে Great Poetry বলা যাইতে পারে। কিন্তু কাব্য এমন Great বা মহান্ না হইলেও, 'Good' বা সুন্দর হইতে পারে; অর্থাৎ সেই 'রস' বৃহৎ-বিশেষকে আশ্রয় না করিয়া ক্ষুদ্র-বিশেষকে আশ্রয় করিতে পারে,—সেই বিশেষও ঐ রসের অভিষেকে কাব্য হইয়া উঠে। আমি এই যে এখানে বার বার 'রস'-কথাটির উল্লেখ করিতেছি, ইহাতে রসশাস্ত্রীদের উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই,—'রস' বলিতে এখানে সেই বস্তুই বুঝিতে হইবে, বিশেষের রূপেই আমরা যাহা আস্বাদন করি,—বিশেষকে ছাড়িয়া যাহার কোন নির্গুণ ব্রহ্মসত্তা নাই; এইজন্য আমি 'রূপ-রসে'র পরিবর্ত্তে 'রস-রূপ' কথাই ব্যবহার করিতে চাই। ঐ বিশেষ বলিতে আরও অনেক-কিছু বোঝায়; যেমন, প্রত্যেক কবিতার নিজস্ব বিষয় বা আলম্বন, তাহার আকৃতির বিশেষত্ব, তাহার নিজস্ব প্রকাশ-ভঙ্গি, প্রভৃতি। এই সকলই ঐ 'রস'কে আমাদের আস্বাদন-যোগ্য করিয়া থাকে—অর্থাৎ, উহাদের সাহায্যে 'রস'—একটা নিরাকার তত্ত্ব না হইয়া সাকার বস্তু হইয়া উঠে। ঐ রূপ—ঐ বিশেষই কবিতার সর্ব্বস্ব।

এখন ঐ বিশেষকে আরও একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে। না দেখিলে, আমার আজিকার এই আলোচনা আপনাদের মনঃপূত হইবে না। ঐ বিশেষেরও একটা ছোট-বড় ভেদ করিয়াছি বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বিশেষের মূলে একটা গভীরতর কারণ বিদ্যমান নাই কি? সেটা কি বলুন দেখি? কবি যত বড় কবিই হউন, কাব্য যত বড় কাব্যই হউক, তাহার প্রেরণায় একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে; ইহা তত্ত্বসম্মত নয় তাহা জানি, কিন্তু কবিপ্রতিভার সম্পর্কে

ইহা অতিশয় বাস্তব—নিয়তির মতই দুর্লঙ্ঘ্য। আপনারা তত্ত্ববাদীরা ইহা মানিতে না পারেন; কবিও সজ্ঞানে ইহাকে অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে উহা মানিতেই হয়, মন না মানিলেও প্রাণ মানে। কারণ, ঐ কাব্যও একটা জমিরই ফসল; ফল-ফুলের মত তাহারও একটা ভূমি বা উৎপত্তি-স্থান আছে, পরিবেষ্টনী আছে; সেই ভূমিতে ঐতিহ্যের সার-মিশ্রণ আছে; কবিতাও সেইরূপ মাটির রস আকর্ষণ করিয়া ফুটিয়া উঠে; যদি তাহা না করিয়া "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিয়া" উঠে, তবে তাহা মনোহর হয় বটে, কিন্তু তাহা আকাশ-কুসুম অথবা গন্ধর্ব্ব-নগরীর মত—যেন "শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা"; তাহা সুন্দরের বা রূপ-রসের একটা ভোজবাজি, জীবনের জীবন্ত রসরূপ নয়। এই জন্যই কবিতার রসবাহী মূল একটা জাতি বা সমাজের মনোভূমিতে নিহিত থাকা চাই; আরও কারণ,—"একাকী গায়কের নহে ত' গান, গাহিত হবে দুই জনে"; সেই দুইজনের আর একজন কে? সেই একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠি, না বৃহত্তর সমাজ? সেই জাতি ও সমাজগত অনুভূতিই কবির ব্যক্তিগত কবিপ্রেরণাকে জাগ্রত ও সঞ্জীবিত করে। ইহাও প্রেম,—এই প্রেমেই কবিতার জন্ম হয়। যে প্রেমহীন পাপিষ্ঠেরা অতি হীন ও কদর্য্য আত্মপরায়ণতার দম্ভে, জাতি ও সমাজ—এমন কি, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকেও অগ্রাহ্য করিয়া, নিজেদের মানস-ব্যাধির নানা ভঙ্গিমাকে, দুর্ব্বোধ্য ভাষায়; এবং ততোধিক দুর্ব্বোধ্য ভাব-চিন্তার ধনুষ্টঙ্কারে, কবিতা বলিয়া প্রচার করে, তাহারা কবিতা লেখে না,—কাব্য-সরস্বতীর প্রতি আক্রোশ করিয়া তাঁহাকে ভ্যাংচাইয়া থাকে। হোমার, শেকস্‌পীয়ারকে ঐ প্রেমই প্রবুদ্ধ করিয়াছিল—জাতির রস-চেতনাই তাঁহাদের কবি-প্রাণ প্রবুদ্ধ করিয়াছিল; পরে সেই কাব্যই বিশ্বজনের মনোহরণ করিয়াছে; ইহাও সেই বিশেষের বিশ্বজনীনতার রহস্য। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, কাব্যসৃষ্টির মূলে ঐ আর একটা বিশেষ আছে—জাতির বিশিষ্ট রস-জীবন।

এতক্ষণে আমার কথাটা একটু গুছাইয়া আনিয়াছি, আপনাদিগকে বোধ হয়, আর বেশীক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে না। বাংলা কাব্য এই জাতিগত বিশিষ্ট রসচেতনা হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি নিজে নব্য-তন্ত্রের উপাসক—সেটা ভাবের, কি ভঙ্গির—সে বিচার এখানে অবান্তর।

ইংরেজীর মারফতে আমরা যে নূতন কাব্যজগতে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের কাব্যের আদর্শ যে বহুগুণ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কথাই পুনরায় স্মরণ করি; তিনিও এই উন্নত কাব্যকলার লোভ যেমন সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তেমনই দীর্ঘশ্বাস সহকারে তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছিল, হউক সুন্দর—তবু ইহা যেন বাংলা নয়, বাঙালীর নয়! সেদিন যে কারণে তিনি এই নূতন কবিতার জয়যাত্রাকে অভিনন্দিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা বুঝি; কিন্তু আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে তিনিও শিহরিয়া উঠিতেন; সেই জয়যাত্রার ফলেই আজ বাঙালীর কবিতা শুধুই যে বাংলা নয় তাহাই নয়—তাহা আর কবিতাও নয়। বাঙালী আর কবিতা পড়ে না; বাহিরের জীবনেও তাহার অবকাশ যেমন আর নাই, ভিতরেও বহুপূর্ব্বে সেই রস-জীবন শুকাইয়া গিয়াছে—সে পিপাসাই লুপ্ত হইয়াছে। কবিতা যে কি পদার্থ, তাহা সে আর বুঝিতেও চায় না; কবিতার নামে যে রাশি রাশি ছাপা-অক্ষরের বিভীষিকা তাহার চারিদিকে উড়িয়া পড়িতেছে, তাহাতে সে আর ভয় পায় না—সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করে; সে বুঝিয়াছে, ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, উহাকেই কবিতা বলে; তারপর সেই বস্তুকে ও তাহার উৎপাদকদিগকে, কৃপামিশ্রিত মুরুব্বিয়ানা অথবা সাহিত্যিক-জনোচিত সৌজন্যের দ্বারা সহ্য করিয়া, তাহার ও নিজের মানরক্ষা করে। এখন কবিতা-লেখক ও কবিতা-পাঠকে কোন শ্রেণীগত ভেদ নাই—যাহারা লেখে তাহারাই পড়ে; বাঙালীর মধ্যে কোন পৃথক কাব্যরসিক-সমাজ আর নাই।

কেন এমন হইল? আমরা ঈশ্বরগুপ্ত ও দাশুরায়কে বিদায় করিয়া অতঃপর যে কাব্যরসের সাধনায় মাতিয়া উঠিলাম, সে রস উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু ক্রমেই তাহা জাতির রসজীবন বা রস-চেতনাকে অতিক্রম করিয়া গেল। আমাদের কবিরা যে আসর করিয়া বসিলেন তাহাতে ইংরেজী-শিক্ষিত উচ্চতর কাব্যমন্ত্রে-দীক্ষিত রসিকগণই প্রবেশের অধিকার পাইলেন—বিশাল বাঙালী-সমাজ বঞ্চিত হইয়া রহিল। ঐ কাব্য উৎকৃষ্ট কাব্য বটে, কিন্তু জাতির রসজীবন হইতে তাহা পুষ্টি গ্রহণ করিল না; শেষে তাহাও অতিশয় ব্যক্তি-স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল, সমাজের সহিত যোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গেল। সেই রসকল্পনা বাংলা কবিতাকে একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য দান করিল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে প্রাণধর্ম্মকেও নির্ব্বাসিত করিল।

উৎকৃষ্ট কবিতা, অথচ প্রাণ-ধর্ম্মহীন—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কাব্য আর্ট-প্রধান ও জীবনানুভূতি-প্রধান, দুই রকমেরই হইতে পারে। আমাদের কাব্য ঐরূপ আর্ট-প্রধান হইয়া উঠিল—নির্ব্বিশেষ সৌন্দর্য্যধ্যানই তাহার একমাত্র প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইল; তাহার ভাবও যুগ বা জাতিকে অতিক্রম করিয়া বর্ণহীন বিশ্ব-জনীনতার অত্যুচ্চ মানস-বিলাসকে আশ্রয় করিল, এবং একটি অতিশিক্ষিত-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন নাগরিক রসপিপাসাই তাহাতে চরিতার্থ হইল। এদিকে জাতির সমাজ-জীবন ক্রমেই বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়ায়, উচ্চ হইতে নিম্নস্তর পর্য্যন্ত রস-সংবেদনার যে একটি আত্মীয়তা-বন্ধন ছিল তাহাও ছিন্ন হইয়া গেল। বাঙালী কবির কাব্য অতঃপর আর বাঙালী-জাতির রসপিপাসার পানীয় হইল না। এই-রূপে গত দুই পুরুষ ধরিয়া বাংলা কাব্য সেই প্রাণ-ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইল,—সকল কাব্যের—রস-সৃষ্টির নয়, রূপ-সৃষ্টির—যাহা একমাত্র সহায়।

তাই, সেই যে ভদ্রলোকটির কথা আমি এই প্রবন্ধের আরম্ভে স্মরণ করিয়াছি, যাহাকে এতদিন আমি আমার মনের একটি কোণে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম, কিছুকাল পরে তাহাই আমার চিন্তাকে আক্রমণ করিতে লাগিল; আমি তাহার একটা গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিলাম। মধুসূদনের কাব্য যাহার রসবোধকে তৃপ্ত করে, সে-ও দাশুরায় বলিতে অজ্ঞান! তাহা হইলে, মধুসূদনের ঐ উচ্চতর আদর্শের কাব্য—সে কালের পক্ষে, যাহা প্রায় বিজাতীয় ছিল—তাহাও বাঙালীর রস-সংস্কারের বিরোধী নয়, দাশুরায়ের কাব্যরসের সহিত ঐ কাব্যের রস কোথায় যেন এক হইয়া আছে। তাই ব্যক্তিগত রুচির পক্ষপাত যেমনই হউক, দাশুরায়-ভক্তের পক্ষে 'মেঘনাদবধ' উপাদেয় হইতে পারে। অর্থাৎ, কাব্যের কলানৈপুণ্য, আদর্শের উচ্চ-নীচ-ভেদ, এমন কি, রূপ-রসের বিভিন্নতা যেমনই হউক—ঐ দুইজাতীয় কাব্যের রসাস্বাদনে মূল অনুভূতি-মার্গ একই। ইহাই তবে জাতীয় রস-চেতনার সেই এক ভূমি যেখানে দাঁড়াইয়া বাঙালী তাহার ভাষায় রচিত সর্ব্বপ্রকার কাব্য—যাহার যেমন রুচি ও রসবোধ, সেই অনুপাতে—আস্বাদন করিতে পারে। তাহার কল্পনামূলে কবির মানস-উৎকর্ষই (Intellectual) কাব্যের রস-প্রমাণ নহে; কাব্য যতই উচ্চতর অনুভূতি-কল্পনায় সমৃদ্ধ হউক না কেন, তাহা বিশুদ্ধ aesthetic বা intellectual সৌন্দর্য্যের আধার হইলেই চলিবে না; তেমন কাব্য আমাদের মত ব্যক্তি-স্বতন্ত্র, উচ্চাশয় রসিকগণের উপাদে

বটে, কিন্তু তাহা প্রাণহীন; তেমন কাব্য চিরজীবী হইতেও পারে না। চিরজীবী হয় সেই সকল কাব্য যাহা একাধারে ঐ মানবীয় জীবন-ধর্ম্মে (যাহা জাতি বা সমাজকে আশ্রয় করিয়া আছে) অনুপ্রাণিত, এবং বৃহৎ ও গভীর কবিকল্পনায় অনুপ্রেরিত। বাঙালীর কাব্যও—যত বড় কাব্য হউক, তাহাকে বাংলা হইতে হইবে। ভাষা বাংলা হইলেই তাহা যে বাঙালীর কাব্য হয় না, তাহাও আমরা দেখিয়াছি; তাহারও কারণ, তাহার ভাষা একটা ব্যক্তিরই ভাষা, জাতির ভাষা নয়। তাই সেই বাঙালী ভদ্রলোকটির আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষটি বড় রসিক, চোখে-মুখে ও কথায় একটি নিরাবিল প্রীতিস্নিগ্ধ রসিকতা সর্ব্বদাই উছলিয়া উঠিত। গল্প করিতে করিতে তিনি প্রায়ই, তাঁহার নিজেরই রচিত একটি অদ্ভুত ইংরেজী বচন হাস্যসহকারে উচ্চারণ করিতেন; বাক্যটি শুনিলে আপনারাও হাসিয়া উঠিবেন—"Bengality of the Bengalians"। আমরা দুইজনেই খুব হাসিতাম, কিন্তু সেই রঙ্গরসের অন্তরালে প্রাণের কোন্ গূঢ় বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাও আভাসে বুঝিতে পারিতাম। আজ সেই হাসির কথাটাই আমার এই গুরুতর আলোচনার মূল-সূত্র হইয়াছে!

২

ঠিক মনে নাই, সেই প্রথম কিনা,—কুমুদরঞ্জনের কবিতার যে একটি পংক্তি আমাকে চমকিত করিয়াছিল, এখানে সেইটি উদ্ধৃত করিয়া, এবং তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া, কাব্য-পরিচয় আরম্ভ করিব; আমার মনে হয়, উহা দ্বারাই কুমুদরঞ্জনের কাব্যমন্ত্র এবং তাঁহার কবি-কর্ম্মের বিশেষরূপটি হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। পংক্তিটি এই—

রেখে গেনু, দেব, আঁখির তিয়াষা
আরতির দীপে তুলি'।

কবি পুরীর মন্দিরমধ্যে পুরুষোত্তমের বিগ্রহ দেখিয়া জীবন ধন্য মনে করিয়াছেন; সেই মূর্ত্তির মধ্যে তিনি যে রূপ দেখিয়াছেন, তাহার পিপাসা যেন মেটে না; তাই মন্দির হইতে বিদায় লইবার কালে তাঁহার প্রাণের আকুতি ঐ একটি উপমায় নিঃশেষ হইয়াছে। বাঙালী হিন্দু-সন্তান নিশ্চয় আরতির দীপ কাহাকে বলে এখনও তাহা জিজ্ঞাসা করিবে না, যদিও, হয় তো আরতির সময়ে প্রতিমার মুখের

সম্মুখে দীপের সেই দোলন-আবর্ত্তন সে দেখে নাই। ইহাও সত্য যে, ঐ কবিত্বের মূলে যে একটি বিশেষ ভাব রহিয়াছে, তাহা আমাদের পরিচিত, এবং অধুনা অতিনিন্দিত সেই ভক্তি-ভাব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ পংক্তিটি এমন চমকিত করে কোন্ গুণে? মুগ্ধ হইবার জন্য প্রথমেই ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয় না, তার কারণ, সেই ভক্তিভাবই একটি অপূর্ব্ব রস-রূপ ধারণ করিয়াছে,—সেই রূপই উৎকৃষ্ট কাব্য; তাই যাহার অন্তরে সেই রস-সংস্কার বা রসের 'বাসনা' আছে, তাহাকে ঐ 'রূপ'ই মুগ্ধ করিবে। উহার মূলে যে ভক্তিভাব রহিয়াছে তাহা কবির ব্যক্তিগত ভাব—সেই ভাবই একটি নৈর্ব্যক্তিক রস-রূপ ধারণ করিয়াছে, অর্থাৎ সাধারণ মানবীয় অনুভূতির বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, ঐ উপমা ও তাহার ভাষায় নিখিল মানব-হৃদয়েরই রূপ-পিপাসা একটি বিশেষ-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আঁখি দিয়াই আমরা রূপের আরতি করি—অর্থাৎ, সুন্দরকে যখন দেখি, তখন দৃষ্টির আলোকবর্ত্তিটিকে প্রাণের স্নেহরসে উদ্দীপিত করিয়া ঐ আরতির দীপের মতই তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া, সেই সৌন্দর্য্যের সীমা পাই না, পিপাসাও মিটে না,—ঐ দীপের জ্বালাই যেন সেই পিপাসা। ঐ 'আঁখির তিয়াষা' এক অপূর্ব্ব উপমায়, কত স্বল্পাক্ষরে একটি অধ্যাত্ম-মনোহর 'দেহ' ধারণ করিয়াছে; দেহই বটে; উহাই সেই 'রূপ'—যাহা মনুষ্যহৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিকে, এবং ধ্যানগম্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তোলে; উহাই কবির সৃষ্টি।

তারপর, কবিকে শ্রীমন্দির হইতে বিদায় লইতে হইবে, ঐ রূপ তিনি আর দেখিতে পাইবেন না—প্রিয়জন-বিরহের মতই এই বিরহ; তার কারণ, ইহাও যে হৃদয়ঘটিত, এ প্রেমেও ফাঁকি নাই। তাই প্রাণকে এই বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন যে, ঐ দীপগুলিই ত' আঁখি, ঐ আরতির দীপ হইয়াই তাঁহার চক্ষুদুটি সেই রূপ নিত্য-নিরীক্ষণ করিবে; সেই স্বপ্ন—প্রাণের সেই আবেগ-বিভোর বিশ্বাসই তাঁহার বিরহ-দুঃখ দূর করিবে। প্রশ্ন উঠিবে, কেন? সেইখানে ভিন্ন আর কোথাও কি সেই রূপের, সেই সৌন্দর্য্যের আরতি করা যায় না? ইহার উত্তর, শুধুই হিন্দুর ধর্ম্মসাধনার তত্ত্ববিচারে নয়—মানব-হৃদয়-শাস্ত্রেও পাওয়া যাইবে। রূপ বা সৌন্দর্য্যের এক একটি স্থান, এমন কি কালগত বিশেষ প্রকাশ আছে—কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত্তে, একটি বিশেষ স্থানে তাহার একটি বিশেষ প্রকাশ সারাপ্রাণকে যেমন আকুল করে, তেমন আর কোথাও নয়। স্থানের সঙ্গেও সম্বন্ধ কম নয়।

আমি বলিয়াছি, উপমাটিতে ভাবের একটি রূপ-দেহ গড়িয়া উঠিয়াছে—একটি বিশেষ রূপ বলিয়াই তাহা এমন লক্ষণীয় হইয়াছে। কিন্তু কেবল তাহাই নয়,—ঐ বিশেষই নির্ব্বিশেষের, ঐ ক্ষুদ্রই বিরাটের, ঐ সীমাই অসীমের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে; সমগ্র রূপজগৎ এইরূপ প্রতীকময়—এক-একটি রূপ এক-একটি বিগ্রহ বলিয়াই ঐ রূপ এত সুন্দর, তাহার মূল্য এত অধিক। রূপের মধ্যে আমরা সেই অরূপকেই প্রত্যক্ষ করি, ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রকাশগুলিই আমাদের—মানবমাত্রেরই—বোধগম্য; ঐ রূপের ভিতর দিয়া অরূপের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের—আমাদের অন্তরতম সত্তার আত্মীয়তা ঘটে; এইজন্যই ঐ বিশেষ, ঐ রূপ, ঐ বিগ্রহই এত মূল্যবান। কাব্যেও ভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া প্রথমে আমাদের রূপ-পিপাসা চরিতার্থ করে, তাহাতেই কাব্যের প্রাথমিক অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়; কিন্তু সেই রূপ যদি সীমার বন্ধনে অসীমকে ধরিয়া দেয়, তবেই তাহা শুধুই সুন্দর নয়, অধ্যাত্ম-মনোহর হইয়া উঠে। এখানেও একটি বিগ্রহ-মূর্ত্তি নিখিল সৌন্দর্য্যের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে; যে-পিপাসা রূপ-রসিক মাত্রেই অনুভব করেন তাহা কবির ঐ পিপাসার সহিত অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে; ঐ দীপারতি একটি বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পূজাবিধি হইয়াও, এমন একটি ভাবের দ্যোতনা করিয়াছে যে, সেই পূজা সর্ব্ব-মানবের পূজা হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ, উহার মন্ত্র সেই মন্ত্র, যাহাকে আমরা খাঁটি কাব্যমন্ত্র বলি—যে মন্ত্রের কোন শাস্ত্র নাই, কোন সম্প্রদায় নাই। আর একটি কথা বলিলেই, বোধহয়, একটা মূল প্রশ্নের সমাধানও হইয়া যাইবে—কবিতার কোন্‌গুণে, উহার ঐ রূপ-সৃষ্টি আমাদেরও এমন প্রত্যক্ষ, চিত্তগোচর হইয়াছে? ঐ যে 'infection', অর্থাৎ ভাবের সংক্রামকতা—উহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, কবির অনুভূতির অকপটতা—অতিগভীর আন্তরিকতা; ইহাই সকল উৎকৃষ্ট লিরিকের লক্ষণ।

অতঃপর, আমি এই একটি-পংক্তি হইতেই, ইহার কাব্যরসের আর এক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব—যাহাকে আমি জাতিগত রসজীবনের বা রস-সাধনার বৈশিষ্ট্য বলিয়াছি। ঐ আরতির দীপ যেমন নির্ব্বিশেষ সৌন্দর্য্য-পিপাসাকেই একটি বিশেষ 'রূপ'-দেহ দান করিয়াছে বলিয়াই, উহা এমন কাব্য হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই, ঐ রস-রূপটির ভিতর দিয়া একটি বিশিষ্ট ভাবসাধনাও প্রকাশ পাইতেছে। আমরা দেখিয়াছি—উহা রূপের সাধনা, সৌন্দর্য্যের সাধনা, এবং সেইহেতু উহা

সার্ব্বভৌমিক বা সার্ব্বজনীন। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যপ্রীতিরও এখানে একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে; এই পিপাসা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পিপাসা নয়—ইহাই প্রেম। এই পিপাসা পরম-সুন্দরের নিকটে আত্মনিবেদন করিয়াই কৃতার্থ হয়, নিঃশ্রেয়সকে লাভ করে; উহা সেই অপর সৌন্দর্য্য-পিপাসা নয়, যাহা সুন্দরকে ভোগ্যবস্তুরূপে—একরূপ আত্ম-সেবার উপকরণরূপে ভোগ করিতে চায়,—মদ্যপানে মাতালের যে সুখ সেই সুখে বিভোর হইতে চায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই রস-পিপাসার মূলে 'ভক্তি'-নামক একটি ভাবের প্রেরণা আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তিও বটে; কিন্তু এইখানেই এই ভাবসাধনার একটি অনন্যসাধারণ লক্ষণ রহিয়াছে—উহাই বাঙালীর সাধনা। ভক্তির ঠিক ঐ পন্থা—এমন কি, ভারতেরও—আর কোন জাতির সমাজে উদ্ভূত হইতে পারে নাই; এ ভক্তি সাধারণ সাধু-সন্তদের ভগবদ্ভক্তি নয়। একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই এই 'ভক্তি'র বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার প্রধান লক্ষণ রূপ-পিপাসা; ইহার ভগবান যিনি তিনি আর কিছুই নন—তিনি পরমসুন্দর; বিশ্বের বিরাট দেউলে সেই পরমসুন্দরই তৃণ হইতে তারকা পর্য্যন্ত—সর্ব্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম নাম দিয়াছে, যাহাকে সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বময় বলিয়াছে, এবং শেষে সেই এক ছাড়া আর কিছুই নাই বলিতে গিয়া এমন একটি কথা বলিয়াছে—সেই "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,"—যাহাতে সেই একেরই মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়, যেন জগৎরূপে স্ব-প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য;—সেই ব্রহ্মের—সেই 'সৎ-চিৎ-আনন্দে'র আনন্দ-উপাধিই, জগতের রূপরাশিতে সার্থক হইয়াছে। জগৎ সেই আনন্দ-ধাতুতে গঠিত, ঐ সৌন্দর্য্য সেই আনন্দেরই রূপ; আবার, আনন্দ হইতেই যেমন রূপ, তেমনই রূপ হইতেই আনন্দ; সেই আনন্দ-ব্রহ্মকে ঐ রূপে ভিন্ন—অর্থাৎ প্রকাশমান সৌন্দর্য্য ভিন্ন, আর কোন উপায়ে হৃদ্গম্য করা যায় না; এবং জ্ঞানগম্য নয়—ঐরূপ হৃদ্গম্য করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই যে একটি বিশিষ্ট ভাবমার্গের সাধনা—ইহাই বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবতন্ত্র। বলা বাহুল্য, আমি এখানে সেই বৈষ্ণবদর্শনের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিতেছি না, কেবল ঐ সৌন্দর্য্য-পূজার একটি বৈশিষ্ট্যের কথাই বলিতেছি। যেটুকু বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যাইবে, এমন সৌন্দর্য্যধ্যান আর কোন জাতি করে নাই। আমার কেবল ঐ কথাটুকুই দরকার, কারণ আমি এখানে কাব্যরসের আলোচনাই করিতেছি। এখন

কবির সঙ্গে আর একবার পুরীর সেই দেউল-দুয়ারে দাঁড়াইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, ঐ "আঁখির তিয়াষা' কি বস্তু। ঐ গভীর আকুতি এমন কাব্য-রসের উৎস হইয়াছে কি কারণে? আরও বুঝিতে পারিব, ঐ দেউল, ঐ বিগ্রহ, ঐ আরতির আনুষ্ঠানিক যাহা-কিছু—সকলই সেই রূপ-পিপাসার শুধুই প্রতীক নয়, শুধুই রূপক নয়,—কোন্ অর্থে তাহা একেবারে একটা সাক্ষাৎ 'রূপ' হইয়া

৩

কবি কুমুদরঞ্জন বাংলার সেই বিশিষ্ট ভাব-সাধনার কবিই বটে, হয়তো তিনি সেই সম্প্রদায়ের গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণব। কিন্তু আমরা এখানে তাঁহার সেই পরিচয় দিতেছি না, সেই সাধনার মানস-লতায় যে কাব্যকুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই পরিচয় করিতেছি। আমি নিজে বৈষ্ণব-সাধনার অনুরাগী নই; শ্রীচৈতন্যকে বাঙালী-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও, ঐ বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও তাহার সাধনাকে একটা পন্থা-বিশেষ বলিয়াই মনে করি। এ বিষয়ে আমি বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-বংশীয় বাঙালী। তথাপি, চৈতন্য-পরবর্ত্তী বাঙালী-সমাজ যে একটি রস-সংস্কার লাভ করিয়াছে, তাহা মূলে যে ঐ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনার রস, তাহা স্বীকার করি—কুমুদরঞ্জনের কাব্য-পরিচয় প্রসঙ্গে সেই 'কালচারে'র কথাও কিছু বলিব। উহাকে বৈষ্ণব, বা শাক্ত বা অন্য কোন সাম্প্রদায়িক নাম না দিয়া, এক্ষণে কেবল 'বাঙালী' নাম দেওয়াই যে কেন সঙ্গত, তাহাও বলিব। আমি ঐ যে 'রস-জীবন' কথাটা বার বার উল্লেখ করিতেছি, উহা আর কিছু নয়, ইংরেজীতে যাহাকে 'কাল্‌চার' বলে তাহারই এক অর্থে একটা বাংলা প্রতিশব্দ। কারণ, জাতির রস-চেতনার উপরেই কাল্‌চারের প্রতিষ্ঠা হয়, অথবা কালচারের সার অংশ তাহার ঐ রস-জীবনের সৃষ্টি। বাঙালীর ধাতুগত প্রকৃতি যে তান্ত্রিক, তাহাতে সন্দেহ নাই; এই তান্ত্রিকতা তাহার ধাতুতে চিরদিন—এখনও—নিহিত আছে; ইহাকেই কালবিশেষে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, শাক্ত-তান্ত্রিক প্রভৃতি নানা পন্থায় সে চরিতার্থ করিয়াছে। কিন্তু একটা ঘটনায় তাহার সেই ধাতুগত প্রকৃতি হইতেই একটি গূঢ়তর রসধারা উৎসারিত হইয়াছিল, এবং আর একটি কারণে সেই রস তান্ত্রিক বাংলার সর্ব্বসমাজে সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রথম ঘটনাটি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব;

দ্বিতীয়টি বৈষ্ণব-কাব্যসাহিত্যের অভ্যুদয়—অর্থাৎ, বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করিয়া এক অপূর্ব্ব হৃদয়-বিধুরতার আকস্মিক প্লাবন। সেই ভাষাই রসসিক্ত হইয়া যে একটি নবরূপ ধারণ করিল তাহাই সমগ্র-জাতিকে সমভাবে রসাবিষ্ট করিল; তাহার সেই আদি ধাতু-প্রকৃতির উপরেই একটা নূতন রসজীবন গড়িয়া উঠিল। ফলে, সমাজভেদে, সম্প্রদায়ভেদে সেই আদি জাতিগত সংস্কার যেখানে যতটুকু সবল ও সজীব থাকুক না কেন, বাঙালীর কালচার ঐ একটি প্রধান রঙে রঞ্জিত হইয়া গেল। এই রস-সাহিত্যের আদি জন্মস্থান, এবং বৃদ্ধি ও বিকাশের স্থান—উত্তর ও পশ্চিম রাঢ়ই বটে; এবং বাংলা-ভাষার ঐ প্রাদেশিক বুলিই এইরূপ ভাবসমৃদ্ধ ও রসব্যঞ্জনাময় হইয়া অবশেষে বাঙালীর রসজীবনের—অর্থাৎ, তাহার সাহিত্যের—ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। ভাষাই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাহন, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। কবি কুমুদরঞ্জন বাঙালীর সেই দীর্ঘকালগত রসজীবনের কবি; তাঁহার জন্মস্থানও যে সেই আদি বৈষ্ণব-কবিগণের দেশে, তাহাও হয়তো একটা দৈব ঘটনা নহে।

সেই বৈষ্ণব-কবিদের কথাই আসিয়া পড়িল, ঐ কাল্চারের স্রষ্টা তাঁহারাই। কিন্তু আমি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের কথা বলিতেছি না, যদিও ঐ কালচার সেই সাধনমন্ত্রেরই একটা পুষ্পিত রূপ। তথাপি, সেই ফুলটার কথাই আমাদের কাছে বড়; ধর্ম্মের সহিত কাল্চারের সম্পর্ক যেমনই হোক, ধর্ম্ম যখন কালচারে পরিণত হয়, তখন তাহাতে সজ্ঞান ধর্ম্মভাব বা ধর্ম্ম-চিন্তা থাকে না, তাহা আর একবস্তু হইয়া দাঁড়ায়,—জাতির জীবনে তাহা একটি সূক্ষ্ম রসধারারূপে সঞ্চারিত হইয়া থাকে; কাব্যসাহিত্যে তাহারই একটা রূপ ফুটিয়া উঠে। কবি তাঁহার প্রেরণা যেখান হইতেই লাভ করুন না কেন, তাহাতে কিছুই যায় আসে না, তাঁহার কাব্য রসরূপত্ব লাভ করিয়াছে কিনা তাহাই বিচার্য্য; যদি সেই কাব্যে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসও প্রবেশের অধিকার দাবি করে (তাহাও স্বাভাবিক), তাহাতেও কাব্যের রসরূপত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, যদি সেই বিশ্বাস রূপসৃষ্টির সহায় হয়। যেখানে তাহা হয় নাই, সেইখানে তাহা কাব্য হয় নাই। এইজন্য, ভক্তের ভক্তির উচ্ছ্বাস অনেক স্থলেই কাব্যসৃষ্টি করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে—তাহা একপ্রকার ভক্তি-উদ্দীপক সাধন-সঙ্গীতমাত্র হইতে পারিয়াছে; তাহাতে সেই 'রূপ' নাই, যাহা কাব্যের অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। কুমুদরঞ্জনের সাম্প্রদায়িক সাধক-মনোভাব যেমনই হোক, তৎসত্ত্বেও তিনি

কবি—সেই কবিশক্তির পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। আমি এই আলোচনায় কেবল একটি কথার উপরে বিশেষ জোর দিতে চাই, তাহা এই যে, বাংলা কবিতা বাঙালীর যে রসজীবন হইতে একালে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং তাহার ফলে বাঙালী কাব্য-রস প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে—কুমুদরঞ্জনের কবিতা সেই খাঁটি বাঙালী-সংস্কৃতি, ও তাহারই উপযুক্ত প্রাণময় সহজ ও সরল একটি সুরের বাহন হইয়াছে। সেই কাব্য কত উচ্চস্তরের, তাহাতে কবি-কল্পনার প্রসার কতখানি, তাহার কলাশিল্পই বা কত উচ্চাঙ্গের—সে সকল প্রশ্ন অন্য কবির সম্বন্ধেও যেমন, কুমুদরঞ্জনের নিজস্ব কবি-পরিচয়টির সম্বন্ধেও তেমনই অবান্তর; কারণ, কবি যদি সত্যকার কবি হন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্য তাঁহারই মতন হইবে; সেই স্বকীয়তাই আমাদিগকে চিনিয়া লইতে হইবে। আমি এতক্ষণ তাঁহার কাব্যপ্রেরণার বৈশিষ্ট্যই আলোচনা করিয়াছি, এবং একটি মাত্র পংক্তির সাহায্যে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি—পাছে, আধুনিক পাঠকপাঠিকাগণ ঐ 'Bengality of the Bengalians'—কথাটার হাস্যরসটাই উপভোগ করেন, উহার গভীরতর অর্থটি গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন।

এইরূপ কাব্যরসের আলোচনায় আরও একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। উহা যদি সেই জাতিগত রসসংস্কারের কাব্যই হয়—পূর্ব্বে বলিয়াছি, সকল বড় কাব্য তাহাই,—তবে তাহার রসসম্ভোগে আর একটা বস্তুও কম সহায়তা করে না,—তাহা জাতির পুরুষানুগত কতকগুলি ভাব-স্মৃতি; তাহা হইতেই কতকগুলি বিশেষ অনুভূতি জাগে—একরূপ জাতিস্মরতা ভাবরসকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে। সকল জাতিই তাহার কাব্যে সেই সকলের আচম্বিত প্রতিধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ ও চমকিত হয়। ইংরেজি কবিতার রস আমরা মাত্রাভেদে উপভোগ করি; তাহার যেটুকু সার্ব্বভৌমিক বা সার্ব্বজনীন তাহাই আস্বাদন করি; এবং ইংরেজী ভাষার রসগূঢ়ত্ব বা বৈদগ্ধ্যও যেমন, তেমনই ইংরেজ-জীবনের বহুকালাগত সংস্কার আমরা যতটুকু মনোগত করিতে পারি, ততটুকুই সে কাব্যের সূক্ষ্ম রস-রূপ আমাদের চিত্তগোচর হয়। কিন্তু একজন ইংরেজ তাহার রূপমাধুরী যেমন আস্বাদন করিবে, আমরা কিছুতেই তেমন পারিব না। আমি বাঙালী, আমার কাব্যেও কাব্য-রূপসীর এমন একটি কটাক্ষ আছে যাহার মনোহরণ হইতে আর

সকলে বঞ্চিত থাকিবে। অতএব কাব্যরসসম্ভোগে এই জাতিস্মরতার গূঢ়তর সংবেদনাও কম মূল্যবান নহে। আমি ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার ঐ যে একটি পংক্তি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহাই এ এ পর্য্যন্ত আমার যেমন সর্ব্ববিধ প্রয়োজনে লাগিয়াছে—এখানেও লাগিবে। ঐ কবিতাটির ভাবমণ্ডল এমনই যে, আমি একটি বিশেষ কারণে অতি সহজেই উহার দ্বারা রসাবিষ্ট হইয়াছিলাম। একথা পূর্ব্বে বলি নাই—বলিলে আপনারা উহার ঐ বিশুদ্ধ কাব্য-রসরূপ সম্বন্ধে আমার এত কথায় কাণ দিতেন না, আমি আপনাদের কাব্যীয় মতামত জানি। এখন বলিতে আমার ভয় নাই। আমিও একদা পুরীর মন্দিরদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠিক ঐরূপ ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। কবি কুমুদরঞ্জনের পক্ষে তাহার বিশেষ কারণ থাকিতে পারে, আমার পক্ষে বরং ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকই ছিল। তথাপি, আমার সেই 'ব্যক্তি'টাকে যেন সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, শত শত বৎসরের বাঙালী-সংস্কার, বহু পুরুষের ভক্তি-কাতর আত্মা—আমার মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া, সেই বিগ্রহমূর্ত্তির পানে চাহিয়া আমি 'আত্মহারা' হইয়া গেলাম; সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িয়া কেবল ইহাই স্মরণ করিতে লাগিলাম—ঠিক এই স্থানটিতে আসিয়া, ঠিক এমনই করিয়া দাঁড়াইয়া ঐ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবার জন্য, কত যোজন পথ হাঁটিয়া, কি আকুল হৃদয়েই না কত নর-নারী সেই সুদূর বাংলার পল্লী হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে! অনেকে পৌঁছিতে পারে নাই, পথেই প্রাণ হারাইয়াছে। দেবতার কথা নয়, ভক্তির কথাও নয়—একটা সমগ্র জাতির সেই প্রাণের আকুলতা এইখানে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—সেই মূর্ত্তি, সেই মন্দির, সেই চত্বর! আমি যেন সেই প্রণাম-লুণ্ঠিত অগণিত মস্তকের ধূলিধূসরিত কেশ, সেই অপূর্ব্ব আনন্দচ্ছটায় উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখিতে পাইতেছি! উপলক্ষ্য যাহাই হোক—দারুই হোক, আর শিলাই হোক, একটা বিশাল সমাজের মনুষ্য-হৃদয়সিন্ধু এইখানে, ইহারই তটে যুগ-যুগ ধরিয়া আছাড়িয়া পড়িয়াছে,—এখনও পড়িতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, নহিলে আমাকে, আমার মত মহা-নাস্তিককে অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও এমন অভিভূত করিল কেমন করিয়া? এ পুরী এত প্রাচীন বলিয়াই এমন জীবন্ত! বুঝিলাম, এ সেই ব্যক্তি-আমিটা নয়, জাতির আমিটাই আমার উপরে ভর করিয়াছে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই—যখন পড়িলাম—

মন্দির-বায়ু শত ভকতের
ভরা অনুরাগ-মাখা,
তৃষিত অযুত আঁখির আলোক,
ভকত-হিয়ার অধীর পুলক,—
দেবতা-চরণ-চিহ্নিত পথ
মরমে রহিল আঁকা।

*   *   *

দুর্ব্বল হিয়া কাঁপে দুরু দুরু
দাঁড়াইতে তব আগে,
বেদী পরশিতে শিহরে যে বুক,
পূত শঙ্কায় শুকায় এ মুখ,
পাষাণ-হৃদয় হয় বিগলিত,
গলে' যায় অনুরাগে!

তারপর ঐ পংক্তি—

রেখে গেনু, দেব, আঁখির তিয়াষা
আরতির দীপে তুলি'।

—তখন কবির সহিত একাত্ম হইয়া গেলাম।

না, ভক্ত-কবির ভক্তির কথাই নয়, উহাতে বাঙালীর জন্মান্তর-সংস্কার, তাহার জাতিগত 'বাসনা' উদ্বেল হইয়া আছে। আজিকার বাঙালী যে তাহা অনুভব করিতে পারে না, তার কারণ, সে সেই জাতীয় জীবনরস-ধারা ও সেই জাতিস্মরতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

৪

এইবার কাব্যপাঠ। কবির পরিচয় কাব্যে, আর কোথাও নয়, কিছুতেই নয়। আমরা যে এত আলোচনা করিতেছি তাহা কেবল আসরটি তৈয়ারী করিবার জন্য, —আপনাদের মনে, উপভোগের পূর্ব্বে একটু ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য। আরও কারণ, এই কাব্যগুলির রসে কোন রং নাই, মশলা নাই—ইহা শরবতও নয়, একেবারে ডাবের জল। কুমুদরঞ্জনের ভাষায় কোন যত্ন-কৃত পারিপাট্য নাই; তাঁহার ছন্দও—কৃত্তিবাসী পয়ার ও লাচাড়ীকে একটু দোলদেওয়ার ছন্দ, ওই দোলটাই তাঁহার ছন্দের আধুনিকতা। তাঁহার ভাব-বস্তু কল্পনার দ্বারা সংগৃহীত

নয়—চারিপাশের অজস্র উপচীয়মান অতি সুলভ দৃশ্য, ঘটনা ও মানুষ; ক্ষুদ্র বাস-পল্লীর অণু-পরিমাণ বৈচিত্র্যও, এবং (সৌভাগ্যক্রমে) তাহার পুরাকালীন তীর্থ-মহিমা তাঁহাকে অনুক্ষণ রসাবিষ্ট করে,—কবিতার ধারাও তেমনই অফুরন্ত। এ কাব্য এমন সরল সহজ বলিয়াই ইহার রস-রূপের ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করা একরূপ অসাধ্য বলিলেই হয়। এই 'সহজ, সরল'-এর আনন্দ বুঝাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের মত কবিও ফাঁপরে পড়েন, যদিও তাহাতেই একটি কবিতার জন্ম হইয়াছে, যথা—

সহজ আনন্দখানি,
কেমনে সহজে তারে তুলে ঘরে আনি,
প্রফুল্ল সরস! কঠিন আগ্রহভরে
ধরি তারে প্রাণপণে, মুঠির ভিতরে
টুটি' যায়। হেরি' তারে তীব্রগতি ধাই
অন্ধবেগে, বহুদূরে লঙ্ঘি' চলে যাই,
আর তার পাই না উদ্দেশ।

—অতএব, আসুন, আর কথা নয়, একেবারে চুমুক দেওয়াই যাক্।

প্রথমে, কবি নিজেই নিজের কবিতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই শুনাইব।

অষ্টাঙ্গেতে নাইকো কোথাও অষ্টরতি সোণা,
পরনেতে রাঙাপেড়ে শাড়ী তাঁতের বোনা।
পা দুখানি আল্তা-রাঙা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে,
কর্ম্মকাজে গিয়া ধনী আত্মীয়দের গৃহে,
থাকে যেমন উপেক্ষিত, — তেম্‌নি মেঠো গীত,
সাহিত্যেরি হর্ম্ম্যে ফিরে হ'য়ে সশঙ্কিত।
নাই কো তাহার গয়না-গাঁটী, নাইকো ভাল বেশ,
অমার্জ্জিত রূপটি তাহার, অসংযত কেশ।
যদি বা কয় দু'এক কথা — শুনে কথার টান
হাস্য করে অন্য সবে, রয় সে ম্রিয়মাণ।
একটি কথা বলতে গিয়ে খায় সে থতমত,
একটি দিবস হয় যে মনে একটি যুগের মত।
সভ্যতা হায় চেড়ীর মত রয় তাহারে ঘিরি,—
কাঁদে বালা পঞ্চবটীর কুটীরখানি স্মরি'।

('মেঠো-গান', বনমল্লিকা)

ইহার পর কবি-হৃদয়ের পরিচয়, ও কবির কামনা।—

(১) হয়ত' আমার এ পথে আর
হবেনা ক' আসা,
দু'ধারে যাই রোপণ ক'রে
বুকের ভালবাসা।
ধূলার এ পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমর ক'রে যাই রেখে যাই
ক্ষণিক কাঁদা-হাসা।
সরায়ে দিই পথের কাঁটা,
ছড়ায়ে যাই ফুল,
নিকায়ে যাই স্নেহের বেদী,
ছায়া-তরুর মূল।
মমতা মোর পথের কীটও
পায় যেন হায়, পায় যেন গো,
বন-বিহগের কণ্ঠে আমার
অমর হউক ভাষা।
* * *
হয়তো কারো হরবে ক্ষুধা
আমার তরুর ফল,
স্নিগ্ধ কারো করবে দেহ
অশ্রু-দীঘির জল।
ঝরা-ফুলের গন্ধে ওরে,
হয়তো কেহ স্মরবে মোরে,
ভাবুক পথিক বলবে হেসে—
লোকটা ছিল খাসা।
('হয় ত', অজয়)

(২) পথে দেখেছিনু হা-ঘরে' বালক
কাঁপিছে দারুণ শীতে,
বলেছিনু তারে বাসায় যাইতে
ছিন্ন বসন নিতে।
সে গেল ফিরিয়া না পেয়ে আমায়
আমি তদবধি খুঁজে মরি তায়,
আজি এ বাদলে ম্লান মুখ তার
উঁকিঝুঁকি মারে চিতে।
* * *
রেলে যেতে কবে লয়েছিনু ফল
দিলাম পয়সা ছুড়ি';
কোথায় পড়িল ভিড়ের মাঝার,
খুঁজিতে লাগিল বুড়ি।
গাড়ী চ'লে এলো, জানিনে ত আহা,
গরিব মালিক পেলো কিনা তাহা,
আজ মনে হয় সে রয়েছে চাহি'
নামায়ে ফলের ঝুড়ি।
('পথের দাবী', অজয়)

কিন্তু কবি-হৃদয় ছাড়া এ-কবিরও মন বলিয়া একটা বস্তু থাকিবে তো? ইহারও কতকগুলি ভাব-সংস্কার, নীতি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস আছে; অবশ্য কোন্‌টা মতবাদের মত নয়—মতবাদ হইলে তাহা কবিতার অঙ্গ হইত না; কুমুদরঞ্জনের মত কবির কোন মতবাদও থাকিতে পারে না। তাঁহার মানস ও তাঁহার ব্যক্তি-স্বভাবে কোন পার্থক্য নাই; সকল চিন্তা ও সকল মতবাদ সত্ত্বেও মানুষ যাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না—পারিয়াছে বলিয়া মিথ্যা দম্ভ, এবং মিথ্যাচার করিয়া থাকে,—কুমুদরঞ্জন তাহাই অকপটে কবুল করিয়াছেন। সেই স্বভাবগত বিশ্বাস

বা নীতি-সংস্কারের পরিচয় তাঁহার কাব্যে একটি লিরিক্-আবেগ-যুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তার কারণ, ঐ ভাবগুলা তাঁহার জীবনেরই সত্য। নিম্নে আমি যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমি কবির সেই ব্যক্তিগত ধর্ম্মমন্ত্র বা হৃদ্‌গত বিশ্বাস বলিতে কি বুঝি—কবি এই মানুষের সংসার ও সমাজকে কোন্ চক্ষে দেখেন, তাঁহার সেই ভাব-দৃষ্টিতে কল্যাণের আদর্শ কি।)

(১) অস্পৃশ্যের আবেদন—

ধন্য হয়েছি মোরা তোমাদের চরণের রেণু চুমি',
উচ্চেই থাক, আমারে উঠাতে নামিয়া এসো না তুমি।
তুমি থাক' নিতি সুদূর উচ্চে মহামহিমায় ঘেরা,
মোরা উঠি সেথা ভক্তির পথে ভাঙিয়া জাতির বেড়া।
আমাদের আছে আপনার জন দেবতার কাছাকাছি —
এ কথা স্মরিয়া বুকে বল পাই, ঐ আশা নিয়ে বাঁচি।

তোমাদের সব—সব সদাচারে হোক আমাদের দাবী;
পংক্তি-ভোজনে কি মান বাড়িবে? মোরা সেই কথা ভাবি।
তোমরা শিখর, আমরা সোপান—এক-হৃদি মহাজাতি,
একই সনাতন ধর্ম্মের মোরা বিরাট দেউল গাঁথি।
পরশের মোরা নহি ত' কাঙাল—শ্রীরাম দে'ছেন কোল,
শ্রীগৌরাঙ্গ বুকে জড়াইয়া বলেছেন 'হরিবোল'।

*　　*　　*　　*

সমাজ আমার নামিয়া আসিবে নিম্নে আমার স্তরে—
ভাবিতেও আমি শিহরিয়া উঠি, পরাণ কেমন করে।
আমারে উঠাতে যে শক্তি চাই—চাই যেই মহা-পণ,
আমাদের মাঝে হোক উদ্ভব—সেই নব নারায়ণ।
তুমি সোনা থাক—আমি যে লৌহ, ছুঁয়ে কোন ফল নাই,
পরশমাণিক চিন্তামণির পরশন আমি চাই।

(স্বর্ণ-সন্ধ্যা*)

---

* 'স্বর্ণসন্ধ্যা' কবির নূতন কবিতা-সংগ্রহ — শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। কবিতাগুলি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) ভৃত্য—

মনুরে আমিই মানুষ করেছি, সহিয়াছি আবদার,
কোলে ক'রে আমি কান্না ভুলানু সেদিন মান্ধাতার।
রামভদ্রের হামাগুড়ি দেখে হাসিয়া হয়েছি খুন,
'দাদা' ব'লে মোর গরব বাড়ালে বালক ভীমার্জ্জুন।
আমি আসি যাই, শুধু সেবা করি, সদা প্রফুল্ল মন,—
আমার সুখের নিকটে তুচ্ছ রাজার সিংহাসন।
উমার বিয়ের টোপর এনেছি, আনিয়াছি চিঁড়া ক্ষীর,
অক্ষয় শাঁখা গড়ায়ে এনেছি বিবাহে সাবিত্রীর।
দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বহিয়াছি শতভার,
দ্বিরাগমনেও সঙ্গে গিয়াছি শ্রীবৎস-চিন্তার।
পাতিয়া দিয়াছি বেদব্যাসের আমিই অজিনাসন',—
জননান্তর-ভাগ্য স্মরিয়া উড়ু উড়ু করে মন।

মনিব ছিলেন কালিদাস মোর, ছিনু তাঁর অনুরাগী,
তুলট-কাগজ কিনিয়া এনেছি 'শকুন্তলা'র লাগি'।
কৃষ্ণদাসের পাদুকা বহেছি, ধোয়ায়েছি পদ আমি;
মোর হাত হ'তে হরীতকী লন সনাতন গোস্বামী।
চণ্ডীদাসের লেখা পদাবলী আমি রাখিতাম তুলি',
স্বহস্তে আমি সেলাই করেছি নরোত্তমের ঝুলি।
রামপ্রসাদের বেড়ার বাখারি আমিই এনেছি বহি',
মহামায়া এলো কন্যা হইয়া—দেখিয়াছি দূরে রহি'।
ধনী-মহাজন, রাজা-মহারাজা—হিংসা করিনে কারু,
গর্ব্ব আমার—বিদ্যাপতির বহেছি গামছা-গাড়ু।
(স্বর্ণসন্ধ্যা)

(৩) দরিদ্রতা—

জানি, তুমি সব গুণরাশিনাশী,
সকল শক্তিহরা,
করঙ্গ তব দুখীর রক্ত
আঁখির সলিলে ভরা।

অসীম ক্ষমতা, মমতা-বিহীন—
হীরা গলে' যায় তাপে,
ভীম তালতরু মাটিতে লোয়ায়
ক্ষীণ অঙ্গুলি-চাপে।

হিমের নিদাঘে কমল ফেরার—
সলিল-প্রাসাদ ছাড়ে,
গঙ্গা চলেন বহি' অঙ্গার
রত্নাকরের দ্বারে।
গুণী বট তুমি একথাও জানি,
একথাও যায় শোনা—
দুখের আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে
উজ্জ্বল কর সোনা।

বাঘের মতন তুলে নিয়ে যাও—
না কেঁদে রহিতে পারি,
টানিবে নোংরা কাঁটাবন দিয়ে
—সেইটে সহিতে নারি।
সবল মরালে শর বিঁধে মারো—
সহিতে পারিবে সেটা,
বিমল পালক ময়লা কোরো না
লাগায়ে 'কাঠি'র আঠা।
যূথিকারে তুমি খাতক কোরো না
হীন সেঁয়াকুল কাছে,
পাপিয়ারে তুমি চাতক কোরোনা—
কবি এ করুণা যাচে।

(অজয়)

এই প্রসঙ্গে আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, তিনি কেমন মানুষের পূজা করেন। এই মানুষ-পূজার অনেকগুলি বিগ্রহ তাঁহার কাব্যে, গাথা বা কাহিনীর বিষয় হইয়াছে—উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় বলিয়াই করিলাম না, নতুবা দেখিতে পাওয়া যাইত, কবির সমাজ কোন্ মানুষের সমাজ। আমাদের চক্ষে যাহারা হীন, এমন কি কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার পাত্র, তাহাদের মধ্যেই মনুষ্যত্বের মহিমা কত রূপে লোক-লোচনের অগোচরে নিত্য প্রকাশমান রহিয়াছে। মনুষ্যত্বের এই আদর্শ—এই মানুষের পূজাই—বাংলার মজ্জাগত ডিমোক্রেসি, উহাই বাঙালীর আধ্যাত্মিক জীবনকে এমন অনন্যসাধারণ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা যে নিবিড়-গভীর গূঢ়-সঞ্চারী মানবতার সুর বাউলের একতারার মত বাজিয়া উঠিতে দেখি, তাহা এই মজ্জাগত বাঙালীত্বের নিরুদ্ধ আবেগ; তিনিও তাঁহার সেই অত্যুচ্চ স্বর্লোকমুখী কল্পনায় অন্তরের কবি-পুরুষকে জ্যোতির্ময় রাজটীকা পরাইয়া, শেষে এই ধূলামাটিতে গড়াগড়ি দিয়া—ঐ মানুষের বন্দনা করিয়া, তবে প্রাণের তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। উপায় নাই যে! তিনিও যে বাঙালী। তাঁহার 'ছোটগল্প' এই মানুষেরই পূজা করিয়াছে কতরূপে! 'পঞ্চভূতে'র 'মনুষ্য'-নামক প্রবন্ধে তিনি ইহাকেই তাঁহার কাব্যমন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে যে একটি নূতন ধারা সহসা বেগবতী হইয়া উঠিয়াছে—সেই কথা-সাহিত্যের যে-কথায় বাঙালী আপনার

মুখচ্ছবি দেখিয়া চমকিত ও বিস্মিত হইয়াছে, এবং বাঙালীর কথাই সেই রস-রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া যাহা খাঁটি বাংলা-সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে—তাহারও মূলে রবীন্দ্রনাথের ঐ খাঁটি বাঙালী-প্রতিভা,—মন্ত্রটি তিনিই ধরাইয়া দিয়াছিলেন।

কুমুদরঞ্জনের এই কবিতাগুলিতে সেই মানুষপূজাই, হৃদয়ের আদি-কাব্যমন্ত্রে, ও অনাড়ম্বর শুচিতায় সম্পন্ন হইয়াছে। মানুষকে দয়া করা, মানুষের উপকার করা প্রভৃতির মত মনুষ্য-প্রেম ইহা নয়—ঐ নর-রূপের মধ্যেই মহা-রূপের অধিষ্ঠান দেখিয়া যে প্রকৃত মানুষ-পূজা, ইহা তাহাই। আমাদের পল্লী-সমাজে—বাঙালীর নিজস্ব সাধনার সেই সাধন-ক্ষেত্রে, এক কালে এই মানুষ-দেবতার অভাব ছিল না; এখনও একেবারে বিরল হয় নাই, তাহার প্রমাণ কবির এই সাক্ষ্য; বর্ত্তমান লেখকও তাহার কিছু-কিছু সংবাদ রাখে। এই মানুষই বাংলার আদর্শ-মানুষ,—বীর নয়, 'নেতা' নয়, রাষ্ট্রনায়ক নয়, রাজনীতি-ধুরন্ধর নয়, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতও নয়—কেবল মানুষ; সে মানুষ—হৃদয়বান, সত্যবান, একাধারে ত্যাগী ও সংসারী, আত্মবিশ্বাসী, এবং—"দারিদ্র্যের মৃদুগর্ব্বে চরিত্র সুন্দর"। ইহাও বাঙালীর সেই কালচারের ফল—তাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরে আরও কিছু বলিব। কুমুদরঞ্জনের মানুষ-পূজার একটি বিগ্রহ এইরূপ—

"পঞ্চাশ পার হয়েছে বয়স,
বাঁচিব বা কত দিন?
দেখিছ না মোর দেহ একে একে
হইয়া আসিছে ক্ষীণ।
যাহা আনিয়াছি তাহাই দিয়েছি
শুধু তোমাদের পাছে,
তীর্থে যাইব, কড়িটিও আজ
নাহিক' আমার কাছে।"
পিতার বচন শুনিয়া তনয়
বলিল ঈষৎ হাসি'—
"যেরূপেতে পারি দিব দু'শো টাকা,
ক'রে এসো গয়া-কাশী"।

কোথা গয়াধাম, কোথায় মথুরা,
কোথা বা সুদূর কাশী,
শালোগু-গ্রামে রায়েদের বাড়ী
উঠিলেন তিনি আসি'।
ডাকি' কর্ত্তারে অশেষ বিনয়ে
নফরচন্দ্র কয়,
"আপনার কাছে দুই শত টাকা
ঋণী আছি, মহাশয়"।
* *
বিস্মিত রায় বলিলেন, "এই
খাতাপত্তর ভাই,
তোমাদের কই ঋণের কথার
একটি বর্ণ নাই।"

"পিতা মোর যবে পাঁচ বছরের
পিতামহ যান চলি,
"রায়েদের বাড়ী দুইশত টাকা
ঋণী আছি আমি' বলি"।
অল্প বয়সে ইহলোক ছাড়ি'
পিতাও গেলেন পরে,
পারি নাই মোরা শুধিবারে ঋণ
দুইটি পুরুষ ধরে'।
নয় বছরের শিশু আমি যবে,
বিদায়ের দিন মাতা
বলিয়াছিলেন, প্রপিতাদেবের
এই সে ঋণের কথা।
তারপর হায় নানা ঝঞ্চাটে
চ'লে গেল কত দিন,
আমারো সময় ঘনায়ে আসিছে
শুধিতে নারিনু ঋণ!

"পিতামহ তব দেছিলেন ঋণ—
কাগজে কি আছে কাজ?
পুরুষে পুরুষে রয়েছে যে লেখা
আমাদের হৃদিমাঝ।"
বহু মিনতিতে শ্রীমন্ত রায়
টাকা ক'টী হাতে তুলি',
সজল নয়নে বারেক দু'জনে
করিলেন কোলাকুলি।
* *
নফরচন্দ্র সুস্থ হৃদয়ে
এতদিন পরে আজ
শুইলেন আসি আপনার সেই
পৈত্রিক গৃহমাঝ।
হাসিও না শুনি' এ তীর্থভ্রমণ,
হে পাঠকমহাশয়,
গয়ার পিণ্ডে পিতৃপুরুষ
এত কি তৃপ্ত হয়!

("তীর্থযাত্রী," উজানী)

দেখুন দেখি, এমন মানুষ কি আপনাদের পছন্দ হয়? আপনারা যে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন—সেই ধর্ম্মের মানুষগুলি যে-মহিমায় দেশকে ও জগতকে আলোকিত করিতেছে তাহার তুলনায়, এই অখ্যাত, গ্রাম্য, রাষ্ট্রচেতনাহীন, ত্রিবর্ণ-পতাকার মন্ত্রদীক্ষাহীন, অতি-নির্ব্বোধ মানুষটা কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য!

কুমুদরঞ্জনকে আমি যে খাঁটি বাঙালী কবি বলিয়াছি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ, এই কবি বাংলার পল্লীকে—শুধু প্রাণ দিয়া ভালবাসা নয়, আত্মার পরম তীর্থরূপে বরণ করিয়াছেন। য়ুরোপীয় রোমাণ্টিক গীতিকাব্যের প্রভাবে, আমাদের এ যুগের কবিরা একরূপ প্রকৃতি-প্রেম ও পল্লী-প্রেম, এবং সরল 'ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্দীয়' কৃষক-কৃষাণী-প্রীতি তাঁহাদের কাব্যে প্রকটিত করিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাকে বৈষ্ণব-ভাবের দ্বারা রসোজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু সে সকলের মধ্যে একটা সজ্ঞান আর্ট-সাধনা অল্পাধিক মাত্রায় আছে—জীবনকে দূরে ধরিয়া শিল্পীর দৃষ্টিতে তাহার

সৌন্দর্য্য উপভোগ করার ভঙ্গি আছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের পল্লী-গীতি ঠিক সেই ধরণের কবিতা নয়; তার কারণ, জলের সঙ্গে মাছের যে সম্বন্ধ, পল্লীর সহিত কুমুদরঞ্জনের সম্বন্ধ সেইরূপ; তাঁহার কবিতাগুলি যেন কবির রচিত নয়—ঐ পল্লীর অধিদেবতাই সেগুলি লিখিয়া দিয়াছে। আবার, সেগুলির প্রেরণামূলে প্রকৃতি-প্রেমও যেমন, তেমনই, আমি সেই যে কালচারের কথা বলিয়াছি—যাহা মূলে বৈষ্ণব হইলেও, পরে 'বাঙালী' হইয়া উঠিয়াছে—সেই কালচারও আছে। অতএব, তাঁহার এই পল্লী-বন্দনা কেবল আর্ট বা রূপ-পিপাসার কবিতা নয়, তাহাতে একটি গভীরতর অধ্যাত্ম-সংবেদনা আছে। একটি কবিতায় কবি যেন এই কথাটাই ফুকারিয়া বলিয়া উঠিয়াছেন—

তোমারে যে আমি ভাল বাসিয়াছি—
কাব্য পড়িয়া নহে;
নহে ক' শ্যামল স্নেহের লাগিয়া,
অন্যে যে কথা কহে।

হয়েছি তোমার সুখদুখভাগী—
নহে ক' নেহাৎ অভাবের লাগি';
আমার ভক্তি, এ অনুরক্তি
হৃদয়রক্তে বহে।

তোমার আদরে মানুষ হয়েছে
মোর পিতা-পিতামহ,
অণুকণা তব সে পুণ্য-কথা
কহে মোরে অহরহ।

তুমি মোর গয়া, তুমি মোর কাশী,
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি,—
একদিকে তুমি 'ভ্রমরা' আমার,
আর দিকে 'কালিদহ'।

* *

আমি নর্ম্মদা-মর্ম্মর-তটে
বাঁধিতে চাহিনা ঘর,
উচ্চ প্রাসাদ-অলিন্দ হেরি'
ভীত মোর মধুকর।

নেবুর কুঞ্জে, মাধবীর শাখে
ছোট মৌচাক বাঁধিয়া সে থাকে,
কাশ্মীর-'ডাল'-কমলকানন
নয় তার প্রিয়তর।

('পল্লী', স্বর্ণসন্ধ্যা)

এই পল্লী-প্রীতির একটি বাউল-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি—কুমুদরঞ্জনের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা—

তোরি আঁচলের খুঁট ধরে' যাই
ভরা-অজয়ের ঘাটপানে;
তোরি পাদমূলে দাঁড়াইয়া চাই
রামধনু-আঁকা মাঠপানে।

মন্দিরে তোর সাথে সাথে যাই,
পীযূষ-প্রসাদ হাত ভরে' পাই,
ভগবতী যার সুমুখে, তাহার
বৃথা ভাগবত-পাঠ কেনে?

দিওনা আমারে দরবারে যেতে—
দুরুদুরু কাঁপে বক্ষ, মা ;
আছে শুধু দীন দুর্ব্বল দুখী
অক্ষম সাথে সখা, মা।
জ্ঞানাঞ্জনের শলাকার ভার
জলভরা চোখ স'বে না আমার,
কাজল-লতার কাজলে তোমার
জুড়াও নয়ন, রক্ষ, মা।

যেন মা তোমার স্নেহের দীঘিতে
কমলের সাথে নাইতে পাই ;
যেন মা তোমার বিপিন-ভবনে
পাপিয়ার সাথে গাইতে পাই।
চন্দন সাথে যেন রোজ রোজ,
পরশি মা তোর চরণ-সরোজ,
যেন মা তোমার চাতকের মত
হরির করুণা চাইতে পাই।

('পল্লী-শ্রী', অজয়)

এহেন পল্লীর বিরহে কবির এইরূপ বিলাপ কি সত্য নহে ?—

বনবাস মোর শেষ হবে কবে —
জান যদি কেহ, কহ রে ?
চৌদ্দ বরষ রয়েছি যে আমি
পাড়াগ্রাম ছাড়ি' সহরে।
কাননে রামের বহু সুখ ছিল,
ছিল ফুল তরু লতা হে,
স্বচ্ছসলিলা ছিল গোদাবরী
ভুলিতে পারিত ব্যথা হে।
এখানে নাহিক' বনমর্ম্মর,
বনবিহগের সাড়াটি,
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি
ক্ষীণ কল-জল-ধারাটি।

কোথা আমগাছে ঝুল-ঝাপ্পুর,
কোথা বটগাছে ঝুলবো,
কোথা অজয়ের সেই শ্যাম-কূল
যেথা বুনো কুল তুলবো।

*   *

হাঁফ ছাড়িবার সময় নাহি মা,
পেটেতে নাহি মা অন্ন,
দিশেহারা হয়ে ছুটেছি কেবল
স্বর্ণমৃগের জন্য।
আর কি তোমার কোমল কোলে মা,
পাবনা ক' আমি ফিরতে —
শৈশব-সুখ-স্বর্গ আমার
সরযূর তীর-তীর্থে ?

("প্রবাসী", বনমল্লিকা)

'এ শ্রেণীর কবিতা আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, কুমুদরঞ্জনের সকল কবিতারই জন্মভূমি ঐ পল্লী ; কারণ, কবির হৃদয়-ভূমি আর ঐ পল্লীভূমি যে এক।

কিন্তু পাঠক-পাঠিকা—বিশেষ করিয়া পাঠকগণ—বোধ হয় ইতিমধ্যেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন': এতক্ষণ ধরিয়া এত কবিতা পড়িলাম—তা' বেশ ভালো

কবিতাই বটে—কিন্তু আসল কবিতা কই—প্রেমের কবিতা? আজকাল গল্প, উপন্যাস ও কবিতাই প্রেমসম্ভোগের একমাত্র উপায় হইয়াছে, ঐ রস আর কোথাও আস্বাদন করা ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, স্বপ্নক্লান্ত কবি-কবিনীগণ কবিতার অক্ষরে অক্ষরে দিবা-স্বপ্ন ও নিশীথ-স্বপ্নের সেই প্রেম, ও তাহার বহুবিধ নিঃশ্বাস এবং হাই ভরিয়া দিয়া থাকেন; সেই কাতরতার সাঙ্কেতিক ভঙ্গিমায়—সেই রূপরেখাহীন মনোভঙ্গিমায়—তনুও অতনু হইয়া যায়। এহেন চোরাবাজারী প্রেম-দুর্ভিক্ষের দিনে, কবিতাতেও যদি প্রেম-ক্ষুধার তণ্ডুল না মেলে তবে বৃথাই কবিতা পাঠ! তেমন বুভুক্ষু পাঠক-পাঠিকার নিকটে আমি বড়ই অপরাধ করিয়াছি, কারণ সে বিষয়ে হয়তো তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতেই হইবে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের পরিচয় এতদূর পাইবার পর তাঁহারা কি এমন কবির মুখে ঐরূপ প্রেমের কবিতা শুনিতে আশা বা ইচ্ছা করেন? আমি এমন বলিতেছি না যে, প্রেমের কবিতা নিকৃষ্ট কবিতা—কুমুদরঞ্জনের মত কবি তেমন কবিতা লিখিবেন কেন? কিন্তু সকলের প্রেম তো এক নয়? কুমুদরঞ্জন যে-প্রেমের প্রেমিক তাহাতে, বিশেষ করিয়া যৌবনকে এবং যৌবনের ঐ পিপাসাকে মহিমান্বিত করা তাঁহার পক্ষে কি সম্ভব বা স্বাভাবিক? তবে আর তাঁহার কি পরিচয় করিলাম? এ কবির মধ্যে একটি চির-কিশোর আছে; জীবনের এই আনন্দ-মেলায় সে কেবল তাহার সেই তালপাতার বাঁশিটি বাজাইয়া আপন মনে, আপনারি আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়; তাই না আমরা তাঁহার কবিতায় একটি নিরাবিল প্রীতির—নব-নবনীতের মত স্নিগ্ধ-কোমল, কমনীয় মাধুরীর—আস্বাদ পাই।

কুমুদরঞ্জন যে একটি বিশিষ্ট ভাব-জীবনের কবি, তাহা আমরা দেখিয়াছি—সেই জীবনে কবি-মানুষটি কবি হইতে ভিন্ন নয়; ভিন্ন হইতে পারে না, ইহাও বলিয়াছি। গীতি-কবি মাত্রেই যে এইরূপ মানুষ-কবি, তাহা নয়; বরং কবিত্বের স্বাধীন স্ফূর্তির জন্য কবির বাস্তব-জীবন ও ভাব-জীবনে কোন বন্ধন না থাকাই আবশ্যক বলিয়া মনে হয়; সকল কবিতাই বিহগ-গীতির মত 'unpremeditated art' নয়। তথাপি গীতি-কবিমাত্রেরই অকপটতা আছে, তীব্র অনুভূতি আছে; কারণ, বাস্তব ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করিয়া কবি যে আর এক ব্যক্তিত্ব লাভ করেন, সেখানে সেই ব্যক্তিই অকপট। এইজন্য গীতিকাব্যেও দুইটা ব্যক্তি থাকে,

—একজন, সেই কবিতার কবি ; আর একজন, সেই কবিরও পশ্চাতে যে বাস্তব মানুষটা আছে সেই মানুষ। তাই একথাও সত্য—

কাব্য দেখে যেমন ভাবো
কবি তেমন নয় গো।
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয় না পড়ে' নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয় গো।
(ক্ষণিকা, 'কবি')

কিন্তু এ কবি সে জাতের কবি নয়—প্রায় সেই আদিম জাতের কবি বলিলেই হয় ; তাই তো ইঁহাকে লইয়া আপনাদের মত 'বিলাস-কলা-কুতূহলী' নব্য কাব্য-রসিকদের সভায় এমন বিপদে পড়িয়াছি। ইঁহার ভাব-জীবনও এতটুকু কাল্পনিক নয়,—তাহাও তাঁহার স্বভাব বা স্বধর্ম্মের বাস্তব। এই অর্থে, তাঁহার 'কল্পনা' নাই বলিলেই হয়।

উপরে যে কিশোর বা বালক-স্বভাবের কথা বলিয়াছি, তাহার সেই প্রীতিরস (পিরীতি নয়) যখন তীব্র ক্ষুধার সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহা যে আর একটি রসে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক, সে-ও এক প্রকার ভক্তিরস—মধুর-রসের পরিবর্ত্তে সেই রসেই তাহা পরিণত হয়। সেই ক্ষুধা মাতৃস্নেহের ক্ষুধা, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। পত্নীপ্রেম বা যুগল-জীবনের রসপিপাসাকে অতিক্রম করিয়া এই ক্ষুধা তাঁহার কাব্যে যে তীব্র-গভীর অথচ সরল ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা একালের বাংলা কাব্যে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি কয়েকটি এইরূপ কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

মাগো আমার পুণ্যময়ি!—তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনম জনম পেলাম তোমার এই করুণা, এই মমতা।
গুল্ম হয়ে, বসুন্ধরে, স্তন্য তোমার টেনেছি গো,
তারা হ'য়ে, নীলিমা, তোর বুকের দরদ জেনেছি গো।
চাতক হয়ে, তোমায় আমি কাতর হয়ে ডেকেছিলাম,
পূর্ণিমা, তোর সুধার আদর চকোর হয়ে চেখেছিলাম।

বৎস হয়ে, শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছি গো,
হরিণ-শিশু—তোমার সাথে কোথায় তৃণ খুঁটেছি গো
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী, তুমি আমার ডাকিনী-মা,
উষ্ণতা এই রক্তে দিলে দুগ্ধ তোমার, বাঘিনী-মা।
দোল্‌নাতে মা জনম-জনম তুমিই আমায় দোল দিয়েছ,
আমি যখন কুসুম-কোরক, লতা হয়ে কোল দিয়েছ।
শবরী-মা—আঁচল দিয়ে বুকে আমায় বেঁধেছ গো,
দুখিনী-মা—আমায় লয়ে ভিখ্‌ মাগিয়া কেঁদেছ গো।
আমার লাগি' হর্ম্ম্য রচি' আপনি থাকো শ্মশানে মা,
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি' তুমিই ছোট মশানে মা।
পক্ষিণী-মা, বুঝতে পারি এই বুকেতে তা দিয়েছ,
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি, জনম-জনম যা দিয়েছ।
তোমার ডাকে চাঁদ আমারে টিপ্‌ দিয়ে যায় বরণ করি',
সাঁজের প্রদীপ লয় মা আমার আলাই-বালাই হরণ করি'।
পান্না ঝরে কান্নাতে মোর, মাণিক ঝরে হাস্যেতে গো,
লুকাচুরি খেলেন গোপাল কোমল কচি আস্যেতে গো।
জনম-জনম মা হয়েছ—জনম জনম হবেও মা,
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার—তোমার কাজল, তোমার চুমা।

("মাতৃস্তোত্র", স্বর্ণসন্ধ্যা)

চিঠিখানি মায়ের হাতের লেখা
শুক্রবারে পেয়েছিলাম কবে,
গভীর স্নেহ অমৃতের সে রেখা—
ভাবি নাই তো শেষ চিঠি যে হবে।

বুড়ো-খোকার তৃষিত এই মুখে
মায়ের বুকের শেষ দুধের এ ধার,
শেষের কাজল জলভরা এই চোখে—
এ জনমে মিলবে না ত আর!

("শেষ চিঠি", স্বর্ণসন্ধ্যা)

রাঙা রবির উদয় দেখে
আনন্দে মোর মন মাতে
ইচ্ছা করে নূতন দেশে
নূতন হয়ে জন্মাতে।

আবার যেন হাস্‌তে সে চায়
প্রভাত-কিরণ-সম্পাতে।
পোষের নিশির শিশির-চাপে
মুমূর্ষু ঐ কমল কাঁপে,

পীড়ায় যখন অবশ তনু,
    ফুরায় যখন আনন্দ,
মৃত্যু যে অমৃত বিলায়
    নয়কো মোটেই তা' মন্দ।
রুগ্ন শরীর—নয়ন-নীরে
শাবক হতে চায় সে ফিরে,'—
মায়ের আনন সে চায় শুধু,
    চায় না গোটা কানন ত!

ভিড়ের মাঝে হারায় যে মুখ
    পাই খুঁজে আর কৈ তারে?
মন-মাঝি আর বাইতে নারে,
    বলে, নে এই বৈঠারে।
তুফানের এই ভাসান বেলা—
সাঙ্গ করে' আলোর মেলা,
অন্ধকারে ফিরছে খুঁজে
    বাঁধা ঘাটের পৈঁঠারে।

*   *

পূরবীতে ললিত মিশে
    বাজে যখন ভুল বীণা,
বিশ্ব যখন নিঃস্ব লাগে—
    সেথায় থাকা চল্‌বে না।
সাহস-হারা দুর্ব্বল, ভাই,
কোথায় আবার মিল্‌বে রে ঠাঁই?
নূতন দেশে নূতন ঘরে
    মায়ের স্নেহের কোল বিনা?

*   *

ঝাপ্‌সা-লাগা সজল আঁখি
    নূতন কাজল মাগছে রে!
বুভুক্ষিত তপ্ত হিয়ায়
    স্তন্য-তৃষা জাগছে রে!
হতাদরের পরাণ যে ফের,
    চাইছে সোহাগ মা-মাসীদের,
অনাগতের অমৃত-ঢেউ
    অধর-কোণায় লাগছে রে!

["রোগ-শয্যায়", স্বর্ণসন্ধ্যা]

(তবু দুই একটি কবিতাকে প্রেমের কবিতা বলিলে ভুল হইবে না, সে কেমন প্রেম পাঠক-পাঠিকারাই বিচার করিবেন।)

নয়নে পড়েছে মৃত্যু-কালিমা—
    দেরী নাই বেশী আর,
মোর পানে প্রিয়া তুলিল বারেক
    করুণ নয়ন তার।
অঞ্চলে বাঁধা চাবি-রিং তার
    দিল মোর পদতলে,
শুভদৃষ্টির দুইজোড়া আঁখি
    ভরিয়া উঠিল জলে।

বিজন দুপুরে উদাসী পরাণ,
    হাতে নাই কোনো কাজ—
বাক্সটী তার কাছেতে আনিয়া
    খুলিয়া দেখিনু আজ।
রহিয়াছে সেই আশীর্ব্বাদীর
    ইয়ারিং একজোড়া,
ঠাক্‌মার দেওয়া প্রাচীন ঝুম্‌কা
    লাল কৌটায় ভরা।

তারি সাথে আছে চিঠি একতাড়া
অনেক দিনের লেখা—
নব-অনুরাগ-রঞ্জিত লিপি
আজ পড়িতেছি একা।
পড়ি আর কাঁদি কত শরতের
গত-উৎসব স্মরি',
ঝরা-শেফালির আলিঙ্গনের
আমেজ রয়েছে ভরি'।
ছোট ছোট কথা, ছোট দুখ-সুখ
গাঁথা আছে তার সাথে,
ফুলশয্যার শুষ্ক কুসুমে
অতীত সুরভি রাজে।
যৌবন হেথা বাঁধা পড়িয়াছে —
দেখে মনে হয় ভুল,
কুড়ানো উপলে পাই যে আবার
ঝরণারি কুলকুল।
ক্ষুদ্র ঝিনুক প্রেম-সাগরের
খবর দিতেছে ভাই,
চরণ-সিঁদুরে দেবী-প্রতিমার
কৃপার আভাস পাই।
হায়, আঙুরের বাক্সে আমার
রাখিল কে হীরাচুর,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি করিল কে মোর
বেদনায় ভরপুর।
পূজারিণী যবে খুলে দিয়ে গেল
আজি মন্দিরদ্বার,
আছে ধূপ-দীপ, বিল্বপত্র —
দেবী যে নাহিক আর!
("শেষ দান", ।)

মাঝি — ভিড়ায়োনা, চলুক তরী
নদীর মাঝে,
তরী — এ ঘাটেতে বাঁধব না কো
আজকে সাঁজে।
ওই ঘাটে ওই বকুলগাছে,
জলটী যেথা ছুঁয়েই আছে,
— এখনো ওই যে-ঘাটেতে
পল্লীবালার কাঁকণ বাজে,
তরী সেথা বাঁধব না কো আজকে সাঁজে।

এই নদীরই এই ঘাটেতে
এম্‌নি সাঁজে আমার প্রিয়া,
যেত ছোট কলসীখানি
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।
সোহাগে জল উথ্‌লে উঠি'
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি',
পথের মাঝে আমায় দেখে
ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে, —
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

* *

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে
তটিনীর ওই শ্যামল কূলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে'।
আজকেও সেই চিতার 'পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে',
আজও মধুর মুখখানি তার
দেয় যে বাধা সকল কাজে,
তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁজে।
["নৌকাপথে" একতারা]

যেহেতু এ ক্ষেত্রে নিজ-জীবনের অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই সত্য নহে, এবং যেহেতু সকল ব্যক্তিগত প্রেমের একটা আব্রু আছে, — তাই তাহার পবিত্রতাও আছে, অতএব, তেমন প্রেম মুখর হইতে পারে না। মিলন-সুখের যেমন ভাষা নাই (যদি তাহা ব্যক্তির সত্য-সুখ হয়, ও গভীর হয়), তেমনই বিচ্ছেদের ব্যথাও প্রকাশের অতীত হইয়াই থাকে ; কেবল অশ্রু বাধা মানে না বলিয়াই, তাহা ধরা পড়ে। উপরকার ঐ যে ব্যথার কবিতা, উহাও কবির কবি-হৃদয়ের ব্যথা — ব্যক্তি-হৃদয়ের নয় ; অর্থাৎ, ঐ বিয়োগ তাঁহার নিজেরই প্রিয়া-বিরহ নয়। প্রেম সম্বন্ধে কবির নিজের এই উক্তিও এখানে স্মরণীয় —

মধুর ভবে শুধু নীরব ভালবাসা,
হৃদয়-অনুভব হৃদয়ে ;
জগতমাঝে র'য়ে জগৎ ভুলে থাকা,
একেতে মিশে থাকা উভয়ে।
* *
সুনীল নভসম প্রেম যে নিরমল,
নাহিক উচ্ছ্বাস তাহাতে,
ভাষা ত' নিদাঘের বারিধি উচ্ছল,
কল্লোল পারে শুধু জাগাতে।
প্রণয় ফুরাইলে জাগিয়া উঠে ভাষা—
দেখানো আলাপন-চাতুরী,
বন্যা শুকাইলে তটিনী-বুকে যথা
বাড়ে গো কল্লোল-লহরী।
[বীথি, 'প্রেম ও ভাষা']

এইবার আর কয়েকটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিব, এ গুলিতে কুমুদরঞ্জনের ভাবুকতা ও রস-কল্পনাও যেমন, তেমনই বাণী-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে —

(১) বন্যা

আমি ভালবাসি দিগন্তব্যাপী বন্যার অভিযান,
শুরু তার কলকল্লোলে পাই অকূলের আহ্বান।
চৌদিকে ওই ছলছল্-করা গৈরিক-গলা জল—
উন্মাদনার একি উৎসব ! প্রাণ করে চঞ্চল।
ভাবের বন্যা, প্রেমের বন্যা, উদ্দাম আলোড়ন—
এলো ভাসন্ত ভরা বসন্ত, দুরন্ত যৌবন।
দুকূল-ভাসানো অকূল পাথারে উচ্ছ্বাস ব'হে যায়,
যেন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগে প্রতি জলকণিকায় !
* * *
ফণা প্রসারিয়া চলে অনন্ত, ভীম তরঙ্গ নাচে,
গ্রীক্ সেনা ল'য়ে দর্পে আলেকজাণ্ডার ছুটিয়াছে !

এসেছে পাহাড়ী বন্যা, এসেছে বন্যা ভুবন জোড়া—
চলে তৈমুর লঙের বাহিনী ছুটাইয়া লাল ঘোড়া।
শত গৈরিক-পতাকা উড়ায়ে ঝঞ্ঝার মত আসে—
শিবাজীর চতুরঙ্গ-বাহিনী ভৈরব উল্লাসে।
ভেসে যায় কত, ডুবে যায় কত, গলে' যায় কত কি যে,
জলরাজ্যের 'ওয়াটারলু' ও 'জেনা,' 'অষ্টারলিজে'।

*　　*　　*

এমনি বন্যা এসেছে লক্ষ ভিক্ষু-শ্রমণ সাথে,
কপিলাবস্তু, তক্ষশীলা ও নালন্দা সারনাথে
এমনি প্লাবন আনিল আবার শঙ্কর-জটাজাল
চৌদিকে রচি' দুর্জ্জয় মঠ, মন্দির সুবিশাল।
নূতন বন্যা আবার ডুবালো নদীয়া শান্তিপুর,
রাঙাইয়া মন, রাঙাইয়া বন বহে' গেল দূর-দূর।
ভালবাসি বান—দেখিয়া আমার তৃপ্তি মানেনা হিয়া,
জগন্নাথের রথের অগ্রে গেরুয়া কীর্ত্তনীয়া।

[স্বর্ণসন্ধ্যা]

(২) ফিরে

ফিরে এলাম তোমার কোলে
　　আবার এলাম ফিরে,
অভাগিনীর বেশে মাগো,
　　আকুল আঁখিনীরে।

চন্দ্রহারা কোজাগরে,
জাগতে এলাম তোমার ঘরে,
সোনালী মেঘ সজল হ'য়ে
　　ঘিরলো অবনীরে।

পাঠাইতে পরের ঘরে
　　কেঁদেছিলে বড়,
আজ্‌কে কেঁদে ফিরে এলাম,
　　মাগো, কোলে কর।

রেখেছিলাম বক্ষে চাপি,—
হারিয়ে এলাম সিঁদুর-ঝাঁপি,
অভাগিনী পাগলিনী
　　কাঁকণ হানি শিরে।

*　　*

কোলের মেয়ে ফিরে এলো
　　দেখ মা চোখ মেলি',
গৈরিকে আজ কে ছোপালে
　　কমলাফুলী চেলী!
সাঙ্গ হল সে ফুলসাজ,
ফুলদানী হায় ধুনাচি আজ,
কুশী ক'রে কে আনিল
　　'কাজলনাতা'টিরে।

[অজয়]

(৩) ফুল-ঝুমকা

আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ,
কটকে ছিলেন নিমক-দেওয়ান, চাকুরী কষ্টসহ।
অর্থ প্রচুর, সম্মান বড়,—কাজেই প্রিয়ার তরে,
মুকুতা-দোলানো ঝুম্‌কা গড়ান স্বর্ণকারের ঘরে।
প্রতি মুক্তাটি সুন্দর খাঁটি, নিটোল চমৎকার,—
দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন নিশ্চয় প্রিয়া তাঁর।
তারপর গেছে সুদীর্ঘকাল প্রীতির বারতা বহি',
সে ফুল-ঝুমকা পেলেন ক্রমেতে সে যে মোর মাতামহী
বহু ঝঞ্ঝাট অভাব গিয়াছে তাহার উপর দিয়া—
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ছয়টা মেয়ের বিয়া;
ঝুম্‌কা তবুও অটুট রয়েছে বন্ধক হতে ফিরি',
স্বর্গবাসিনী আত্মীয়দের প্রেম আছে তারে ঘিরি'।
যুগের যুগের নবীন বধূর রাঙা ঘোমটার ঘামে
প্রেমের জ্যোৎস্না, প্রীতির সরিৎ, বক্ষে তাহার নামে।
প্রণয়-ব্যবসা করিতে করিতে সে পেয়েছে বুঝি প্রাণ,
অতীত প্রেমের নির্ম্মাল্য সে—কুল-দেবতার দান।
ঝুম্‌কাজোড়াটি যৌতুক পেলে পরিশেষে মোর প্রিয়া,—
শত বাসন্তী ফুলের পরশ আদর সোহাগ নিয়া।
এখন হয়েছে আবার রঙীন কৌটায় তার ঠাঁই,
স্বর্গবাসীর স্বর্ণ-মরাল, তুলনা তাহার নাই।
ফুল-ঝুম্‌কায় মোদের প্রণয় যাইতেছি সঁপে দিয়া—
অংশ লভিয়া হাসিবে মোদের নাতির নাতির প্রিয়া।

[স্বর্ণসন্ধ্যা]

(৪) গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—

চলিয়াছ তুমি, সড়কের রাজা,
কলিকাতা হ'তে 'পেশবার';
সুবিধা পেয়েছ কত নদ-নদী
নগরীর সাথে মেশবার।

আঙুর, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌
খেতে জিব করে নিশপিশ,
ডাকে 'খাইবার' গিরি-পথ, ডাকে
ডাকিনী এলায়ে কেশভার।

*　　*　　*

ধর্ম্ম তোমার বিশ্বজনীন,
　　পথে পথে তব মন্দির ;
নগরে নগরে কত মস্‌জিদ,
　　গীর্জ্জাও প্রতিদ্বন্দ্বীর।
সমাধির সব গম্বুজ,
কালো নীরে শ্বেত অম্বুজ—
রয়েছে দাঁড়ায়ে—স্বর্গে মর্ত্ত্যে
　　ফন্দী করিছে সন্ধির।
　　*
তুমিই মিশালে আমে আখ্‌রোটে,
　　আলুবোখারায় চাল্‌তায়।
এক পর্দ্দায় ফুটি-সর্দ্দায়,
　　পুনকো পালঙ পল্‌তায়।

বাঙালী এবং তুর্কে,
দুর্গাবাড়ী ও দুর্গে,
জর্দ্দার সাথে সাঁচী পান, আর
　　সুর্ম্মার সাথে আলতায়।

তুমিই মিশালে শালে মস্‌লিনে,
　　হুঁকা কাছে এল ফরসী।
মিহিদানা পাশে বেদানা বসিল,
　　বর্শার কাছে বঁড়শী।

হিঙ্‌ কলায়ের পার্শ্বে,
চিনে লওয়া আরশুার সে,
ভুট্টা বালাম বাসমতি সব
　　একদম পাড়া-পড়শী।
　　　　[অজয়]

কাব্যপাঠ এইখানেই শেষ করিলাম, উদ্ধৃতি-বাহুল্যের ভয়ে অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা বা কাব্যপংক্তি ত্যাগ করিতে হইল। আরও কিছু যোগ করিতে পারিলে ভালো হইত, কারণ, কবির অজস্র ও অবিরাম রচনা-স্রোতে উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি তলাইয়া রহিয়াছে — 'চয়নে'র বড়ই প্রয়োজন ; আমার এই আলোচনায় আমি সেই প্রয়োজনীয়তা কিছু অধিক অনুভব করিয়াছি। উপরে যে কবিতা ও কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে আমি প্রধানতঃ একটি বিশিষ্ট কবি-ভাবের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছি, তার কারণ, কুমুদরঞ্জনের কাব্যের শ্রেষ্ঠ গৌরব উহাই। এক্ষণে আমরা সেই বিশিষ্ট ভাবধারার সম্বন্ধে আর একবার আমাদের পূর্ব্বকথা মিলাইয়া দেখিব, তাহাতে পাঠক-পাঠিকাদের প্রত্যয় আরও দৃঢ় হইবে। আমি সেই যে বাঙালীর জাতিগত কালচার বা রস-জীবনের কথা বলিয়াছি — আপনারা তাহার কোন্‌ লক্ষণ এই কবিতাগুলিতে দেখিতে পাইলেন ? একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ — অতি সরল, সহজ সৌন্দর্য্য-প্রীতি ও অনুভূতি-কাতরতা। আরও কয়েকটি লক্ষণ রহিয়াছে। মানুষে-মানুষে ছোট-বড়-ভেদ নাই ; অতি ক্ষুদ্র নগণ্য যে সেও পূজনীয় হইতে পারে। ক্ষুদ্রের মধ্যে যে বিরাট বসতি করিতেছেন তাঁহাকে ধরিতে হইলে প্রেম চাই। কবি নিজের অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীটিকে ভালবাসিয়াই

বিশ্বজগৎকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন। যাহারা এইরূপ ক্ষুদ্রের পরিবর্ত্তে বিশাল, এবং তুচ্ছের পরিবর্ত্তে উচ্চের পশ্চাতে ছুটিয়া থাকে, তাহাদের আশয় উচ্চ বটে, কিন্তু তাহারা উচ্চভাবের ভাবুক মাত্র; তাহারা প্রেমিক নয় — তাহাদের সকল ভালোবাসার মূলে আছে আত্ম-পূজা। বাংলার এই কালচার — ভারতীয় বৈরাগ্য-সাধনা নয়। মানুষকে, মানুষের জীবনকে, সংসারের তুচ্ছতম বস্তুকে এমন প্রেমের পূজা আর কোন জাতি করে নাই। কুমুদরঞ্জনের কাব্যে সেই কালচার, শুক্ল-সন্ধ্যার গোধূলি-জ্যোৎস্নার মত, বিনীত-মাধুর্য্যে বিকীর্ণ হইয়া আছে, — তাহাই কাব্যে একটি রস-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রূপের কথা বলিলাম এই জন্য যে, বাংলার বৈষ্ণব-সাধনার সেই অমর কাব্যকুসুম — বৈষ্ণবপদাবলীর মত, ইহা কেবল একটি বিশিষ্ট তত্ত্বের রস-সাধনাকেই মুখ্য করে নাই; কুঞ্জ-কুটীরের নিরালায় ধ্যানস্থ হইয়া, একটি যুগল-মূর্ত্তিকে প্রতীক করিয়া, সেই প্রেম কেবল অধ্যাত্ম-গভীর হইয়াই উঠে নাই। এ প্রেম সেই কুঞ্জকুটীরের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে—বাহির আসিয়া কোলাকুলি করিতেছে, দেবারতির দীপালোকে মানুষের মুখ—সংসার ও সমাজ আলোকিত হইয়াছে। ইহাই এ কাব্যের আধুনিকতা। রবীন্দ্র-যুগে—ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই নব-ভাব-প্লাবনের শেষে, সেই নব-ভাবকে উৎকৃষ্ট কলাশিল্পে মণ্ডিত করিয়া যে গীতিকাব্যের পত্তন হইল, তাহার আওতায় পড়িয়াও, বাংলার সেই জাতিগত কালচার যে খাঁটি কাব্যরূপ ধারণ করিতে পারে—কুমুদ-রঞ্জনের কাব্য তাহাই। কুমুদরঞ্জন এযুগের একমাত্র কবি, যিনি বাংলার সেই রস-জীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আধুনিক মানব-পূজাকে, সেই বৈষ্ণব—বা আরও আদি তান্ত্রিক—ভাব-সাধনার মন্ত্রে শোধন করিয়া, অসংখ্য কবিতায় গুঞ্জরিত করিয়াছেন। তান্ত্রিক বলিলাম এই জন্য যে, ঐ মানুষ-পূজার আদি-মন্ত্রই তান্ত্রিক। বেদান্তের অদ্বৈতকে তন্ত্রই সৃষ্টি-সত্যের সহিত মিলাইয়া লইয়াছে—দ্বৈত ও অদ্বৈতের অভেদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে মানুষের দেহভাণ্ডেও তাহাই আছে—ইহা তন্ত্রের কথা। মানুষ সেই বিরাটেরই ক্ষুদ্র অথচ সম্পূর্ণ সংস্করণ। এই তত্ত্বকেই একটু কাটিয়া ছাঁটিয়া, বৈষ্ণব তাহার রস-সাধনার উপযোগী করিয়া লইয়াছে—বেদান্তের ব্রহ্ম ও তন্ত্রের প্রকৃতি (শিব ও শক্তি) দুইয়ের মধ্যে একটি নিত্যলীলার দ্বৈত-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে; সে-ও এই সৃষ্টিকে নিত্য-বৃন্দাবনের রসরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাগ ও বৈরাগ্যের বিবাদ মিটাইয়াছে। পিপাসাটা মূলে

একই—তাহা বাঙালীর সেই জাতিগত রস-পিপাসা। বাংলার এই জীবনবাদের কথা—এই অতিশয় মৌলিক, অনন্য-সুলভ অপূর্ব্ব তত্ত্ব—বাঙালীর স্বোপার্জ্জিত এই অমূল্য-সম্পদের কথা আমরা ভুলিয়াছি, তাই বাংলাসাহিত্য তথা বাংলা কাব্যের রসাস্বাদনেও যেমন, সমালোচনাতেও তেমনই, হয় অতি-মূর্খতা, নয় অতি-পাণ্ডিত্যের অভিমানে অন্ধ হইয়া, অতি-নিন্দা বা অতি-প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠি। জাতির সেই রস-জীবনকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া, সেই রক্তগত সংস্কৃতিকে তুচ্ছ করিয়া, আমরা কেবল দুইটি মাত্র বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি—(১) সাহিত্যিক কলা-নৈপুণ্য; (২) আধুনিকতম ভাব-চিন্তার সদম্ভ সমাবেশ। এ কথা ভুলিয়া যাই যে, কলা-কৌশল যতই উচ্চাঙ্গের হউক, এবং নব্যতম ভাবচিন্তা যতই মূল্যবান হউক—সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া কাব্যে, সেই সকল বস্তু কবির প্রাণবৃন্তে বিকশিত হওয়া চাই; সেই প্রাণ তাহার জাতিগত চেতনারই আধার; সেই প্রাণের রসে রসায়িত হইতে না পারিলে কোন কাব্যই রসরূপত্ব লাভ করে না। অতিশয় ব্যক্তি-স্বতন্ত্র যে কবিতা, তাহারও মূলে জাতীয় ভাবজীবনের গ্রন্থি না থাকিলে, সে কাব্যের রসরূপ হৃদয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে না।

কুমুদরঞ্জনের কাব্য হইতে আরও একটি বড় তত্ত্ব আমাদের হৃদ্‌গোচর হয়, এক হিসাবে তাহাই মূল তত্ত্ব; সে তত্ত্ব এই যে,—বাৎসল্য, সখ্য, মধুর প্রভৃতি যে রসগুলির কথা আমরা জানি, তাহা কেবল রসশাস্ত্রের অধিকারভুক্ত নয়, বাঙালীর জীবনেও তাহা অতিশয় বাস্তব। ঐ কালচারের কারণেই, তাহা এক-একটি বিগ্রহকে—মানুষের ব্যক্তি-বিগ্রহকেই—আশ্রয় করিয়া মহাভাবের সিদ্ধিলাভ করে। ঐ যে বিগ্রহ-রূপনিষ্ঠা (ভিন্নধর্ম্মীরা যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে)—উহার সাধনায়, অন্ততম, অতি-অশিক্ষিত মানুষেও সেই উপলব্ধির অধিকারী হয়। এই তত্ত্বটিও আমরা কুমুদরঞ্জনের কাব্যপাঠ-কালে—অন্ততঃ হৃদয়ে অনুভব করি। ইহাও সেই কালচার। এই জন্যই একজন সুপণ্ডিত চিন্তাশীল ইংরাজের মুখে এমন কথা বাহির হইয়াছিল যে, এ দেশের অতি-অশিক্ষিত কৃষককুলের জীবনেও যে কালচার আছে তাহা পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ঐ কালচার এই বাংলাদেশেই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—উহাও বাঙালীর ঐ রূপচর্য্যার ফল। মূর্ত্তি, বিগ্রহ, বা অবয়বী কিছুকে তাহার চাই—অত্যুচ্চ, অত্যুৎকৃষ্ট ভাবেরও রূপ চাই; সে নিরাকারের ভজনা করিবে না। অন্য হিন্দুর মত সে কেবল প্রতীক বা বিগ্রহ পূজা করে না,

—তাহার বিগ্রহও মানুষ, মানুষই বিগ্রহ ; তাহার ভগবান প্রত্যক্ষ ও বাস্তবের ভগবান। ঐ বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতিই তাহার পরমার্থ-সাধনার সহায় ; অর্থাৎ, সে মানুষকেই রস-সাধনার যন্ত্র করিয়া—জ্ঞানের পথে নয়, আরও অপরোক্ষ ভাবে, সেই পরম বস্তুকে লাভ করিবে। কুমুদরঞ্জনের কাব্যেও মানুষই সেই ভাব-সাধনার বিগ্রহ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে, ঐ বিগ্রহ-পূজার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ আমি একটি গল্পের উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না, গল্পটির নাম 'ননীচোরা'—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। পাঠক-পাঠিকাগণ এই গল্পটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমি যে ঐ বিগ্রহ-নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি, উহার অর্থ কি ? ঐ গল্পটিতে একটি বৈষ্ণব গৃহস্থের গৃহ-দেবতা ঘরের শিশুর রূপে মিলিয়া গিয়াছেন ; বাৎসল্য-রসের অতি সহজ এবং অতি গভীর তন্ময়তায়—ভক্তের ইষ্ট যে ভগবান, তিনি ঐ শিশুর রূপেই সত্য হইয়া উঠিলেন। ইহাতে মানবহৃদয়ের একটি পরম-কোমল অনুভূতিই মহামহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া, উহার কাব্যরসও এমন এক মাত্রায় পৌঁছিয়াছে যে, আমি পূর্ব্বে রসরূপের যে অধ্যাত্ম-মনোহর দিকটির কথা বলিয়াছি, রসিকমাত্রেই এখানেও ঐ বিশেষের মধ্যে সেই নির্ব্বিশেষ রস-ব্রহ্মকে অপরোক্ষ করিতে পারিবেন।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যের প্রেরণা ও তাহার বহির্গত ভাবজগতের পরিচয় ইহার অধিক আবশ্যক হইবে না ; এইবার তাঁহার কবিকর্ম্মের—অর্থাৎ রচনা-রূপের বিচার করিতে হইবে, কারণ, কবিতা অন্যান্য আর্টের মত একটি সজ্ঞান শিল্পকর্ম্ম না হইলেও, কবিরও যথার্থ কবিশক্তির পরিচয় ভাবের উদ্বোধনে নয়—ভাবের রূপসৃষ্টিতে ; এইজন্য নিছক গীতকার যিনি তিনি কবি নহেন। কুমুদরঞ্জনের সেই কবিশক্তি কিরূপ, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি—তাহার দৃষ্টান্তও দিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে এইবার কবিকে ছাড়িয়া কবিতাসুন্দরীর রূপটিকে মাত্র নিরীক্ষণ করিতে হইবে।

৫

কুমুদরঞ্জন যে কবি অর্থাৎ কবিতা-লেখকই নহেন তাহা আমরা দেখিলাম। তথাপি কবি কাহাকে বলে, তাহা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা বোধ হয় আবশ্যক। অতএব, এইখানে কবির একটা সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিব,—পণ্ডিতদের জন্য নয়, সাধারণ কাব্যামোদী এবং জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য।

কবিতা-লেখা একটা কলা-বিদ্যাও হইতে পারে—আমাদের দেশে পুরাকালে উহা তাহাই ছিল, সেইজন্য কাব্য-কলার একটা শাস্ত্রও গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখনও সেইরূপ কলা-বিদ্যা হিসাবেই অনেকে উহার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ তাহাতেও পারদর্শী হইয়া উঠেন। যেমন বেহালা-বাজানো, বাজি-দেখানো—এমন কি ঘুড়ি-ওড়ানো,—তেমনই অনেকেই কবিতা-রচনায় হাত পাকাইয়াছেন—বেশ ভাল পদ্য-রচনা করিতে পারেন। যেমন বড় বড় চিত্র-শিল্পীদের বিখ্যাত ছবির অনুলিপি করিয়া, অথবা সেগুলির রেখা ও বর্ণ-বিন্যাস প্রভৃতির পদ্ধতি অনুকরণ ও অনুশীলন করিয়া, শতশত ছবি আঁকা হইয়া থাকে এবং বাজারে তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হয়, তেমনই এই সকল কবির নকল কবিতারও আদর হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল চিত্র-অঙ্কনকারীকে চিত্রকর বা পটুয়া বলিলেও কেহ চিত্র-কবি বলিবেন না। তেমনই, কবিতা লিখিলেই কবি হওয়া যায় না, তা' সে কবিতা ছন্দে, ভাষায়, এমন কি ভাবেও যতই সুশ্রাব্য ও মনোহর হউক না কেন। কবি বলিয়া চিনিতে পারি তাঁহাকেই, যিনি একটি নূতন রস-রূপের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার কাব্যে একটা নূতন ভাবের হাওয়া বহিতেছে, যিনি আমাদের মনে একটা নূতন রং ধরাইয়াছেন। আবার, শুধু ভাব হইলেই হইবে না—ভাবের রূপটি বাণীতে মূর্ত্তিমান হওয়া চাই; ঐ কথারই সুরে ও ভঙ্গিতে সেই ভাব আমাদের অন্তরের চাক্ষুষ হইয়া উঠে। এই রূপ-সৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপকতা—দুইয়েরই উপরে কবিদের ছোট-বড় ভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ যে মূল লক্ষণটির কথা বলিয়াছি, তাহা যদি কাহারও কবিতায় থাকে তবেই তিনি 'কবি'। কুমুদরঞ্জন যে ঐরূপ একজন কবি, তাহা উপরকার ঐ কবিতাগুলি হইতেই কাব্য-রসিক পাঠক-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন; যাহাদের সেই রস-বোধ নাই তাহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজনও নাই, কারণ অন্ধকে রংএর পরিচয় দিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র, তাহাদের নিকটে কবিতা-লেখক ও কবি —পদ্য ও কবিতায় কোন পার্থক্য নাই; বরং ভাবের একটু কাতুকুতু এবং ছন্দের রুমু-ঝুমু্ বা ঝম্‌ঝম্ থাকিলেই তাহা শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কিন্তু কেবল কবি বলিলেই কবির পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। প্রধানতঃ দুই জাতের কবি আছে—একজাত, যেমন—হোমার, শেক্সপীয়ার, বাল্মীকি ও ব্যাস; আর একজাত, যেমন—শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, চণ্ডীদাস ও রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ

রূপ-কবি ও রস-কবি ; এখানে 'রূপ' বলিতে বাহিরের জগৎ ও মনুষ্যজীবন ; এবং 'রস' বলিতে ভিতরের ভাব-জগৎ এবং আত্মানুভূতির আনন্দ। প্রথম জাতের কবি যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শেক্সপীয়ার। তিনি বাহিরের জগৎ ও মনুষ্য-জীবনকে ঠিক তদনুরূপ দেখিয়াছেন ; সে দেখা এমন যে মানুষমাত্রেই তাঁহার কাব্যের আরসীতে নিজের মুখ-প্রতিবিম্ব দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। শুধু তাহাই নয়,—মনুষ্যহৃদয়ের গভীরতম কামনা-বাসনা, আশা-আশঙ্কা, মর্ম্মান্তিক যাতনা ও অবোধ উল্লাস, তিনি যেন অন্তর্য্যামীর মত উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, এবং যে-বেদনা মানুষ অন্তরে অন্তরে অনুভব করে কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাও তিনি, ভাষাকে গলাইয়া-পিটাইয়া দলিয়া-ছানিয়া তাহারই ছাঁচে অবিকল গড়িয়া তাহাকে দৃশ্য-বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু উহার কোনটাই তাঁহার নিজের কথা নয়—মনুষ্যসমাজের কথা ; ঐ বহির্জগৎ ও মনুষ্যজীবনের অন্তর-বাহির—সব মিলিয়া যে একটা রূপ-জগৎ, তাহারই ঢাক্‌না খুলিয়া দিয়াছেন।

অপর যে-জাতের কবির কথা বলিয়াছি, তাঁহারা অন্তর্জগতের কবি ; সে জগৎও একহিসাবে মনুষ্য-সাধারণের অন্তর্জগৎ বটে—নহিলে লোকে তাঁহাদের কথা বুঝিবে কেমন করিয়া ? তথাপি ইহারও প্রকৃতি-ভেদ আছে। ঐ যে অন্তর্জগৎ, সেখানে মনুষ্যসাধারণের সহিত কবি-হৃদয়ের যোগ থাকাই স্বাভাবিক—সেকালের কবিতায় তাহাই ছিল। কিন্তু একালে, ঐ জাতীয় কবিদের কবিতায় তাহা আর থাকিতেছে না, ইহারা এত বেশী আত্মপরায়ণ যে, সেই অন্তর্জগৎ আর কাহারও নয়, তাঁহাদেরই। অতএব এই 'রস-কবি'দের মধ্যেও দুই ভাগ আছে—এক, যাঁহারা আত্ম-প্রেমিক, Egoist ; আর এক, যাঁহারা আত্মভাববিভোর হইলেও—পরের সহিত হৃদয়ের যোগ আছে। এই যে দুই ভাগ—ইহার প্রত্যেকটিকে আবার দুই ভাগ করিয়া লইলে রস-কবিদের গোত্র আরও সুনিশ্চিত হইয়া উঠিবে।

ঐ আত্ম-পরায়ণ Egoist-দের মধ্যে যাহারা অদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ নিজেদের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব মানে না—অর্থাৎ যাঁহারা absolute egoist—তাহাদের কল্পনা এমনই দুর্দ্ধর্ষ যে, সমগ্র জগৎটাকে তাহারা আত্মভাবে গ্রাস করিয়া ফেলে, তাই কোন বিরোধ আর থাকে না,—বিরোধ থাকিলে তাহাদের আত্মার মহিমাই যে খর্ব্ব হয়। কিন্তু একটু নিম্নস্তরের Egoistও আছে ;

ইহারা 'আত্ম' ছাড়া একটা 'পর'ও মানে; এই 'পর'টা সেই আত্মারই বিরুদ্ধ, তাই কেবলই ঘুসি উঁচাইয়া বা উরুতে থাপ্পড় মারিয়া, সেই 'পর'কে যুদ্ধে আহ্বান করে, এবং ঐ আত্মভাবের শাণিত অস্ত্র দ্বারা তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া মনে মনে জয়োৎফুল্ল হয়। যে অপর রস-কবিদের কথা বলিয়াছি—সেই যাহারা আত্মভাববিভোর হইলেও এতখানি আত্মপরায়ণ নহে,—তাহারা ভাব-তান্ত্রিক হইলেও Egoist নয়,—প্রেমিক; তাহাদেরও দুইটা ভাগ আছে। এক ভাগে আছেন তাঁহারা যাঁহারা প্রাণের প্রেম-পিপাসায় সকলই সুন্দর ও মধুর দেখেন—কুৎসিত, ভীষণ, নিষ্ঠুরকে স্বীকার করিতেই ভয় পান, সম্ভব হইলে সেগুলাকেও আত্মভাবের মাধুরীতে মণ্ডিত করিয়া নির্ব্বিরোধের শান্তি কামনা করেন। ইঁহারা প্রেমধর্ম্মী বটেন, কিন্তু সেই প্রেমে শক্তি বা জ্ঞানের সাধনা নাই—আত্ম-সমর্পণ আছে; ইঁহারা ভক্ত। অপর ভাগে আছেন যাঁহারা, তাঁহারাও প্রেমিক, অর্থাৎ এই জগৎকে ও জীবনকে সুন্দর দেখেন, ভালোবাসেন; তাঁহাদের সেই জগৎ ভাব-জগৎ হইলেও, Egoistদের মত আত্মকেন্দ্রিক নয়—অর্থাৎ জগৎটার পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া, নিজেরই অস্তিত্বের জবানীতে, তাহার একটা আত্ম-মনোহর রূপ কল্পনা করিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত নহেন। তাঁহাদের ভাব-সাধনায় ভীষণ ও মধুর, কু ও সু, কোমল ও কঠোর সকলই সমান রসবৎ;—কুৎসিতকে, ভীষণকে, নিষ্ঠুরকে ইঁহারা অস্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না; তার কারণ, ইঁহারা ভাবসাধনাতেও জ্ঞান-পন্থী, জ্ঞানের দ্বারা সব হজম করিয়া লন। ইঁহারাও ভাবসাধক বা রস-কবি বটেন—রূপ-কবি নহেন; তথাপি রূপ-কবিদের সঙ্গে ইঁহাদের একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে, তাহা এই যে—রূপ-কবিরা যদি অধিকতর আত্মসচেতন হইতেন তবে তাঁহারাও এইরূপ 'রস-কবি' হইয়া উঠিতেন; আবার, এই জাতের রস-কবিরা যদি আত্ম-সচেতন না হইয়া, সেই অপূর্ব্ব 'কল্পনা' বা 'প্রজ্ঞার' অধিকারী হইতেন—যাহার দ্বারা জগতের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে ইঁহারাও অনায়াসে 'রূপ-কবি' হইতে পারিতেন, কারণ উভয়ের ভাব-দৃষ্টি এক। তথাপি, এই জাতের রস-কবি যাঁহারা তাঁহারা সেই ভাবের দিক দিয়াও একঅর্থে Realist, Naturalist বা প্রকৃতিপন্থী; ইঁহারা 'শাক্ত'।

উপরে অতিশয় সংক্ষেপে, আমি যে কবিকুল-পঞ্জিকা প্রণয়ন করিলাম,

তাহাতে, আশা করি, জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকার সকল সংশয় মোটামুটি দূর হইবে। ঐ কথাগুলি একটু মনোযোগ সহকারে পড়িয়া বুঝিয়া লইলে তাঁহারা অতঃপর, যেখানে যত কবি আছেন, তাঁহাদের কুল-পরিচয় ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি, যাঁহারা 'কবি' নহেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ফরম্যুলা খাটিবে না, খাটিবে না বলিয়াই বুঝিতে হইবে তাঁহাদের কোন জাতিই নাই।

এখন বলুন দেখি, কবি কুমুদরঞ্জন কোন্ জাতের কবি? ইহার পরেও যদি বলিতে না পারেন তবে আমি বৃথাই এই পরিশ্রম করিতেছি; ঐ যে কবিতারাশি উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একবার সেইগুলি ভাল করিয়া পড়ুন দেখি, কোন সংশয় থাকিবে না।

এইবার কুমুদরঞ্জনের কবি-কর্ম্মের কথা। কবি-কর্ম্ম বলিতে যদি নিছক আর্ট বুঝায় তবে কুমুদরঞ্জনের কবি-কর্ম্ম তাহা নয়; সে পক্ষে যথেষ্ট ত্রুটি আছে; কিন্তু কবি-কর্ম্ম বলিতে যদি Expression বুঝায়, তবে কুমুদরঞ্জনের তাহা আছে বৈকি? না থাকিলে আমরা তাঁহার কবিতার রস-গ্রহণ করিলাম কেমন করিয়া? তবে একটা কথা আছে; এই Expression, অর্থাৎ কবিতার বাণী-রূপ একটা রূপও বটে, এবং 'রূপ' বলিতে একটা সুসম্পন্ন অনবদ্য (perfect) কিছু বুঝায়—ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য একটা নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ ও অব্যর্থ বাণী-দেহ চাই। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় সেই বাণী-রূপ-বিচারে আমাদিগকে আরও একটু ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইবে। কুমুদরঞ্জনের যে কবি-প্রকৃতি হইতেই একটা ভাবধারার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা যে কেমন সরল ও স্বভাব-প্রবণ তাহা আমরা দেখিয়াছি, ভাবও তেমনই হইবে। তাহা হইলে সেই ভাবের বাণীরূপ কেমন হওয়া উচিত বা অবশ্যম্ভাবী? ভিখারীর অভিনয়ে রাজবেশ মানায় কি? বালকের মুখে বৃদ্ধের বচন কেমন শুনায়? আসল কথা, ঐ—Expression কথাটার অর্থ একটু বাড়াইয়া লইতে হইবে। সকল কবি-কর্ম্ম মুখ্যতঃ ভাষা বা বাগ্‌বিভূতির উপর নির্ভর করে; তথাপি ইহাও সত্য যে, ভাষাহিসাবেই ভাষার কোন পৃথক মূল্য নাই, ভাবের অব্যর্থ প্রকাশই কবি-ভাষার গৌরব। অতএব ভাব-বিশেষের পক্ষে ভাষার এইরূপ শৈথিল্য বা অযত্ন-বিন্যাসও যথার্থ Expression বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কুমুদরঞ্জনের কবিতার কবি-পুরুষ যদি সভাকবি বা ওস্তাদ বাঁধি্‌কার না হইয়া 'বাউল' হয়, তবে তাহার 'পোষাক কিরূপ

হইবে? যদি দেখা যায়, তাহার সেই বাউল-বেশ নিখুঁত হইয়াছে—একতারাটি একতারাই বটে, তবেই তাহার Expression বা বাণী-রূপ যথার্থ হইয়াছে।

ঐ বাউলের উপমাটি ধরিয়াই তবে বিচার করা যাক্। সুরটা বাউলের সুরই বটে, একতারাও খাঁটি একতারা। লিরিক-কবিতামাত্রেই একতারা, অর্থাৎ তাহাতে একটা ভাবের একটা সুরই থাকে; এবং একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতির তীব্রতা ও একাগ্রতা থাকে—পরোক্ষ অনুভূতির 'কল্পনা' থাকে না। সেই খাঁটি লিরিক, সেই একতারাই কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বাজিয়াছে। এইখানে খাঁটি লিরিকের লক্ষণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলি। যাহাকে আমরা কবি-কল্পনা বলি, লিরিকে তাহা বড়ই কম, কল্পনায় একরূপ জ্ঞানের বা মনের ক্রিয়া আছে। খাঁটি লিরিকে তাহা প্রায় নাই বলিলেই হয়। কল্পনায় ভাবের বিস্তার আছে, বিষয়ের বিস্তৃতি আছে, বহু-ব্যাপ্তি আছে—দেশ ও কালের দূরত্ব আছে; পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষের মোহাবেশ আছে। কিন্তু ঐরূপ নিছক অনুভূতির রসাবেশে তাহা নাই; এইজন্যই, লিরিক বা গীতি-কবির একমাত্র নির্ভর—অনুভূতির গভীরতা, একাগ্রতা বা অকপটতা। একরূপ অবশতাও আছে—তাই আর্টের আত্ম-সচেতনতা থাকে না। বাউলের একতারা ইহাই।

সুরের কথা হইল, এইবার কবিতার বাণীরূপের কথা। ভাবের যে Expression-রীতির কথা বলিতেছি এখানে তাহাও ঐ একতারার একটি তারের মত। এই তার—তাঁহার কবিতার উপমা; বাণী বলিতে তাঁহার কবিতায় আর কিছুই নাই। কিন্তু উপমা বলিলেই ত সব বলা হইল না, কারণ উপমা ত অলঙ্কার-শাস্ত্র অনুসারে একটা বাঁধা-নাম। ঐ নামটা ব্যবহার করিতেই হইবে—ব্যাকরণ মানিতেই হইবে। কারণ, যাহা অনন্যসদৃশ, অতিমাত্রায় বিশিষ্ট (Particular) তাহাকে অন্য নাম দিতে হইলে একটা চিহ্ন-নাম (Proper name) দিতে হয়, কিন্তু সে নামের কোন অর্থ হয় না। তাই বিচার—বিতর্ক ও আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে বস্তুর একটা সাধারণ সংজ্ঞা ধরিয়া পরে তাহার অসাধারণত্ব বুঝাইতে পারি। তাই এখানেও ঐ উপমা নামটি ব্যবহার করিতে হইল। আসলে উহা কবিদের একটা বাণী-ভঙ্গি এবং তাহাও সকল কবির একরূপ নয়। অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি মান্য করিয়া উহার জন্ম হয় না; একটি ভাব কবি-হৃদয়কে যেমনই বিদ্ধ করিয়াছে অমনই সেই বিদ্ধস্থল হইতে

ভাবের সেই শোণিতধারা হইতে—একটি বাণী-পুষ্প আপনি ফুটিয়া উঠে, যাহা মূলে অ-রূপ, বা নিরবয়বী তাহাই অবয়ব ধারণ করিবার জন্য রূপজগৎ হইতে অনুরূপ উপাদান সংগ্রহ করে, ভাব-জগতের ও বস্তু-জগতের মধ্যে এই যে সেতু-যোজনা, ইহাই উপমা ; ইহাই আদি এবং চিরন্তন কবি-ভাষা, ইহা অলঙ্কার নহে। কুমুদরঞ্জনের ঐ উপমা-ভঙ্গিতেই তাঁহার কবি-ভাবের বিশিষ্ট লক্ষণ ধরা দিয়াছে। সেই ভাব এক-একটি মুহূর্ত্ত বা লগ্নের একটি মাত্র ভাব, একেবারে অখণ্ড ও একাগ্র; তাহাই এক একটি কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ কবিতায় সেই এক অনুভূতি-বেগ পুনঃপুনঃ উদ্বেলিত হইয়াছে,—ভাবের ধারা সেই একই, কিন্তু তাহার উচ্ছ্বাসে একটা বারংবারতা আছে। যেন তৃপ্ত হইতেছে না—আপনাকে ফুরাইতে পারিতেছে না—ভাবের রূপটিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য, তাহার চূড়ায় পৌঁছিবার জন্য—উপমার শেষ হয় না। এই যে ভঙ্গি ইহাই সেই আবেগকে যেমন, তেমনই তাহার প্রকাশকেও একটি বিশিষ্ট রূপদান করিয়াছে—আকুল আকুতির ঐ প্রকাশ-ভঙ্গিই ভাবের স্বরূপটাকেও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, উহাতে যে চমক আছে, তাহা ভাবেরই চমক ; ঐ উপমা সেই ভাবেরই এক একটা প্রতীক ; উহাদের পৃথক বস্তু-সৌন্দর্য্য যেমনই হোক, সেই বস্তুর ভাব-রূপটাই প্রধান। এই ভাবমূলক উপমা আর একজন বড় কবির কাব্যকলার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে—কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। কিন্তু সেখানে কবি-মানসের একটা স্বতন্ত্র লক্ষণও আছে। দেবেন্দ্রনাথ নিছক ভাবানুভূতির কবি নহেন—খাঁটি সৌন্দর্য্যরসের কবি, তাই তাঁহার অনুভূতি-মূলে কল্পনার মানস-ক্রিয়াও আছে ; সে অনুভূতি প্রত্যক্ষ হৃদয়জাত অনুভূতিই নয়—অর্থাৎ বাহিরের বস্তু হইতেই জাগে নাই ; ভিতরে একটা গভীরতর পিপাসা আছে। এইজন্য তাঁহার ভাব বস্তুকে ইসারা বা ইঙ্গিতের মত ছুঁইয়া যায়, উপমেয় উপমানকে ছাড়াইয়া যায়, তাহাতেই নিঃশেষ হয় না,—আমি দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় যে উৎকৃষ্ট রস তাহার কথাই বলিতেছি ; নতুবা তাঁহার অনেক কবিতায় ঠিক এই ধরণের উপমাও মিলিবে ; তাহাতে মনে হয়, কুমুদরঞ্জন দেবেন্দ্রনাথেরই সগোত্র ; কিন্তু আসলে তাহা নয়, উপমার ভঙ্গি অনেকস্থলে বাহ্যত এক হইলেও ভিতরে তাহা নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। দেবেন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'বিধবার আরসি' অযত্নে ও অব্যবহারে শ্রীহীন, কালিঝুল-মাখা হইয়া পড়িয়া আছে—সুন্দরী বিধবার হাসি-মুখ আর তাহাতে

ফুটিয়া উঠে না ; তাই সে দুঃখ করিয়া তাহার সেই প্রসাধন-সঙ্গিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠে—

'ভুল—ভুল !-'সখী' নয়, সে মোর সতীন হয়,—
সব কথা বুঝিয়াছি আমি ;
যামিনী হয়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে স্বপন-ঘোর,
—একদিনে দু'সতীনে হারায়েছি স্বামী"।

[অশোকগুচ্ছ]

—এখানে প্রত্যক্ষ অনুভূতির গভীরতা অপেক্ষা, কবির কল্পনাকুশলতাই অধিক। কিম্বা, বালবিধবা যখন তাহার ব্যর্থ জীবন-যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করে—

"এক ছাদ রোদ আছে, কত মালা আছে গাঁথিবার !"

[ঐ]

—তখনও, সেই আক্ষেপের মধ্যেও একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবিধুরতা ফুটিয়া উঠে—হৃদয়ের ব্যাথার উপরে রূপ-পিপাসাই জয়ী হয়। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ঐরূপ কল্পনাকুশলতা বা সৌন্দর্য্যপিপাসার পরিবর্ত্তে ব্যাথাটাই বড় হইয়া উঠে—উপমার জন্ম হয় অনুভূতির গভীরতা-প্রকাশের জন্য ; তাই মেয়ে যখন সদ্য-বিধবা হইয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহার সেই কাতর মাতৃ-সম্ভাষণে কবি যে উপমার মালা গাঁথিয়াছেন তাহার কবিত্বও হৃদয়-বিদারক,—পূর্ব্বে উদ্ধৃত 'ফিরে' কবিতাটির কথা বলিতেছি।—

কোলের মেয়ে ফিরে এলো
দেখ মা চোখ মেলি,
গৈরিকে আজ কে ছোপালে
কমলাফুলী চেলী।

সাঙ্গ হ'ল সে ফুল-সাজ
ফুলদানী হায় ধুনাচি আজ,
কুশি করে' কে আনিল
'কাজল-লতা'টিরে !

—ঐরূপ উপমাই কুমুদরঞ্জনের কবি-ভাষা, তাঁহার কবি-কর্ম্ম বা কাব্যকলা ঐ একটিকে আশ্রয় করিয়াছে—ইহাও বাউলের সেই একতারার উপযোগী।

ঐ বাউলের উপমাটি আর একটু ঠেলিয়া লইয়া গেলে কুমুদরঞ্জনের কবিতার বাণীরূপ বা ষ্টাইল বিচার করিবার সুবিধা হইবে। আমরা এতক্ষণ সেই বাণী-রূপের একটা ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রূপের আরও দুইটা প্রাথমিক উপাদান আছে—ছন্দ ও ভাষা। কবিতার ভাষা বলিতে অবশ্য ব্যাকরণ অভিধান-

সম্মত আদর্শ-ভাষা নহে, তথাপি তাহারও একটা পরিচ্ছন্নতা চাই, নহিলে ভাবের প্রতিবিম্বটি সুস্পষ্ট ও সুডৌল হইয়া উঠিবে না। কুমুদরঞ্জনের ভাষাও তাঁহার ভাবের মতই সহজিয়া—কোন সজ্ঞান প্রসাধন আছে বলিয়া মনে হয় না; থাকিলে তাহা ঐ ভাবের পক্ষে কৃত্রিম অতএব কুৎসিত হইত। তথাপি ঐ ভাষাতেও তাঁহার কবিতার সেই কবি-বাউল একটু বেশি বাউল-পনা করিয়াছে, অর্থাৎ আলখাল্লার তাপ্পিগুলাও যেমন খুলিয়া গিয়াছে—তেমনই সব সময়ে তাহা ভাল করিয়া পরিতেও চাহে নাই। ভাষার বুনানীতে কার্পাস ও পাটের সূতা নির্ব্বিবাদে পাশা-পাশি স্থান পাইয়াছে—সরু মোটার মিল হয় নাই। ছন্দের দোষ আছে, মিলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহা বাউলের পক্ষে স্বাভাবিক বটে, সে দিক দিয়া বাউলটি কিছুমাত্র অপরাধ করে নাই। কিন্তু এইখানেই বাউলে ও কবিতে বিরোধ বাধিয়াছে—কারণ কুমুদরঞ্জন কবি-বাউল হইলেও বাউল-কবি নহেন। বাউলে ও কবিতে প্রভেদ এই যে, বাউলের ভাব রূপকে অতিক্রম করে—এইজন্যই মিষ্টিককে কবি বলা যায় না। কুমুদরঞ্জন সেইরূপ মিষ্টিক নহেন, তিনি রূপেরই উপাসক—রূপকার। তথাপি, তাঁহার কবিতায় বাউলের সেই সহজিয়া সুর আছে—ভঙ্গিও সহজ, তাই আমরা তাঁহাকে কবি-বাউল বলিয়াছি। কিন্তু কবিতামাত্রের—অতি-সহজেরও—ছন্দ-মিল এবং শব্দ-গ্রন্থি নির্দ্দোষ হওয়া চাই; একটু ঢিলা হইলে ভাব রূপ-পরিগ্রহ করিতে বাধা পায়—তাহার সেই বাণীদেহ বিকলাঙ্গ হয়। প্রত্যেক কবিতাই এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ—তাহার সর্ব্ব অঙ্গের সংস্থান এক একটি সৃষ্টির মত—'round and perfect as a star'। গীতি-কবির তাহাতে বেশি কষ্ট করিতে হয় না; প্রথমতঃ, তাঁহার কবিতার পরিধিও যেমন ক্ষুদ্র, অঙ্গ-বিন্যাসও তেমনই সরল। দ্বিতীয়তঃ, ভাব যদি অনুভূতি-প্রধান হয় তবে আপনারই আবেগে তাহা আপনার বাণী-রূপ গড়িয়া লয়, যেমন গতির ঘূর্ণন-বেগে গ্রহ-তারা আপনিই গোল হইয়া উঠিয়াছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় সেই ভাবের আবেগই উপমার ফুলঝুরি খেলিতে থাকে, ভাব তাহাতেই রূপ পায়, কিন্তু সেই রূপ অধিকাংশক্ষেত্রেই একটি সংহতি-সুষমা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাকেই আমি কবি ও বাউলে বিরোধ বলিয়াছি।

ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, কবি কুমুদরঞ্জনকে দেখিতে হইলে তাঁহার কবিতা-রাশি হইতে যেখানে সেখানে অঞ্জলি ভরিয়া তুলিলে চলিবে না—ভাবাবেশের

কোন দৈবলগ্নে যখনই ঐ বাউল ও কবির মধ্যে সন্ধি হইয়াছে, তখনই তাঁহার কবিতায় ভাব-সংহতি যেমন, তেমনই তাহার বাণী-লাবণ্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে —কবিতা সুডৌল ও সুসম্পন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কবিতামাত্রেরই বাণী-রূপ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার প্রমাণ কুমুদরঞ্জনের অনেক কবিতায় মিলিবে; যেখানেই ভাবের প্রেরণা একাগ্র গভীর বলিয়া মনে হয়, যে কবিতাটি পাঠ করিয়া রসিক-চিত্ত তৃপ্তি অনুভব করে, সেইখানেই দেখা যাইবে, কবিতার বাণীরূপ প্রায় নির্দ্দোষ হইয়াছে—ভাষার কোন দুর্ব্বলতা নাই; আকার সুপরিমিত, কোন পংক্তিই বৃথা নয়; শব্দ-যোজনায়, ছন্দে বা মিলে হোঁচট-খাওয়া নাই। বস্তুতঃ এইরূপ কবিতা যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া না গেলে, কুমুদরঞ্জন যথার্থ কবি-নামের যোগ্য হইতেন না, কারণ বাউল বা গীতকার এবং কবিতে প্রভেদ আছে।

তবে আমি কেন তাঁহার সেই কবিতাগুলিই বাছিয়া লইয়া তাহাদেরই বাণীরূপ বিচার করিতেছি না? ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, ষ্টাইল বলিতে ভাষা বা শব্দযোজনা-রীতির যে মৌলিকতা বুঝায় তাহা কুমুদরঞ্জনের কবিতায় কোথাও নাই—সেদিক দিয়া সকল কবিতাই এক; তাঁহার ভাষার যে চমৎকারিত্ব তাহা উপমাগুলিরই ভাব-অর্থগত; তাহাতে যে চমক আছে তাহা প্রধানতঃ ভাবেরই চমক, তাঁহার ভাষায় যে একটা নিরাবরণ নগ্নতা আছে তাহা প্রায় গদ্যের মত; এ বিষয়ে কবি বিহারীলালের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে। তথাপি বিহারীলালের ভাবাবেগ সরল হইলেও ভাববস্তু সরল নয়; ভাবের অনুভূতি অতিশয় ব্যক্তিগত বলিয়া তাঁহার সেই সরল ভাষাকেও যথোচিত ব্যক্তিগত করিয়া লইতে হইয়াছে, এজন্য বিহারীলালের শব্দযোজনায় একটা ষ্টাইল আছে। কুমুদরঞ্জনের সেই সরলতাই আছে, ষ্টাইল নাই; তার কারণ, তাঁহার অনুভূতির ব্যক্তিত্ব থাকিলেও—ভাবগুলি বিশেষ নয়, সাধারণ। এজন্য এদিক দিয়া তাঁহার সকল রচনাই সমান।

দ্বিতীয়তঃ আমি বরাবরই বলিয়াছি, কুমুদরঞ্জনের কবিতায় আমরা একটা বিশিষ্ট সাধনার বিশিষ্ট ভাবধারাতেই অবগাহন করি; হাঁ অবগাহনই করি, পান করি বলিলে ঠিক হইবে না। পান করিবার জন্য ভালো ভালো কবিতা বাছিয়া লওয়াই সঙ্গত,—কিন্তু অবগাহনের জন্য ঐ জলরাশিতেই নামিতে হইবে, নহিলে

তাঁহার কাব্যের সেই ভাবমণ্ডলটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভরিয়া লওয়া যাইবে না; কেবল ফুলগুলি দেখিলেই হইবে না, লতাবিতানটিকেও দেখিতে হইবে।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার বাণীরূপ সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার নাই; কেবল এই প্রসঙ্গে মনের মধ্যে আর একটা কথাও বারবার উঁকি দিতেছে, তাহা এই যে, কুমুদরঞ্জন যদি খাঁটি বাঙালী কবিই হন, তবে তাঁহার কবিতার বাণী-কর্ম্মেও সেই 'Bengality of the Bengalians' থাকিবে তো? বাঙালী কবি কচিৎ আর্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে; ভাবের আবেগে তাহার কণ্ঠে যে গান নিঃসৃত হয়, তাহাই বাঙালীর কবিতা—সে গানের বাণীরূপ কেমন হইল, সে প্রশ্ন করে না; প্রাণের আবেগকে মুক্তি দিয়াই সে স্বস্তিলাভ করে। তারপর সেই গানে যদি বাণীর মণিমাণিক্যভূষণ ঝলমল করিয়া উঠে ভালোই,—না উঠে, তাহাতেই বা কি? তাহাতে তাহার আনন্দের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইবে না।

আমি বলিয়াছি কুমুদরঞ্জন একাধারে বাউল ও কবি। বাউল কথাটির আর একটি অর্থও আছে—ভাবাবেগে আত্মহারা হওয়া। অত্যধিক ভাবপ্রবণতার ফলে, তাঁহার কবি-মানস যেমন সরল ও কোমল হইয়াছে, তেমনই দৃঢ়তা হারাইয়াছে। যাহা কিছু তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করে তাহাকেই তিনি ছন্দোবদ্ধ করেন, অতিশয় তুচ্ছকে মূল্যবান্ মনে করেন—সামান্য কারণেই ভাঙ্গিয়া পড়েন। এইরূপ ভাবচর্চ্চা সাধনা-বিশেষে, মানুষটির পক্ষে যতই উপকারী হউক, কবির পক্ষে ক্ষতিকর। এখানেও কবি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার আশ্চর্য্য মিল আছে; দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার কবি-জীবনের শেষভাগে কবিজনোচিত রসজ্ঞান হারাইয়াছিলেন—ভক্তি-ভাবের আতিশয্যে তিনিও রূপ-দেবতার প্রাঙ্গণে কেবলই গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

* * *

আমি কুমুদরঞ্জনের কাব্য, কবি-মানস ও কবি-কর্ম্ম সম্বন্ধে এই যে বিস্তারিত আলোচনা করিলাম তাহাতে, আশা করি, শুধুই কবি কুমুদরঞ্জনের পরিচয় নয়—কবি ও কবিতাকে বুঝিতে হইলে যে কতকগুলি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে বাংলার আধুনিক কাব্য-পিপাসু ও কাব্য জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকা সজাগ ও সতর্ক হইতে পারিবেন। এই উপলক্ষ্যে আমি যে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা ও সবিশেষ আলোচনা করিলাম, তাহা এই কারণে সঙ্গত হইয়াছে যে, কুমুদরঞ্জন এমন

এক শ্রেণীর কবি, যাঁহার পরিচয় করিতে হইলে, কবিতা ও কাব্যরসের মূল উৎসটির তীরে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। কাব্য যে বাক্যের আড়ম্বর মাত্র নয়, ছন্দের ঘনঘটা বা অলঙ্কারের স্বর্ণচ্ছটাই যে কাব্যের কাব্যত্ব নয়, অথবা ভাব-বস্তুর উচ্চতা বা সূক্ষ্মতাই যে কাব্যের একমাত্র কৌলিন্য-লক্ষণ নয়, তাহাই আমাদিগকে পুনরায় বুঝিয়া লইতে হইবে। কাব্য যদি সত্যকার কবিপ্রেরণা-সম্ভূত হয়, তবে এই সকল লক্ষণ তাহার গৌরব বৃদ্ধি করে, নতুবা ওগুলা একটা মিথ্যা ও কৃত্রিম উপসর্গ মাত্র। অনেকেই সেইরূপ কাব্যের বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া অভিভূত হয়—তাহার সত্যকার রূপটি দেখিতে পায় না, দেখিতে চায়ও না। অতিশয় বর্ত্তমান কালে বাংলাদেশে কাব্যের জাতি গিয়াছে; যে-কাব্যের মূলে সত্যকার কবি-প্রেরণা নাই, যাহাতে সেই রূপ-সৃষ্টির কোন লক্ষণই নাই—তেমন কাব্যও, কেবল বাক্যের বর্ব্বর চীৎকারে এবং ছন্দের অশ্ব-নৃত্যে পরম উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। আবার, যাহার ভাব-বস্তু রসের গন্ধমাত্র-শূন্য—কেবল বিক্ষুব্ধ দেহ-মনের-সাময়িক সমাজ-বিদ্রোহের ঘুসি উত্তোলন ছাড়া আর কিছুই যাহাতে থাকে না, এবং সেই হেতু অতিশয় বেরসিক জনমণ্ডলীকেও একরূপ উত্তেজনায় উত্তেজিত করে, তাহাও উৎকৃষ্ট কবিতা; সেই কবিকেও কবি-শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে এমন সকল মহারসিক, যাহারা সাহিত্যের হাটে কলা বেচিতে আসিয়া—কালের মহিমায়—রথে উঠিয়া বসিয়াছে। এজন্য আজিকার দিনে কুমুদরঞ্জনের মত কবির কাব্য-সম্পর্কে এইরূপ বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল; কারণ, কুমুদরঞ্জন কত বড় কবি—সে প্রশ্ন নয়, তাঁহার কাব্যে ও কবি-চরিতে আমরা কবিতার সহজ-সরল, নিসর্গ-সুন্দর অবিকৃত রূপটির পরিচয় পাই।

[আশ্বিন, ১৩৫৫]

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য ও কবি-প্রতিভার পরিচয় দিবার কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। কথাটা দুই অর্থেই সত্য; প্রথম, যতীন্দ্রনাথের কবিপরিচয় এতদিন পরেও অনাবশ্যক হওয়া উচিত; দ্বিতীয়, তিনি যেকালের কবি, সে কাল বাংলাদেশে প্রায় সম্পূর্ণ গত হইয়াছে; সেকালের যাঁহারা এখনও কবিতা লিখিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে একজন ইংরেজ কবির ভাষায়—"Idle singer of an empty day" বলাই সঙ্গত।

দ্বিতীয় কারণটা আর একটু বিশদ করিলে ভাল হয়; 'ভাঙা আসর'ই বটে, কিন্তু তেমন আসরেও গান শুনিবার জন্য দুই-চারিজন শ্রোতা অবশিষ্ট থাকে। আজিকার আসর ঠিক ভাঙা-আসর নয়, কারণ, সেই একই মণ্ডপে আর একটি আসর বেশ জম-জমাট হইয়া উঠিয়াছে; তাহার কলরব এত বেশি যে, কে গায়ক আর কে শ্রোতা, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের 'গান-ভঙ্গ' কবিতাটি মনে পড়িতেছে; সেখানে কবি একরূপ ভাঙা-আসরের কথাই বলিয়াছেন—বৃদ্ধ ওস্তাদ বরজলালের গান একালের নব্য-গীতি-রসিকেরা শুনিতে চায় না, কাজেই বুড়াকে এই বলিয়া আসর ত্যাগ করিতে হয় যে—

"মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ,
এখন আসিয়াছে নূতন লোক—
ধরায় নব নব রঙ্গ।"

ধরার নিয়মই তাই, 'নব নব রঙ্গ' আসিবেই। কিন্তু গানের আসরে গান চাই; যদি রঙ্গটাই বড় হইয়া উঠে তবে রসিকসমাজের বড়ই দুর্দ্দিন। বরজলাল দুঃখ করিয়া বলিলেন—

"যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা—
সেখানে গান নাহি জাগে।"

—প্রেমহীন, অতএব 'বোবা,' অর্থাৎ সাড়াহীন শ্রোতৃবর্গ দেখিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন। তবু একটা বিপদ তাঁহার ঘটে নাই—সেই নব নব

রঙ্গের রসিকেরা তাঁহাকে গালিগালাজ করে নাই, তাঁহার মাথার উষ্ণীষখানিও রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু আজিকার এই আসরে বরজলালের মত কাহাকেও গান শুনাইবার জন্য ডাকিয়া আনিলে তাঁহার যে কি হাল হইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া আমি একটু সন্ত্রস্ত বোধ করিতেছি।

তথাপি, আজ এই কবির পরিচয়-দানে প্রবৃত্ত হওয়ার একটি বিশেষ কারণ আছে। কবি যতীন্দ্রনাথের কাব্যগুলি ইতিপূর্ব্বে যথাসময়ে মুদ্রিত হইলেও, রীতিমত প্রচারিত হয় নাই—বোধ হয় কবির নিজেরই দোষে, বা গুণে। একরূপ প্রচার যে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহাকে শাস্ত্র-মতে 'প্রচার' বলা যায় না। এটা প্রোপাগাণ্ডার যুগ; প্রোপাগাণ্ডার জন্য যে সকল যন্ত্র চালনা করিতে হয়, এবং যে মন্ত্রটি বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা কবি অপেক্ষা অ-কবিরই অধিকতর সুসাধ্য। কবি যতীন্দ্রনাথের ভাগ্য এতদিনে একটু ফিরিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে; একজন অধ্যবসায়ী প্রকাশক তাঁহার কাব্যগুলিকে একত্র করিয়া একটা নূতন নাম দিয়া, (হালফ্যাশনের বানান সহযোগে) তাহার নূতন জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ, ঐ আধুনিক যন্ত্রে তাহাকে আরূঢ় করিয়া বাংলার সাহিত্য-বিপণিতে উপস্থিত করিয়াছেন। এখন মন্ত্রটা ভাল করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে, চাই-কি, এই ভরা-আসরের কোলাহলে তাঁহার নামটাও মাঝে মাঝে শোনা যাইতে পারে।

এই নূতন সংগ্রহ-কাব্যের নাম—'অনুপূর্বা'। ইহাতে যতীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য হইতে কতকগুলি করিয়া কবিতা বাছিয়া সাজানো হইয়াছে। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোনটিই বাদ দিবার যোগ্য নয়, বরং যেগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশই গ্রহণ-যোগ্য। এরূপ হইবার কারণ, কবির রচনায় যেমন প্রাচুর্য্য নাই তেমনই বাহুল্যও নাই—তিনি কোন কবিতাই বৃথা রচনা করেন না, অর্থাৎ তাঁহার অলস কবিতাবিলাস নাই, প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় প্রাণের তীব্র উৎকণ্ঠার অলঙ্ঘ্য 'তাগিদ' আছে। এজন্য তাঁহার কবিতার 'চয়ন' বা নির্ব্বাচন সম্ভব নয়, তাহা অনাবশ্যক। যতীন্দ্রনাথ স্বভাব-কবি নহেন, তিনি অতিশয় আত্মসচেতন—অতি প্রবল ভাবাবেগকেও তিনি দৃঢ়রূপে নিজের বশে রাখিতে পারেন, তাই অন্য অনেক কবির মত তিনি ভাবমাত্রকেই ছন্দোবদ্ধ করেন না। যে কবির ঐরূপ স্বভাব, তাঁহার কবিতাই 'চয়নে'র

উপযুক্ত, এবং উত্তমরূপে নির্ব্বাচন করিয়া একখানি গ্রন্থে সাজাইয়া না দিলে সেইরূপ কবির কবি-পরিচয় অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রোত্তর কবিগণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কিছু বিলম্বেই হইয়াছিল, কিন্তু বিলম্বের একটা স্বাভাবিক কারণও ছিল। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রযুগের যখন 'ভরা-কোটাল' তখন তাঁহার আবির্ভাব না হওয়াই যেন স্বাভাবিক। তার পূর্ব্বে রবীন্দ্র-কাব্যের সেই অমরী-দুর্ল্লভ রূপ, এবং ভাষা ও ছন্দের যাদুকরী-লীলা যে কয়জন কবিকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহারই উত্তরসাধকরূপে পরিচিত করিয়াছিল, যতীন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে স্থান লাভ করিবার যোগ্য ছিলেন না; তাই বোধ হয়, তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী কিছুকাল গুণ্ঠন ত্যাগ করিতে সাহসী হন নাই। উত্তরকালে যতীন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস তাঁহার নিজের প্রাণ-পাত্রে নিজের মত করিয়াই পান করিয়াছিলেন, তাহার সেই রঙে ও রূপে নিজের কাব্য-প্রেরণাকে কিয়ৎ পরিমাণে শোধন করিয়া লইয়াছিলেন—কিন্তু সে-ও টনিকহিসাবে, তাহাতে তাঁহার নিজস্ব কাব্যভঙ্গিই আরও দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে বিলম্বের কথা বলিয়াছি তাহার মূল কারণও বুঝিয়া লইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যজগতের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা যেমন অত্যুচ্চ কল্পনার জগৎ, তাহার গীতিমূর্চ্ছনায় যেমন ঊর্দ্ধতম আকাশের নক্ষত্রলোক স্পন্দিত হইতে লাগিল—তেমনই, তাহার অন্তর্গত সেই দুর্দ্ধর্ষ আত্ম-কেন্দ্রিকতাই, দেহ-বাস্তবের যে ব্যক্তিত্ব, তাহাকে একরূপ অস্বীকার করিল; রবীন্দ্রনাথের সেই আইডিয়ালিজম্ এমনই ঐকান্তিক যে, তাহাতে কবি-ব্যক্তির ধ্যানী-আত্মাই দৃঢ়াসন করিয়া বসিয়া আছে, নিজের দেহ-সংস্কারকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিবে না। সে কবিতায় কবির যে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহা ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া একটা ঊর্দ্ধভূমিতে মানব-সাধারণের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে; সেই সর্ব্বজনীন ব্যক্তিত্বের যোগেই আমরা ঐ কবির সাযুজ্যলাভ করিতে পারি; এবং তাহা করিতে পারিলে যে রস আস্বাদন করা যায় তাহা এই দেহ-গত ব্যক্তিত্বের ভাবোদ্ধৃত রস নয়; তাহাই খাঁটি রস,—যেমন উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের রস, যে-রসকে আমাদের আলঙ্কারিক 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই রসেরই রূপ-সৃষ্টি করিয়াছেন—তেমন আর কোন কবি করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ রূপও বাস্তব দেহ-জীবনের রূপের অনুরূপ মাত্র—প্রতিরূপ নয়, যে

প্রতিরূপের মধ্যেও মূল বস্তুরূপটা রূপান্তরিত হয় মাত্র, একেবারে ভাবান্তরিত হয় না। এ রসে সকলের অধিকার নাই; তথাপি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসাধন-কলা এমনই মনোহর যে, নিম্নাধিকারেও তাহা হইতে যেটুকু রস আদায় করা যায়, তাহাতে আকৃষ্ট হওয়াও যেমন সহজ, বুঁদ হওয়াও তেমনি অনিবার্য্য। ইহার ফলে, বাংলা কাব্যে একটা নূতনতর কাব্যকলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রবীন্দ্রকাব্যের সেই গূঢ় অন্তর্নিহিত রস সাধারণের পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়া রহিল বটে, কিন্তু ঐ কাব্যকলাই একটি নূতন কবি-সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল। তাহাতে বাংলা কবি-ভাষা ও কাব্যচ্ছন্দের যে অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধিসাধন হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই সগর্ব্বে স্বীকার করি; কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের সেই রস-কল্পনার দুঃসাধ্য অনুকরণ অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে; তাহার ফলে বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া, অতি উচ্চ ভাব-কল্পনার অভিমানে—মানবহৃদয়ের যে সত্য, দেহ-সংস্কারের যে অতি-জাগ্রৎ অনুভূতি ও আকুতি—তাহার প্রতি মিথ্যাচরণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কবি যতীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সকল বিদ্রোহের মধ্যে যেমন একপ্রকার আন্তরিকতা থাকে, যেমনই আতিশয্যও থাকে; যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহে দুই-ই আছে। কিন্তু যেহেতু, ইহা কাব্য-ঘটিত বিদ্রোহ—রাষ্ট্রনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক বিদ্রোহ নয়, এইজন্য সেই অতিশয্যও আন্তরিকতার ভূষণ হইয়াছে—আন্তরিকতাকেই আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

এইবার যতীন্দ্রনাথের ঐ বিদ্রোহের একটু ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বিদ্রোহটা মূলে ভাবগত হইলেও, উহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বহির্গত বস্তুর প্রতি বিরুদ্ধতাও আছে; সে বিদ্রোহ ঐ তৎকালপ্রচলিত কাব্যরীতির বিরুদ্ধে, অতএব তাহা খাঁটি সাহিত্যিক বিদ্রোহও বটে। সেকালের কাব্যের সেই অতিমার্জ্জিত, অতি-পেলব-মসৃণ শব্দযোজনাই তাহার কৃত্রিমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে যতীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতিকে বাহির হইতেও আঘাত করিয়াছিল। তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কি কারণে ভাষার ঐ লালিত্য ও চিক্কণতাই কবিদিগের এমন সাধনীয় হইয়া উঠিয়াছে। উহাই তাঁহার কবিদৃষ্টিকে সজাগ করিয়া থাকিবে। তারপর, সেই বিদ্রোহ আর বাধা মানিল না—কোন দ্বিধা আর রহিল না, তিনি নিমেষেই বুঝিতে পারিলেন, ইহারা যাহা লেখে তাহাতে নিজেদের প্রাণগত

উৎকণ্ঠার কোন তাগিদ নাই—যাহা আছে তাহা একরূপ কাব্য-অনুশীলন-পটুতার অভিমান। কেন নাই? প্রথমতঃ ইহাদের কাব্য-প্রেরণার মূলে কোন সাক্ষাৎ-অনুভূতি নাই—আমাদের দেশের অর্ব্বাচীন সংস্কৃত কবিদের মত, ইহারা যেন অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত 'রসে'র ঢেঁকুর তুলিয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ ইহারা ভাবালুতাকেই উৎকৃষ্ট কবিধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। মহাকবি গেটেও (Goethe) জার্ম্মান রোমাণ্টিকদের বিরুদ্ধে ঠিক এই অভিযোগ করিয়াছিলেন, আমি অন্যত্র তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও তাহা উদ্ধৃত করিবার যোগ্য; যথা:—

If feeling does not prompt
in vain you strive;
If from the soul
the language does not come
By its own impulse,
to impel the hearts
Of hearers, with
communicated power,
In vain you strive,
in vain you study earnestly.

Toil on for ever:
piece together fragments,
Cook up your broken
scraps of sentences
And blow with puffing breath
a struggling light,
Glimmering confusedly now,
now cold in ashes:

—যতীন্দ্রনাথও ঐ সকল কবিতা সম্বন্ধে ঠিক এমন মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐ ভাবালুতার একটা বিশেষ লক্ষণ তাঁহার বিদ্রোহকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাকেই আমি ভাবগত বিদ্রোহ বলিয়াছি; উহা কাব্যরচনার ঐ কৃত্রিম ভঙ্গির বিরুদ্ধেই নয়—একেবারে তাহার অন্তর্গত কবিধর্ম্মের বিরুদ্ধে। জগৎ ও জীবনটাকে একটা সুখাবেশের গোলাপী আভায় মণ্ডিত করিয়া দেখাই যেন উহাদের কবিধর্ম্ম; দুঃখ-দুর্দ্দশাকেও একটা মধুর বেদনা-রসে অভিষিক্ত করিয়া, ভাবাকুল নেত্রে তাহার সেই 'রস' আস্বাদন করিতে হইবে। জীবন একটি সুদীর্ঘ বাসর-রাত্রি, তাহার সর্ব্বত্রই ফুলশয্যা; তাহার সকল কলরবই একটি বিলোল বেহাগ-রাগিণীর বহুবিচিত্র আলাপমাত্র। যতীন্দ্রনাথের সুপ্ত কবিশক্তি ইহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল, বিদ্রোহের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় যাহা হইয়া থাকে তাহাও হইল,—তিনি কবিত্বমাত্রকেই অস্বীকার করিতে চাহিলেন; সেণ্টিমেণ্ট বা সৌন্দর্য্যপ্রীতিকে কোন কারণেই বরদাস্ত করিবেন না—সে সকলই দুর্ব্বলের সৌখীন আত্মবিলাস, স্বেচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা। ইহাকেই বলে কবি-

প্রতিভার উপরে কালের প্রভাব, ঐ কালে না জন্মিলে যতীন্দ্রনাথের কবি-মনোভাব এমন কঠিন হইয়া উঠিত না।

কিন্তু সত্যই কি একমাত্র কালই ঐরূপ বিদ্রোহের জন্য দায়ী? উহার মূলে কি কোন গভীরতর ব্যক্তিগত প্রেরণা নাই? একেবারে ব্যক্তিগত যাহা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা অতিশয় দুরূহ। তাঁহাকে আদৌ কবি করিয়াছে—কোন্ একান্ত ব্যক্তিগত আকুতি? এই বিদ্রোহ কোন্ ব্যক্তিপুরুষের অতিশয় নিজস্ব অভিযোগ? আমি যতীন্দ্রনাথের কাব্যের কাব্যরস, ও তাঁহার কবিপ্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে বসিয়াছি, কিন্তু যেহেতু আধুনিক কাব্যে কবির কবি-মানস এবং তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিগত কাব্যপ্রেরণা এমনই মনোযোগ দাবী করে যে, প্রথমে তাহাকেই সাদর-সম্ভাষণ না করিলে কবির কাব্যসুন্দরীও অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না, অতএব, আমাকেও প্রথমে কবি যতীন্দ্রনাথের এই অতিশয় আত্মগত আধ্যাত্মিক প্রেরণাটিকে সম্মানসহকারে অভিবাদন করিতে হইবে, কাব্যের রস-নিবেদন পরে করিব।

যতীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা একটা মোটা-কথা সহজেই বলিতে পারিবেন, তাহা এই যে, এ কবি দুঃখকে একান্ত করিয়া দেখিয়াছেন—ইনি দুঃখের কবি। মোটা-কথা বলিলাম এই জন্য যে, সাধারণ পাঠক দুঃখকে দুঃখ ছাড়া আর কিছু বলিয়া বোঝে না; সুখের বিপরীতই দুঃখ, দুঃখের আর কোন অর্থ তাহাদের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ জীবচেতনায়, বা অধ্যাত্ম-দর্শনে, দুঃখ যে-বস্তুই হোক্, কাব্যে দুঃখ শুধু দুঃখই নয়, তাহা একটা রসও বটে; যদি তাহাই না হয়, তবে 'দুঃখের কবি' বলিলে কোন অর্থই হয় না, তেমন দুঃখ কাব্য হইয়া উঠে না। অতএব যতীন্দ্রনাথের এই দুঃখ একটা গভীর অনুভূতিরসের প্রকারভেদমাত্র। উহার মূলে যে বিদ্রোহ আছে তাহাও অভাবাত্মক নয়, ভাবাত্মক; কারণ, যে বিদ্রোহ করে সে-ও একটা কিছু চায়, পায় না বলিয়াই বিদ্রোহ করে। এই চাওয়ারও কারণ, সে সেই বস্তুকে বিশ্বাস করে; তাই সে নাস্তিক নয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, সেই বস্তু থাকিয়াও নাই, অন্ততঃ কবি-ব্যক্তিটিকে সে ধরা দেয় না, তবে সেই বঞ্চনাটাই দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই বঞ্চনাও সকলের পক্ষে সমান নয়; কারণ সাধারণ মানুষ যেটুকু পায় তাহাতেই তৃপ্ত, না পাইলেও পাইয়াছি মনে করিয়া সুখী। এই কবি ব্যক্তিটি সেই সাধারণের

একজন নহেন, তাই তিনি ঐরূপ কবি হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার পিপাসা যেমন প্রবল তেমনই অসীম; গণ্ডূষে তাঁহার তৃপ্তি নাই, তিনি অগস্ত্যের মত সাগর শোষণ করিতে চান। ক্ষুদ্র মানুষ অগস্ত্য নয়, সাগর তাহাকে ব্যঙ্গ করে। কবি যদি ভাব-সাধক আইডিয়ালিষ্ট হইতেন তবে কোন কথাই ছিল না, রস-সাগরের ভ্রূকুটি-তরঙ্গকে রূপান্তরিত করিয়া ভাবের আবেশে তাহাই পান করিতেন,—কাব্যে তাহারই গদভাষণ ও স্বরমূর্চ্ছনায় তিনি আমাদের অভ্যস্ত রসপিপাসা তৃপ্ত করিতেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাহা করিবেন না, তিনি বাস্তব-জীবনের জবানীতে, মানুষের হৃদয়-শোণিতের ছন্দে, সেই রসদেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চান—প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া স্রষ্টার কবিত্বের কোন প্রমাণ পাইতে চান না, বাস্তবকে কল্পনা দ্বারা পূরণ করিয়া লইবেন না। তিনি দেখিয়াছেন, এই সৃষ্টি যদি একখানি কাব্যই হয়, তথাপি তাহা অতিশয় অসম্বদ্ধ, অসম্পূর্ণ ও খেয়াল-খুসীতে পরিপূর্ণ। বেশ, যদি তাহাই হয়, তবে অত গালি-গালাজ কেন? 'তুত্তোর' বলিয়া লোটা-কম্বল লইয়া সরিয়া পড়িলেই ত' সব হাঙ্গাম চুকিয়া যায়। না, বাঁধনটাও বড় শক্ত। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা কবি বড়ই ধূর্ত্ত, সে যে-বস্তুর লোভ দেখায় প্রাণ তাহাকে তুচ্ছ করিতে পারে না—বঞ্চনা দ্বারা সে সেই লোভটাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। ফলে, একদিকে তাঁহার অভিমান যেমন দুর্জ্জয় হইয়া উঠে, তেমনই ঐ আত্ম-প্রবঞ্চিত সুখ-ভিখারীদের প্রতি অশ্রদ্ধার অন্ত থাকে না।

যতীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে জগৎ ও জীবনকে যে দুঃখের রঙে এক-রঙা করিয়া তুলিয়াছেন, সে রং কালো নয়, তাহা শোণিত-বর্ণ। তার কারণ, তাঁহার ঐ নিন্দাবাদ বৈরাগীর নয়—অনুরাগীর,—দারুণ অভিমানের প্রিয়-পরিবাদ। তিনি যেন জিদ করিয়াই তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া, নিজে বিরুদ্ধপক্ষের উকিলের মত, তাহার যত কিছু অপকীর্ত্তি কবুল করাইয়া লইতে চান। অভিযোগটা আর কিছু নয়,—যে পিপাসা দিয়াছে সে পানীয় দেয় নাই; বুকের ভিতরে বসিয়া আছে, অথচ ধরা দিবে না! সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপিয়া একটা অসম্পূর্ণতা, একটা ব্যর্থতা ও নিদারুণ নশ্বরতাই বিরাজ করিতেছে, তাহারই দুঃখ মানুষকে অধীর করিয়া তোলে; সেই দুঃখবোধের জন্যই সুখের পিপাসা! এত বড় নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে? অতএব সৃষ্টিটা মিথ্যাই। তাহাই যদি হয়, দুঃখটা

সত্য হয় কেন? রহস্য এইখানেই; দুঃখটাও সত্য হইত না যদি সুখপিপাসা সত্য না হইত। কবি যদি ঐ সুখপিপাসার সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিতেন তবে তিনিও এই দুঃখের কাব্য লিখিতেন না। পারেন না কেন? এই কাব্যে সর্ব্বত্র তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। কবিও ভালবাসিয়াছেন, সেই ভালবাসা খাঁটি মানবীয় আসক্তির ভালবাসা; এ ভালবাসা নশ্বরতার আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে। ইহাই মানুষের প্রাণের গভীরতম আর্ত্তনাদ—ইহাই ভাববাদীর বিরুদ্ধে বাস্তববাদীর বিদ্রোহ। এই অর্থেই যতীন্দ্রনাথের কাব্য অতিশয় বস্তুতান্ত্রিক—আর কোন অর্থে নয়। এই প্রসঙ্গে একজন য়ুরোপীয় কবির কথা মনে পড়ে, এই কবিও নাকি কোন এক যুগের কাব্যে, ভাবালুতার পরিবর্ত্তে ব্যক্তি-হৃদয়ের বাস্তব-অনুভূতির সুর প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহাকেও ঐ নশ্বরতার ভয়ই বিহ্বল করিয়াছিল। ইঁহার সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন—

"In death he can see nothing but the horrors of dissolution. In brighter moments he may seek to console himself by a kind of philosophy, that all beauty must perish,' that life is but fleeting, and so on, but even as he speaks, his teeth are chattering and there rise before his eyes the creaking gibbets of Montfaucon with his own place prepared and ready, and hears the hollow croaks of the magpies rising upon the night air."

—কেবল, আমাদের কবি Villon-র মত এতটা দেহ-সর্ব্বস্ব নহেন বলিয়া তাঁহার বলিষ্ঠ মন যেমন সকল ধর্ম্মশাস্ত্র বা দর্শনের সান্ত্বনাকে উড়াইয়া দিয়াছে, তেমনই, তিনি ঐ নশ্বরতার ব্যথাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিলেও তাহার দ্বারা অভিভূত হন নাই। কিন্তু তিনিও ঐরূপ বিভীষিকা দেখিয়াছেন, তাঁহার কাব্যে এমন সকল বীভৎস-ভীষণ দৃশ্য-কল্পনা আছে, যাহা উপরের ঐ চিত্রকেও ম্লান করিয়া দেয়। যতীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর এই নশ্বরতা-বোধের বেদনা; দুঃখকে তিনি আরও অনেকরূপে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ একটা চিন্তাই তাঁহার কল্পনাকে সর্ব্বাপেক্ষা উর্জ্জিস্বল করিয়াছে—পরে উদ্ধৃত কাব্যপংক্তিগুলিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। মৃত্যুকে, নশ্বরতাকে এমন ঐকান্তিক করিয়া দেখার কারণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; তাঁহার স্নায়ু-শিরা-শোণিতে একটা প্রবল ক্ষুধা বাসা বাঁধিয়াছে; তাহা যেমন বাস্তব, তেমনই ব্যক্তিগত। সে অনুভূতি ঐরূপ বাস্তব ও ব্যক্তিগত

বলিয়াই রবীন্দ্রকাব্যের নৈর্ব্যক্তিক (দেহ-ব্যক্তিত্বহীন) রসকল্পনাকে যেন 'চ্যালেঞ্জ' করিয়াছে। যতীন্দ্রনাথই বোধ হয় একমাত্র কবি, যিনি নিজ হৃদয়ের সাক্ষ্য ছাড়া আর কোন সাক্ষ্যই মান্য করেন নাই; বাংলাকাব্যে—ভাবের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নয়—দেহী মানুষের স্বাধিকার-ঘোষণা এই প্রথম। এই যে নিজ হৃদয়কেই একমাত্র প্রামাণ্য করা, ইহাতে কবির যেমন শক্তিবৃদ্ধি হয়, তেমনই আর এক পক্ষে ক্ষতিও হয়; কিন্তু সে কথা পরে।

কবি যতীন্দ্রনাথের ঐ দুঃখবাদের কারণ ও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি, এখন আর একটি কথা যোগ করিলেই এ প্রসঙ্গ শেষ হয়। আমি বলিয়াছি, ঐ দুঃখবাদেরও মূলে আছে একটা আস্তিক্য-বুদ্ধি। দুঃখকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনই দুঃখদাতাকেও অস্বীকার করা চলিবে না। একজন কেহ আছে, কিন্তু তাহাকে জানিবার উপায় নাই—সে যেন কিছুতেই জানিতে দিবে না; তাহার এই দুর্জ্ঞেয়তাই সকল দুঃখের মূল, তাহাই দুঃখকে অর্থহীন করিয়া আরও অসহনীয় করিয়াছে। এই দুর্জ্ঞেয়বাদ জ্ঞানের নয়—প্রেমের; কারণ যে-পিপাসার ভিতর দিয়া সেই একজনের আভাস মেলে, সে পিপাসাও প্রেমের পিপাসা। তখন কবি আর কোন সান্ত্বনা না পাইয়া স্থির করিলেন, ঐ দুঃখ যদি সত্য হয়, তবে সেই সত্য-স্বরূপও দুঃখ-স্বরূপ। তিনিই এই অসীম দুঃখ নিজেও বহন করিতেছেন, অতএব মানুষ তাঁহার নিকটে সান্ত্বনা চাহিবে কি,—তিনিই মানুষের সান্ত্বনাদানের পাত্র! ইহাও এক অপূর্ব্ব ভগবৎপ্রেম; জগৎ-জোড়া দুঃখের আরতি করিতে করিতে কবি ঐ দুঃখেরই একটা অধ্যাত্মযোগ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই যোগে তিনি সেই মহান্ দুঃখস্বরূপের সহিত যুক্ত হইয়া, দুঃখের অনল-শিখাতেই এক অদ্ভুত প্রেমের বাসর-শয্যা পাতিয়াছেন। ইহাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাব্যের গূঢ়তম রস-প্রেরণা।

২

এইবার আমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত কবির কাব্য হইতেই উদ্ধৃত করিব—পাঠক-পাঠিকাগণ আমার পূর্ব্বসিদ্ধান্তগুলি মিলাইয়া দেখিবেন। প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমি এখানে যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি, মূল কবিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাহাদের কবিত্ব নষ্ট হইবারই কথা। কিন্তু

আমি এক্ষণে, কবির—কাব্য নয়— কবি-মানসের পরিচয় করিতেছি, কাব্য-পরিচয় পরে করিব। —

১। সৌখীন কবিকল্পনা ও কবি-ভাবের প্রতি শ্লেষ ও ব্যঙ্গ; যতীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যমন্ত্রের—তাঁহার নূতনতর বাস্তব-দৃষ্টির—পরিচয়ও ইহাতে আছে।

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস?
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি।
নব ফরমাস, দেখি তোমা, সাজো কল্কের পর কল্কে,
বুকের রক্ত ছল্‌কে উঠুক, হাড়গুলো যাক্ পল্‌কে'।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ওই ছুটে যায় লক্ষ মরণ-ঘোড়া,
প্রেমের বল্গা বৃথাই কসিছে সোয়ার সে জোড়া-জোড়া,
ঢেলে সাজো, সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ শূন্য হউক, যত সাদা সব কালো! (পৃঃ ২৩)

২। যতীন্দ্রনাথের চক্ষে সংসার ও সৃষ্টির বাস্তব রূপ—

(ক) শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধরো মরীচিকা।

* *

জীবনে কি বনে, মাঝে মাঝে তুমি জ্বলে' ওঠো দাবানলে,
বক্ষে চক্ষে পেতেছ আসন তৃষ্ণার শতদলে! (পৃঃ ১)

(খ) ফাঁদ-করা রসি বাখড়ায় কসি', কটিতে কাটারি গুঁজে
বড় স্নেহে চাষা খেজুর-বৃক্ষ জড়াইল দুই ভুজে।
কাণ্ড বহিয়া স্কন্ধে উঠিয়া, দাঁড়ায়ে ফাঁদের ভরে,
কাটারি খুলিয়া খেজুরের পালা ঝোড়ে চাষা থরে থরে।
কামাইয়া নির্মোক—
কত না যতনে কাটারির হুলে কেটে আঁকে দুটি চোখ।
কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,
[illegible] ফাঁস ক'রে ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।

সেদিন হইতে খেজুর-বাগানে নীরবে অনর্গল
সারারাত ধ'রে খেজুরগাছের দুইচোখে ঝরে জল।
সিউলিরা ভোরে সংগ্রহ করে ভাঁড়-ভরা মিঠে রস,
দিক্ হ'তে দিকে ছড়ায়ে পড়িল খেজুরগাছের যশ।

চোখের অভাবে জমাট অশ্রু বুকে বেঁধেছিল বাসা,
সে চক্ষুদান করিয়া বৃক্ষে বড়লোক হ'ল চাষা।

ঐ ধরণী ভরি' খেজুরগাছের আবাদ করিল কেবা ?
নয়নের জল-জ্বাল-দেওয়া চিনি কোথা কে করিছে সেবা ?
অবেলায়-ঝরা অশ্রু তাহায় ভাঁড় ছেপে গেঁজে ওঠে ;
সে নেশার আশে কোন্ মাতালের অধরে হাস্য ফোটে ?
মোদের এখানে খেজুর-বাগানে কেঁদে কেঁদে নিশি ভোর,
না জানি সেখানে হেসে খুন কোন্ রসখোর তাড়িখোর ! (পৃঃ ৮৩)

৩। মৃত্যু ও নশ্বরতার চিন্তায় কবিহৃদয়ের হতাশ্বাস —

(ক) ওগো ভাড়াটিয়া বাড়ী !
সে দিন যাহারা এসেছিল ভাড়া, আজই গেল তারা ছাড়ি ?
বৃথা হ'ল যত রং-চূণ-কাম, ঝাড়-পোঁচ, ঘসা-মাজা,
ভাঙা খসা, ফুটা মেরামতে ঢাকি' নবযৌবনে সাজা ?

হায় গো বন্ধু, তোমার ভাগ্যে হেন দশা চিরদিন,
কভু যৌবনপুলকাঞ্চিত, কখনো জীবন-হীন।
কত এল গেল, জাগিল ঘুমা'ল—কত সুখ-দুখ-রোল,
কত হুলুরব শঙ্খধ্বনি, "বল হরি হরি বোল" !
কত ওষ্ঠের চাপা হাসি, কত কণ্ঠের ক্রন্দন,
মর্ম্মছেদন কত বিচ্ছেদ, কত ভুজবন্ধন,—
গাঁথা হয়ে গেছে বন্ধু গো তব গাঁথনির স্তরে স্তরে,
তারি চাড়ে চাড়ে ধরিয়াছে ফাট, বালিচূণ খ'সে পড়ে।
ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা হয়েছ ভাড়াটের সুখে দুখে,
উপরে এখনো রং-তালি তবু দাও ভাই কোন্ মুখে ? (পৃঃ—৭৪-৭৫)

(খ) তড়িৎ যেমন মেঘে সঞ্চিত বেদনার শিহরণ,
আলোক যেমন অন্ধ ব্যোমের হাহাকার-কম্পন,
মিলন যেমন বিরহের ভয়ে মুখে-মুখ বুকে-বুক,
জীবন তেমনি মরণের ভয়ে হৃদয়ের ধুক্ ধুক্।
যত খুলে যায় পাক—
মরণেরই দমে জীবনের ঘড়ি টিক্-টাক্ ঠিব্-ঠাক্। (মরুশিখা, পৃঃ ৩৫)

৪। ভগবান-নামক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ —

(ক) সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মূরতি জগন্নাথ!—
রথের চাকায় লোক পিষে যায়, তোমার নাহিক হাত।
তুমি শালগ্রাম-শিলা;—
শোওয়া-বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা! (পৃঃ ৮)

(খ) ও ভাই কর্ম্মকার!
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম্ম আর?
কোন্ ভোরে সেই ধ'রেছ হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হোলো,
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলো গো যন্ত্র তোলো।
ঠকা-ঠাঁই-ঠাঁই কাঁপিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আল্‌গোছে ছেনি চুমে,
দেখ গো হোথায় হাঁপর হাপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;
ক্লান্ত নিখিল, কর গো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি। (পৃঃ ৬৬)

(গ) উঠো না বন্ধু, অঘ্রাণ মাস,—তাহে নবান্ন, ভাই,
আজিকার দিনে চাষার ঘরে যে কুটুম ফিরাতে নাই।
বারবেলাটুক্ কাটুক, দেবতা, ঘুরে আসি ক্ষেতখানা,
মইডলা ভুঁই ঘেঁটে ঘুঁটে আনি যা' পাই ধানের দানা।
চিরান্নহীন নবান্ন-দিনে এসেছ আমার ঘরে,
শুভখনে শেষ অন্নপিণ্ড অর্পি' পরস্পরে,
চরম প্রণাম করিব যখন,—বন্ধু, মাথার কিরে—
ফণায়িত ক'রে আশীষ ঢালিয়া দংশিও মোর শিরে। (পৃঃ ১০৭-১০৮)

৫। শাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেশের সম্বন্ধে —

(ক) সবাই বলেছে, মোরে পাঠালেন নিজে তিনি ভগবান্;
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর—তোমাদেরি তিনি চান;
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—

র'বে না নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ।
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল ;
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল ;
কি হবে কথার ছলে ?
ভগবান চান—তবু হয়নাকো, একথা পাগলে বলে ! (পৃঃ ৭-৮)

(খ) চারহাত-খাড়া মানুষে ভরিয়া সাড়ে তিন হাত ঘরে
কৌতুক দেখ—কেমনে নিয়ত মাথা ঠুকে ঠুকে মরে।
প্রেম-মন্দিরে তাহারই বিপদ—যেজন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়া-ভাঙা যত কোল-কুঁজো আর ঘাড়-গুঁজোদেরই মজা।
নমি' জুড়ি' করপুট,—
হে রসিক, তব চরম সৃষ্টি ঘোড়া পিটাইয়া উট। (মরুশিখা—পৃঃ ১৬)

৬। এই দুঃখবাদ ও বিদ্রোহের মূল কোথায় ?

(ক) ভিটেয় ভিটেয় বসে আছে দেখি বাস্তু-ঘুঘুর জোড়,—
প্রেমের নেশায় রক্তিম আঁখি, ক্ষণিকের সুখখোর !
বিশ্ব পুরুষের বিস্মৃতি-তলে কাঁদে লাখো হাহারব ;
তাহারি উপর সোহাগ-কূজন, দুজনের উৎসব ! (পৃঃ ১০১)

(খ) আমরা দুজনে চলেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে-পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক-খোঁজা।
তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা,
ক্ষুধায় সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারিনি এ ওর জ্বালা।
(পৃঃ ১৫৯)

(গ) ফাগুন আকাশে নামে কাল-সাঁঝ,
ঝোড়ো মেঘে দিক্ ঘেরা,
ওঠ্ রে বেদিনী ! মোট বেঁধে নিই,
তুলিতে হইবে ডেরা।
সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে,
মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটালি, বেদিনী,
ভরাবুকে বুক চাপি'।
তুই আর আমি পথে পথে ভ্রমি,
সাথে শত-তালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে কাল ভুজঙ্গী
চিরসাথী শির'পর !
ছুটে যায় খুঁটো, ওড়ে ছেঁড়া-তাঁবু,
টুটে যায় দড়াদড়ি,
ফুটো ভাঁড় আর কানা-ভাঙা হাঁড়ি
দূরে দূরে গড়াগড়ি।
অকালের এই কালবৈশাখী—
ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে
বেদিনী রে হাত ধর্।
(পৃঃ ১৭২)

৭। যতীন্দ্রনাথের নব-ভগবদ্গীতা, বা 'দুর্ভাগবদ্গীতা'—

(ক) তন্দ্রা টুটিয়া সহসা আজি যে সন্দেহ মনে জাগে,
হয় তো তোমায় বৃথা অনুযোগ করিয়াছি আগে আগে।
যাহা আছে যার তাহা ছাড়া আর কী পারে সে পরে দিতে?
অপার দুঃখ তোমা হ'তে তাই ঝ'রে পড়ে চারিভিতে।
হে বিরাট। আজ হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ওর;
চির-বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরাণ আঁখিলোর।
প্রকাশিতে নয়,—করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা?
তথাপি, বন্ধু, নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ-হৃদয়-রক্ত মাখা!
* * * *
কণ্ঠে কণ্ঠে কে কণ্ঠহীন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ওঠে।
মরণে মরণে তিল তিল করি' কোন্ মহাপ্রাণ টোটে? (পৃঃ ৯৩)

যতীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম্ম ও কবি-মানসের পরিচয় একরূপ সাঙ্গ করিলাম; কিন্তু ইহা ত' কাব্য-পরিচয় নহে, এইবার সে পরিচয়ের চেষ্টা করিব।

৩

এতক্ষণ যে প্রথায় যে আলোচনা করিয়াছি, আজিকার দিনে তাহাই প্রশস্ত, কাব্য-সমালোচনার তাহাই উৎকৃষ্ট রীতি। কবিমানসের, অর্থাৎ কবির ব্যক্তিগত অহংমহিমার, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার বিদ্রোহ, আস্ফালনপূর্ণ আর্ত্তনাদ, সমাজ-বিধ্বংসকারী হুহুঙ্কার প্রভৃতির—যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সমর্থন, তাহাই যথার্থ কাব্য-সমালোচনা। আমি সে কাজটি করিয়াছি—অন্ততঃ যতীন্দ্রনাথের কবিমানসের পরিচয় দিবার কালে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও বিদ্রোহ এই দুইটি কথার উপর জোর দিয়াছি,—আশা করি, তাহাতেই আধুনিক কাব্যরসিক বিশ্বামিত্রগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন।

না, একালে কাব্যের জাতি গিয়াছে। প্রাণের অগম-গহন হইতে যে বাণী সুরময় হইয়া উৎসারিত হয়, তাহার নাম কাব্য নয়; আমি কাব্যের যে রস-নিবেদন করিব বলিয়াছি—সে আবার কি? আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ—যাঁহাদের বয়স ষোল হইতে তিরিশের মধ্যে—তাঁহারা বোধ হয়, ঐরূপ কিছুর

নামও শোনেন নাই, কারণ জন্ম হইতেই তাঁহারা এই 'brave new world'-কেই জানেন, পুরাতন বুড়ী পৃথিবীর খবর রাখেন না। তথাপি আমি তাঁহাদিগকে কিছু নূতন কথা শুনাইব, তাহা এই যে, মস্তিষ্কের চীৎকারই যেমন কবিতা নয়, তেমনই, কাব্যে—বিশেষ করিয়া আধুনিক কাব্যে—কবি-মানস একটা নূতন এবং অনিবার্য্য উপসর্গ হইয়া উঠিলেও, এবং তাহা বুঝিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক হইলেও, যতক্ষণ না কাব্যের রসরূপটি আয়ত্ত করা যায়, ততক্ষণ কাব্যের কোন পরিচয়ই পাওয়া হইল না। সেই রস-রূপ কি? এ বিষয়ে বহু বিচারবিতর্ক আছে, কিন্তু সে সকলই পণ্ডিতী বা বৈয়াকরণিক বিচার; তাহাতে অতিশয় ভাগ্যহত বেরসিক ভিন্ন আর কাহারও অধিকারও নাই, প্রয়োজনও নাই। কিন্তু আর এক প্রকার বিচারও আছে, কাব্যপাঠকালে ঠিক কি কারণে তাহা মুগ্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার একটা সাক্ষাৎ রহস্যসন্ধান;—অর্থাৎ সেই যে রসানুভূতি তাহার প্রত্যক্ষ কারণ কি? সেই অব্যবহিত স্পর্শ কিসের স্পর্শ? অনুভূতির নাম যাহাই হউক, অনুভূতিটা কিসের? কবিতার কোন্ বস্তুটা সেই অনুভূতির সাক্ষাৎ কারণ? ইহার উত্তরে আধুনিক কাব্যপ্রমাতাগণ নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছেন—উহা কাব্যবিশেষের বিশিষ্ট বাণী-রূপ। অতএব কবিতার সেই বাণী-রূপের বিচারই প্রকৃত কাব্যবিচার। প্রত্যেক কবির ও কাব্যের একটা অতিশয় স্বতন্ত্র বাণীভঙ্গি ও বাণীরূপ আছে, উহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে, অর্থাৎ আমাদের চিত্তে রসসঞ্চার করে—মুগ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ করার রহস্যটাও আমাদিগের বোধগোচর করে। অতএব 'রস' নামক একটা তুরীয় বস্তুর দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, এবং তাহার ফলে একটা নির্ব্বিশেষ কাব্য-ব্রহ্মের স্থাপনা না করিয়া, প্রত্যেক কাব্যের বাণীরূপটিকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমরা যাহা আবিষ্কার করি, তাহারই নিবেদনকে কাব্যের রসনিবেদন বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক রসিক পাঠক কাব্যপাঠে মুগ্ধ হইবার কালে, তাহার ঐ বাণী-রূপটাই দেখেন আর কিছুই দেখেন না, অথচ একথা কিছুতেই সজ্ঞানে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। আধুনিক কাব্য-সমালোচনা সেই উপকারই করিয়াছে।

আমি ইতিপূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে কতকগুলি ভাব-চিন্তা পৃথক উদ্ধৃত করিয়াছি—উহাতে আমাদের যে বৃত্তির তৃপ্তিসাধন হইয়াছে, তাহা কাব্য-রসগ্রহণের বৃত্তি নয়, উহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি। তথাপি ঐ আলোচনাও আমাদের

কাজে লাগিবে—যাহাকে এমন বুদ্ধিবৃত্তির অধীন বলিয়া মনে হয়, তাহাও রসরূপে পরিণত হয় কেমন করিয়া—কোন্ মন্ত্রে? যাহা একটা মানসিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাধি তাহাই রসের হেতু হয় কেমন করিয়া? অতিবড় দার্শনিক যিনি তিনি কবি হইতে পারেন না এইজন্য যে, তাঁহার চিন্তা হৃদয়-প্রসূত নয়—মস্তিষ্ক-প্রসূত; সেই চিন্তা তাঁহার সারা দেহমনঃপ্রাণের, তাঁহার সমগ্র সত্তার একাগ্র উপলব্ধি নয়; তাহাতে সেই মুহূর্ত্তকালের দিব্য আবেশ নাই, যাহার ফলে, কোন চিন্তাই আর বিশুদ্ধ চিন্তার রূপে অবস্থান করিতে পারে না, একেবারে শরীরী হইয়া দেখা দেয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যত রূপ জগতে ও জীবনে ছড়াইয়া আছে তাহাদেরই নূতন নূতন সঙ্কলনে এক একটি বাণী-বিগ্রহ হইয়া উঠে। কবির সেই উপলব্ধি চিন্তার পথে হয় না, হইলে তাহা তন্মুহূর্ত্তেই রূপময় হইয়া উঠিত না। আমরাই বিশ্লেষণ করিয়া তাহার একটা চিন্তাসূত্র আবিষ্কার করি, এবং রসবোধের অভাব পাণ্ডিত্যের দ্বারা পূরণ করিবার জন্য কাব্য ছাড়িয়া, ওই রসকে ছাড়িয়া, রসতত্ত্বের রোমন্থন করি। আসলে সে তত্ত্ব রসের নয়—রূপের; রস পরে—রূপ আগে।

সেই রূপের কথাটাই ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কবি যতীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা বুঝিবার একটু বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়াই, আমি এইখানে কথাটার অবতারণা করিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রূপ আর কিছুর নয়—বাণীর; অর্থাৎ, ভাষাকে কোমল মাটি বা মোমের মত গলাইয়া, ছানিয়া, আবশ্যকমত ছাঁচে ফেলিয়া যে মূর্ত্তিনির্ম্মাণ—ভাষার সেই মূর্ত্তি, সেই রূপ। প্রত্যেক শক্তিমান কবি বা সত্যকার কবি ভাষাকে লইয়া এই যে একটা নবরূপ নির্ম্মাণ করেন, তাহাই তাঁহার কাব্য; কাব্যবিচারেও যেমন, কাব্যের রস-নিবেদনেও তেমনই, কবির ঐ বাণীসৃষ্টিই সর্ব্বাগ্রে বরণীয়; ভাব নয়, ভাবের রূপ—ভাষার যাদুই রসোদ্রেকের একমাত্র হেতু। সেই ভাষা অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধিনির্দ্দিষ্ট রীতির ভাষা নয়—নয় বলিয়াই প্রত্যেক কবির ভাষা নূতন, নূতন বলিয়াই আমাদিগকে চমকিত করে, ঐ চমকই রসানুভূতির প্রথম সোপান। শেষ সোপানও তাহাই, কারণ, আমরা আমাদের শ্রুতিমূলে বাণীর সেই রূপটিকে বাঁধিয়া রাখি, আবৃত্তি করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠি। শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইয়ে মিলিয়া সেই রূপটিকে অমর করিয়া রাখে; আমরা তাহার ভাব নয়, অর্থ নয়, তাহার সেই অক্ষুণ্ণ অক্ষরধ্বনিকেই চাই, তাহাই কবিতা; ইহার মত সত্য আর নাই।

এইবার ঐ বাণী-রূপের সহিত সাধারণ ভাষার কি সম্পর্ক তাহাও বুঝিয়া লইতে হইবে। কবিতার ঐ রূপসৃষ্টি হয় ভাষাকে গলাইয়া ঢালিয়া, নূতন নূতন ছাঁচে ফেলিয়া। অতএব ভাষা কবিতার সেই বাণীরূপের উপাদান মাত্র—প্রত্যেক কবির যেমন, প্রত্যেক কবিতারও তেমনি, ভাষা অতিশয় স্বতন্ত্র। কবির ভাষাও বাংলা, বা ইংরাজী, বা ফার্সীই বটে, তথাপি তাহা একটা নূতন ছাঁচ বা গড়ন লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক কবিতারও একটা নিজস্ব বাঙ্ময় রূপ আছে, সেই শব্দবন্ধটিই তাহার স্বরূপ; তাহাতে যে ধরণের শব্দচয়ন ও শব্দযোজনা আমরা দেখিতে পাই, তাহার কোন সাধারণ রীতি নাই,—নাই বলিয়াই তাহার সেই স্বকীয় রূপ অতিশয় উজ্জ্বল ও লক্ষণীয় হইয়া উঠে। প্রত্যেক কবিই যদি সত্যকার কবি হন, তবে সাধারণ ভাষা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া, আশ্চর্য্য বাণী-প্রতিভার বলে তিনি তাঁহার কবিতার উপযোগী রূপ-নির্ম্মাণ করেন। কবিত্ব বা কবিশক্তির আদি ও শেষ এই বাণীবিগ্রহ-রচনা।

আমি কবিতার ঐ ভাষাটাকে কবিত্ব বা কবিশক্তির অকাট্য নিদর্শন বলিয়াছি—আবার ভাষা অর্থে এখানে কি, তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি গুরুতর কথাও মনে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক কবির ভাষার ঐ যে স্বাতন্ত্র্য, তাহা কবিমানুষটার স্বাতন্ত্র্য নয়, সজ্ঞান স্বেচ্ছাচারের স্বাতন্ত্র্য নয়; সে স্বাতন্ত্র্য শিল্পীর,—রূপকারের স্বাতন্ত্র্য। কারণ ভাষার 'নবত্ব'ই কবিত্বের লক্ষণ নয়, ভাষার রূপময়ত্বই কবিত্বের প্রমাণ। যেখানে 'রূপ' নাই, কিন্তু ভাষার নবত্ব-বিধানের চেষ্টা আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, একটি চতুর্ভুজ-জাতীয় জীব কবিত্বের আস্ফালন করিতেছে। কবি যিনি তিনি ভাষার বস্ত্রহরণ করেন না, কারণ, তিনিই ভাষার পতি—গীষ্পতি; এইজন্যই দেখা যায়, তাঁহারা ভাষাকে যতই নব নব রূপে রূপবতী করুন না কেন, তাহার ধর্ম্মনাশ কখনও করেন না।

কবির ভাষার সেই নবত্বের কারণ কি, তাহা এতক্ষণে নিশ্চয়ই কতকটা বোধগম্য হইয়াছে। প্রথমতঃ, কবির অনুভূতি একটা রূপময় অনুভূতি (এই-জন্যই এত উপমা, এত রূপকের ঘটা); দ্বিতীয়তঃ, সে অনুভূতি আর কাহারও সমান নয়, তাই তাহার রূপও অনন্যসদৃশ। অতএব ভাষাও যে অনন্যসদৃশ হইবে, ইহাই ত স্বাভাবিক। এই জন্যই, কে প্রকৃত কবি, কে তাহা নয়—তাহার প্রমাণ ভাষাতেই জাজ্বল্যমান হইয়া থাকে। বড় কবি, ছোট কবির কথা

নয়—কবিমাত্রেরই উহাই প্রত্যক্ষতম পরিচয়। যাহার ভাষায় অপরের প্রভাব বা অনুকরণ অতিশয় স্পষ্ট, সে উৎকৃষ্ট পদ্যরচয়িতা হইতে পারে, কিন্তু স্রষ্টা কবি নয়; আবার যাহার ভাষা আদৌ রূপময় নয় (সুরময় হওয়া দূরের কথা) —কেবল হিক্কা ও চীৎকারে ভরা, অথবা low-muttering delirium-এর মত কি যে বলে তাহা সেই জানে, আর কেহ বুঝিতে পারে না,—সে যে কোন্ শ্রেণীর কবি, তাহা কাব্যরসিকমাত্রেই অবগত আছেন।

এইবার আমরা ঐ একটি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া যতীন্দ্রনাথের কবিত্ব-বিচার, তাঁহার কাব্যের রস-বিচার করিব। কাজটি খুব সহজ করিয়া লইয়াছি—বুদ্ধিমান পাঠক তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, নতুবা 'অনুপূর্বার' কাব্যপরিচয়-প্রসঙ্গে, আমি এত পরিশ্রম করিয়া এতক্ষণ ঢেলা ভাঙ্গিয়া জমিটি সমান করিলাম কেন? অতঃপর একেবারে ঐ ভাষার কথাই বলিব। পূর্ব্বে আমি যে সকল কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে যতীন্দ্রনাথের ভাষা যে কিরূপ, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই পাঠকমাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ ভাষা হইতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি—এ কবির একটা 'বাণী' আছে, অর্থাৎ নিজস্ব একটা প্রাণগত উৎকণ্ঠা আছে—সে উৎকণ্ঠা যে-প্রকার হউক, তাহা যে সত্যকার অনুভূতি, ঐ ভাষাই তাহার প্রমাণ। ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতি যদি সত্যকার অনুভূতি হয়, তবে তাহা অনন্যসদৃশ হইবে, অনন্যসদৃশ হইলেই তাহার জন্য ভাষার একটা নূতন ছাঁচ আবশ্যক। যতীন্দ্রনাথের ভাষা কেমন তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখানো যাইবে না, কারণ কবিতার মত, কবিতার ভাষাও অখণ্ড। কিন্তু ইহার কয়েকটি লক্ষণ ব্যাকরণ-অভিধান এবং ইডিয়ম প্রভৃতির প্রমাণে প্রমাণিত করা যায়। যতীন্দ্রনাথ প্রচলিত কবিভাষাকে যেন পদদলিত করিয়া বাংলাভাষার ভূগর্ভস্থ ভোগবতী-ধারাকে উৎসারিত করিয়াছেন—অনুভূতির গভীরতা তাঁহাকে এমন ভ্রূক্ষেপহীন করিয়াছে। যেখানে যে শব্দ পাইয়াছেন, তাহাকেই ধরিয়া সেই অনুভূতির অগ্নিশিখায় তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকেও আগ্নেয়-দীপ্তি ধারণ করাইয়াছেন। চল্‌তি, সাধু, সংস্কৃত বা ম্লেচ্ছ, চাষা বা ভদ্র—সকলকেই ধরিয়া একাসনে বসাইয়া, তিনি একটি নূতন সারস্বত-সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন। একই কবিতার ভাষা শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রের স্তরে নামিতেছে, অথচ কোথাও স্পর্শদোষ নাই। কোন কবিতার ভাব যেমন রিয়ালিষ্টিক তেমনই

ভাষাও চূড়ান্ত গদ্য, কিন্তু তাহাতেও সহসা কাব্যের যেন বান ডাকিয়াছে। আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কবি যতীন্দ্রনাথকে ইহার জন্য কোনরূপ মেহন্নৎ করিতে হয় নাই, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয় নাই; উহার যে প্রযত্ন তাহাকেই সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা 'দিব্যপ্রযত্ন' বলিয়াছেন, অর্থাৎ প্রযত্নটা স্বয়ম্ভব—ইংরাজীতে ইহাকেই বলে 'inspired'। ঐ মূল inspiration-টা যদি অব্যর্থ হয়, complete হয়, তবে, সে যে ভাষা-সমেত উপস্থিত হয়, তাহার জন্য কবিকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। নহিলে, সাধ্য কি যে, যতীন্দ্রনাথ ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে সাহসী হন। ভাষা ভাবকে মূর্ত্তি দিবার উপাদান মাত্র—যতীন্দ্রনাথের ঐ ভাষাও তাহাই; আমরা ত' পৃথক করিয়া ভাষাকে দেখিতেছি না, ভাবের মূর্ত্তিটাকে দেখিতেছি। ভাব যদি সুন্দর হয়, অর্থাৎ সত্যকার কবি-ভাব এবং রূপময় হয়, তবে ভাষাও অনবদ্যসুন্দর হইবে। এই তত্ত্বটি যতীন্দ্রনাথের কাব্যভাষায় অতিশয় সুস্পষ্ট-গোচর হইয়াছে। ভাষার সকল রীতিকে লঙ্ঘন করিয়াই, এই যে একটি অনবদ্য বাক্‌ভঙ্গির সৃষ্টি হইয়াছে, উহা ঐ এক কবির কবিপ্রাণের ভাষা—আর কোন কবির বা সাধারণ কবিতার ভাষা উহা নহে। আরও কয়েকটি লক্ষণ যতীন্দ্রনাথের কবিশক্তির, অর্থাৎ বাগীশতার—পরিচয় দিতেছে। তিনি যেমন অতিপ্রচলিত আটচালা-চণ্ডীমণ্ডপ, বৈঠক-বাজারের বুলিতেও ভাবার্থের বৈদ্যুতিক শক্তি যুক্ত করিয়াছেন, তেমনই, কবি-প্রতিভার নিঃসংশয় প্রমাণ যাহা, তাহাও তাঁহার ভাষায় আছে—তিনি নূতন শব্দরচনা এবং নূতনতর শব্দযোজনাও (phrase-making) করিয়াছেন। শব্দ লইয়া কারিগরিও কম নয়; কবিমাত্রেই যে মুখ্যতঃ শব্দশিল্পী তাহাতে কি সন্দেহ আছে? কেবল ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, কাব্য নিছক শিল্পকর্ম্ম নয়; সে-শিল্প কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি অথবা মানস-স্বপ্ন-প্রকাশের শিল্প নয়—তাহার মূলে আছে মানুষের প্রাণের আকুতি, তাই তাহার বাহন হইয়াছে ভাষা;—যাহার মত আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছুই নাই; তাই কাব্যসাহিত্য আর সকল শিল্পের উপরে।

৪

এইবার আমি উপরকার মন্তব্যগুলির উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিব।

(১)

সহসা সে দিন—বেজায় কু'দিন, সন্ধ্যা-অন্ধকারে
ঘাড়-মোড় ভেঙ্গে ড্রেনের ভিতর পড়িলাম একেবারে!

কাদা মেখে উঠি' নেশা গেল ছুটি, পাঁজরে বিষম ব্যথা ;
গুণে দেখি ভাই, একখানা হাড় খসিয়া পড়েছে কোথা ?
কথা নহে বলিবার ;—
আপনিই তাই গোপনে সেখানে জুড়িনু ভেড়ার হাড় !
উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঙানো চামড়া-পটি ;
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খটাখটি !
হ'ল হাড় জ্বালাতন ;
তোমায় আমায় প্রাণের কথায় হবে তাই প্রলাপন। ['ঘুমের ঘোরে' পৃঃ ১৮]

আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে জেয়াদা—
দাদন-ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা !
সহরে বরষা ঝরে,
মেঘদূত ঘরে ঘরে,—
গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁধা !
আমি কি করি ?
বুঝি 'বাইকে' চড়ি'
আল-পথে টাল রেখে,
বেড়াই ইঁদারা দেখে—
যোগাই যে চায় তারে—কলসী দড়ি !

শ্রাবণে আমন কিছু হয়েছে রোয়া ;
নূতন পাটের ডগা সবুজে-ধোয়া।
অবিরল ঝরে জল,
কবিদল চঞ্চল,
পাকা পথে থাক্ দেওয়া সাজানো খোয়া !
দো'চাকা-দাঁড়ে
'বরষাতি'টি ঘাড়ে,
শন্ শন্ চ'লে' যাই,
পড়ি—পড়ি—সামলাই,
নিজে ভিজে' সুখে রাখি চাকুরিটারে !
['পথের চাকুরী', পৃঃ ৫০-৫১]

(২)

কোথা হ'তে তুমি এলে গো লক্ষ্মি ! কোথা ছিলে এতদিন !
আমার প্রমোদ-ভবনের তরে কারা হ'ল ভিটাহীন ?
আমার দীপালি রাতি
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন-বাতি ?
অশ্রু-সায়রে শোভে সহস্র নয়ন-কমল-দল,
তারি' পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চরণতল ?
তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি'
যে ছায়া পড়েছে তাহাতে লুকায় কত শোক-বিভাবরী !
ভরেছ আতরদানি—
কত প্রভাতের আধফোটা-ফুল মর্ম্ম নিঙাড়ি' ছানি' ?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব-সুগন্ধ ঢালা—
সদ্য-ছিন্ন শিশু-কুসুমের কচি-মুণ্ডের মালা! ['ঘুমের ঘোরে', পৃঃ ১৪-১৫]

কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
মোর আঁখি হতে উড়িয়া চ'লে ?
গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।
কোন্ অশোকের চৈতি ঝরণ
ও-কপোলতলে শুকায়ে উঠে ?
কোন্ পদ্মের পঙ্কজ-কলি
গরবী উরসে ফুটিয়া টুটে ?
কোন্ শেফালির একটি রাতের
দীপালি নিবিছে ওষ্ঠাধরে ?
কোন্ বকুলের একটি বাদল
ওই কেশপাশে ঝুরিয়া ঝরে ?
['বোঝা', পৃঃ ১৫৮]

বেদের আদরে বেদিনী রে তোর
চুলে ধরিয়াছে জট,
তারি সোহাগের ভাঙনে ভেঙেছে
শ্যামল তনুর তট।
ফাগুন-পবনে ঘুরি' বনে বনে,
হাতে ছাগলের দড়ি,
বেছে বেছে তার মুখে তুলে দিস্
ফুলে-ভরা বল্লরী।
গোপনে ছোপানো হৃদয় হইতে
ছিঁড়িয়া রঙিন্ ফালি,
চির-হাঘরে'র ঘরণী রে তুই
ঘাগ্‌রায় দিস্ তালি।
তবু যে বেদিনী বেদের ভক্ত—
বিস্ময় সবে মানে ;
গুরুর কৃপায় বেদে'রা যে হায়
মোহিনী-মন্ত্র জানে।
['বেদিনী', পৃঃ ১৭৪,]

(৩)

ধরণী তোমার প্রমোদ-প্রবাস—
বাঁধ নি কো হেথা ঘর ;
বিশ্বশুদ্ধ বুকে টেনে, বলো—
সবাই আমার পর।
নিষ্কলঙ্ক নিকষ-হৃদয়
প্রেমলেখা-রেখাহীন ;
রূপের গরব ভেঙেছ, করিয়া
রূপা হ'তে তারে দীন।
অজেয় অতনু ফুলধনু টানি'
এসেছিল তব পাশ,
রুষিয়া ভস্ম করনি,—আছে সে
দ্বারে-বাঁধা ক্রীতদাস।
মায়ার অতীত, অয়ি মায়াবিনি,
কতই না রূপ ধরো ;
যৌবনখানি বসনের মতো
খুলে রাখো, তুলে' পরো।
কার কল্যাণে করে কঙ্কণ,
সিন্দুর সিঁথা 'পরে ?
অমর কাহারে বরিয়া লয়েছ
বিশ্ব-স্বয়ম্বরে ?
['বারনারী', পৃঃ ৪৫-৪৬]

(৪)

বৌবাজারের মোড়ে—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইয়ে মাংস থোড়ে,
যে-চৌমাথায় মাথা ঘুরে যায়, খুঁজে' পায় নাকো পথ,
যেথা যাবতীয় রথের সারথি থামায় বারেক রথ,

* * *

ইতি উতি চাহি' পড়িল নয়নে, ঝুড়ির উপর উচ্চ—
মালীর মাথায় কুড়ি-দুই-দেড় কেয়া-কুসুমের গুচ্ছ।
আসি' কাছাকাছি ওরই মাঝে বাছি' কিনে' ফুল তাড়াতাড়ি
বর্ষার সাঁজে আগাগোড়া ভিজে খুসী-মনে এনু বাড়ি।
শয়নঘরের চুকে
ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে।
বাহিরে তখনো ঝরিছে বর্ষা, থেকে থেকে ডাকে দেয়া,
ভিতরে আমার শয়ন-শিয়রে গন্ধ ছড়ায় কেয়া।
রাত দু'পহর, স্তব্ধ শহর, কাঁদে নিশি নিশ্চন্দ্রা,
কেতকী-গন্ধে কত কি ভাবিতে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা।

আধঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্ব্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি।
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধ-ঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা!
তোমারই শপথ, কহিনু সত্য,—দেখিলাম, প্রাণবন্ধো!
দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে মৃত-কেতকীর গন্ধ?
হাঁকিল পাহারা,—উঠি' ধড়মড়ি দু'হাতে খসানু ফাঁসি,
ঝর ঝর ভুঁয়ে ঝরিয়া পড়িল শুষ্ক পরাগরাশি।
কাঁটা বিঁধে' হাতে বুঝিনু—স্বপন! আমারই মনের ভুল;
দুপুর-রাতের ঘুম মাটি করে—দু'-পইসে কেয়াফুল?

['কেতকী', পৃঃ ১৩০-৩২]

বসেছিনু নিঃসঙ্গ—
সহসা আকাশে ঘনায়ে আসিল
বিপুল শকুন-সঙ্ঘ।
ক্ষণিকে ঢাকিল রাহুল ছায়ায়
উদয়-অস্তাচল,
তাদের পাখার শ্বাসে-প্রশ্বাসে
প্রলয়ের পরিমল।

* *

মেরু-অরোরার ঝর্ণা-ঝারায়—
করিয়াছে উষা-স্নান,
কুরুবর্ত্তের আকাশ ভাসায়ে
অবিরাম অভিযান।
বারেক গৌরীশঙ্কর-চূড়ে,
চিরতুষারের বুকে,
রেখে এল ক্ষণ-চরণচিহ্ন
বিশ্রাম-কৌতুকে।
বারেক শুনিল—বাঁকা চঞ্চুতে
ঘসি' চঞ্চল পাখা—
দেওদার-তলে সুর-গঙ্গার
কুলু-কুলু পিছু-ডাকা।

মানস-সরসে মরাল-মিথুন
দেখাল মৃণাল তুলে':
শ্যাম-উপকূলে নারিকেল-শ্রেণী
ডাক দিল দুলে' দুলে'।
পারসী-গোলাপে গাহে বুল্‌বুল্‌
কাস্পিয়ানের পারে,
দূর ককেশাস্ ইসারা জানায়—
পাইনে ও পপলারে।

* *

অবহেলি' সবাকায়—
নির্নীড়-মতি নির্ভয়-গতি
শকুন-সঙ্ঘ ধায়।
চক্ষে কেবল সুতীক্ষ্ণ-কালো
রঞ্জন-আলো জ্বলে;
ন'ড়ে ন'ড়ে উঠে নরকঙ্কাল—
তন্বীরও তনুতলে।
ওদের ডানার ঘন মন্থনে
যত বুদ্‌বুদ্‌ ফোটে,—
বিশ্বের নীল নবনীত-বিষ
বুঝি ভেসে ভেসে ওঠে।
['এশিয়ার আশা', পৃঃ ১৯৬-৯৭]

একা চাকা-ভাঙা কাক-কেতু রথে
ভ্রমে ধূমাবতী বুভুক্ষাপথে,
—বুঝেছ ?
গগনবিহারী সে কাক-কণ্ঠে
হে কবি, তোমার
কোকিল-কূজন কূজেছ ?

* *

রংদার-কায়া রাংতার মায়া—
আব্রু ও ছায়া ঘুচেছে,

বাঁশ-দড়ি-খড়ে বাঁধা কবন্ধ
সুধা খেয়ে মুখ মুচেছে ?
কত ক্ষতি ক্ষুধা, কত লোভ ক্ষোভ
কতদিন ধরে' চাপিয়া
এতদিনে আজ উঠিয়াছে ওই
দামোদরোদরও ফাঁপিয়া।
হে কবি, একথা জানিতে—
উদরাধ্মানে মাথার বেঠিক,
আধাদৈবিক আধ্যাত্মিক,
কবিরাজ, তুমি মানিতে।
['কুয়াসা', পৃঃ ১৯৯]

(৫)

নবনী-নিন্দী সুন্দর তনু—কামেরও কামনা ঠাঁই,
কত অভিমানে লেপিলে কে জানে অজানা চিতার ছাই!
কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া পরেছ হাড়ের মালা,
কটির কাপড় দিয়েছ ফেলিয়া—না জানি সে কত জ্বালা!
বেছে বেছে তুলে ধুতুরার ফুলে ভরা বসন্ত-রাতে,
কি জানি কি মনে ভ্রমো, হে কিশোর, ভূত-ভুজঙ্গ সাথে!
সুরের জনম যার কণ্ঠে, সে বেণু-বীণা তেয়াগিয়া
সাধারণ দুখে কাটায় কি দিন শিঙা ডুগডুগি নিয়া?
কি জ্বালা ভুলিতে, জ্ঞানের আকর! ধরেছ ভাঙের নেশা?
অন্নপূর্ণা-পতি কম দুখে ভিক্ষা করে নি পেশা।
কহ কহ, দিগ্‌বাস!
পূজার অর্ঘ্যে চাপা-পড়া যত বেদনার ইতিহাস।
সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর,—তুমি মৃত্যুঞ্জয়। ['শিবস্তোত্র', পৃঃ ৯৮-৯৯]

নদীর ও-কূল কালো হয়ে আসে শ্রাবণ-সন্ধ্যাবেলা,
তখনো, বন্ধু, ছিপটী তোমার সম্মুখে থাকে ফেলা।
চিক্কণ কালো জলে,
মুমূর্ষু আলো আহত কৃষ্ণ-সর্পের মতো চলে।
দূর পল্লীতে বেজে যায় শাঁখ, জ্বলি' ওঠে দীপশিখা,
থামে ছায়ান্‌ট, ঢাকি' দিক্‌পট নামে মায়া-যবনিকা।
তখনো কিসের আশে,
তোমার নয়নে ঢেউয়ের মাথায় ফাৎনার ছায়া ভাসে?
['মৎস্য-শিকার', পৃঃ ১০৬

তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে
চেয়ে থাকি দূর-দূরে,—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে
জড়ায় জরির ডুরে। ['নবান্ন', পৃঃ ১০৮]

জ্যৈষ্ঠ দুপুর চাপিয়া বসেছে সেরা শহরের বুকে,
ইঁট-পাথরের বিরাট্ নগর জ্বরঘোরে যেন ধুঁকে।

আল্‌কাতারার তপ্ত প্রলেপে কাত্‌রায় শিলা-পথ,
গলিত সে 'লাভা' দলিত করিয়া চলিছে অগ্নিরথ।

*   *   *

পাষাণের বুকে,—যেতে যেতে ভাবি জ্যৈষ্ঠ দুপুরবেলা,—
বকুল রোপিল কোন্ অরসিক পথ-কর্ত্তার চেলা?
কানন-রাণীর শিশু-কন্যায় হরণ করিয়া কেবা
লোহার খাঁচায় মানুষ করিয়া করায় পথের সেবা?
ছায়া বাড়াইয়া যত পথতরু দাঁড়াইয়া সারে-সার,
তারি মাঝে হায় বকুলও বিলায় লাজুক গন্ধ তার?
শ্যামল বনের অমল স্মৃতি কি ফুলে ফুলে আজও ফুটে!
নবতৃণ-তরে যে চুম্ব ঝরে,—তপ্ত পাথরে লুটে!
মনে নাই তার বনের বর্ষা, শোনেনি সে কুহুতান,
দলে দলে কাক ডালে ডালে বসি' করে তা'রে অপমান।
আকাশের চাঁদ কখন উঠিয়া কখন্ যে ফিরে ঘর,
পাষাণ-কারায় ফাঁক নাহি পায় বুলাইতে স্নেহ-কর।
ঈশানের মেঘ বিষাণ বাজায়, পূবে-মেঘে বারি ঝরে,
জন-শ্মশানের পাষাণ-সোপানে বকুল ঝরিয়া মরে। ['পাষাণ-পথে', পৃঃ ১২৮]

আঁধারের বাঁকে বাঁকে,
মেঘেদের ফাঁকে ফাঁকে,
চাঁদের কলসী কাঁখে চলে বিভাবরী;
বনবায়ু ফিরে পাশ,
ছাতিমের ছুটে বাস,
বকুল ফেলিয়া শ্বাস ধীরে পড়ে ঝরি'।

শুনি' ও নূপুর-ধ্বনি
পথ-ছেড়ে দেয় ফণী,
পেচক উড়িয়া বসে পাশের শাখায়;
শ্বাপদ দাঁড়ায় সরি'
দু' চোখে প্রদীপ ধরি,
বাদুড় ঝুলিয়া ডালে ঘুরিয়া তাকায়।
['বারনারী', পৃঃ ১৭৯-৮০]

তোমার পথের ঝরা-শেফালীরা
এসেছিল আজ ভোরে,
বেলা হ'ল যেই, মলিন মাধুরী
আরবার গেল ম'রে।
চ'লে গেল তারা ভোরের তারার
হাতে হাতে হাত ধরি',

ব'লে গেল তারা—"বোলো বন্ধুরে
আজিও অঝোরে ঝরি।"
দিয়ে গেল তারা মর্ম্মবৃন্তে
ছোপানো উত্তরীয়—
কয়ে গেল তারা—"শরতের শত
শপথ স্মরিও, প্রিয়!
['বন্ধুর অভিনন্দন দিনে', পৃঃ ২১২]

(৬)

চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ?
['ঘুমের ঘোরে', পৃঃ ৬]

এ ব্রহ্মাণ্ডে নিজ ব্রহ্মেরই লাগে নি কি ভাই ধোঁকা ?
আপন ভুলের জটিল গুটিতে অদৃশ্য গুটিপোকা।
বাঁচাইতে গেলে পোকার জীবন, থাকে না গুটির দাম ;
গুটি যদি গোটা পেতে চাই তবে লুপ্ত পোকার নাম।
['নবপন্থা', পৃঃ ৭৩]

শোক-উদ্বেল নারীর অশ্রু-সাগরে করিয়া স্নান,
কন্দর্পের মাথার খুলিতে বারুণী করিব পান।
['মর্ত্ত হইতে বিদায়', পৃঃ ৯১]

আছে গো আছেও সুখ ;
খদ্যোত বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ।
মাঝে মাঝে মৃগতৃষ্ণিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা।
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারায় দিশা!
['কবির কাব্য', পৃঃ ৯৩]

স্বর্গ হতেও গরীয়সী কি না স্বদেশ জন্মভূমি—
স্বর্গ তো নাই, কেমনে যাচাই করিবে সে কথা তুমি ?
এও বড় বিস্ময়—
'গরীয়সী' ফেলে দলে দলে দলে স্বর্গে না গেলে নয়!
মাটি যদি হত মাতা,—
তর্পিতে তায় লাগিত কি লাখো পুত্রের কাঁচা মাথা ?
['বিভীষণ', পৃঃ ১১০-১১]

শোণিত-গন্ধী মহাপ্রান্তরে ঝিমায় অন্ধরাতি ;
দেহ খুঁজে মিছে আত্মা ভ্রমিছে জ্বালি' খদ্যোত-বাতি।
['শরশয্যায় ভীষ্ম', পৃঃ ১২৪]

রস-মাতাল ও মুক্তিমাতালে প্রভেদ জানিহ থোড়া,
একজন কাটে তালের আগা ও আরজন কাটে গোড়া।
['মুক্তি ঘুম" পৃঃ ১৩৮]

তুলে তৌলিয়া ঘানিতে তুলিবে,
তবে যাবে ঠিক জানা,—
সর্ষে-ক্ষেতের মাধুরী মরিয়া
বাঁধিল কেমন দানা।
* *
সুদূর গোঠের শ্যাম-বার্ত্তা কি
স্মরিছে রে বার্ত্তাকু ?
কচি-বুক হাটে সুলভ করিতে
ফলে ফালা দিল চাকু !
* *
হারায়ে হারায়ে গেরুয়া মাঠ কি
বিবাগিনী হ'ল, ভাই ?
কচি-বয়সেই ছাঁচি-কুমড়োকে
দু'হাতে মাখালে ছাই !
* *

বাসনায় বাঁধা ফেটে পড়ে ফুটা
না জানি কি স্মৃতিভারে !
বাক্‌সোয় ঢাকা আঙুরের 'মমি'
ঘুমায় রে সারে সারে !
* *
খেলিয়া বেড়া'তে জলের দুলাল,
ঢেউএর আঁচলে ঢাকা,
সন্ধ্যার মুখে পদ্মার বুকে
জালে জড়াইল পাখা।
এখনো যে দেহ রূপোর পাত্‌ রে,
হীরের টুক্‌রো আঁখি ! —
মরণের শীত করে নিবারণ
বরফের কাঁথা ঢাকি' !

['হাটে', পৃঃ ১৪০-৪৩]

আমি উপরে যে কবিতাংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পাঠ করিলে যে-কোন সারস্বত-গোত্রীয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যতীন্দ্রনাথের কাব্যের আস্বাদন কিরূপ,—ভাষা, ভাব, উপমা, অলঙ্কারে মিলিয়া তাহা কোন্ বিশিষ্ট রস-রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ উদ্ধৃতিগুলিকে আমি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিলেও, সবগুলির সেই রূপ একই, লক্ষণগুলি পৃথক করিয়া দেখাইবার জন্য ঐরূপ শ্রেণীভাগ করিয়াছি। প্রথম শ্রেণীতে ভাষার যে একটা লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—সে লক্ষণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সেই ভাষারই আর এক রূপ—রসাবেশের রূপ, ভাব যেন খদ্দর ছাড়িয়া চীনাংশুক পরিয়াছে। তিন-চিহ্নিত পংক্তিগুলিতে ভাষার আলঙ্কারিকতাই ভাব-দৃষ্টির গভীরতা সম্পাদন করিয়াছে—এই গুণে যতীন্দ্রনাথেরর কাব্য অতুলনীয়। চতুর্থ শ্রেণীর উদ্ধৃত কাব্যখণ্ডগুলি যতীন্দ্রনাথের কল্পনাভঙ্গির উদাহরণ; ইহাদের প্রথমটি, তাঁহার কবিধর্ম্ম বা কাব্যমন্ত্র যে কিরূপ রসসৃষ্টি করিতে পারে, তাহার একটা সার্থক নিদর্শন। অপরগুলিতে সেই কল্পনার বিচিত্র ও বিরূপ বিলাস আছে। পঞ্চম শ্রেণীতে যতীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেম ও চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার পরিচয় আছে, এখানেও তাঁহার দৃষ্টিশক্তির

তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। ছয়-চিহ্নিত পংক্তিগুলিতে তাঁহার আলঙ্কারিক বাগ-বৈদগ্ধ্যের একটু স্বতন্ত্র উদাহরণ দিয়াছি।

ইহার পর, সাধারণভাবে আরও দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, যতীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা রূপক-রূপেই সার্থক হইয়াছে, এদিক দিয়া তাঁহার কল্পনাভঙ্গি প্রাচীন রীতিকেই আশ্রয় করিয়াছে। তথাপি, 'খেজুর বাগান', 'লোহার ব্যথা', 'বেদিনী' প্রভৃতি কবিতার রূপকগুলিতে বস্তুর সহিত ভাবের নিখুঁত সাযুজ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়—ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'inevitable', ইহাদের মধ্যে সেই গুণ রহিয়াছে। আর একটি লক্ষণ এই যে, যতীন্দ্রনাথের কাব্যে কবিমানসের একটা তীক্ষ্ণ সজ্ঞানতা আছে, তাঁহার ঐ তীব্র অনুভূতিই যেন একপ্রকার জ্ঞানে পরিণত হয়, হৃদয়টাই মস্তিষ্কের কাজ করে। ইহাই তাঁহার কাব্যে Idealism-এর বিরোধী একপ্রকার Realism-এর কারণ। বাস্তবের অনুভূতি হইতে মুহূর্ত্তের পরিত্রাণ নাই বলিয়া, কবিচিত্ত তিক্ত হইয়া উঠে, এবং বেদনাদিগ্ধ বিদ্রূপের শরজাল দশদিক আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। কেবল যেখানে তাঁহার প্রাণ অতৃপ্ত, বা ব্যর্থ-পিপাসায় হাহা করিয়া উঠে, সেইখানেই ব্যথার একটা মোহকর অনুরণন বাস্তবঅনুভূতির পরেও জাগিয়া থাকে—'বেদিনী', 'বারনারী' প্রভৃতি কবিতা ইহার দৃষ্টান্ত।

কবি-মানসের এই সজ্ঞানতা তাঁহার প্রায় সকল কবিতায় অনুস্যূত হইয়া আছে, তাই উপমা ও দৃষ্টান্তের অব্যর্থতা, সময়ে সময়ে কাব্যরসকেও অতিক্রম করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও চমকিত করে। "বিভীষণ', 'শরশয্যায় ভীষ্ম' প্রভৃতি কবিতায় তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিরুদ্ধপক্ষের উকীল তাহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিত না। ঐরূপ ব্যাখ্যার মূলে শুধুই তর্কবুদ্ধি নাই,—জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, ইতিহাসেও তাহার সমর্থন খুঁজিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে 'কৃষ্ণা' কবিতাটি ভাব-সত্যের দিক দিয়াও অধিকতর সার্থক হইয়াছে।

৫

এইবার যতীন্দ্রনাথের কাব্যে, ভাবের যেমন, অভাবেরও তেমনি একটা হিসাব-নিকাশ করিতে হইবে। কি পাইলাম তাহা আমি দেখাইয়াছি, পাওয়াটা বুঝাইতে হয় না—হইলে, কাব্য-পাঠই বৃথা হইয়া যায়। কিন্তু না পাওয়াটার

একটা কৈফিয়ৎ আছে—সেটা পাঠকের তরফে। কারণ ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, কবি কাহারও ফরমায়েস মত কাব্য রচনা করেন না; তিনি যাহা দেন তাহা যে আদৌ দিতে পারেন, তাহার কারণ এই যে, তাহার উল্টাটি দিতে পারেন না। তাই কবির দান ঠিক দানহিসাবেই গ্রহণ করা উচিত, যে দানের মূল্যবিচার করে সে অকৃতজ্ঞ। তথাপি, যাহা পাই না, তাহা কেন পাই না—সঙ্গে সঙ্গে তাহার কারণটা জানিতে চাহিলে খুব দোষ হয় না, সেখানে আমরা ত' কবিকে জবাবদিহি করিতেছি না—নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করিতেছি।

এই বিচারে, আমি 'রস', 'রসোত্তীর্ণ' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিব না, করিলে—ভাবের ঘরে না হউক, ভাষার ঘরে চুরি করা হইবে; যাহা নির্ব্বিশেষ তাহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তৎপরিবর্ত্তে, আমরা 'অনুভূতি' এবং 'কল্পনা' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিব। কল্পনা সেই বস্তু যাহা অনুভূতির দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া অনুভূতির ক্ষেত্রটাকে অতিক্রম করে, এবং করে বলিয়াই আমাদিগকে ভাবলোক হইতে কল্পলোকে উত্তীর্ণ করিয়া বাস্তবকেও যেন সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেয়। এই বাস্তব-মুক্তিই প্রাণের আরাম, ইহাকেই যদি রসাস্বাদ বলা যায়, তাহা হইলে কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পনাকে একটি বিশিষ্ট অনুভূতি-মার্গে ধরিয়া রাখিয়াছেন। যে কল্পনা বস্তুকে, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমানকে, অতিক্রম করিয়া নব নব রূপলোক সৃষ্টি করে—যতীন্দ্রনাথ যেন শপথ করিয়া তাহাকে পরিহার করিতে চাহিয়াছেন; ফলে কল্পনা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই, কেবল একই স্থানে আবদ্ধ হইয়া পাখা ঝাপটাইয়াছে। এ যেন এক অতিতীব্র অনুভূতিশীল হৃদয় রস-সমুদ্রের কূলে বসিয়াও পিপাসা-বারি পান করিবে না, অথচ সেই পিপাসাকে অস্বীকারও করিবে না। ইংরেজীতে যাহাকে abnormal বলে, এই প্রকৃতিও সেইরূপ abnormal। সকল কবি-প্রকৃতি তাহাই। তথাপি যতীন্দ্রনাথের এই abnormalityও যেন একটু abnormal। ইহা যেন একটা সজ্ঞান আত্মদ্রোহ। এই জন্যই যাহা মূলে ভাব-মাত্র তাহাই একটা তত্ত্বের রূপ ধারণ করে, সেই একই mood—উপমা, অলঙ্কার রূপক ও দৃষ্টান্তের নব নব ভঙ্গিতে যতই বিচিত্র হউক, পাঠক-চিত্তে একটা বন্ধনস্বরূপ হইয়া উঠে। আমি সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছি,

কবিতার তত্ত্বটা কিছু নয়, প্রকাশটা—অর্থাৎ তাহার বাণীরূপটাই—আসল; যতীন্দ্রনাথের কবিতার বাণী, যেমন উজ্জ্বল তেমনই পরিস্ফুট,—বাণী বলিতে রচনার যাবতীয় রূপসমষ্টি বুঝিতে হইবে। কিন্তু ঐ বাণীরূপের রস-সংবেদন ভাবকে অতিক্রম করিয়া, তত্ত্বের প্রাধান্যকে নষ্ট করিতে পারে নাই; তাঁহার কবি-মানসের অতিরিক্ত সজ্ঞানতাই ভাবানুভূতিকে কল্পনায় বেশিদূর প্রসারিত হইতে দেয় নাই। ইহার কারণ, তাঁহার সেই ব্যক্তি-চেতনার অভিমান; তিনি অনুভূতির তীব্রতায় যতটা অধীর হন, ততটা অজ্ঞান হইতে পারেন না—আত্মহারা হইয়া যান না। এই কারণে তাঁহার কাব্যের রস-আস্বাদনে, অর্থাৎ প্রাণের সেই মুক্তি-সুখে—শেষ পর্য্যন্ত একটু অভাব বোধ থাকে, হৃদয় যতটা অভিভূত হয়, ততটা আশ্বস্ত হয় না।

ইহাই যেন যতীন্দ্রনাথের কবি-জীবনেরও একটা ট্র্যাজেডি। তাঁহার কাব্যও নিছক কাব্য নয়—একটা বন্ধনপীড়িত মানব-হৃদয়ের জ্বালাই যেন সত্যকার কবিশক্তির সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে। আমি, নিজেরই তত্ত্বচিন্তা-অনুযায়ী এই রহস্যের একটা অর্থ করিয়া, এই দীর্ঘ আলোচনার উপসংহার করিব। আমার ব্যাখ্যাটি হইবে বৈদান্তিক,—তজ্জন্য কাহারও ভয় পাইতে হইবে না। আমি কাব্যসমালোচনা শেষ করিয়াছি, এক্ষণে কবির আত্মাটি লইয়া একটু সাইকো-এনালিসিস করিব, তাহাও আমারই মতে—বেদান্ত একটু সাহায্য করিবে মাত্র, ধমক দিতে পারিবে না। বৈদান্তিক বলেন, 'আত্মা' বা 'ব্রহ্ম' (যত 'আমি' আছে সকলেরই যেটা সর্ব্বনাম) যিনি, তাঁহার সৃষ্টি-কামনা হইতেই পারে না; কারণ কামনা বলিতেই একটা কিছুর অভাব বুঝায়, ব্রহ্মের অভাব-বোধ অসম্ভব। তথাপি কোন দুর্জ্জেয় কারণে (সৃষ্টি মানিতে হইলে), সেই 'আত্মা'ই প্রথমে কামনারূপিণী 'মায়া'র দ্বারা লিপ্ত হইলেন, পরে তাহার বশীভূত হইয়া 'জীব'-রূপে অধঃপতিত হইলেন। ঐ প্রথম অবস্থাটা ঈশ্বরের অবস্থা—ঈশ্বর-রূপী ব্রহ্ম 'মায়া'কে লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন; ঐ 'মায়া'ই 'কল্পনা'-শক্তি হইয়া ঈশ্বরকে কবি করিয়া তুলিল, ঈশ্বর কল্পনার দ্বারা এই সৃষ্টিকাব্য রচনা করিলেন। তিনি তখন কবি, কল্পনা তাঁহার দাসী। দাসী তাঁহাকে নব নব রস আস্বাদন করাইয়া শেষে এমনই নেশা ধরাইয়া দিল যে, সেই কবি-ঈশ্বর জ্ঞান হারাইলেন, একেবারে ঘোরতর মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন; তখন যাহা কল্পনা ছিল তাহাই বাস্তব হইয়া

পড়িল, এবং যাহা রস-হেতু তাহাই দুঃখ-হেতু হইয়া উঠিল। এক কথায়, তখন কবিও নাই, কল্পনাও নাই; 'ঈশ্বর'টি তখন 'জীব' হইয়া কল্পনার জগৎকে বাস্তব মনে করিয়া, এবং নিজেকেও তাহার একটা অংশ মনে করিয়া, আর্ত্তনাদে দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বাস্তবটা—জীবের; কল্পনা—কবির, ঈশ্বরের। কবির সহিত 'কল্পনা'র বা 'মায়া'র প্রভু ও দাসী-সম্পর্ক। জীবরূপী ব্রহ্ম 'মায়া'র দাস হইয়া, বাস্তবকে স্বীকার করিয়া, তাহার সহিত রফা করিতেই ব্যস্ত। কিন্তু তাহার অন্তরস্থ সেই ব্রহ্ম মাঝে মাঝে 'মায়া'র ছলনা ধরিয়া ফেলে, সে তখন উহাকে গালি দেয়, 'কল্পনা'র উপরে বড়ই বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু মানুষের মধ্যে, জীবের মধ্যে, সেই 'ব্রহ্ম' কখন কখন তাহার পূর্ব্বতন কবি-স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখন সে ঐ ছলনাময়ীকেই বৈষ্ণব-ভাবে শোধন করিয়া লইয়া রসবিহ্বল হয়, অশ্রুকেও পরমানন্দের অমৃতরস করিয়া তোলে। যদি সেই ব্যক্তি একাধারে কবি ও বৈদান্তিক হয়, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, যতীন্দ্র-নাথের তাহাই হইয়াছে। যেহেতু যতীন্দ্রনাথ কবি, সেই হেতু তিনিও স্রষ্টা-ঈশ্বর, তিনিও মায়াধীশ,—তিনিও তাঁহার কল্পনাকে ইচ্ছামত রূপরসসৃষ্টিতে নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু সেই সঙ্গে জীবত্বাভিমান বর্জ্জন করিতে পারেন না বলিয়া, নিজেকে সেই 'মায়া'র দাস মনে করিয়া তাহার প্রতি অতিশয় কুপিত হন; প্রকৃতিরূপিণী মায়া তাঁহাকে প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া, তাহার সেই কটাক্ষ-ঈক্ষণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেও, তাহাকে ভাল লাগে বলিয়াই তাহার প্রতি বিদ্বেষের অন্ত নাই। ভিতরে যেন দুইটা বিষম-ধাতুর অবিরাম সংঘর্ষ চলিতেছে; তিনি নিজেই তাহা একটি সুন্দর উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন যথাঃ—

"সহসা সেদিন, বেজায় কুদিন—সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
ঘাড়-মোড় ভেঙে ড্রেনের ভিতর পড়িলাম একেবারে!
কাদা মেখে উঠি' নেশা গেল ছুটি', পাঁজরে বিষম
ব্যথা—
গুণে দেখি ভাই, একখানা হাড় খসিয়া পড়েছে
কোথা!
কথা নহে বলিবার—
আপনিই তাই গোপনে সেখানে জুড়িনু ভেড়ার
হাড়।

উপরে মিলেছে বেমালুম হ'য়ে শিঙানো চামড়া-পটি
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খটাখটি !''

—এই 'খট্‌খটি'ই তাঁহার কবি-জীবনের ট্র্যাজিডি।

আরও প্রমাণ আছে। বৈদান্তিকের ধ্যানে ও জ্ঞানে এক বই দুই নাই; যতীন্দ্রনাথের 'বন্ধু'ও যতীন্দ্রনাথ নিজেই,—তাই দুঃখটাও তাঁহার সেই 'বন্ধু'রই দুঃখ, অর্থাৎ ইহাও বেদান্তের সেই 'আত্মার' দুঃখ। ঐ আত্মার পক্ষে 'মায়া' বা 'কল্পনা'ই সকল অনিষ্টের মূল—উহাই ত' ঈশ্বর-ব্রহ্মকে জীবের অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছে! কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ত' খাঁটি বৈদান্তিক নহেন, তাঁহার মধ্যে যে ঐ 'নর-ভেড়া-হাড়ের খটাখটি' রহিয়াছে; তাই বৈষ্ণবের মত রসবিহ্বল হইতে না পারিলেও ঐ অবিদ্যারূপিণী তাঁহার ধর্ম্মনাশ করিয়াছে, অর্থাৎ কল্পনা তাঁহাকেও রেহাই দেয় নাই, শেষ পর্য্যন্ত রূপের একটা বিরূপ রসসৃষ্টিতে তাঁহাকে মশ্‌গুল করিয়াছে।

কিন্তু তাহাতেই বাংলাকাব্যে একটি অতিশয় বিশিষ্ট সুর—যেমন মৌলিক, তেমনই পূর্ণকণ্ঠ হইয়া—ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে যতীন্দ্রনাথ যে কারণে, যে গুণে যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা আজিকার এই হট্টগোলে কাহারও চোখে পড়িবে না,—একদিন পড়িবে, এই আশায় আমি তাঁহার কাব্য ও কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে এই কয়টি কথা লিখিয়া রাখিলাম।

[আশ্বিন, ১৩৫৪]

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরেশচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৩২৫ সালে 'ভারতী'র সাহিত্যিক বৈঠকে। তাঁহাকে অতিশয় সত্যভাষী, দৃঢ়চেতা ও আত্মসম্মানী পুরুষ বলিয়াই প্রথমে বুঝিয়াছিলাম। তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ তৎপূর্ব্বেই হইয়াছে, কিন্তু সেই খ্যাতি অপেক্ষা ব্যক্তিটির সাক্ষাৎ পরিচয় আমাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। পরে তাঁহাকে আরও ভাল করিয়া চিনিবার, বুঝিবার এবং শ্রদ্ধা করিবার সুযোগ যখন আমার হইল, তখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আমি একটি বিশিষ্ট চরিত্রের মানুষ বলিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে গৌরব বোধ করিয়াছি।

সুরেশচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত আমার ভালরূপ জানা নাই—পরোক্ষে যেটুকু জানিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছিল, তাহার অধিক জানিবার প্রয়োজন হয় নাই। ১৯০৪।৫ হইতে ১৯০৯।১০ পর্য্যন্ত বাংলাদেশের যুবক-সমাজে যে নবজীবনের সাড়া জাগিয়াছিল, মুক্তিপিপাসা ও মনুষ্যত্ব-সাধনার যে অধীর আগ্রহ অনেকের মধ্যে সত্যই জাগিয়াছিল—সুরেশচন্দ্রের মধ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার পিতা উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া সামাজিক ও বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সেই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশচন্দ্র স্বাধীন জীবিকা ও মানুষের মত জীবনযাপনের উপায়-সন্ধানে জাপানে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন। সুরেশচন্দ্র একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, জাপানে অবস্থান কালেই তিনি নিজেকে শিক্ষিত করিতে ("to educate myself") প্রবৃত্ত হন। সেই আত্মশিক্ষা-কার্য্যের ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা, যাঁহারা সুরেশচন্দ্রকে একটু ভিতর হইতে দেখিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন; আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষা সাধারণতঃ যাহা হয়, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সুরেশচন্দ্র একজন স্থিরধী, স্থিরলক্ষ্য, সুশিক্ষিত, রুচি ও রসবোধ-সম্পন্ন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, এবং স্বাধিকার ও পর-অধিকার সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন, আদর্শ ভদ্র-মানুষরূপে আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করিয়াছিলেন। 'ভারতী'-চক্রের যে তিনজনকে আজ একসঙ্গে মনে পড়িতেছে, যাঁহাদের ব্যক্তিত্বের

স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, ব্যবহারে ও সামাজিক আচরণে একটি খাঁটি চারিত্রিক আভিজাত্য চিরদিন স্মরণীয়, তাঁহাদের মধ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বহু-পূর্ব্বেই গত হইয়াছেন—বাকি ছিলেন সুরেশচন্দ্র, তাঁহার জীবদ্দশাও শেষ হইল ; ঐ শ্রেণীর আধুনিক সমাজে তেমন চরিত্র বিরল হইয়া উঠিয়াছে।

সুরেশচন্দ্রের জীবনের একটি ঘটনায় তাঁহার চরিত্রের একটি দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া, আমি এখানে তাহার উল্লেখ করিব। জাপান হইতে যে নূতন জীবনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি দেশে ফিরিলেন, তাহার ফলে তাঁহার মত সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে রক্ষণশীল পিতার সহিত অনেক বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হইল না। তিনি সামাজিক জীবনে এমন একটা বিদ্রোহ-সূচক কার্য্য করিলেন, যাহার জন্য পিতৃপরিবারের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। তারপর সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়া একক অসহায়ভাবে কঠিন জীবন-যুদ্ধে সেই যে ব্রতী হইয়াছেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে যুদ্ধ, সর্ব্বপ্রকার অভাব-অনটনের মধ্যে, তিনি হাসিমুখে করিয়া গিয়াছেন ; ভিতরে ও বাহিরে আত্মসম্মান অটুট রাখিয়া, ভদ্র-জীবনযাপনের আদর্শ এবং তদনুরূপ স্বচ্ছন্দতার অভাব—এই দুইয়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব মিল রাখিয়া তিনি যে ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার মধ্যে তাঁহার মনের যে উদারতা, চরিত্রের সংযম, এবং আত্মসম্ভ্রমযুক্ত স্বাধীনতা-প্রীতি লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতাম—একদা পরোক্ষে তাঁহার কোন আত্মীয়ের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বিস্ময়ের আর কোন কারণ রহিল না। সে কাহিনী এই। পিতার জীবিতকালে তাঁহার সহিত পুত্র সুরেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সুরেশচন্দ্র জানিতেন পিতা তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার কোন ক্ষোভ ছিল না ; কিন্তু পিতা যখন মৃত্যুকালে কোন উইল করিয়া গেলেন না, তখন তিনি অনায়াসে পিতৃসম্পত্তি দাবি করিতে পারিতেন, কিন্তু কিছুতেই কোন পরামর্শে তিনি তাহা করেন নাই ; তাহার কারণ, তাহাতে তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়—আইন সে অধিকার দিলেও বিদ্রোহী সন্তানের পিতৃ-সম্পত্তি-ভোগ তাঁহার নিজের ধর্ম্ম-অনুসারে অতিশয় অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, নিজের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রার সকল দায়িত্ব তিনি প্রকৃত বীরের মত বহন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একবার কাশী-বাসিনী মায়ের অতিশয় কষ্ট হইতেছে শুনিয়া, সাংসারিক সকল বন্ধন ছিন্ন হওয়া

সত্ত্বেও, তিনি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কীর্ণ গৃহস্থালীতে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

এই চরিত্র, বাংলাদেশের যে আবহাওয়ায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই আদর্শ-বিপর্য্যয়-জনিত আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব বা নৈতিক সংগ্রামশীলতার আবহাওয়া আজ আর নাই। অতিশয় রক্ষণশীল হিন্দু-বাঙালীসমাজেই এককালে যে সকল বলিষ্ঠ বিদ্রোহী মানুষের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আজ প্রায় লোপ পাইয়াছে। বাঙালী-সমাজের একটি নিভৃত কোণে, লোকলোচনের অন্তরালে বাস করিয়া এই যে একটি অতিশয় শক্তিমান, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, বন্ধু-বৎসল, সুরসিক, চিন্তাশীল, নির্ব্বিরোধী, স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠ মানুষ, জীবনের ঋণ অকাতরে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার সেই জীবনকে সমগ্রভাবে স্মরণ করিয়া আমার মনে যে চিত্র উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহাই অতি সংক্ষেপে পাঠকগণের সম্মুখে ধরিলাম। সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র অপেক্ষা মানুষ সুরেশচন্দ্রের মূল্য আজ অনেক বেশী মনে হইতেছে। আজ দেশে সাহিত্যিকের সংখ্যা অগণ্য—কিন্তু সমাজের সকল স্তরেই মানুষের বড় অভাব হইয়াছে; তাই আমাদের দেশের ধন-মান-বিদ্যা ও কাল্‌চারের অধুনাতন প্রদর্শনীতে স্থান পাইবার অযোগ্য হইলেও, এই মানুষটির বিয়োগে অতিশয় দুঃখ পাইয়াছি।

মানুষ সুরেশচন্দ্রের পরিচয় দিলাম। সুরেশচন্দ্রের সাহিত্যিক পরিচয়ও সংক্ষেপে দিব। উপরে তাঁহার চরিত্রের যেটুকু আভাস পাওয়া যাইবে, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলেও সেই চারিত্রিক প্রেরণা আছে। সংযম ও সত্যবাদ, সংস্কার-মুক্তি ও স্বাধীনতার স্পৃহা, যতটুকু নিজস্ব উপলব্ধি তাহার অধিক দাবী না করা, এবং সমসাময়িক সাহিত্যের যেটুকু সর্ব্বাঙ্গীন জীবনের পক্ষে পুষ্টিকর, তাহাকেই আগ্রহে অভিনন্দিত করা—সুরেশচন্দ্রের সকল সাহিত্যিক কার্য্যে ও চিন্তায় ইহাই ছিল একমাত্র প্রেরণা, ইহাই ছিল আশ্বাস ও আনন্দের হেতু। জাপানে গিয়া তাঁহার চিত্তের দ্বিজত্ব-লাভ হইয়াছিল। শুধু মুগ্ধ-বিস্ময়ে নয়, বিচার-যুক্ত শ্রদ্ধা ও ধীর দৃষ্টি সহকারে, মনুষ্য-জীবন ও মনুষ্য-চরিত্রের যে একটি প্রকাশ সে দেশের সেই সদ্য-বিজয়ী জাতির মধ্যে তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সমগ্র সত্তাকে জাগ্রত করিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার এক নূতন জীবনমন্ত্রে দীক্ষা ঘটে। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রথমেই

তাঁহার নিজ চিত্তের সেই বিস্ময় ও শ্রদ্ধা 'জাপান' নামক পুস্তকে যে ভাষায় ও যে ভঙ্গিতে চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ; সে পুস্তকে তিনি চক্ষু, হৃদয় ও বুদ্ধি এই তিনের যে সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই সেকালের উদীয়মান সাহিত্যিক-সমাজে তিনি একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিলেন। 'জাপান' বলিতে এখনও সুরেশচন্দ্রকেই বুঝায়; তাহার কারণ, জাপানের পরিচয় দিতে গিয়া তিনি তাহার মধ্যে আপনাকে দান করিতে পারিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র এই জাপান-কাহিনীকেও নিজের জীবন-কাহিনীর অঙ্গীভূত করিয়া শেষে যে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, সেই 'চিত্রবহা'ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্ত্তি। এই উপন্যাস-খানিতে তাঁহার নিজের অন্তরের ভাব ও ভাবনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তালব্ধ আদর্শকেই—গভীর আন্তরিকতা, উদার অনুভূতি ও সত্য-পিপাসার সৎসাহস সহকারে রূপ দিয়াছেন। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি শুনাইবার জন্য তিনি আমাকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র অথচ অতিশয় পরিচ্ছন্ন গৃহতলে আমরা আসন পাতিয়া বসিতাম, উজ্জ্বল আলোকে ও ধূপের গন্ধে সন্ধ্যাগুলিকে দেবমন্দিরের আরাত্রিক-সন্ধ্যা বলিয়া মনে হইত; সুরেশচন্দ্রের সেই ধীর একাগ্র পাঠভঙ্গিতে একটি বিনীত ও সংযত শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়া উঠিত—যেন তিনি তাঁহার জীবনের দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিতেছেন। এই সকল হইতেই মনে হয়, সুরেশচন্দ্রের জীবনে ও চরিত্রে যে বস্তুটি বিশেষ করিয়া বিকশিত হইয়াছিল —তাহা শ্রদ্ধা; অন্ধ ভক্তি নয়, রসোদ্বেল চিত্তচাপল্য নয়—সত্য-নিষ্ঠার যে আত্মিক তৃপ্তি, এবং তজ্জনিত যে বিনয় ও বিশ্বাস-পরায়ণতা তাহাই ছিল তাঁহার প্রধান গুণ। 'চিত্রবহা'র পাণ্ডুলিপি পাঠকালে, তিনি রচনার অসংযম অথবা ভাবকল্পনার মিথ্যাচার বিষয়ে অতি শঙ্কিতভাবে আমাদিগকে প্রশ্ন করিতেন। বইখানি তিনি প্রাণ দিয়া লিখিয়াছিলেন; আমার মনে হয়, সুরেশচন্দ্রের প্রাণ-মন ও সাহিত্যিক প্রতিভার পূর্ণতম পরিচয় এই পুস্তকেই আছে। নিম্নে তাঁহার রচিত সকল পুস্তকের নাম দেওয়া গেল।

১। জাপান
২। হানাফী
৩। বনস্পতির অভিশাপ

৪। নামিকো

৫। চিত্রবহা

৬। চিত্রগ্রীব (অনুবাদ—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, Gay-Neck)

৭। যূথপতি (ঐ Chief of the Herd)

৮। আলুপোড়া

৯। পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা (অনুবাদ)

এইগুলি ছাড়াও অনেক ছোট গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি, নানা মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

[আষাঢ়, ১৩৪৮]

রবীন্দ্র মৈত্র

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আমি দেখিয়াছিলাম; যাহারা দেখে নাই তাহারা তাহাকে চিনিবে না। বাংলাদেশের আধুনিক 'সাহিত্যিক' সম্প্রদায়ের পরিচয় ছাপার হরফেই ভালো, কারণ তাহারা মানুষ নয়, কেতাব। কিন্তু যে মানুষের জীবন-তথ্য তাহার আকৃতিতে, চলনে, বলনে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে চাক্ষুষ হইয়া উঠে,—যাহার ব্যক্তিত্ব যেন সর্ব্ব অঙ্গে মূর্ত্ত হইয়া ওঠে, তাহার পরিচয় কেবল কথায় দেওয়া যায় না। রবীন্দ্র মৈত্র নামক মানুষটি বাহিরে ধরা দিয়াছিল আর দুইটি রূপে —তাহার কর্ম্মে ও তাহার সাহিত্য-সাধনায়। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির মিল ঘটে নাই; এই উভয়ের মধ্যে যেখানে সামঞ্জস্য ছিল সেখানটিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই—অর্থাৎ নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করিবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া গিয়াছে। এই সামঞ্জস্য-সাধনে সে প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—দ্বিদল চণকের সন্ধিস্থলে অঙ্কুর-উদ্গম হইতেছিল; আশা-বিস্ময়ে উন্মুখ হইয়াছিলাম, বাংলাসাহিত্যে এক প্রাণবান শক্তিমান রসিক লেখকের অভ্যুদয় সুনিশ্চিত মনে করিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম।

সে তাহার জীবনের প্রথম ভাগ নিয়োজিত করিয়াছিল কর্ম্মে, সে কর্ম্মের প্রেরণা ছিল তাহার হৃদয়ে। বর্ত্তমান যুগের বাংলাদেশ তাহাকে 'নিশির ডাকে'র মত ডাক দিয়াছিল—তাহার প্রাণ স্বপ্নবিভোর, দেহ ছিল জাগ্রত; কর্ম্মের পশ্চাতে ছিল দুরন্ত হৃদয়াবেগ, বাস্তবের ভাবনা ছিল প্রেমের আশায় ও প্রেমের বিশ্বাসে প্রদীপ্ত। এই হৃদয়াবেগের সঙ্গে ছিল বলিষ্ঠ মনন-শক্তি,—সে একজন উৎকৃষ্ট বক্তা ছিল। তাহার চোখ দুইটি ছিল আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময়, আবেগে বিস্ফারিত ও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। এই সব লইয়া সে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। এত বড় অস্থির মানুষ আমি আর দেখি নাই, তাহার দেহ-মনে সর্ব্বদা একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়াইত। একই মানুষের মধ্যে, একই কালে, এমন ভাবগভীর আন্তরিকতা ও ব্যঙ্গকুশল রঙ্গরসিকতা আমি আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সময় নাই অসময় নাই, ঝড়ের মত সে আসিয়া পড়িত; হয় ত অনাহারেই আছে, ভ্রূক্ষেপ নাই; দুই তিন ঘণ্টা তর্ক করিয়া, যুক্তি ও আবেগের অদ্ভুত ঝড় বহাইয়া, নিজের রচনা শুনাইয়া সে আবার ঝড়ের মত নিরুদ্দেশ হইয়া গেল; কারণ, আর দাঁড়াইবার সময় নাই,—রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত

তাহার কাজ আছে, ভূতের বেগার আছে,—মুচি-মেথরের বস্তিতে পাঠশালার কাজ আছে, আরও কত কি আছে। তথাপি তাহার চোখ সর্ব্বদা হাসিতেছে, ক্লান্তি বা অবসাদের লেশমাত্র তাহার দেহে মনে কোথাও নাই।

এই ব্যক্তি ছিল লেখক, বাংলার বাণী-মন্দিরে ভক্তসাধক! লেখাও কম নয়, একদিকে সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি; অপরদিকে ব্যঙ্গ-কৌতুক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ও সর্ব্বশেষে নাটক। এই অজস্রতা ও অবাধ প্রবাহের শক্তি দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইতাম। তথাপি মানুষটার মধ্যে যে শক্তির আভাস পাইতাম, সাহিত্যরচনায় তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইত। অনুকৃতিমূলক ব্যঙ্গ-রচনায় তাহার সৃজনীশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম, কয়েকটি ছোটগল্পে তাহার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু এ সকলের মধ্যে, কল্পনার মৌলিকতা, দৃষ্টিশক্তি ও ভাবুকের অনুকম্পা থাকিলেও, ভাষায় ও রচনাভঙ্গিতে উৎকৃষ্ট শিল্পীমনের বিশিষ্ট ছাপ তখনও ফুটিয়া উঠে নাই। বুঝিতাম, এই শক্তিমান পুরুষ এখনও আত্মস্থ হয় নাই; নিজশক্তিকে ঠিকমত প্রয়োগ করিয়া আপনাকে আপনি চিনিয়া লইবার অবকাশ তখনও হয় নাই। সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহার জন্মগত সম্পদ হইলেও, অনন্যমনা হইয়া তাহার সাধনায় ব্রতী হইতে সে এখনও পারে নাই—তাহার সাধন-মন্ত্র এখনও দ্বিধাযুক্ত হইয়া আছে। তাহার যে সকল রচনা তখন পর্য্যন্ত আমি দেখিয়াছি তাহার বৈচিত্র্যে ও বলিষ্ঠতায় একটি সদাজাগ্রত হৃদয়, সাহসী মন, ও তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টির পরিচয় ছিল। যে ঝড়ের মত জীবন সে যাপন করিত, সেই ঝড়ের একটা লীলার দিক এই সকল রচনায় প্রকাশ পাইত—শক্তি আছে, বেগ আছে, যথেচ্ছ বিচরণের যোগ্যতা আছে, কিন্তু সে কোথায়ও দাঁড়ায় না, বসে না; ফলটি ফুলটি যাহা পথে পড়ে তাহাই কুড়াইয়া লইয়া আসে, ছড়াইয়া যায়; যাহা পায় তাহাকে ধ্যানের বস্তু করিয়া, অখণ্ড মানস-সূত্রে গাঁথিয়া, শিল্পী-মনের গভীরতর পিপাসা উদ্রেক ও নিবৃত্তি করিবার অবসর যেন তাহার নাই। তাই তাহার রচনা-শক্তির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাহাতে সেই সুর লাগে নাই, যাহা শিল্পীর আত্ম-প্রত্যয় বা আত্মদর্শনের সুর—যে সুর রচনায় একবার বাজিয়া উঠিলে কাহারো প্রতিভা সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। তথাপি, রবির কর্ম্মজীবন ও সাহিত্যচর্চ্চা —এই দুই দিকেই দৃষ্টি রাখায়, আমি আধুনিক সাহিত্যসম্বন্ধে একটা নূতন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

সকল যুগ সাহিত্য-সৃষ্টির যুগ নয়, কবি-প্রতিভার অধিকারী হইয়াও যুগ-প্রভাবের বশে কত লেখক পথভ্রষ্ট হইয়াছেন—কাব্য লিখিতে গিয়া বক্তৃতা লিখিয়াছেন, অথবা ভাবপ্রধান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কোন যুগে হয়ত মানুষের মনের পিপাসা রসপিপাসাকে অতিক্রম না করিয়া পারে নাই—সে যুগের কাব্যে ছন্দ-সঙ্গীত আছে, লিপিচাতুর্য্য আছে, আশ্চর্য্য উপমা-সমুচ্চয় আছে, ভাবের মৌলিকতাও হয়ত আছে—কিন্তু কল্পনা বা সৃষ্টিশক্তি পাণ্ডিত্য-প্রয়াসের দ্বারা আচ্ছন্ন। আমাদের সাহিত্যে গত যুগের কবিদিগের মধ্যে এমনই একজনকে দেখিতে পাই, যাঁহার উপর সে যুগের একটি প্রধান প্রবৃত্তি বিশেষ করিয়া ভর করিয়াছিল—ইনি 'মহিলা কাব্যে'র কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাঝে রবীন্দ্রনাথের যুগ গিয়াছে, সে যুগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক। তারপর আজ আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহাতে ভাব বা চিন্তার সমস্যা নয়—জীবনের সমস্যাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; এখন পাণ্ডিত্যও নয়, নিরুদ্বেগ সৌন্দর্য্যচর্চ্চাও নয়—এ যুগের প্রধান প্রবৃত্তি কর্ম্মপথে জীবন-জিজ্ঞাসা। আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে এই কর্ম্মও স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না; কর্ম্ম অর্থে অতি সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সন্ধান, এবং জীবন-জিজ্ঞাসার নাম কাম-প্রবৃত্তির উদ্দাম অধ্যবসায়। অতএব এ যুগও সাহিত্যসৃষ্টির যুগ নয় বলিয়াই মনে হইতে পারে। একদিকে যেমন চিন্তা ও ভাবুকতার অবকাশ নাই, আর একদিকে তেমনই জীবনের সম্মুখীন হইবার সাহস নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এই অধঃপতিত সমাজে একাধিক মহাপুরুষের জীবন ও বাণী জাতির হৃদয়-গোচরে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীমূর্ত্তি—তাঁর সেই দুর্নিরীক্ষ্য জ্যোতিশ্চর্য্যা,—আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সে বাণী ব্যর্থ হয় নাই, হইবার নয়। মনুষ্য-দেহে দিব্য-আত্মার প্রকাশ ক্বচিৎ হয়; যখন হয়, তখন জগতে মন্বন্তর আসন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিবেকানন্দকে আজও আমরা চিনি নাই, তার কারণ, আমরা যুক্তিবাদী ও 'প্রগতি'-বাদীর আখড়ায় পরধর্ম্মের উচ্ছিষ্টভোজে এখনও লালায়িত; প্রাণধর্ম্মের দিব্যমন্ত্রে এখনও সাড়া দিতে পারি নাই; দেশ ও জাতির শতজন্মের চেতনা-গহনে যে বিরাট আত্মা পথ হারাইয়া পথ খুঁজিতেছিল, তাহার সেই আকস্মিক পথ-প্রাপ্তির দৈব-ঘটনাকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই—এখনও সূর্য্যকে অস্বীকার করিয়া আলেয়ার অনুসরণ করিতেছি। কিন্তু বিবেকানন্দ আমাদিগকে

চিনিয়াছিলেন, তাই বিংশশতকের আরম্ভ হইতেই অচল-চক্র চলিতে সুরু করিয়াছে, সে চালনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে। দ্বিতীয় মহাপুরুষের বাণী শেষ হয় নাই, সে বাণীমূর্ত্তি আমরা এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্ত্তমান যুগে এই দুই বীর-মানব মন্বন্তরের মহাপ্লাবন রোধ করিয়া মৃত্যুস্রোতের উপরে যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অনেকে আরোহণ করিতেছে, সেই জাঙ্গাল ধরিয়াই জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে। বর্ত্তমানে এ জাতির মধ্যে যেখানে যেটুকু জীবন-স্ফূর্ত্তি ঘটিয়াছে, তাহার মূলে আছে এই দুই মহাপুরুষের প্রেরণা—এ বিষয়ে এ যুগে ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আর কেহই নাই; একথা অস্বীকার করিয়া—সাম্প্রদায়িকতার মোহে, কোনও মিথ্যাকে এখনও খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টা শুধুই নিরর্থক নহে, তাহা নীচতা ও শঠতার পরিচায়ক।

অতএব আজিকার সমাজে জীবন যে কোথায়ও নাই এমন কথা আর বলা চলে না। কিন্তু এই জীবন-চর্য্যা কি সাহিত্যচর্চ্চার অনুকূল? প্রশ্নটা কিছুকাল যাবৎ আমার মনে নূতন করিয়া জাগিয়াছে। জাতির মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে—একদিকে যে অতিরিক্ত ভাবাবেগ, আত্মভ্রষ্টতা ও অসংযম, এবং অপরদিকে যে ধরণের কর্ম্মোন্মাদ, আত্ম-উৎসর্জ্জনের অধীরতা—তাহাতে সাহিত্যিক প্রেরণা বা কবিকার্য্যের অবকাশ কোথায়? বিংশশতাব্দীর এই মন্বন্তরমুখে আমরা আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে বিশেষ বড় কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি? যাহা কিছু উৎপন্ন ও স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাহা গত যুগের আদর্শ বা প্যাটার্ণের উপর সূক্ষ্মতর সূচীকর্ম্ম মাত্র—স্রোতোহীন বদ্ধ জলরাশি যতই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, ততই তাহা অগভীর হইয়াছে। ইহার কারণ, জীবনে যে বান ডাকিয়াছে তাহার গতি ভিন্নমুখী; সাহিত্যের যে আদর্শে আমরা দীক্ষিত হইয়াছিলাম তাহা ভাবাকুল আত্মপ্রসাদের আদর্শ; জীবনকে ফাঁকি দিয়া, মনুষ্যত্ব ও পৌরুষকে উপেক্ষা করিয়া, জীবিতের জীবনধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া, আমরা এক অতিসুন্দর মিথ্যার উপাসনা করিয়াছিলাম। এই মানস-আদর্শের দম্ভও কম ছিল না; ইহার পশ্চাতে ছিল উপনিষদের ব্রহ্মবাদ; কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আস্ফালন; সুরুচি, শুচিতা ও বিবেকের নামে আত্মসুখস্বাধীনতার জয়ঘোষণা; কুৎসিত, কুরূপ ও কর্দ্দমাক্ত বলিয়া জাতিসাধারণের স্পর্শ বাঁচাইয়া একটা নূতন ধরণের কাঞ্চন-কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠা। সমগ্র শিক্ষিতসমাজে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

এই মনোবৃত্তির প্রসার-কল্পে সাহিত্য কম সাহায্য করে নাই। এ আদর্শের প্রভাব এখনও সাহিত্যে প্রবল; অথচ জীবনে যেটুকু সত্যের সাড়া জাগিয়াছে, তাহা এ আদর্শের প্রতিকূল। এ যুগে জীবনের গভীরতর প্রবৃত্তির সঙ্গে এই স্বনুষ্ঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যধর্ম্মের বিরোধ সাহিত্যকে আরও প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে; এককালে সাহিত্য যেমন জীবনের সত্যকে পরাভূত করিয়াছিল, এখন তেমনই, জীবনের সত্য সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু জীবনে এখনও সে দৃষ্টি আসে নাই—জীবনের অন্তস্তল হইতে যে সত্যসুন্দররে অভ্যুদয় হইবে, তাহারই দিব্য-প্রতিভায় অতঃপর সাহিত্যের নবকলেবর নির্ম্মাণের সময় আসিতেছে।

সময় এখনও আসে নাই—আসিতেছে। অতি-আধুনিক সাহিত্যের যে রূপ দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি, উহাতে কোনও নূতন প্রবৃত্তির প্রেরণা নাই; জীবনাবেগ-বর্জ্জিত, পৌরুষ ও মনুষ্যত্বদ্রোহী যে কুৎসিত মানস-ব্যভিচারকে আমরা উচ্চাঙ্গের সত্য বা স্বাতন্ত্র্যসাধনা বলিয়া আশ্বস্ত হইতে চাই—তাহা পূর্ব্বতন সাহিত্য-ধর্ম্মেরই অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক পরিণাম; আধুনিক কালে জাতির যে জীবন-সমস্যা কাপুরুষ মানস-বিলাসীর আত্মপ্রসাদ বিঘ্নিত করিয়াছে, ইহা তাহাকেই অস্বীকার করিবার চেষ্টা। ইহা যে নূতন নয়, পুরাতনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহার প্রমাণ—এই আধুনিক সাহিত্য-ব্যভিচারের প্রতি সে যুগের সাহিত্যনায়ক মহাকবির অদ্ভুত মনোভাব। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত, অস্বীকার করিতেও অসমর্থ—কোথায় যেন একটা মমতাবন্ধন আছে। ইহারা যে বাস্তব জীবন-নীতি, দেশ ও জাতিধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত নয়, ইহারা যে কোনও সংস্কারের দাসত্ব করে না—সূক্ষ্ম মানসিকতা বা ভাববিলাসের পক্ষপাতী; ইহাদের রুচি ও রসিকতা যে অতি-আধুনিক য়ুরোপের বা 'বিশ্বের' আদর্শে সুসংস্কৃত, ইহাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসের কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষোভ ও লজ্জার কারণ এই যে, ইহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বা আর্টের আদর্শ খুব বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন নহে, ইহাদের মানস-বিলাসে একটা রুচির শৈথিল্য আছে, মনের সাজসজ্জায় দুই রঙের তালি দেওয়ার মত ইতরামি আছে; এইখানে বাধে, মানস-বিলাসের সত্য-শিব-সুন্দর এইখানে ক্ষুণ্ণ হয়। তাই দেখিতে পাই, গত যুগের সাহিত্যাবতার এ যুগে বড়ই অস্বস্তি

ভোগ করিতেছেন, দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন—কাব্য ছাড়িয়া চিত্রকলার আশ্রয় লইতেছেন, জাতি ও সমাজের পরিবর্ত্তে 'বিশ্ব,' এবং সুন্দরের পরিবর্ত্তে মহামানব-বিগ্রহের সেবায় রত হইয়াছেন।

যতই দিন যাইতেছে ততই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এযুগে সাহিত্যের সে আদর্শ অচল; কারণ, সত্য ও সুন্দরকে এখন আর মানস-বিলাসের সামগ্রী করা চলে না। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের ডাক পড়িয়াছে; সেবায় ও ত্যাগে, মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের মহিমায় সত্য-সুন্দরের অভিনব প্রকাশ মানুষের চোখ ধাঁধিয়া দিতেছে। অন্তরের গভীরতম আবেগ আজ ভিন্নমুখী; সেই মুখে সাহিত্য যদি আজ আপনাকে স্থাপিত করিতে পারে, তবেই এযুগে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব। নতুবা সাহিত্যক্ষেত্রে বানরের ব্যভিচারই প্রশ্রয় পাইবে।

কিন্তু জীবন-বন্যার এই অতি বেগবান স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাহারই গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া, যাহারা সিন্ধুসন্ধানে চলিয়াছে—যাহারা বৃহৎ ও মহৎকে, সত্য ও সুন্দরকে, কর্ম্মের মধ্যে উপলব্ধি করিবার বাসনায় অধীর হইয়াছে তাহারা কি সাহিত্যধর্ম্মী? রস-চর্চ্চা, আর্টের মর্য্যাদা-রক্ষা, খাঁটি কবিকল্পনার আবেগ কি তাহাদের পক্ষে সম্ভব?—সাক্ষাৎভাবে হয়ত নয়। কিন্তু যাহারা সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছে, এযুগের এই প্রবলতম প্রবৃত্তি তাহাদের সেই প্রতিভাকে প্রভাবিত করিবে না? য়ুরোপীয় বহু কবি-সাহিত্যিকের জীবনেতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত দ্বারা এমন সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যাইতে পারে যে, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, প্রত্যক্ষ বাস্তবের ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির সাধনা—সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায় নহে; বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াই কবিকল্পনা শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে এই ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপ না দিলেও, যাহাদের ভাবনা ও কল্পনাশক্তি সুন্দর ও সতেজ—জাতির জীবন-ধর্ম্ম-সাধনা, যুগবিশেষের সমষ্টিগত প্রেরণা, তাহাদের ব্যক্তি-চেতনায় সাড়া পাইয়াছে, রস-সঞ্চারের অনুকূল হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কাব্য-সংস্কার ও কবি প্রবৃত্তি রসের যে আদর্শকে চিরদিন বরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার মতে, কাব্য-জগৎ বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্র হইতে এতই দূরে যে, এ দুইএর মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ ঘটিলে কাব্যের রসহানি অনিবার্য্য। তার কারণ, আমরা কবিত্বকে মনুষ্যত্ব হইতে পৃথকরূপে ধারণা করি, আমাদের কাব্যসাধনা একরূপ বানপ্রস্থ। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ

আমরা কখনও স্বীকার করি নাই, আমাদের সাহিত্যিক আদর্শ চিরদিনই অসম্পূর্ণ; তাই আজ জীবন যখন এমন করিয়া আমাদের সর্ব্ব-চেতনাকে গ্রাস করিয়াছে, তখন আমরা সাহিত্য-ধর্ম্ম বজায় রাখিবার কোনও উপায় আর দেখিতেছি না। পুরাতন আদর্শবাদীরা আজ চমকিত, বিভ্রান্ত; নূতন আদর্শের নূতন প্রেরণা এখনও নূতন রস-রূপের সন্ধান পায় নাই।

একই কালে জীবনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাত নিজ বক্ষঃপঞ্জরে ধারণ করা, এবং তাহারই মধ্যে ধ্যাননিবিষ্ট দৃষ্টিতে রস-রূপের সাক্ষাৎকার—আজিকার সাহিত্য-সাধনায় কবিপ্রতিভার এই দুরূহ পরীক্ষা উপস্থিত। ভবিষ্যৎ কবি-শিল্পী হয় ত কল্পনার সাহায্যে তাহাকে আয়ত্ত করিবে; কারণ, তখন জীবনে ও সাহিত্যে বিরোধ ঘুচিয়া, উভয়ের মধ্যে রসের সংক্রমণ-সেতু নির্ম্মিত হইয়া যাইবে। কিন্তু আজিকার সাহিত্যসেবী এই দ্বন্দ্বের দ্বারা নিরতিশয় বিক্ষিপ্ত—আজ তাহাকে ভাব ও কর্ম্মের বিরোধ নিজের জীবনেই মিটাইয়া, সাহিত্যে নূতন রসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

রবীন্দ্র মৈত্রকে দেখিয়া ইহাই মনে হইয়াছিল। তাহার মত আরও অনেকে এই দ্বন্দ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভার সম্যক অবকাশ পাইতেছে না। কেহ বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমন একজনকে অন্ততঃ জানি, যাহার শিল্পী-মনের পরিচয় বহুপূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম; তাহার রচনায় কবি-শক্তির নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে; চিত্রকলার সাধনাও সে করিয়াছে; কিন্তু যুগ-দেবতার আহ্বান সে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই—ধ্যানের আসন ত্যাগ করিয়া সে অবশেষে প্রাণের তাড়নায় গৃহত্যাগী হইয়াছে। রবি জীবনের ডাক শুনিয়াছিল আগে, কর্ম্মোৎসাহই তাহার জীবনের আদি-প্রবৃত্তি। তাই, প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন তাহাকে চিনিতে পারি নাই, তাহার সাহিত্যিক প্রতিভার বিশেষ কোন উন্মেষ তখন লক্ষ্য করি নাই। পরে যখন তাহার রচনাশক্তির নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখনও তাহার শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইলেও, প্রতিভায় বিশ্বাস করি নাই। গত বৎসর সে যখন আমাকে তাহার কয়েকখানি পুস্তক দিয়া অভিমত জানিতে চাহিল, তখন তাহার জীবন ও সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে আমি অধিকতর সচেতন হইয়াছি—লেখাগুলি আবার পড়িলাম, কিন্তু কোনও মন্তব্য করিলাম না। এবার যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে

হইল, সে নিজ শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, আত্মপ্রত্যয়ের বিপুল সাহস তাহার চোখমুখে প্রতিভাত হইতেছে। সে তখন 'ঘৃতকুম্ভ' নামক উপন্যাস-রচনায় মশগুল; পরে বিষম কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেই 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' লিখিয়া 'শনিবারের চিঠি' ভরিয়া দিল। এই সময়েই আমি তাহাকে শেষ দেখি, এবং সেই দেখাতেই বুঝিয়াছিলাম, সাহিত্যে তাহার পথ সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। লেখাও পড়ি, মানুষটিকেও দেখি—একই বস্তু চোখে ঠেকে,—সত্যকার শক্তিচেতনার একটি সপ্রতিভ দৃঢ়তা, ও পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব উভয়ত্রই বিদ্যমান।

'ঘৃতকুম্ভ' অসমাপ্ত রহিয়া গেল। এই উপন্যাসে সর্ব্বপ্রথম তাহার রসদৃষ্টির নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলাম। কেবল আবেগ বা অনুকম্পামূলক কাহিনী-রচনা নয়—এ রচনায় লেখক আত্মস্থ; জীবন ও চরিত্রের গভীরতর প্রদেশে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া অনাসক্তভাবে সেই রহস্য ধ্যান করিবার যে ভঙ্গি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহার গৌরব। ভাববাদ বা বাস্তববাদ,—সর্ব্ব বাদ-বিসম্বাদের সংস্কার উত্তীর্ণ হইয়া, কেবল জীবনের আবরণ উন্মোচন করিবার যে স্পৃহা, তাহাই এই উপন্যাসে লেখকের কল্পনায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। কথাবস্তু বা ঘটনাসংস্থানে যেমন কোনও সংস্কারবশ্যতা নাই—নায়ক ও নায়িকার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ প্রথাবিরুদ্ধ, তেমনই চরিত্র-চিত্রণে, মানবীয় প্রকৃতি অথবা সামাজিক সংস্কার—কোনটাই লঙ্ঘন করিবার সজ্ঞান অধ্যবসায় নাই; মোটের উপর কোথাও কোনও অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি নাই; আছে কেবল আধুনিক জীবন-যাত্রার রঙ্গমঞ্চে চিরন্তন মনুষ্য-হৃদয় লইয়া এক অভিনব রস-রহস্যের অভিনয়। এই উপন্যাসে নায়িকার যে চরিত্র কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেই লেখকের মৌলিকতার পরিচয় আছে; এই চরিত্রের রহস্যই কাহিনীকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। রবির প্রতিভার প্রথম প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই এই উপন্যাসে।

'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এর অভিনয় অনেকেই দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন—লেখক দেখেন নাই; দেখিলে নাটকখানির সম্বন্ধে আরও নিশ্চিন্তভাবে মত প্রকাশ করিতে পারিতাম। অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে—এই রচনার উৎকৃষ্ট হাস্যরস। উপন্যাসে ও গল্পে যেমন হউক, বাংলা নাটকে আমরা সাধারণতঃ যে হাস্যরসে অভ্যস্ত—তাহা রঙ্গরস মাত্র। যে হাসির অন্তরালে অতি গভীর criticism of life আছে, অর্থাৎ, যে হাস্যরস

উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কোনও মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত হয়—তাহাই কাব্য, তাহাই উৎকৃষ্ট রস। 'ঘৃতকুম্ভ' ও 'মানময়ী' এই দুইটি রচনায় লেখকের অকৃত্রিম জীবন-প্রীতি বা জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় রহিয়াছে। এই মানস-ভঙ্গি অতিশয় দুর্লভ ; যে দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতে জানিলে, একই কালে অধর হাস্যরঞ্জিত ও নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে, তাহাই রসিকের দিব্যদৃষ্টি। রবি এ দৃষ্টি পাইল কোথায় ? সে ত' আজীবন দুরন্ত আবেগে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে ; কখন কেমন করিয়া সে এই স্থির রসদৃষ্টি লাভ করিল !

আজ যে তাহাকে স্মরণ করিয়া এত কথা বলিতেছি, তাহার মূলে আছে এই বিস্ময়। রবি তাহার সাহিত্য-সাধনায় যে সিদ্ধির পথে পা দিয়াছিল, আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে যে-সিদ্ধিলাভ সে নিশ্চয় করিত, তাহা হইতে একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়াছি। আমি সাহিত্যের যে যুগোচিত আদর্শ ও সাধনার কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রবির সাহিত্য-সাধনায় তাহার একটা সুস্পষ্ট সঙ্কেত পাইতেছি। রবির জীবনে ছিল একটা প্রচণ্ড আবেগের তাড়না, তাহারই বশে সে তটভূমি ত্যাগ করিয়া তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল—এক মুহূর্ত্ত কর্ম্মের উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি ছিল না ; যুগধর্ম্ম তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। জাতির জীবন-সঙ্কট, ধর্ম্ম ও সমাজ-রক্ষার দুরূহ সমস্যা, বর্ত্তমানের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রাচীনের ভিত্তিমূল একেবারে ভাসিয়া যাওয়ার উপক্রম, ব্যক্তির আত্ম-সাধনায় সত্য-মিথ্যার অনিশ্চয়তা,—এ সকল তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল ; নূতন ও পুরাতন, ব্যক্তি ও সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মনীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও মানব-সেবা—সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ-বাস্তবের প্রতি এই আসক্তি সত্ত্বেও তাহার সহজাত রস-পিপাসা সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল, ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেও স্থিরবিন্দুটিকে ধরিবার সাধ ও সাধনা সে কখনও ত্যাগ করে নাই। মনে হইয়াছিল, বুঝি এই দ্বন্দ্ব সে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না, তাহার সাহিত্যিক প্রতিভা হার মানিবে—তাহার শক্তি, জীবনকে দেখা অপেক্ষা জীবনকে জয় করার দিকেই ব্যয়িত হইবে। কিন্তু শেষ দুইটি রচনা পড়িয়া সন্দেহ দূর হইল ; বিশ্বাস হইল, সে জীবন ও সাহিত্যের সুগভীর রস-সঙ্গতি প্রাণের মধ্যে লাভ করিয়াছে—সহসা সে এমন একটি স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, যেখানে জীবনের খরস্রোত নিঃশব্দ-গভীর, অতিচঞ্চল জ্যোতিঃপ্রবাহ স্থিরশিখায় দীপ্যমান। জীবনকে এমন করিয়া জয়

করিবার সাধনা যে না করিবে, এ যুগে তাহার দ্বারা উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হইবে না। বাস্তব-বাধাহীন নিরঙ্কুশ কল্পনার দিন গিয়াছে, সোনার স্বপন দেখিবার কাল আর নাই,—লোহাকেই বক্ষ-শোণিতের রসায়নে সোনা করিয়া তুলিতে হইবে, জীবনের বাস্তব সুখদুঃখের তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়া এই দেহের শুক্তি-গর্ভে মুক্তা ফলাইতে হইবে; ইহাই এ যুগের কাব্যসাধনা। রবির অসমাপ্ত সাহিত্য-সাধনা ইহারই ইঙ্গিত করিতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যুগ-প্রভাব প্রতিকূল হইতে পারে, যুগ-প্রভাবের প্রবল শাসনে কবিপ্রকৃতিও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারে; অথচ যুগকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া কবি-মানসের যে স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠা, তাহাও সত্য নহে—কল্পনার সে স্বাতন্ত্র্য যতই ব্যক্তিত্ব-মহিমায় মণ্ডিত হোক, তাহাতে কাব্যের উৎকর্ষহানি হয়। কাব্য যতই সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বভৌমিক হোক—যুগ, জাতি, ও দেশের ভাব চৈতন্যের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এইজন্য, যদি সে সকলের প্রবৃত্তি কাব্যসৃষ্টির অনুকূল না হয়, তাহা হইলে রসিকচিত্তও নিগৃহীত হয়, সম্যক স্ফূর্তিলাভ করে না। আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে যে যুগ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে তাহা কাব্যসাধনার অনুকূল না হইলেও, তাহার মূলে ভাবাতিরেক আছে—অতিদৃঢ় কর্ম্মব্রত-উদ্‌যাপনের মধ্যেও প্রবল হৃদয়াবেগ আছে। জীবনের গুরুতর সমস্যা অনুধাবন করিয়াই যাহারা কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহারাও কর্ম্মবুদ্ধি অপেক্ষা ভাবের আদর্শকেই আশ্রয় করিয়াছে; এই ভাবপ্রবণতা বাঙালীর চরিত্রে বদ্ধমূল। কর্ম্মের কামারশালে অতিতপ্ত লৌহপিণ্ড হাতুড়ির আঘাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে, তাহাতে শক্তিক্ষয় হয়। কিন্তু এই স্ফুলিঙ্গ-রাশিই যে সাহিত্যের দীপপাত্রে আলোকশিখায় পরিণত হইতে পারে, রবির জীবনে তাহারই আভাস আছে; অর্থাৎ, 'through literature to life' একদিক দিয়া যেমন সম্ভব, তেমনই, 'through life to literature' আমাদের পক্ষে এযুগে শুধুই সম্ভব নয়, ইহা ভিন্ন সাহিত্যের গত্যন্তর নাই। যুগধর্ম্মের যে প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে বর্ত্তমানে সাহিত্যের সম্বন্ধে নিরাশ্বাস হইয়াছিলাম; কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তে আবার আশার সঞ্চার হইতেছে, মনে হইতেছে—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এযুগে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু ভাবপ্রবণ রস-পিপাসু বাঙালী, জীবনের বন্যাবেগ বক্ষে ধারণ করিয়াই সাহিত্যে নূতন রস-রূপের

প্রতিষ্ঠা করিবে; ভাব-চৈতন্যের গহন-অতলে, জীবন ও মৃত্যুর প্রচণ্ড সংঘর্ষে যে ভীষণ আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়, তাহারই মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সে আত্মার রস-রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অভয়প্রাপ্ত হইবে,—বাঙালীর জীবনে শাক্ত ও বৈষ্ণবের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এতদিনে এক অপূর্ব্ব জীবন-সঙ্গীতে লয় পাইবে। রবির অসমাপ্ত সাহিত্য-সাধনায় যে সিদ্ধির আভাস পাইয়াছি, তাহাতেই এত কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

রবির জীবনে এযুগের মূল প্রবৃত্তি—সর্ব্বদ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের উৎকণ্ঠা—সর্ব্বাঙ্গীণ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহারই অন্তর্গতরূপে সাহিত্যের সমস্যাও সমাধানের পথ খুঁজিতেছিল। আধুনিক জীবনযাত্রার যত কিছু বৈসাদৃশ্য, তাহার মধ্যেই 'ঘৃতকুম্ভ' ও 'মানময়ী'র লেখক একটা গভীরতর রস-সত্যের সন্ধানে উদ্‌গ্রীব ও আশান্বিত হইয়াছিল। 'ঘৃতকুম্ভ' নামে যে উপন্যাস সে ফাঁদিয়াছিল, তাহাতে একটা উদ্ভট ঘটনা-সংস্থানে ট্রাজেডির ছায়াপাত হইয়াছে; নীতি ও দুর্নীতি উভয়কে সবলে পাশ কাটাইয়া তাহার কল্পনা যে পথে অগ্রসর হইতেছিল তাহার গন্তব্য ছিল মানুষের হৃদয়-রহস্যের শাশ্বত তীর্থমন্দির। উপন্যাস অসমাপ্ত রহিয়া গেল, তথাপি তাহার কল্পনার যে ভঙ্গি ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহার পূর্ণ পরিণতি এই প্রথম রচনাতেই দৃষ্টিগোচর না হইলেও, সে ভঙ্গি যে কালে অপরূপ সাফল্যে মণ্ডিত হইত, সে অনুমান মিথ্যা নহে। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' রচনাহিসাবে সার্থক হইলেও, খুব বড় কিছু নয় সত্য; কিন্তু ইহার মধ্যেও জীবন-রস-রসিকতার যে ভঙ্গি চোখে পড়ে, তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অল্প ছিল না। ঘটনাবস্তু সামান্য হইলেও, এবং তাহাতে কল্পনার গভীরতা ও অবকাশ যথেষ্ট না থাকিলেও, লেখকের সৃষ্টিশক্তি ও রসদৃষ্টির প্রচুর প্রমাণ ইহাতে আছে। নবযুগের নূতন ভাবপ্রেরণাও ইহাতে লক্ষিত হইবে; অতিশয় বিরুদ্ধ সংস্কারসম্পন্ন নরনারীর একটি সহজ আত্মীয়তা—উদার প্রীতির সম্ভাব্যতা—যে রসের সৃষ্টি করিয়াছে, অতিশয় প্রাচীনভাবাপন্ন পাত্র-পাত্রীর মনে অতি-আধুনিক-আদর্শও অজ্ঞাতসারে যে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছে, তাহাই নাটকখানিকে এমন হাস্য-মধুর করিয়া তুলিয়াছে; কল্পনার এই প্রবৃত্তিই ঘটনা ও চরিত্রগুলির উদ্ভাবন করিয়াছে। সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের উপরে মানুষের হৃদয় যে চিরজয়ী হইয়া আছে—সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতির সমস্যা যেমনই হোক, ধরণীর মহারাসে রসিক-শেখরের রাসলীলা কিছুতেই বাধা মানে না—এই দিব্য-উপলব্ধি রবীন্দ্র মৈত্রকে

কর্ম্মী হইতে কবিপদবীতে তুলিয়া ধরিতেছিল। জীবনের আবর্ত্তসঙ্কুল স্রোতে যে নির্ভাবনায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পক্ষেই এই রসদৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল; কারণ, বাস্তবকে যে সত্য করিয়া দেখিতে পারে, সুন্দর তাহার কাছেই ধরা দেয়। রবির সাহিত্য-প্রতিভা যে শেষে নাটকের দিকেই ঝুঁকিয়াছিল এবং তাহাতেই স্ফূর্তি পাইত বলিয়া মনে হয়—ইহাও আশ্চর্য্য নহে। যে কল্পনা জীবনের গতিবেগ ও কর্ম্মোন্মাদনা হইতে আপন পুষ্টি সংগ্রহ করে, তাহার প্রকাশ-ভঙ্গি নাটক হওয়াই স্বাভাবিক। এই নাটকের অভাব আমাদের সাহিত্যে এখনও ঘুচে নাই। খাঁটি নাটকীয় প্রতিভা এদেশে এত দুর্লভ কেন, এবং আগামী বাংলা-সাহিত্যে নাটক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে কি না—সে প্রশ্নের উত্তর রবির জীবন ও তাহার সাহিত্য-সাধনার কাহিনী হইতে মিলিতে পারে।

রবির সম্বন্ধে আজ আমার যাহা মনে হইতেছে তাহার প্রায় সবটাই বলিয়া রাখিলাম। তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলিবার সময় আসে নাই, তাই এতদিন, কিছুই বলি নাই। কিন্তু তাহার বলা সে শেষ করিয়া গিয়াছে, সকল আশা, সকল কামনার অন্ত হইয়াছে; তাই, একদিন যাহা সম্পূর্ণ প্রমাণসহকারে, অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিবার আশা করিয়াছিলাম, আজ তাহাই দ্বিধাকম্পিত কণ্ঠে সসঙ্কোচে বলিলাম। একদিন সে বড় আব্‌দার করিয়া নিজের রচনাসম্বন্ধে আমার অভিমত চাহিয়াছিল, সেদিন তাহার সে আব্‌দার রক্ষা করিতে পারি নাই। আজ সে নাই, আমার অভিমতের মূল্যও আর নাই; বাঁচিয়া থাকিলে কামনা করিতাম, কাহারও অভিমতের প্রয়োজন যেন তাহার না থাকে। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে নবযুগের কর্ষণ চলিতেছে; যে দুই চারিটি বীজ ইতিমধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে তাহাদের একটি; প্রার্থনা করি, অপরগুলি শাখা-পল্লবে ফলে-ফুলে নিজ নিজ আকার ও আয়তন লাভ করুক, কিন্তু রবির সাধনার প্রায় সবটুকুই ভূমিতলে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল। অকাল-মৃত্যু আরও অনেকের হইয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া ফুটিবার মুহূর্ত্তেই কেহ ঝরিয়া পড়ে না। মৃত্যুকে অনেকরূপেই দেখিলাম—মোহ আর নাই, শোক করিতেও লজ্জা হয়। মহাকাল আপনার প্রয়োজন বোঝে—লাভের অঙ্ক তাহারই, ক্ষতির হিসাবও সেই পূরণ করিবে; আমরা দিন-মজুরীর মজুর মাত্র, নালিশ করিবার কে?

[ফাল্গুন, ১৩৩৯]

দুইখানি উপন্যাস

('শেষ প্রশ্ন' ও 'পথের পাঁচালী')

১

শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' শেষ প্রশ্নই বটে। ইহার পর আর কোন প্রশ্নের বালাই থাকিবে না। শরৎচন্দ্র যখন ঔপন্যাসিকরূপে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন যে তাঁহার মনে সর্ব্বশেষে এই প্রশ্নটি জাগিবার সঙ্কল্প ছিল তাহা কে জানিত? প্রথমে বেশ করিয়া আসর জমাইয়া তুলিয়া বোকা বাঙালী পাঠকের মন ভুলাইয়া তাহার হৃদয় মনের যত কিছু দুর্ব্বলতা আছে সেগুলিকে বেশ করিয়া খুঁচাইয়া তুলিয়া, পরিশেষে, যখন তাহারা তাঁহাকে সাহিত্যসম্রাট পদে বরণ করিয়া লইল, তখন শরৎচন্দ্র অবসর বুঝিয়া এই বেতালের প্রশ্নটি তাহাদের মস্তিষ্কের উপর নিক্ষেপ করিলেন। এখন আর বলিবার যো নাই—এ কি হইল? উপন্যাস কই? এ যে নবধর্ম্ম-প্রচারের প্রশ্নোত্তরমালা! এ ত' নরনারীর জীবন-যাত্রার কাহিনী নয়,—এ যে কড়া নেশার ধোঁয়ায় আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপের বাগ্‌বিতণ্ডা! কিন্তু তাহাতেই কাজ হইয়াছে; শরৎচন্দ্র এতদিন বৃথাই লেখনী ধারণ করেন নাই—বাঙালী পাঠকের রসবোধ সম্বন্ধে তাঁহার নাড়ী-জ্ঞান অসাধারণ! বায়ু, পিত্ত এবং কফের মধ্যে এখন কোন্‌টা কুপিত হইয়াছে তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়া লইয়াছেন। এককালে 'গৃহদাহ' ছিল তাঁহার সাহিত্যকীর্ত্তির চূড়ান্ত, তারপর হইল 'পথের দাবী'; এখন সর্ব্বোচ্চ শিখর হইয়াছে 'শেষ প্রশ্ন'। ইহাই স্বাভাবিক—যেটা যত পরে সেইটাই যে তত পরিপক্ব। স্বর্গারোহণ করিতে হইলে পিছনের পানে তাকাইলেই সর্ব্বনাশ।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' যেমনই হৌক, একটা আন্দোলন, একটা সাড়া জাগাইয়াছে। অতএব 'শেষ প্রশ্নে' শক্তির প্রমাণ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া 'শেষ প্রশ্ন' কি একটি সুরচিত উপন্যাস-কাব্য? শরৎচন্দ্র সরস গদ্য লিখিতে পারেন, তাঁহার লিখনভঙ্গি চিত্তাকর্ষক। গদ্য দুই কাজই করে—উভচর-বৃত্তি তার

পক্ষে সহজ। তাই গদ্যে যখন কাব্য-রচনা হয়, তখন পদ্য অপেক্ষা তাহার যেমন অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য আছে দেখা যায়, তেমনই একটি বড় বিপদও আছে; গদ্য সহজেই কাব্যের সীমানা লঙ্ঘন করিতে পারে, রস-সৃষ্টির ভার লইয়া সে তত্ত্ব-চিন্তা, বিজ্ঞান-ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হইবার ঝোঁক সামলাইতে পারে না। গদ্যের সেই যে অপরা প্রবৃত্তি তাহাই যদি রসসৃষ্টির ব্যপদেশে প্রকট হইয়া ওঠে, তবেই একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। একই পাঠক খাঁটি গদ্যবস্তু ও খাঁটি কাব্যবস্তুর অনুরাগী হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহার রসবোধ জাগ্রত থাকে তিনি দুইবস্তুর দুইটি পৃথক ক্ষেত্র ও বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকেন; তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে' খাঁটি গদ্যের সরস ভঙ্গি আছে, তাহার বিষয়-বস্তুর মূলে আছে তত্ত্ববিশ্লেষণ। এ গ্রন্থের প্রেরণা, কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা নয়—প্রবীণ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তাই ইহার প্রধান উপাদান। শরৎচন্দ্র তাঁহার সেই চিন্তাকে আর কোনওরূপে প্রকাশ করিতে না পারিয়া—উপন্যাসই তাঁহার একমাত্র অভ্যস্ত প্রকাশরীতি বলিয়া—কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রসৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সেই নিজ মানসের উত্তেজনা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। মানুষের জীবন, তাহার চরিত্র ও নিয়তির চিরন্তন রহস্য—যাহা দেশে ও কালে বিচিত্র হইলেও, কবিকল্পনার সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে চিরকাল একই রসের উৎস—এ গ্রন্থে তাহার আভাসমাত্রও নাই; ইহার যাবতীয় পাত্রপাত্রী সেই মানুষ নয়, সৃষ্টির অতি জটিল দুর্ভেদ্য নিয়ম-জাল যাহার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় রসরূপে সরল অথচ চিররহস্যময় হইয়া প্রকাশ পায়। দৈন্য, দুঃখ, অজ্ঞতা, পাপতাপের মধ্যে আমরা যাহাকে স্রষ্টার চরমতম কাব্যসৃষ্টি বলিয়া মানি; যাহার আত্মাভিমান বা জ্ঞানস্পৃহা নয়,—মূক-মৌন জীবনাবেগই বিপুল বিস্ময়ের নিদান; যাহার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চিন্তার খোরাক যোগায় না, বরং —"teases us out of thought";—সেই মূল মনুষ্যপ্রকৃতির পরিচয় এ গ্রন্থে নাই। 'শেষ প্রশ্নের' এই সকল নরনারীকে আমরা অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়াই অনুভব করি, ইহাদের জীবনে সৃষ্টির সাগরস্রোতের গূঢ় সঞ্চার লক্ষ্য করি না—ইহারা কেবল চিন্তা করে, এবং চিন্তার দ্বারা মরজীবনের নিয়তিনিয়মকে ভূমিসাৎ করিতে চায়। 'কমল'-চরিত্র সেই জীবন-রহস্যের বিরুদ্ধে—বিধাতার চির-চমৎকার কবি-কল্পনার বিরুদ্ধে—একজন চিন্তাভিমানী মানুষের বিকট দন্তবিকাশ বলিয়া

মনে হয়। প্রকৃতির উপরে জয়ী হইবার আকাঙ্ক্ষা মানুষ চিরদিনই করিয়াছে, দুই স্কন্ধে মোমের পাখা বাঁধিয়া ঊর্দ্ধাকাশে উড়িবার চেষ্টাও করিয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত উড়িয়াছেও বটে, কিন্তু তথাপি মানুষ পাখী হইতে পারে নাই। কমল সমস্ত নীতিবিধান ও সমাজবিধানকে অস্বীকার করিয়া যে নীতিহীনতার আস্ফালন করে—তাহা সামাজিক সত্য নয় বলিয়াই, এবং সমাজও মূলে প্রকৃতির তাড়নার ফলে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া, তার সেই চমকপ্রদ মিথ্যা উক্তিগুলি শরৎচন্দ্রের চিন্তাবিলাসমাত্র; সেই উক্তিগুলিকে যে চরিত্রের দ্বারা তিনিও বাঁধিয়া দিয়াছেন, সে চরিত্রটি কতকগুলি বাক্যস্ফুলিঙ্গের আতস-বাজি। সে কোনও সংস্কার মানে না, সত্যের সংস্কারও নয়; কোনও কিছুকে ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া থাকিতে সে রাজী নয়। কিন্তু এ ত' মানুষের সম্মতি-অসম্মতির কথা নয়—প্রকৃতি চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে যে একটা কিছু মানাইবে; তাহার রক্ত-মাংসের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের নিয়ম কাজ করিতেছে—তর্ক করিয়া সে হারাইবে কাহাকে? শরৎচন্দ্রের কল্পনায় কমল যে কৃত্রিম জীবনযাপন করিতেছে—সংসারে সেরূপ জীবন-যাত্রা অচল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সে শুধু বাঁচিয়া নাই, মহিমান্বিত হইয়াছে, তার কারণ ইহাতে জীবনের সত্য নাই—ইহা কাব্য নয়, ইহা পুরাতন সমাজনীতির উচ্ছেদমূলক একটি অতিশয় মৌলিক গবেষণা। কমল-নাম্নী তর্ককুশলা বাগ্‌ব্যবসায়িনী আর যাহাই হোক, জীবনান্বিত নারী বা নরজীব নহে, আমরা তাহাকে জীবন-নাট্যের কোনও একটি বিশেষ চরিত্র বলিয়া চিনিতে পারি না; তাহার তুলনায় একজন অতি সাধারণ বারবনিতাও চরিত্রহিসাবে সত্য ও বরণীয়।

কিন্তু তথাপি 'শেষ প্রশ্ন' বাংলা সাহিত্যের হাটে এমন কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছে কেন? ইহার সম্বন্ধে এমন সুস্পষ্ট মতবিরোধ হইবার কারণ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রচনাটি গদ্যকাব্য না হইলেও গদ্যরচনা বটে; গদ্যরচনায় সকলেই কাব্য চায় না; বরং গদ্য খাঁটি রসরচনা না হইয়াও যদি বেশ রসাল হয়, অর্থাৎ খাঁটি কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যাহা অবান্তর সেই সকল চিন্তা, তর্ক ও সূক্ষ্ম মত-বিশ্লেষণ বা সমস্যাসৃষ্টি যদি তাহাতে কাব্যের আকারে উপস্থিত হয়, তবে অনেক সমস্যাবিলাসী তত্ত্বপিপাসু অরসিক ব্যক্তির তাহাতেই কাব্যপাঠস্পৃহা পরিতৃপ্ত হয়। আশ্চর্য্য হই ইহাই ভাবিয়া যে কবি-পদবী হইতে দার্শনিক পদবীতে শরৎচন্দ্র এত শীঘ্র ডবল প্রমোশন পাইলেন কি করিয়া?

২

প্রায় একই কালে আর একখানি বাংলা উপন্যাস রসিক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বহু পাঠকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, বাঙালীর রসবোধ এখনও জাগ্রত আছে; মনে হয়, আধুনিক কালে কুসাহিত্য বা অ-সাহিত্যের যে এত প্রসার তার কারণ ইহাই নহে যে, দেশে সাহিত্যবোধ একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। বুভুক্ষু পাঠক-সমাজ ভাল কিছু না পাইয়া যাহা-তাহা গলাধঃকরণ করে বটে, কিন্তু ভাল কিছু পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লয়। ইহা আশার কথা বটে। 'পথের পাঁচালী'র রচনারীতি সম্পূর্ণ নূতন; ইহাতে মনস্তত্ত্ব নাই, সমস্যা নাই, গল্পবস্তুর চমৎকারিত্ব নাই, তথাপি ইহাতে কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে। বাঙালী-জীবনের তুচ্ছতম উপকরণকে আশ্রয় করিয়া, অতিশয় অনাদৃত, উপেক্ষিত, বৈচিত্র্যহীন পল্লী-প্রকৃতির পটভূমিকায়, এই যে একটি সুস্থ প্রাণবান মর্ত্ত্যতীর্থ-যাত্রীর অন্তরকাহিনী এ কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা পুণ্যবান রসিকের চিত্তে কি অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার করে! কোনওখানে ভাববস্তু বা কল্পনার অসামান্যতা নাই, আছে কেবল—অতি সাধারণ নিত্যকার অনুভূতিকে অকপটে বর্ণন করিবার আগ্রহ; তাহাতেই বিস্ময়ের যেন অবধি নাই। মনে হয়, যেন অনন্ত তমিস্রা-গর্ভ হইতে বাহির হইয়া এই চিরাভ্যস্ত অতি পুরাতন সূর্য্যোদয় দৃশ্য দেখিতেছি—সে আলোকে পৃথিবীর ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত সম্ভ্রম উদ্রেক করে। যেখানে যে-কেহ আছি সেইখানেই তাহার চক্ষে তৃণলতাগুল্মকণ্টক পর্য্যন্ত একটি অনর্ঘ প্রীতির মূল্যে মূল্যবান হইয়া উঠে, সমস্ত চরাচর যেন বৈদিক ঋষির স্তবগানে প্রসন্ন হইয়া উঠে, সকলই মধুময় বলিয়া মনে হয়। এই উপন্যাসের যে নায়ক, তাহার চির-অজর শিশু-হৃদয়কে—তাহার সেই ক্ষুদ্র জীবন-লীলাকেই—কেন্দ্র করিয়া, সুখ-দুঃখ ভাব-অভাবের ছন্দে, বিপুল কালের পরিধি আবর্ত্তিত হইতে থাকে; সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, এমন কি সর্ব্বজীবের যে জীবন-রহস্য তাহারই বিরাট ছায়ায় চির-সদ্যোজাত মানব-প্রাণ অমৃত-পিপাসায় অধীর হইয়াছে। জীবনের সকল তুচ্ছতার অন্তরালে নৃত্যোন্মত্ত মহাকালের সেই ব্যোম-বিভ্রান্ত জটাজাল দেখিয়া, সেই তুচ্ছতাকেও প্রাণের প্রণাম নিবেদন করিতে ইচ্ছা হয়; মৃত্যুর এপার হইতে মৃত্যুর ওপারে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে, এ প্রাণের কাহিনী যেন

বাড়িয়াই চলে, শেষ হইতে চাহে না। দারিদ্র্যের পীড়নে এই জীবন-চেতনা আরও গভীর হয়, স্নেহ-মমতার তন্তুগুলি দৃঢ় হইয়া উঠে; অতৃপ্ত কামনার আবেগে কল্পনা দিগন্ত লঙ্ঘন করে, ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র ভূ-সীমার মধ্যেই ভূমণ্ডলের আভাস জাগে—সাগর-মেখলা অরণ্যকুণ্ডলা পৃথিবীর স্বপ্ন অধীর করিয়া তোলে। যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু গ্লানিকর, যাহা কিছু মুক্তির অন্তরায়, তাহাই অতি সবল সরল মানবাত্মার আনন্দচৈতন্য প্রবুদ্ধ করে। 'পথের পাঁচালী'র সেই শুদ্ধসত্ত্ব অপাপবিদ্ধ শিশু-নায়কের জীবন-লীলা পাঠককেও শিশু করিয়া তোলে, মনে হয়, যেন কেবল শৈশবই নয়, জন্মান্তরের জাতিস্মরতা লাভ করিয়াছি। মনে হয়, মানুষ যেন ললাটে অমর-আত্মার রাজটীকা ধারণ করিয়া এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সংসার সেই রাজ-অতিথির সেবায় আপনার খুদকুঁড়া নিবেদন করিয়াই ধন্য হইতে চায়, তাহারই অমৃত-ভিক্ষার আকিঞ্চনে বিশ্ব তাহার বিপুল বিভব উদ্ঘাটিত করিতে বাধ্য হয়। মনে হয়, ইহাই জীবন, ইহাই যুগ-যুগান্তরের শাশ্বত সত্য,—মানুষ ছোট নয়, জীবন তুচ্ছ নয়, কালের পারাবারে যে অগণিত মন্বন্তর-তরঙ্গ আছাড়িয়া পড়িতেছে, তাহার মুখে, সেই অনন্তবিস্তার ভূমি-সৈকতে, আমার সুখ-দুঃখের শঙ্খ-শুক্তির যেমন হিসাব নাই, তেমনি তাহাদের সে বর্ণ-গরিমাও ব্যর্থ নয়!

ইহাই বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। সকল কাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রেরণা এ উপন্যাসে তাহা আছে। চরিত্রসৃষ্টি বা ঘটনাবিবৃতিই এ রচনার রসবৈশিষ্ট্য নয়; জটিল মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, বা আধুনিক কালের অতি সজ্ঞান নর-নারীর বিষম মানস-বিষের ব্যাখ্যান ইহাতে নাই। মানুষ যে দৃষ্টি হারাইয়াছে—সেই চিরতরুণ গাঢ়-নীল চক্ষুতারকার অনাবিল দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তিনি তাহার জীবনকে গভীরতর ভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন; কোনও তর্ক নাই, কোন সমস্যা নাই—সুখের উন্মাদনা নাই, দুঃখেরও হাহাকার নাই, আছে কেবল দুইটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া এই জীবন-দেবতার দীপারতি। তথাপি এই দৃষ্টির অন্তরালে একটা বিশেষ কল্পনা, একটা বিশেষ ভাবনাভঙ্গি আছে—থাকিবারই কথা, না থাকিলে এ কাব্য এমন একটি সুসম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিত না। কিন্তু সেটাও তত্ত্ব নয়, সমস্যার ইঙ্গিত নয়; সে একটা মনোভাব—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবিচিত্তের একটা বিশেষ রসোপলব্ধি; সেই মনোভাবটি এই কাব্যের পরিকল্পনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

পাঠক সেটিকে বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করে না, কোন একটি তত্ত্বরূপে গ্রহণ করে না—একটি অনুরূপ ভাবাবস্থার দ্বারা অনুভব করে মাত্র। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নয়, একটা নূতন ধরণের চেতনা যেন পাঠককে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করে। একবার ইহার একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থকার নিজে আমাকে জানাইয়াছিলেন,—এই ভাবকে একটি নির্দ্দিষ্ট চিন্তার আকারে সুস্পষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই উপন্যাস-রচনার প্রেরণায় কোনও বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি পক্ষপাত নাই; সমস্ত বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্য দিয়া তিনি যে ধারণাটিকে অনুভূতি-গোচর করিতে চাহিয়াছেন তাহা—'vastness of space and passing time'—এই বিপুল রহস্যের অনুধ্যানে জীবনের স্বরূপ-উপলব্ধি। হইতে পারে, এই উপলব্ধিই তাঁহার কল্পনার মূলে কাজ করিয়াছে; কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্য দিয়া সেই ভাবচিন্তা বস্তু-মমতার রূপেই এমন কাব্য-সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে—রূপে, রঙে, রেখায় ভাবানুভূতির সহস্র ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনায় যে রসমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে কোনও অর্থের বাঁধনে বাঁধা যায় না। কবি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহার পৃথক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয় ত' হইতে পারে, কিন্তু কাব্যে তাহাকে জ্ঞানগোচর করিবার চেষ্টা না করিয়া একটি অনুভূতি-রূপে তিনি যে তাহাকে পাঠকের হৃদয়গোচর করিয়াছেন তাহার কারণ, তিনি বিশেষের মধ্যেই সেই নির্ব্বিশেষকে দেখিয়াছেন; বেশ বুঝা যায়, সে ধারণা কবির কল্পনা-বীজমাত্র—এ বীজ জীবনের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেই কবিচিত্তে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছে।

সকল খাঁটি কাব্যের লক্ষণ ইহাই। কবি-কল্পনার প্রকৃতি যেমনই হোক, তাহার প্রকাশভঙ্গি যতই বিশিষ্ট হোক, কাব্য কোনও সমস্যার উদ্ভাবন বা সমাধান করে না। শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্নে' যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভার পরাজয় লক্ষ্য করা যায়; তিনি কবির আসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার কারণ তাঁহার যৌবনশক্তির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাশক্তিও মন্দীভূত হইয়াছে। আর একটা কারণ তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার মধ্যেই বীজরূপে নিহিত ছিল। তিনি যে-শক্তিবলে এককালে উপন্যাস-রচনায় এমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ অশক্তিও তাঁহার কবিধর্ম্মের একটি লক্ষণ। অত্যধিক emotion বা হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই তাঁহার কবিশক্তির সহায় হইয়াছে—তিনি মানুষকে দেখিতে ও

দেখাইতে পারিয়াছেন তাহার হৃদয়-বেদনার সূত্রটি ধরিয়া। তাঁহার কল্পনা কখনই সেই জাতীয় সহমর্ম্মিতার সাহায্য ব্যতিরেকে বিচরণ করিতে পারে নাই; তিনি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখেন নাই; গৃহপ্রাঙ্গণ বা সমাজসীমানার বাহিরে যে বিরাট জগৎ তাহার বিপুল রহস্য লইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহার দিকে তিনি কখনও দৃষ্টি করেন নাই; একমাত্র শ্রীকান্ত ভিন্ন আর কোনও উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারের তেমন পরিচয় নাই—এবং শ্রীকান্তেও প্রকৃতির সে-রূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের রূপ হইলেও, তাহা যেন জীবনের বহির্দ্দেশে, সে যেন আগন্তুক, অন্তরঙ্গ নহে। এরূপ সংকীর্ণ কল্পনার পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টির যে প্রেরণা যতটুকু সফল হইবার, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে তাহা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোনও রসিক পাঠকেরই নালিশ নাই। কিন্তু এ কল্পনা শীঘ্রই নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে; কেবলমাত্র emotion-এর শক্তি কবিকেও বেশিদিন জীয়াইয়া রাখিতে পারে নাই। জীবনের দুঃখ দৌর্ব্বল্যের দিকটাই তাঁহার যে কল্পনাকে একদিন অপূর্ব্ব-সহানুভূতিরসে পুষ্ট করিয়াছিল, আজ সে কল্পনা যখন আর নাই, অথচ সেই খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত জীবনের দৈন্য তেমনই তাঁহাকে অভিভূত করিতেছে, তখন জীবনের মূলনীতিকে অস্বীকার করা এবং মানুষের আত্মাভিমানকে জয়ী করিবার প্রবৃত্তি আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে। তাই শরৎচন্দ্র এখন উপন্যাস-রচনার ছলে, জীবন-রহস্যের পরিবর্ত্তে, মানুষের মানস-ব্যাধির ঔষধ সন্ধান করিতেছেন।

[ফাল্গুন, ১৩৩৮]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'কবি'-উপন্যাস

১

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রচনাটির একটু বিশেষ পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছি—আমার এই আলোচনা হইতে সকলে তাহার কারণ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সাধারণভাবে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করিতে হইবে, এবং তাহা একটু সবিস্তার হইলেই ভাল হয়।

তারাশঙ্কর বাংলা গল্প-সাহিত্যে, যে একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি এবং রসসৃষ্টির একটি নূতন ক্ষেত্র যোজনা করিয়াছেন, আমার মনে হয়, ইহার সম্যক সজ্ঞানতা আমাদের সাহিত্য-রসিকগণের চিত্তে এখনও ঘটে নাই। আমিও কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে বর্ত্তমান বাংলা গল্পসাহিত্যের যে একটা মোটামুটি পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহাতে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক প্রতিভার দুই একটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাঁহার দৃষ্টি বা কল্পনাভঙ্গির গভীরতার উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের পক্ষেই তাঁহার ঐ প্রতিভার যে একটি অতিশয় মৌলিক, এবং বোধ হয়, গূঢ়তর দিক প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছে, সে সম্বন্ধে তখনও আমি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে সাহস করি নাই। তারপর, 'কবি' নামে এই বড় গল্পটি পাঠ করিয়া আমি তারাশঙ্করের কবিশক্তির মূলপ্রেরণা, বা প্রধান লক্ষণটির সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছি।

ইতিপূর্ব্বে (অর্থাৎ, 'কবি'-রচনার পূর্ব্বে) তারাশঙ্কর অনেকগুলি গল্প এবং বৃহত্তর কাহিনী বা উপন্যাস রচনা করিয়া তাঁহার শক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙালী পাঠক সমাজ, অন্ততঃ তাহাদের সদ্য-রসপিপাসা তৃপ্তির প্রমাণে, স্বীকার করিয়াছে। তাঁহার গল্পগুলির অভিনবত্বের একটা কারণ এই যে, বাংলার একটা অঞ্চলের একেবারে মাটির গন্ধ তাহাতে লাগিয়া আছে—সেই মাটির নদী মাঠ বন জঙ্গলের সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশিয়া আছে যে মানুষের সমাজ—সেই সমাজও যেন বাংলার প্রকৃতিরই একটা অংশ; সেই সমাজের উপরকার স্তর হইতে

নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত, সব যেন তাঁহার ঐ গল্পগুলিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 'জলসা-ঘরে'র জমিদার হইতে ডোম, বাগদি, বেদে পর্য্যন্ত—সমাজের সকল স্তরের সকল চরিত্র যেন নিপুণ মৃৎশিল্পীর হাতে, তাহাদের সেই মাটিতে-গড়া মূর্ত্তি লইয়া আমাদের এই শহুরে সভ্য-দৃষ্টির সম্মুখে হাজির হইয়াছে; সহসা চোখ আড়াল-করা একটা পর্দ্দা যেন কে সরাইয়া দিল—জীবন-রঙ্গমঞ্চের একটা যবনিকা উঠিয়া গেল; একটা ভূদৃশ্য ও তাহার পটভূমিকায় যে জীবন-নাট্যের অভিনয় দেখিতে লাগিলাম, তাহা যেমন বাস্তব, তেমনই অপরিচিত! মুগ্ধ হইয়াছিলাম এই দেখিয়া যে, এইসকল চিত্রে ও কাহিনীতে লেখক সেই তন্ময়তা আয়ত্ত করিয়াছেন, যাহার বলে প্রত্যেক চরিত্র লেখকের আত্ম-সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া অতিশয় স্বতন্ত্র স্বাধীন রূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। অর্থাৎ, জীবন সম্বন্ধে কোন থিয়োরী বা মতবাদ, কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ধমক বা চমক তাহাতে নাই। ইহা ঠিক বাস্তবনিষ্ঠা নয়, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিহীন বহিরঙ্গের ফটোগ্রাফ নয়; ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে জীবনেরই এক-একটা পৃথক ও বিচিত্র স্বর বিভিন্ন দেহতন্ত্রীতে বাজিতেছে; লেখক সেই তন্ত্রী কোথাও নিজে এতটুক স্পর্শ করেন নাই, তিনি যেন জীবনের সহিত যোগযুক্ত হইয়া—আপনার লেখনীটিকে সেই স্বরের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি প্রত্যেক চরিত্রের মর্ম্মস্থানটিতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাই তাহারা এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দৃষ্টিই প্রাতিভ দৃষ্টি, ইহাকেও একরূপ পূর্ণ-দৃষ্টি বলা যাইতে পারে।

তখন ইহাও বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, এই লেখক যে অঞ্চলের, যে-সমাজের জীবনকে তাঁহার রসসৃষ্টির উপাদান করিয়াছেন, তাহার সেই মাটি তিনি দুইহাতে ছানিয়াছেন; তাহার কঠিন ও কোমল অংশ, তাহার বালি ও কাঁকর তিনি তাঁহার অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন; অর্থাৎ, তাঁহার গল্পসৃষ্টির সেই উপাদান, তিনি বই পড়িয়া, নানা তথ্য, তত্ত্ব ও কল্পনাবস্তু সংকলন করিয়া, পাণ্ডিত্য বা ভাবুকতার উগ্রগন্ধী মসলা মিশ্রিত করিয়া, তৈয়ার করিয়া লন নাই; ওই মাটিকেই তিনি চিনিয়াছেন—সেই মাটির ধর্ম্মকে, তাহারই তলদেশের নিগূঢ় রসধারাকে নিজহৃদয়ে পূর্ণ অনুভব করিয়াছেন; তাই তাঁহার গল্প, গল্পের চরিত্র, এবং তাহার পটভূমি ও মৃৎবেদিকা—প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ—এমনই এক-ধাতুময় হইয়া উঠে যে, সকলকেই সেই এক জীবনের অঙ্গাঙ্গী বলিয়া বোধ হয়। সে সৃষ্টির

কোন অংশ যে বিচ্ছিন্ন নয়, সকলই এক কার্য্যকারণসূত্রে পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া রহস্যকে গভীর করিয়া তুলিয়াছে, এমনই একটা প্রত্যয় সেই রসাস্বাদের কালেও অলক্ষ্যে জাগিয়া ওঠে। এই সকল কারণে, তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে জীবনের একটা নূতন রূপ ও নূতন রসাস্বাদ আছে; উহা বাস্তব বটে, কিন্তু তাহা বাস্তবভেদী গভীরতর বাস্তব—জীবনের রস-রহস্যের বাস্তব।

উপরের কথাগুলা একটু তত্ত্ব-ঘেঁসা হইয়া গেল, কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পগুলির অধিকাংশ স্মরণ করিলে এবং সবগুলিকে একসঙ্গে ধরিলে, পাঠক-পাঠিকারা সম্ভবতঃ আমার ঐ কথাগুলার একটা মোটামুটি অর্থ বুঝিয়া লইতে পারিবেন। একটা বিষয় তাঁহারাও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তাহা এই যে, তারাশঙ্করের গল্পের কথাবস্তু ও চরিত্র-চিত্র এ দুইয়ের যোগ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ঐ চরিত্রকেই কেন্দ্র বা ভিত্তি করিয়া গল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে; অথচ গল্পগুলি নিছক চরিত্র-চিত্রণ নয়, অধিকাংশের মধ্যে একটা নাটকীয় ঘটনা-পরিণাম আছে। এইখানেই তাঁহার কল্পনার গভীরতা ও সম্পূর্ণতার নিঃসংশয় প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি স্থির-চিত্র নয়, তাঁহাদের ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে, বিকাশ আছে, পরিণতি আছে—অর্থাৎ তাহারা খাঁটি জীবন-ধর্ম্মী, তাহাদের মধ্যে সেই শক্তির ক্রিয়া আছে যাহার সাধারণ অতিস্থূল নাম প্রবৃত্তি,—আরও সূক্ষ্ম দার্শনিক নামও আছে,—যাহা নানাগুণে নানা অবস্থায় ও নানা কারণে মানুষকে এক একটি চরিত্ররূপে বিকশিত করে; সেই রহস্যময় শক্তির আগুনে গলিয়াই এক-একটি চরিত্রের ছাঁচে প্রত্যেক মানুষের মুখ পৃথক হইয়া উঠে। মন-গড়া—কিম্বা সাইকোলজি, বায়োলজি, জুওলজি, অ্যানথ্রপোলজি, সোসিওলজি প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিদ্যার ল্যাবরেটরীতে তৈয়ারী করা চরিত্র তাহারা নয়, কাব্য-পুরাণ-ইতিহাসের ত' নহেই। এরূপ চরিত্রসৃষ্টি করিবার জন্য জীবন-কর্ম্মকারের কামারশালায়, হাপরের পাশে দাঁড়াইয়া জাঁতার দড়ি টানিবার ছলে সেই কর্ম্মকারের হাতের কৌশল, তাহার হাতুড়ির ছন্দ চোখে কানে ও বুকে নোট করিয়া লইতে হয়; ইহার জন্য মেধ্য-অমেধ্য, শুচি-অশুচি-বিচার ত্যাগ করিতে হয়; ঐ জীবন যেন একই প্রবাহ, মানুষগুলা এক-একটা তরঙ্গ মাত্র—একই স্রোত, একই জল, উহার আবার শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দর, উচ্চ-নীচ-ভেদ কি? আসলে, উহা সেই এক শক্তির লীলা—যে-শক্তি মানুষের প্রবৃত্তিরূপে কত রঙ-বেরঙের খেলা খেলিতেছে। উহাকে প্রেম বলিলে হইবে

না, জ্ঞান বলিলে হইবে না, সৌন্দর্য্য বলিলেও হইবে না, উহা নিছক শক্তিমাত্র। সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, আত্ম-মুগ্ধ, নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার শক্তির লীলা বুঝিতে না পারিয়া আমরা, ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি নানা বিরোধাভাস স্বীকার করি। তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা ধরিতে পারা যায় না, দূরে ধরিয়াও দেখা যাইবে না; তাহার সহিত চিত্তকে যোগযুক্ত করিতে পারিলে যে-রসের অবস্থা হয়, তাহাতেই কবি-শিল্পীগণ তাহার সেই অনর্থকে একটা অর্থের ছন্দে বাঁধিয়া দেন,—অর্থহীন, নিয়তিনিয়মহীন, পূর্ব্বাপর-সঙ্গতিহীন, খণ্ড, অসম্পূর্ণ, বিরূপ ও বিসদৃশ ব্যাপারগুলিকে একটা রসরূপ দান করেন। ইহাই সকল শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম্মের লক্ষণ। কিন্তু তারাশঙ্কর, অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যের এই কাহিনীকাব্য-বিভাগে, সেই শক্তিকে যেদিক দিয়া তাঁহার কবিচিত্তগোচর করিয়াছেন—তাহার যে-রূপকে তিনি রসবৎ করিয়াছেন, তাহাতে মৌলিকতার একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। এইজন্যই তাঁহার প্রায় সকল গল্পই চরিত্রকে মুখ্য করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্র বলিতে কি বুঝি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমি, বাংলা গল্প-উপন্যাসের চরিত্র বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, সেই চরিত্রের কথা বলিতেছি না। তারাশঙ্করের গল্পের ঐ চরিত্রগুলি জীবনের সেই কামারশালার অগ্নিকুণ্ড হইতে এক রহস্যময়ী শক্তির লীলাচ্ছন্দে উৎক্ষিপ্ত বা উৎসারিত স্ফুলিঙ্গবিন্দুর মত। ইহাদের মধ্যে একটা প্রবল গতিবেগ আছে — ইহারা স্থির নয়, অন্তরস্থ গতি-বেগে ইহারা যে চরিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই চরিত্রও চলিষ্ণু, গতিমান, ক্ষয়োদয়শীল, পরিণাম-মুখী; তাহার সেই যে গতি, সেই পরিণামশীলতা তাহাই গল্প হইয়া উঠে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, গল্প ত' সকল রকমের চরিত্র লইয়াই রচিত হইতে পারে; তাহার উত্তরে বলা যায়, গল্প ত' একরকম নয় — একটা বর্ণনাও ত' গল্প, কোন একটি ঘটনার চিত্তাকর্ষক বিবৃতিও গল্প; আবার, চরিত্রবিশ্লেষণ-মূলক কতকগুলি অবস্থার দৈনন্দিন লিপিও ত' গল্প। এ গল্প তাহা হইতে স্বতন্ত্র; চরিত্রের বর্ণনা, বিবৃতি বা বিশ্লেষণ নয়, চরিত্রের বিকাশ বা রূপান্তর — যাহাকে ইংরেজীতে growth বা development বলে — এ সকল গল্প তাহারই গল্প; অর্থাৎ সেই যে শক্তির কথা বলিয়াছি, ইহা যেন তাহারই বিচিত্র ব্যক্তি-রূপের স্ফুরণ-কাহিনী — সেই গতির, পরিণতির সেই গতিবেগের মাত্রা ও পরিমাণ স্থির করিয়া লইয়া পরে তাহার গতিপথ নির্ভুলভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। গল্পের

সেই গতি-প্রেরণা চরিত্রের মধ্যেই আছে — সেখানে যদি একটুও হিসাব-ভুল হয়, তবে গল্পটিই মাটি হইয়া যাইবে। কারণ, ঐ চরিত্র নিজের গল্প নিজে সৃষ্টি করিতেছে — তারাশঙ্কর সেই চরিত্রের মধ্যেই সমগ্র গল্পটি সম্পূর্ণ আকারে দেখিয়া লইয়াছেন।

সত্য বটে, তাঁহার সকল গল্পেই চরিত্রের সহিত একটি নাটকীয় ঘটনা-চক্র যুক্ত হয় নাই, অর্থাৎ সকল চরিত্রই গল্পের আকারে পূর্ণবিকশিত হয় নাই, তথাপি চরিত্রান্তর্গত সেই শক্তির ক্রিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইবে। 'রসকলি'র 'রসকলি'-নামক গল্পটিতেও তাহা যেমন আছে, তেমনি 'বেদিনী'র 'বেদিনী'তেও আছে। কিন্তু ঐ যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছি, তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'বেদিনী'র 'না' গল্পটি। এই গল্পের গল্পবস্তু যেমন নাটকীয় লক্ষণযুক্ত, ইহার গল্পরসও যেমন উজ্জ্বল, তেমনই গোড়ায় যে দুইটি চরিত্র অতিশয় দৃঢ় অথচ সরল রেখায় চিত্রিত হইয়াছে — গল্পটির ঘটনাধারাকে সেই দুই চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী বিকাশধারা বলিতেই হয়; 'character is fate' বা 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—এই পরম তত্ত্বটিই যেন এখানে তথ্যরূপ ধারণ করিয়াছে।

আমি তারাশঙ্করের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বা মৌলিকতার আলোচনায় এই যে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম, ইহাতেও হয় ত' আসল কথাটা স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারি নাই। জীবন বলিতে আমি কি বুঝি তাহা বলিয়াছি, বলিয়াছি — মূলে সে একটা শক্তি; আমাদের জ্ঞানে তাহা অন্ধ। সেই শক্তি মানুষের দেহ-জীবন আশ্রয় করিয়া, তাহার নিজেরই সেই দুর্জ্ঞেয় লীলায় যেন এক-একটি চরিত্ররূপে ফুটিয়া ঝরিয়া যাইতেছে। আর কিছু নয়, কেবল তাহারই রস তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে যে ভাবে ও ভঙ্গিতে সঞ্চারিত হইয়াছে, ঠিক তেমনটি আমাদের সাহিত্যে পূর্ব্বে ছিল না। তারাশঙ্করের সাহিত্য-সৃষ্টি আকারে বা আয়তনে — এমন কি পরিমাণেও — বড় নয়; তাঁহার সৃষ্টিশক্তির ঐশ্বর্য্যও শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়াছে। তার একটা কারণ, বাঙালীর জীবনে তাহার বিস্তারের ক্ষেত্র বড় সংকীর্ণ, সেরূপ শক্তির অবাধ লীলার স্থান বা পরিবেশ অতিশয় সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই সীমার, সেই সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে তারাশঙ্কর জীবনের একটি সম্পূর্ণ নূতন রসরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে দৃষ্টি অতিশয় বাস্তবনিষ্ঠ হইলেও বাস্তবভেদী; বাস্তবের ভিতর দিয়াই একটা রস-রহস্যের সন্ধান তাহাতে আছে। তিনি যেন

অতিশয় দৃঢ়চিত্তে ও স্থিরদৃষ্টিতে মানুষরূপী এই জীবকে এক বিরাট পুতুলনাচের মঞ্চে কোন্ অদৃশ্য বাজীকরের হস্তধৃত রজ্জুর আকর্ষণে নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন; সেই বাজীকরের মতই নির্ব্বিকারভাবে জীবনের সর্ব্বত্র তাঁহার দৃষ্টি বিচরণ করিয়াছে — বীভৎসকেও যেমন, ভীষণকেও তেমনই, মধুরকে যেমন করুণকেও তেমনই, এক পংক্তিতে বসাইয়াছে।

এই দৃষ্টির মূলে আছে একরূপ বৈজ্ঞানিক পিপাসা; শুনিতে একটু অদ্ভুত বটে, কিন্তু সকল বাস্তব-জিজ্ঞাসাই বৈজ্ঞানিক। তারাশঙ্করের ঐ রসজ্ঞতা ও সৃষ্টি-প্রতিভাও যেমন দৈবী, তেমনই তাঁহার সেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও কারণ-জিজ্ঞাসা ঐ প্রতিভারই আনুষঙ্গিক। আমরা তাঁহার শিল্পকর্ম্মগুলির নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু তাঁহার শিল্পশালায় প্রবেশ করিলে উপকরণ-আয়োজনের প্রাচুর্য্য দেখিয়াও কম বিস্মিত হইব না। জীবনের রূপকার হইতে হইলে, জীবনের গ্রন্থই পাঠ করিতে হয়; সকল রূপকারই অল্পবিস্তর তাহা পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই আপনাপন রুচি ও রসবোধের গণ্ডির মধ্যে তাহা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ, নিজ নিজ পিপাসার—নিজ নিজ রসকল্পনার দৃষ্টিতে যেটুকু দেখিবার তাহাই দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তারাশঙ্কর যেন জীবনকে, আদৌ একটা ভিন্নতর পিপাসার বশে — রসাস্বাদনের জন্য বা রসকল্পনার বশে নয়—তাহার কলকব্জা, তাহার জটিল জাল-গ্রন্থি খুলিয়া দেখিবার একটা দুর্দ্দমনীয় কৌতূহলে — কেবল দেখিবার ও জানিবার আকুল ইচ্ছায় — বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। গল্পের প্লট সংগ্রহ করিবার জন্য নয়, জীবনকে চায়ে চুমুক দিবার মত সৌখীনভাবে একটু আস্বাদন করিবার জন্য নয়, আমেরিকান টুরিষ্টের ভারতভ্রমণ এবং ভ্রমণ-শেষে ভারত সম্বন্ধে মহা-বিজ্ঞতাপূর্ণ গ্রন্থরচনার জন্য নয়, জীবনকে এক পলকমাত্র আধা-চোখে দেখিয়া, সেই দেখার অভিমানে গর-গর হইয়া জীবন-রহস্যের মহারসিক বা জীবন-তত্ত্বের মহা-আচার্য্য বনিবার জন্যও নয়, — কেবল জীবনকে দেখার জন্যই তাহাকে দেখার এই পিপাসা তারাশঙ্করের যেমন আছে, বা ছিল বলিয়া মনে হয়, ঠিক তেমনটি আমাদের আর কোন ঔপন্যাসিক বা গল্পলেখকের ছিল বা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত একটি বিচিত্র রচনায় — যাহার নাম দিয়াছেন "হাঁসুলীর বাঁকের উপকথা।" এই রচনাটিকে কি নাম দিব? ইহা ঠিক গল্প বা উপন্যাস নয়; ইহা তারাশঙ্করের সেই

অপর ক্ষুধার — সেই মানুষ ও মানুষের সমাজকে জানিবার দেখিবার, সেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহলনিবৃত্তির একটি চমৎকার দলিল। একটি বিশিষ্ট উপজাতির জীবন-যাত্রা, তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, চরিত্র-নীতি, — তাহাদের সুখ-দুঃখ, আত্ম-নিগ্রহ ও পর-পীড়ন, তাহাদের জীবিকা এবং তাহাদের বাস-ভূমির ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক রূপ, এবং সর্ব্বশেষে ঐ জাতিটার পুরাতন ও আধুনিক ইতিবৃত্ত — এই সকলই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কোন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জরিপ-বিভাগের তত্ত্ব-সংগ্রহ-পুস্তকে ইহা অপেক্ষা সম্পূর্ণতর সংবাদ দপ্তরভুক্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি মন এবং আরেকটি চক্ষুও ইহাতে সজাগ হইয়া আছে। সেই যে জীবনের কথা বলিয়াছি, এই সকল নর-নারীর মধ্যে তাহাদের প্রাণের গঠনে, তাহাদের সাধারণ ও ব্যক্তিগত চরিত্রে — সেই জীবন বা সেই রহস্যময় শক্তির লীলা কোন্ ভঙ্গিতে কোন্ ছন্দে প্রকাশ পাইতেছে, তারাশঙ্করের দৃষ্টি সে দিকেও নিবদ্ধ আছে। এ দৃষ্টি মুখ্যতঃ কবি-দৃষ্টি নয়; এ দৃষ্টি হৃদয়াবেগ-বর্জ্জিত, বৈজ্ঞানিক তান্ত্রিকের দৃষ্টি; এই দৃষ্টিই তারাশঙ্করের সকল রচনার আদি-প্রেরণা। এইখানে, এই বিবরণী-রচনায় তাঁহার সেই স্ব-ধর্ম্মই আর সকল প্রবৃত্তিকে পরাভূত করিয়াছে। এই রচনাটি পাঠ করিলে আমরা কোন গল্প বা কাহিনী-রস আস্বাদন করি না, কোন ব্যক্তি বা বিশেষ-চরিত্রই ইহাতে প্রধান হইয়া উঠে নাই — চরিত্রগুলি একটা বিশিষ্ট জীবন-ধারার গতি বা আবর্ত্তের নিশানা মাত্র। এ মনোভাব শিল্পীর মনোভাব নয় — একরূপ সমাজবিজ্ঞানীর মনোভাব; তফাৎ এই যে, তাহাতে কেবল জড়বিজ্ঞান নয়, চিৎ-বিজ্ঞানেরও প্রলেপ আছে।

এই যে তারাশঙ্কর, ইনিই যখন জীবনের শিল্পরূপ নির্ম্মাণ করেন — যেমন তাঁহার গল্পগুলিতে করিয়াছেন — তখন যে তাহাতে একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের রসসৃষ্টি হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। সে রস বাস্তবের রসই বটে, কিন্তু তাহার অন্তরালে একটা নির্ম্মম অনাসক্ত তান্ত্রিক-দৃষ্টি আছে; সেই দৃষ্টি যখন নর-নারীর হৃদয়-মধ্যেও উঁকি দিয়াছে তখন তাহা খাঁটি আর্টিষ্টের নির্ম্মমতায় পরিণত হইয়া, সর্ব্বসংস্কারমুক্তির যে-আনন্দ সেই আনন্দের রস-সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই তারা-শঙ্করের আর্ট, আমি তাহাকে একরূপ তান্ত্রিক রস-প্রেরণা বলিয়াছি; ইহার স্থূল দৃষ্টান্ত হিসাবে, তাঁহার গল্পে নর-নারীর প্রেম ও প্রেম-বিকারগুলি স্মরণ

করিতে বলি। সেই প্রেমে নীতি-দুর্নীতির সংস্কার নাই — আছে কেবল প্রত্যেক চরিত্রে সেই প্রবৃত্তির রক্তগত সংস্কার।

'জলসাঘরে'র জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের প্রেম — দেহ বা প্রাণের পিপাসা নয়, সে একটা সৌখীন মানস-ব্যাধি; তাহার বেদনাও আমাদের সম্ভ্রম উদ্রেক করে, নীতি-দুর্নীতির সংস্কারকে জয় করিয়া আমাদের প্রাণে যে রসোদ্রেক করে, তাহারও মূলে আছে ঐ চরিত্রের পৌরুষ-বীর্য্যের ট্রাজেডি-মহিমা। আবার, ঐ প্রেম কুষ্ঠব্যাধিকেও ঘৃণা করে না, কারণ, তাহাও elemental বা প্রকৃতি-সুলভ প্রবৃত্তি। কোথাও বা একটা সাপিনীর অপূর্ব্ব রূপে মুগ্ধ হইয়া একটা পুরুষ তাহাকে চুম্বন না করিয়া পারে না,—এই সাংঘাতিক রূপ-মোহের মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তির কোন্ সূক্ষ্ম চেতনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে? আমি কয়েকটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিলাম; তারাশঙ্করের ঐ দৃষ্টিও কিরূপ রস-দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে—এই সঙ্কেতটি অবলম্বন করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহার গল্পগুলি আর একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল চরিত্র, যে এমন authentic বা অসংশয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ, তিনি কেবল উপরকার আবরণটাই দেখেন নাই; সর্ব্বত্র সেই রহস্যময়ী শক্তির, সেই জীবনরূপিণী মোহিনী নর্ত্তকীর — সেই বেদ-পুরাণ-নীতিশাস্ত্র-লঙ্ঘন-কারিণী বেদেনীর "আত্মমুগ্ধা স্বয়ংস্থিতা — উপচয়ে দশহস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা"-মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে রাখিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, তারাশঙ্করের সাহিত্যকীর্ত্তি বড় বা বিশাল নহে, তাহার পরিমাণ বা বিস্তার কোনটাই সৃষ্টি-শক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচায়ক নহে। তথাপি বাংলা সাহিত্যে, বা আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে, বাঙালী-জীবনের কাব্য-কাহিনী-রচনায়, তারাশঙ্কর যে একটি বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রচনার পরিমাণ এবং গঠন-রীতি যেমনই হৌক, একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি যে একটি গভীরতর রস-ধারা আমাদের সাহিত্যে, আমাদেরই জীবনের মৃত্তিকা-তল হইতে উৎসারিত করিয়াছেন, আমি এতক্ষণ তাহারই একটা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইবার, আমি যে-জন্য এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম — সেই কাব্যখানির আলোচনা করিব, তারাশঙ্করের আর সকল গল্প উপন্যাস বাদ দিয়া আমি এক্ষণে

কেবল ঐ একটি রচনার সম্বন্ধে আমার মনে যে-চিন্তাগুলির উদয় হইয়াছে, তাহাই একটু বিশদভাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

২

তারাশঙ্করের পূর্ব্ব-লিখিত গল্প ও উপন্যাস পাঠ করিয়া তাহাদের সেই রস-রূপের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হইতাম, তেমনই তাহার অন্তরালে যে একটি অতি গভীর ও অতিশয় তীক্ষ্ণ ভাব-দৃষ্টির আভাস পাইতাম — আমি উপরে তাহার একটু আলোচনা করিয়াছি। প্রথম হইতেই এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, বাঙালী-সমাজ ও বাঙালী-জাতির জাতিগত জীবন, বাংলাদেশের একটা প্রাচীন ভূমিখণ্ডে — গত দুইশত বৎসরের শিক্ষাবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং ধর্ম্মবিপ্লবের আঘাত সত্ত্বেও, সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া — বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি যেটুকু যে-অবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে, বা বহু বিকৃতি সত্ত্বেও এখনও তাহার প্রাণধর্ম্মের সেই প্রাক্তন প্রবৃত্তিগুলা যতটুকু সক্রিয় আছে — তারাশঙ্কর জাতির সেই প্রায়-প্রাকৃতিক জীবনকাহিনীর কথক বা কাহিনীকার-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুধু সেই প্রাকৃতিক জীবনই নয় — সেই সমাজের উচ্চ, মধ্য ও নিম্নস্তরের বালুসৈকতে কালের যত চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে, বাংলার মধ্যযুগের — সেই নবাবী-আমলের — যে আভিজাত্য-গৌরব উচ্চবর্ণের শাক্ত হিন্দুর জীবন-স্রোতকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল, এবং সেই একই সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রকৃতিপুঞ্জকে শ্রীচৈতন্যের নববৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে বন্যা ডুবাইয়া ভাসাইয়া, শেষে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত এখনও তাহার জীবনকে সরস করিয়া রাখিয়াছে — কালস্রোতের সেই যুগ্ম তরঙ্গরেখাও তিনি গণিয়া দেখিয়াছেন, কোথাও তাহার অস্পষ্ট, কোথাও বা গভীরাঙ্কিত চিহ্ন তিনি দৃঢ়চিত্তে ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এ সকলই আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা বা রহস্যভেদের প্রয়াসও অনুভব করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তারাশঙ্কর তাঁহার গল্পগুলিতে যে-সমাজের যে জীবন-চিত্র—যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেন সেই স্থানের মাটিতে গড়া, ঐ মাটিতে তিনি যেন তাঁহার সারা চিত্ত মিলাইয়া দিয়াছেন। এজন্য পূর্ব্ব হইতেই আমার একটু সন্দেহ ছিল, তাঁহার সচেতন কবিবুদ্ধি যেমনই হউক, তাঁহার রস-দৃষ্টি ও সাহিত্যিক প্রতিভা

যতই ব্যক্তিগত হউক্, একটা গভীরতর জাতিগত চেতনা (race-experience) তাঁহারও অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়াছে। যে সমষ্টিগত চেতনা একটা জাতির বিশিষ্ট জীবন-ধারায়—নানা যুগের নানা ভাব ও প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়াও নিজের সেই আদিম প্রাণধর্ম্মকে পুষ্ট অথচ অবিচলিত রাখে—ইতিহাস যাহার বিবর্ত্তনটাই বড় করিয়া দেখে, জীবিতের মধ্যে মৃতের সন্ধান করে, মৃতের জীবিত-রূপকে দেখে না—তারাশঙ্কর তাহাকেই গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন এই বাংলাদেশের এমন একখণ্ড মাটিতে, যেখানে এই জাতির সেই আদি-প্রকৃতি, তাহার রক্তগত প্রবৃত্তি, এক কথায়, তাহার মানবতারই একটা অক্ষত এবং বিশিষ্ট রূপ বহু পলিস্তর ভেদ করিয়া, এখনও এই বিংশশতাব্দীতে নিজের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই 'কবি' নামক কাব্যখানিতে তারাশঙ্কর একটা জাতির সেই মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—ঐ ক্ষুদ্র-কাহিনীটিতে তিনি তাহার সেই সহস্র বৎসরের হৃদয়স্পন্দন ধরিয়া দিয়াছেন। এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই আমি এই কাব্যখানির পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কাহিনীর নায়ক হইয়াছে একজন অন্ত্যজ-জাতীয় অশিক্ষিত যুবা—ইহার নায়িকা হইয়াছে যে-নারী সে সমাজ-বহির্ভূতা স্বৈরিণী। আমরা একেবারে বাংলার সেই প্রায়-প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের সমাজে উত্তীর্ণ হই—যে-সমাজে বৌদ্ধবিপ্লবের ফলে আর্য্য বা ব্রাহ্মণ্য-শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। প্রায় প্রাক্-ঐতিহাসিক বলিলাম এই জন্য যে, তৎপূর্ব্বের বাঙালী-জীবন ও বাঙালী-সমাজ কি ছিল—আমরা এক্ষণে যাহাকে বাঙালী বলি, ঠিক তাহাই ছিল কিনা—তাহা কোন ঐতিহাসিক এখনও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। এ যেন সেই বৌদ্ধগান ও দোঁহার যুগ, যখন বাঙালীর সেই অনার্য্য রক্তের প্রকৃতি-প্রেম একটা নূতন তন্ত্রের প্রশ্রয় পাইয়া উজ্জ্বল ও কৃতার্থ হইয়াছে। কোন বর্ণভেদ—কোন কঠিন আচার-সংযমের শাসন নাই, দেহ হইতে পৃথক কোন আত্মার অভিমান নাই; আছে কেবল একটা অতিগম্ভীর উৎকণ্ঠা; সে উৎকণ্ঠা একরূপ বিষামৃতের রসাবেশে সারা প্রাণকে এমনি বিভোর করে যে, আর সকলই মিথ্যা মনে হয়। এ জগৎ খাঁটি রূপ-রসের জগৎ; সেই রূপ-রসের রহস্যে রহস্যময় নরনারীর যে-জীবন তাহাই মহা-মহার্ঘ ও পরম-পবিত্র বলিয়া মনে হয়। ইহাই এই জাতিকে চিরদিন আবিষ্ট, মুগ্ধ ও উৎকণ্ঠিত করিয়াছে—ইহাই তাহার ধাতুগত সংস্কৃতি। বাহিরে যত-কিছু ভাঙ্গা-

গড়া, যত বিপ্লব, যত নিত্য-নূতনের হুঙ্কার ও মাতামাতি চলুক না কেন, ইহার মাটিতে এবং ইহার সেই একান্ত প্রকৃতি-পরবশ দেহ-চেতনায়—ঐ এক বীজ চিরদিন অঙ্কুরোন্মুখ হইয়া আছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণও যে-মন্ত্রের সাধনা করিয়াছিলেন, সহজিয়া-সাধক চণ্ডীদাসও তাহাই করিয়াছিলেন; আবার এই অতি-আধুনিক যুগের সাধক-কবি বিহারীলাল নূতন সুরে, সেই এক মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত-কবি রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রভাব হইতে নিস্তার পান নাই; আর্য্য-সাধনার—উপনিষদের—দীক্ষা লাভ করিয়াও, বাঙালী-স্বভাবের সেই প্রাণগত উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারেন নাই তিনিও আর্য্য-শাস্ত্রের নূতন ভাষ্য-রচনা করিয়া, ব্রহ্মকে প্রকৃতির রূপে ধ্যান করিয়া রূপরসের ব্রহ্মাস্বাদ করিয়াছেন। তাঁহারও কবি-জীবনে, ঐ আর্য্য-আধ্যাত্মিকতা এবং অনার্য্য বাঙালীর প্রকৃতি-প্রেম-বিভোরতা—একদিকে আত্মাভিমানের উচ্চ-আদর্শ ও অপরদিকে সকল নীতি ও নিয়ম-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে সেই সহজিয়া স্বৈরতন্ত্রের রসাবেশ—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে, শেষ পর্য্যন্ত জাতিগত প্রবৃত্তিই জয়ী হইয়াছে। বারবার তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছে, এই জীবনের মত পরমসুন্দর আর কিছুই নাই, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠায় সুখ নাই; প্রাণের পিপাসাই একমাত্র সত্য, এবং সে পিপাসা মিটাইতে হইলে সব ত্যাগ করিয়া বাউলের একতারায়—বাঁশের বাঁশীতে মাধুরীর সাধনা করিতে হইবে। তারাশঙ্করের ঐ 'কবি' সেই একই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে; কিন্তু সে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে জীবনের ধূলা-মাটির আসনে, একেবারে প্রকৃতির নগ্নবক্ষে, সেই তান্ত্রিক পদ্ধতিতে—যে তন্ত্র বাঙালীরই জীবন-তন্ত্র, যাহার নাম প্রকৃতি-উপাসনা।

এই গল্পে আমরা সেই প্রকৃতিকে—বাংলার ও বাঙালীর প্রকৃতিকে—যে-রূপে ও রসে এবং যে-নগ্নতায় উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত হইতে দেখি, তেমনটি বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও দেখি নাই। ঐ কবি যে-সমাজের সর্ব্বনিম্ন তলদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সেই সমাজ উপরকার সভ্যতায়, বহিরাগত বহু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির চাপে, পতিত—মৃত্তিকা-প্রোথিত বটে। উহার উপরে জমিদার আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সৎশূদ্র আছে, এবং আজিকার বাবু অর্থাৎ ইংরাজী-পড়া চাকুরিয়া বাঙালী আছে; কিন্তু উহারই মধ্য হইতে, এবং উহারই প্রকৃতি-সুলভ ভঙ্গিতে ও

সুরে, যে জীবন-গীতি উৎসারিত হইয়াছে, তারাশঙ্কর যাহার মূল সুরটি ঐ 'কবি'র চরিত্রে এমন নিখুঁত করিয়া প্রাণ-মন ও দেহ-ময় করিয়া দেখাইয়াছেন, বাঙালীর সমগ্র সাধনা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি উহাতেই ধরা দেয় নাই? সে বৈশিষ্ট্য কি? এই কাহিনীতে তাহার সবটাই পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথমতঃ, এ জাতির আভিজাত্য-গৌরব বলিয়া প্রকৃত কোন গৌরব নাই; ইহার গৌরব—সর্ব্ববিশেষণবর্জ্জিত, উচ্চ-নীচ-অভিমানহীন, ঐ ভূমির মতই সমতল-বাহিনী একটি অতি সরল অকৃত্রিম মানবতায়। সেই মানবতার মূল মন্ত্র—জীবনকে যতদূর সম্ভব জটিলতামুক্ত করিয়া, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ-বাহুল্য, ঐশ্বর্য্যের দুরাকাঙ্ক্ষা, এবং লোকব্যবহারের সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম বন্ধনজাল অগ্রাহ্য করিয়া, ব্যক্তি-মানুষকে যতদূর সম্ভব মুক্তিদান করা। সে মুক্তিও একরূপ জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ এই মনুষ্য-জন্মেই, দেহের এই পিপাসাকেই নির্ব্বিষ করিয়া—দেহের অতলে যিনি আছেন তাঁহার ভোগের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া—মৃত্যুকেই অমৃত করিয়া তোলা। কথাটা ভাষায় বুঝাইতে গিয়া এইরূপ তত্ত্বগন্ধী হইয়া পড়িল; কিন্তু পাঠক-পাঠিকাগণ ঐ গল্পটি পড়িলেই ইহার মর্ম্ম হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীর ঐ যে নিজস্ব জাতিগত বা রক্তগত আকৃতি, তাহা সমাজের উপরের স্তরে শাস্ত্র-শাসনের ও সমাজ-বন্ধনের কঠিন কবচে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলেও, ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ পর্য্যন্ত সকলের চিত্তে উহা সমান; সমাজের ঐ কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ সত্ত্বেও, ভাবের বা রসের ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য্য সমানুভূতি সমগ্র জাতিকে সমপ্রাণ করিয়া রাখিয়াছে—এমন দুই-একটি তন্ত্রী আছে, যাহাতে ঝঙ্কার দিলে আর সকল তন্ত্রী ঐক্যতানে বাজিয়া ওঠে,—ইহাও দেখিতে পাই। এমন তন্ত্রী হয়ত আর সকল জাতিরও ঐরূপ দুই-একটা আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেখানে শ্রেণীগত পৃথক সংস্কারও প্রবল। এই শ্রেণীর সৃষ্টি এ যুগের বাঙালী-সমাজেও হইয়াছে—শহর ও শহর-সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে ঐরূপ শ্রেণীর অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু সেই শ্রেণী বিশালতর বাঙালী-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট হইয়াই আছে; আমরা শহরবাসীরা ঐ শ্রেণীকেই জানি ও চিনি, তাই তাহাদেরই মন দিয়া বাঙালীকে বেশি বুঝি বলিয়া দম্ভ করিয়া

থাকি। আসলে, আমরা, অর্থাৎ এই নূতন পরগাছা-শ্রেণীর বাঙালী—পরধর্ম্ম ও পরবিদ্যা-গর্ব্বিত বাঙালী—জাতির সেই চেতনা হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। শ্রেণী-কথাটির উপরে জোর দিবারও আবশ্যক আছে, কারণ, খাঁটি বাঙালী-সমাজে বৃত্তিগত জাতি-উপজাতি-ভেদ ছিল বটে, ঐ রূপ শ্রেণীভেদ ছিল না; তার কারণ, তাহার ঐ মানবতা—ভাব ও রস-জীবনে স্বাভাবিক সাম্য-প্রবণতা। এই 'কবি'ও জাতিতে ডোম বটে, কিন্তু তাহার ঐ ভাবসাধনায়, ব্রাহ্মণে ও তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। সেই ভাব, আমরা যাহাকে সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলি তাহা নয়; অর্থাৎ, কোন জাতির জীবনভাণ্ডের উপরে ভাসমান একটা তৈল-পদার্থের সূক্ষ্ম আস্তরণ মাত্র নয়; উহা তাহার জীবনের সর্ব্বত্র-সঞ্চারী প্রাণ-বস্তু, উহাই তাহার জীবনী-শক্তি—উহাতেই সে বাঁচিয়া আছে। ঐ 'কবি'র মধ্যে সেই প্রাণধর্ম্মেরই গভীরতম ও বিশুদ্ধতম বিকাশ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সেই ভাব—যাহা বাঙালীর ঐ সমাজ-জীবনের নানা বন্ধন ও নানা অস্বাস্থ্যকর সংস্কার-জঞ্জালের তলায় পড়িয়া জীবনের গতিধারায় বিক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে—তাহারও সাধনমার্গ আছে; অর্থাৎ, যাহা রক্তগত, তাহাকেই বীজরূপে আশ্রয় করিয়া সেই বীজের পূর্ণবিকাশ-সাধনের একটা নিজস্ব পন্থাও আছে। এই পন্থাও প্রকৃতির পন্থা; ইহা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নয়, ইহার পথ বাঙালী আপনার অনুভূতি—অর্থাৎ নিজ অন্তরের ক্ষুধা-অনুযায়ী আপনি খুঁজিয়া লয়। ইহারই নাম "সহজিয়া"—বাঙালীই এই মন্ত্রের আদি-সাধক। সে কেমন সাধনা, এ গল্পের ঐ 'কবিয়াল' নায়ক তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। ইহাও এক অর্থে প্রকৃতি-সাধনা, অর্থাৎ ইহাও তান্ত্রিক। কিন্তু বাঙালী শ্মশানে বা ভৈরবী-চক্রে বসিয়া এ সাধনা করে না—তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সে জীবনের পাত্রেই জীবনের রসমাধুরী পান করিতে চায়—সুস্থ ইন্দ্রিয়-পিপাসাকে রুদ্ধ করিয়া নয়, তাহাকেই শোধন করিয়া, নির্ব্বিষ করিয়া; সকল কামনা-বাসনা-বেদনাকে—স্নেহ-প্রীতির সহজাত ক্ষুধাকে—একরূপ রসে পরিণত করিবার যে শক্তি, তাহারই সাধনা করে। সত্য বটে, এই প্রবৃত্তি অধ্যাত্ম-গভীর হইয়া বিভিন্ন যোগ-মার্গে বা গুহ্য-সাধন-মার্গেও প্রয়াণ করিয়াছে; কিন্তু তাহা জাতিহিসাবে নয়—সে সকল সাধনা সাধারণ জীবন-ধারার বাহিরেই বহিয়া গেছে। তাই বাঙালী শাক্তই হোক, আর বৈষ্ণবই হউক, সে যে-তন্ত্রেরই দীক্ষিত শিষ্য

হউক—আসলে সে ঐ সহজিয়া। মহাশক্তিকেও মা বা কন্যারূপে ভজনা করিয়া সে তাহার সেই সহজ-পিপাসা না মিটাইয়া পারে না; শাক্ত বাঙালী ও বৈষ্ণব বাঙালীতে এইমাত্র ভেদ যে, একজনের বাস্তব-বিষয়াসক্তি কিছু বেশি, অপরে সেই বাস্তবকেই গূঢ়তর রসরূপে ভোগ করিতে চায়। আমি এমনও বলিতে পারি যে, ঐ সকল ভেদও উপরকার সেই সমাজবন্ধনের মতই কৃত্রিম; বাঙালী আসলে শাক্তও নয়, বৈষ্ণবও নয়, বৌদ্ধও নয়, বেদান্তীও নয়; সে সকলই কতকগুলা বাহিরের ছাঁচ মাত্র; সে ছাঁচ সে যেমন গড়ে তেমনি ভাঙ্গে; তাহার ভিতরকার সেই তরল বস্তুটা চিরদিন তরলই আছে। ছাঁচগুলা ভাঙ্গিয়া তাহা দেখিবার সুবিধা হইবে না, তাই তারাশঙ্কর, যেখানে ছাঁচের বালাই নাই, সেইখান হইতেই এই মূর্ত্তিটি তুলিয়া লইয়া, সেই তরলকে আমাদের চোখের সম্মুখে পর্দ্দায় পর্দ্দায় দানা বাঁধিতে দেখাইয়াছেন।

সেই সহজের এমন কাহিনী বাংলাসাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে পাই নাই। সহজকে ভাবে-ভাষায় বাক্যে-চিত্রে এমন নিষ্কলঙ্ক সহজ করিয়া তোলা যে কিরূপ কাব্যপ্রেরণা-সাপেক্ষ তাহা বুঝি বলিয়াই এমন বিস্ময় বোধ করিয়াছি। ইহাও মনে হয় যে, এই কাহিনী-রচনায় তারাশঙ্করের অন্তর-পুরুষ আপন বাণী-রূপটি আবিষ্কার করিয়াছে। এই যে পরিপূর্ণ আত্ম-প্রকাশ ইহারই বেদনা সকল কবি-শিল্পীকে, তাঁহাদের সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভ হইতেই, নিরন্তর ব্যাকুল করিয়া থাকে; উহারই তাড়নায় "আপন গন্ধে কস্তুরী-মৃগসম" তাঁহারা বাণীর অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন; কত কাব্যই রচনা করেন, কিন্তু কোনটাতেই সেই বেদনার পূর্ণ-নিবেদন হয় না। পরে একবার সহসা—"by the magic band of chance"—সেই বাণী-রূপটি তাঁহারা খুঁজিয়া পান, তখন বেদনা হইতে মুক্তিলাভ করেন, রসসৃষ্টির সেই আকুলি-বিকুলিও আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয়। সাহিত্যিক প্রতিভা ও সাহিত্যসৃষ্টির যে তত্ত্ব অধুনা কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্য হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তারাশঙ্করের সেই খাঁটি রসসৃষ্টির উৎকণ্ঠা ঐখানেই শেষ হইয়াছে; ইহার পর তাঁহার রচিত কোন কাহিনীতে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের সেই আধ্যাত্মিক আকুতি না থাকাই সম্ভব। আমি পূর্ব্বে তারাশঙ্করের যে বৈজ্ঞানিক পিপাসার উল্লেখ করিয়াছি, অতঃপর সেই প্রবৃত্তিই নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিঘ্ন

হইয়া—রসকল্পনার ভাবঘোরে আবিষ্ট না হইয়া, জীবনকে যে অতিশয় শাদা চোখে দেখিবে, সমস্যা ও সংশয়ের সমাধানে জাগ্রত মনোবুদ্ধির অভিমানকেই তৃপ্ত করিতে চাহিবে, ইহাই স্বাভাবিক। ঐ সাহিত্যসৃষ্টির তত্ত্ব সেই কথাই বলে। কিন্তু এখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক।

৩

এইবার উপন্যাসখানির কাব্য-সমালোচনা করিব। ইহার কল্পনা-মূলে কবি-মানসের যে জাতিগত প্রেরণার আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি, কাব্য-সমালোচনার পক্ষে তাহার সাক্ষাৎ প্রয়োজন না থাকিলেও সেরূপ আলোচনা অবান্তর নহে; কারণ, মানব-জীবন-কাহিনীতেও কবিদৃষ্টির ঐ বৈশিষ্ট্যই জগৎ-সাহিত্যকে অনন্ত রস-রূপে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাংলার একটা বিশিষ্ট কালচার, বা জীবন-সাধনার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিই শুধু নয়—সেই কালচারের রাসায়নিক ক্রিয়ায় মানব-চরিত্রেরও যে একটা গভীরতর দিক ইহাতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহা নিখিল-মানব প্রকৃতিরই আরেক রূপ। য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যে ও নাটকে আমরা যে অত্যুগ্র ভোগ-পিপাসু, অস্থির, সংগ্রামশীল মানুষকে দেখি, সেই মানুষকেই আমাদের সাহিত্যে আরেক রূপে দেখিতে পাই। এখানে সে-রূপ শান্ত স্থির, ভোগবিমুখ, আত্ম-সমাহিত; আমি উভয় সাহিত্যের আদর্শগত জীবনের কথাই বলিতেছি। এইজন্যই আমাদের সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া বাংলাসাহিত্যে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের মত প্লটের ঘনঘটা বা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষজনিত চরিত্র-বিকাশের অবকাশ নাই; এইজন্যই আমাদের জীবনযাত্রার নিস্তরঙ্গ প্রবাহ হইতে পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজিডি বা বৃহদায়তন উপন্যাস সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু সাহিত্যের ঐ আকৃতি বা আয়তনই যেমন মনুষ্যজীবনের একমাত্র দর্পণ নয়, এবং জীবনের বহির্গত আয়তনটাই তাহার একমাত্র বিস্তারক্ষেত্র নয়, তেমনই মানব-চরিত্রের ঐ একটা দিক্—মানুষের ভোগপিপাসার অসীমতা ও দুর্দ্দমনীয়তা, এবং তাহাতেই তাহার যে শক্তি প্রকাশ পায়—তাহাই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়, অন্য পরিচয়ও আছে; য়ুরোপীয় সাহিত্যে তাহা তেমন ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ঐ কামনা-বাসনাই মানুষের মনুষ্যত্বের নিদান বটে, কিন্তু উহারও একটা উল্টা মুখ আছে, তাহাও সেই শক্তিরই আর এক দিক্। বাঙালীর জীবনে এই

দিকটির বিকাশ চিরদিন হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সাহিত্যে তাহার প্রকাশ তেমন করিয়া হয় নাই। তার একটা কারণ আত্মসচেতনতার অভাব; অপর কারণ, ঐরূপ প্রকাশের কোন পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পরীতি ছিল না। ভারতীয় কলাশিল্প বা কাব্যরীতি ইহার উপযোগী নয়, কারণ, বাঙালীর রস-জীবন ততখানি আধ্যাত্মিক বা অরূপতান্ত্রিক নয়; তাহা আত্ম-সমাহিত হইলেও রূপাশ্রয়ী, ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব না হইলেও দেহতাত্ত্বিক। এক কথায় বাঙালী দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ দেহ ও আত্মার অভেদ-সাধনায় পক্ষপাতী। ইহার ফলে, সে ঐ কামনা বাসনাগুলাকে দেহের ক্ষেত্রেই আত্মার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে, দেহেরই জবানীতে দেহাতীতের ক্রন্দনকে এক অপূর্ব্ব গীতিঝঙ্কারে অমৃতনিঃস্যন্দী করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের গানে সে একবার তাহার সেই রস-জীবনকে সাহিত্যে একটা বাণীরূপ দিয়াছিল—ঐ একরূপ, ঐ গীতিকবিতার রূপ ছাড়া, আর কোন রূপ সে উদ্ভাবন করিতে পারে নাই; তাহাতেও সে কেবল ভাবকেই রূপ দিয়াছিল, ভাবময় দেহটাকে রূপ দিতে পারে নাই; যে-জীবন হইতে ঐ ভাবের উৎপত্তি, সেই জীবনকে—নরনারীর মূর্ত্তি গড়িয়া, সাকার করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইহার জন্য যে আর্ট—সেই মূর্ত্তি খোদাই করিবার জন্য যে যন্ত্রপাতি—তাহাই য়ুরোপ হইতে আমদানি করিয়া, আমাদের ভাষার মাটিতে সেই শিল্পরীতির কর্ষণ ইতিপূর্ব্বে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে তারাশঙ্করকে সে বিষয়ে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। বাংলাসাহিত্যের এই যে অঙ্গটি পূরণ করিবার ছিল তাহাই তিনি করিয়াছেন, তিনি বাঙালীর সেই সহজ-জীবনের গীতি-স্বরটিকে ভাবের নিরাকার হইতে মূর্ত্তির সাকারে—জীবন-কাহিনী-রূপে—রূপময় করিয়াছেন।

এই কাহিনীও একটি বড় গল্প অপেক্ষা দীর্ঘ হইতে পারে নাই, অর্থাৎ রীতিমত উপন্যাসের কলেবর প্রাপ্ত হয় নাই। তথাপি ইহা ছোট-গল্প নহে। ছোট-গল্প হইলে ইহা মানব-জীবনেরই একটা কাহিনী হইতে পারিত না—সেই ঘটনা-মণ্ডল বা প্লট আশ্রয় করিতে পারিত না, যাহা নহিলে জীবনের কোন একটা দিক সম্পূর্ণ আকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোট গল্পে তাহা আবশ্যক হয় না, তাহাতে জীবনকে তেমন করিয়া দেখিবার, দেখাইবার অভিপ্রায় নাই; সে যেন ক্যামেরার ক্ষুদ্র প্রেক্ষণ-পরিধির মধ্যে যেটুকু চকিতে দেখিয়া লওয়া যায় তাহারই

একটা চিত্র; সে চিত্রকে বিশালতর পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার পারিপার্শ্বিকের বিস্তার বা খণ্ড-আকার হইতেই তাহার মণ্ডলাকার আমরাই কল্পনায় পূর্ণ করিয়া লই—তাহাই তাহার রস। কিন্তু কাহিনী বলিতে (বড় গল্প ও উপন্যাস) আমরা রীতিমত প্লটের উপরে গাঁথা এবং আদি ও অন্তের গ্রন্থিযুক্ত, একটা জীবন-কাহিনীই বুঝি। কাব্যে (এবং কাব্যপ্রধান উপন্যাসে) ও নাটকে, সেই পরিচয় ততটা বস্তুগত হয় না যতটা ভাবগত হইয়া থাকে। ঐরূপ খাঁটি বস্তুগত কাহিনী-রচনাই আধুনিক সাহিত্যে একটা বড় আর্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাকেই সাধারণ অর্থে 'নভেল' বলা হয়। ইংরাজী শব্দটার বাংলা প্রতিশব্দ আমরা তৈয়ারী করিয়া লইতে পারি নাই, তাই রসবিচারেও আমরা অনেক ভুল করিয়া থাকি। আজকাল আমরা যে-কোন বড় কাহিনীকে উপন্যাস নাম দিই। তাহার একটা কারণ এই যে, অতি আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের দেখাদেখি আমরা উপন্যাসের কোন form বা বাঁধুনিকে গ্রাহ্য করি না, প্লট বা গল্পবস্তু অনাবশ্যক মনে করি। বাস্তব জীবনযাত্রাঘটিত যে-কোন ধরণের কতকগুলা খণ্ডচিত্রের সমষ্টি,—তাহার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা, এমন কি মতপ্রচারমূলক জল্পনাও উপন্যাস নামে চলিয়া যাইতেছে। ঐ যে প্লটের কথা বলিয়াছি, উহাই মানবজীবন-কাহিনীর রসরূপত্বের অবিচ্ছেদ্য উপকরণ, উহারই মূলে আছে একটা সম্পূর্ণ অখণ্ড দৃষ্টি। উপন্যাসের ঐ প্লট বলিতে শুধুই গল্পের শেষ-হওয়া বুঝাইবে না; গল্প-হিসাবে সেইরূপ আদি-অন্তের মিল থাকা ত' চাই-ই, কিন্তু তাহার অভিপ্রায় আরও গূঢ়—ঐ প্লটই কাহিনীগত জীবনকে যে একটি অর্থ-সঙ্গতি দান করে, তাহাই রসরূপে আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়; ঐ প্লটই সেই form-এর—সেই অন্তর্নিহিত রসরূপের—একমাত্র আশ্রয়; উহা যে উপন্যাসে নাই, তাহা আর সবকিছু হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যিক রূপকর্ম্ম—জীবনের রস-রূপ-সৃষ্টি নয়।

এই কথা এইখানে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাংলার প্রায় সকল শক্তিমান কথাশিল্পীই উপন্যাস রচনায় তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই—অন্ততঃ আমি যাহাকে খাঁটি উপন্যাস বলিয়াছি, সেইরূপ কথাকাব্য-রচনায়। তাহাতে বাঙালী কথাশিল্পীর লজ্জা পাইবার হেতু নাই,—শালগাছ যদি আমাদের মাটিতে না হয় তবে তাহাতে বোটানি-বিদ্যার যতই অসুবিধা হউক, বাংলার প্রকৃতি-

শোভার কোন হানি হয় না। গীতিকবিতায় যেমন, ছোট-গল্প-রচনাতেও তেমনই, বাঙালী লেখকগণ যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আমরা একটা বড় আসন দাবী করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের গীতিকাব্যসুলভ রসকল্পনা যাহাদের অস্থিচর্ব্বণপটু দন্তে রসের স্বাদ জাগাইতে পারে না, তাহারাও তারাশঙ্করের ছোটগল্পের অন্ততঃ কতকগুলিতে, তাহাদের দন্ত ও রসনা দুইয়েরই তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে, তেমন তৃপ্তি তাহারা য়ুরোপীয় সাহিত্যের কোন ছোট-গল্পে পাইবে না; কারণ, মানুষের বাস্তব-মানবতাই একাধারে এমন কঠিন ও রসকোমল হইয়া সেখানেও ফুটিয়া উঠে নাই—সেখানকার সাহিত্যে, ছোটগল্পের অতি সংকীর্ণ পরিসরে—মানবচরিত্রের শুধুই আদিম বাস্তব-রূপটাই নয়, তাহার রহস্য-গভীর রূপও আমাদের চিত্তকে এমন উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলে না।

কিন্তু তারাশঙ্কর এই বড় গল্পটিতেই—এই একখানি ছোট উপন্যাসে—বাঙালী-জীবনের সেই লিরিক কাহিনী-বস্তুকে একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ প্লট ও সুডৌল form-এর আকারে বিস্তারিত ও সুগ্রথিত করিতে পারিয়াছেন। ইহাতে যেমন প্লট আছে, তেমনই চরিত্র ও ঘটনা-সংস্থিতি (situation) আছে; একটি মূল সুর যেমন অব্যাহত আছে, তেমনই তাহাতে নানা বিচিত্র সুর—নানা রং ও রূপের নর-নারীচিত্র—একটি ঐক্যতানে সমাহিত হইয়াছে। ইহা একটি বড় গল্প, না উপন্যাস? —আধুনিক সমালোচনা-শাস্ত্রে সে প্রশ্নও অবান্তর। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবি-কর্ম্মই স্বতন্ত্র, তাহার যতকিছু লক্ষণ তাহার নিজেরই; সেগুলি সাধারণ লক্ষণ হইলে কোন একটা শ্রেণীতে তাহাকে ফেলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করা সম্ভব হইত বটে, কিন্তু তাহা হইলে সেই কাব্য খাঁটি সৃষ্টিকর্ম্ম হইত না। তথাপি, আমি এই কাহিনীকে সাধারণ অর্থেই উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছি, তার কারণ, ঐ ক্ষুদ্র কলেবরেই উহা ছোট-গল্পের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া এমন একটা বৃহত্তর ও জটিলতর আখ্যান-ভঙ্গিতে পৌঁছিয়াছে যাহা উপন্যাসের পক্ষেই সম্ভব; উপরন্তু, একটা লিরিক কাব্যবস্তু, কথার আকারে, খাঁটি নাটকীয় কল্পনার লীলাভূমি হইয়াছে। ইহাও একরূপ মৌলিক সৃষ্টি।

এ কাহিনীতে মানুষের জীবনকে কোন্ রূপে, কোন্ ভঙ্গিতে দেখা ও দেখানো হইয়াছে? আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই কাব্যকল্পনার মূলে একটা জাতির বিশিষ্ট

সাধনা ও ইতিহাসগত সংস্কৃতির প্রেরণা আছে; এক্ষণে তাহাও ভুলিতে হইবে, কারণ জীবনের রূপরস-সন্ধানে, উপাদানের কথা বড় নয়, রূপের কথাটাই বড়; মাটি ও সারের বিচার একটা বড় বিচার বটে, কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার কালে মাটি বা মালীর কথা আমরা নিশ্চয় ভাবি না। আবার, যে-সমাজের যে-অবস্থায় ঐ জীবন—তাহার যতকিছু পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, লাঞ্ছনা-নির্য্যাতনের অগ্নিমন্থনে একটা রস-রূপ ধারণ করে, আমরা তাহার সেই অবস্থাকে একটা মন্থনোপায় বলিয়াই মনে করি,—আসলে চাহিয়া থাকি জীবনের সেই মন্থিত রূপটার দিকে, সেটা ভিতরের দিক। কিন্তু বাহিরে, ঐ মন্থনের ফলে, যে ফেন-রাশি উৎপন্ন হয় তাহার বুদ্বুদজালের অন্ত নাই; সেই জাল ছিন্ন করিয়া তাহার তলদেশের স্বচ্ছ শান্ত নীল-শোভা যিনি দেখিতে ও দেখাইতে পারেন তিনিই জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকার। ঐ ফেন-বুদ্বুদের জালই সেই অতিপ্রবৃদ্ধ মানস-চেতনা, যাহা জীবনের স্বচ্ছ রূপটি আচ্ছন্ন করিয়াছে;—য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যে এই জালটি ছিন্ন না করিয়া, সেই জালেরই সূক্ষ্মতম জটিল তন্তুগুলিকে নূতন নূতন অণুবীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করা, অর্থাৎ মানুষের সেই অতিপ্রবৃদ্ধ মানস-চেতনার জটিলতা প্রদর্শন করাই শ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তির নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইয়াছে; মানুষ যাহা নয়, যে-আবরণটা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার প্রকৃত সত্তাকে দুর্দ্দৃশ্য করিয়াছে, তাহারই জয়গানে অতি-আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ কোন একখানি উপন্যাসের পার্শ্বে 'কবি'-গল্পটিকে বসাইলে, মনে হইবে, উহাতে আছে কি? উহাতে মানব-মানসের সেই দুর্ভেদ্য জটিলতা, সেই উচ্চ জ্ঞানবুদ্ধি-সুলভ সমস্যারাজির দুরন্ত সংগ্রাম কোথায়? না, সে সব কিছুই ইহাতে নাই। ইদানীং 'Life'-নামক যে আর একটি হিংস্র, ক্ষুধার্ত্ত পশু-জীবনকে গৌরবান্বিত করা হইতেছে, যাহাতে দেহের প্রবৃত্তিগুলাকে অতিশয় প্রখর করিয়া—সেই দুর্ব্বলতাকেই শক্তি-নাম দেওয়া হইতেছে, ইহার জীবন সেই 'জীবন' নয়। ঐ কবিয়াল নায়কটির জীবন তাহার চতুর্দ্দিকে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেও দেহের স্থান অল্প নহে; তথাপি তাহাতে ক্ষুধার প্রচণ্ডতাও যেমন নাই, তেমনই সমস্যার তরবারি-ঝঞ্ঝনাও নাই। ইহাতে আধুনিক কালের অতি-বিরাট মানস-যন্ত্রাগারে প্রস্তুত কোন শিল্পদ্রব্যের দুর্ম্মূল্য শোভা নাই; মানুষকে মানুষই তাহার শিল্পশালায় যেমন গড়িয়া তুলিয়াছে ইহার জীবন তেমন

মানুষের জীবন নয়। তাই মনে হইতে পারে, এ কাহিনী নিতান্তই তুচ্ছ—যেমন সরল, তেমনই গ্রাম্য। কিন্তু কবি যে বলিয়াছেন—

To me the meanest flower that
blows can give
Thoughts that do often lie too
deep for tears.

—ইহাও তেমনই গভীর, ইহার সত্যও তেমনই চিরন্তন। আবার ইহার শক্তিও পূর্ণ-শক্তি। কবিয়ালের জীবনে যে ঝড় বহিয়াছে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ঝড় মানুষের জীবনে বহিতে পারে না; সেই ঝড়ের শেষে যে ধীর প্রশান্ত অবস্থার ইঙ্গিত করিয়া সে জীবনের পরিণাম সূচিত হইয়াছে, তাহাই জীবনের শক্তিলীলার পূর্ণতম পরিণতি। ঐ শান্তি পরাজয়ের শান্তি নয়, সকল বাসনা কামনাকে বুক পাতিয়া লইয়া, তাহার গভীরতম বিক্ষোভকে জয় করার শান্তি। এ জীবন স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফুলের জীবনই বটে; সমাজের হলচালনায়—তাহার তীক্ষ্ণ কর্তনীর আঘাতে, সে ফুল উন্মূলিত বা বৃন্তচ্যুত হয় বটে, তথাপি সেই ফুলই অমর, তাহা চিরদিন ফুটিয়াছে ও ফুটিবে। হয় তো সমাজেরই কোন একটা ভাব-রসে তাহা পুষ্ট হইয়াছে, আবার সমাজেরই রূঢ় নিষ্পেষণে তাহার জীবন-ধর্ম্মও বিচলিত হইয়াছে; তথাপি, এবং সেই কারণেও, মানবাত্মার সেই আদি অকৃত্রিম রূপ আরও বেশি করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়; একটির জন্য, তাহার বুকে যে রং লাগিয়াছে সেই রং অন্তরের মধুকে আরও মধুর করিয়া তোলে; অপরটির জন্য, তাহাতে যে কণ্টকগুলি দেখা দিয়াছে তাহাও সেই ফুলের বৃন্তকে আরও দৃঢ় করিয়াছে। ইহাও যে একটা বিশিষ্ট সাধনার ফল, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি, কিন্তু এখানে তাহা ভুলিতে হইবে, নতুবা ফুলগুলির সেই অতি-সহজ মানবত্ব-মহিমা উপলব্ধি করা যাইবে না।

সে-জীবনের রূপ ও রস হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে, ঐ নায়ক কবিয়ালের চরিত্র ও তাহার জীবনের গতি-নিয়তি লক্ষ্য করিলেই চলিবে। এখানেও মানবজীবনের মূল গ্রন্থিটি – যে গ্রন্থিতে দেহের সঙ্গে আত্মার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ঘটিয়া থাকে—সেই গ্রন্থিই কাহিনীর সূত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে; সেই গ্রন্থির নাম—নর-নারীর প্রেম। ঐ এক গ্রন্থি—হয় বন্ধন, নয় উন্মোচন করিবার প্রয়াসে, মানুষ আপনাকে

চিনিয়াছে ও চিনাইয়াছে। এই উপন্যাসে সেই প্রেম ভাবে ও অভাবে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে, একদিকে যেমন দেহের বাস্তব, অপরদিকে তেমনই আত্মার অতি-বাস্তব পরস্পরের সহিত সমান যুঝিতেছে; একের পরাজয় ও অপরের জয় দুইই এক রসের সঞ্চার করে—যেন জয় ও পরাজয়ে কোন প্রভেদ নাই। দেহের সহিত আত্মার যে বিরোধ তাহাকে স্বীকার করিয়াও ঐ প্রেম দেহের অসম্মান করে না; দেহের যতকিছু জ্বালা ও বীভৎসতা, তাহার আক্ষেপ ও আক্রোশকে সে প্রাণ পাতিয়া গ্রহণ করে, এবং সেই সঙ্গে দেহের গায়ে পরম স্নেহে হাত বুলাইয়া দেয়। আমি যে মূল-গ্রন্থির কথা বলিয়াছি, তাহা এইরূপ প্রেম; ইহা নর-নারীর যৌন-পিপাসাঘটিত বটে, কিন্তু তাহা যেমন কবিকল্পনার মন্দার-কুসুম নয়, তেমনই একটা পরিশুদ্ধ পাশব-বৃত্তিও নয়। মানুষের দেহের মধ্যেই তাহার বাস বটে, কিন্তু তাহা জাগে ঐ দেহেরই মর্য্যাদাবোধ হইতে, এবং মনে নয় —প্রাণে। এই প্রাণ-ধর্ম্ম স্বভাবের নিয়মে, এমন এক জনের মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছে—যাহার চারিদিকে দেহের ক্ষুধা, রক্তের পশুবৎ উত্তেজনাই প্রবল; অর্থাৎ, সেই সকলের মধ্যে—যাহাদের মানস-বৃত্তি অতিশয় অকর্ষিত, অতি নিম্নস্তরের প্রাণ-ধর্ম্মই যাহাদের একমাত্র সম্বল। ঐ দুর্ব্বার ক্ষুধা কবিয়ালের ধাতুতেও বিদ্যমান, সেই ধাতুর কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া কোন্ ছিদ্রমুখে কখন যে স্বাতী-নক্ষত্রের জল প্রবেশ করিল, দেহের পিপাসাই প্রাণের গভীরতর পিপাসায় পরিণত হইল—তাহা প্রকৃতিঠাকুরাণীই জানেন, ঐ দেহ-ধর্ম্মের বশেই তাহা ঘটিয়াছে। মানব-সভ্যতার আদি-ইতিহাসও ইহার সাক্ষ্য দিবে। যজ্ঞের নামে পশুহননকারী অতিবলিষ্ঠ, দুর্ম্মদ আর্য্যগণের মধ্যেই আদি ঋষি-কবির উদ্ভব হইয়াছিল। সেই দেহের শক্তি হইতেই প্রাণ-শক্তি, এবং প্রাণ-শক্তি হইতে দিব্য-জ্ঞানের দৃষ্টিশক্তি লাভ হইয়াছিল। তারাশঙ্কর বাংলার সেইরূপ সমাজ হইতেই একটি মানুষকে তুলিয়া লইয়াছেন; এ পুরুষ এক হিসাবে আদিম বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি জ্ঞানপ্রবণ নয়, অনুভূতি-প্রধান; তার কারণ, এ মানুষের জাতি ভিন্ন, ইহার দেশের জল-মাটিও ভিন্ন।

এ কাহিনীর নায়ক কবি হইলেও স্বভাব-কবি, শিল্পী-কবি নয়—মানুষ-কবি; অর্থাৎ সে অবসরমত কাব্যচর্চ্চা করে না, কাব্যপ্রেরণার জন্য বাস্তবকে ছাড়িয়া কল্পনার আরাধনা করে না, —ঐ কবিত্ব তাহার বাস্তবজীবনেরই অভিব্যক্তি।

তাহার জীবন দুইটা নয়, জগৎও দুই নয়; এক জগৎ হইতে অপর জগতে পৌঁছিবার কৌশল তাহাকে শিখিতে হয় না। এই মানুষ-কবির সব চেয়ে বড় প্রেরণা—আত্মার মর্য্যাদাবোধ; সকল দুর্ব্বলতা, দৈন্য ও হীনতাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা। অতএব, এই কবি-চরিত্র জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার মত একটি শক্তিমান পুরুষ-চরিত্রই বটে। উহার ঐ কবিশক্তি—প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি বা প্রেমশক্তিরই অপর নাম।

এই প্রেমে সকলই সহজ। যদি বলি, ইহাতে ত্যাগের কৃচ্ছ্র সাধন—আত্মনিগ্রহ আছে, তবে তাহা ঠিক হইবে না, কারণ, ইহার ত্যাগেও শূন্যতা নয়—পূর্ণতাবোধ আছে; সেই ত্যাগের বেদনায় একটা রসের অনুভূতি আছে, তাহাতেও একটা আনন্দ আছে, একটা চরিতার্থতা আছে; তাহাতে ব্যথা আছে, কিন্তু দুঃখ নাই। নিজে নিষ্পাপ বলিয়া সে মানুষকে ঘৃণা করে না; ঘৃণা নাই বলিয়াই বেদনা আছে, যাতনা নাই; সেই বেদনার তীব্রতাই তাহার প্রাণে একটি অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার করে—মৃত্যুকেও অমৃত করিয়া তোলে। ইহাই দেহ-সাধনা, ইহাই সহজিয়া। এই সাধনাতেও, তারাশঙ্কর খাঁটি তান্ত্রিকের মত—প্রায় অঘোরপন্থীর মত—তাঁহার কাহিনীর ঐ নায়ককে, দেহের চরম দুর্গতি ও বীভৎস-লীলার মধ্যেই, শবসাধকের মত জয়ী করিয়াছেন, কৃমিকীটসঙ্কুল গলিত লালাপঙ্কে পঙ্ক-স্নান করাইয়া তাহাকে শুচি ও সুন্দর করিয়াছেন।

ঐ প্রেম মূলে প্রকৃতি-প্রেমও বটে; তবু মানুষের প্রতিই নয়, জল-স্থল-আকাশ-বিহারিণী ধাত্রীরূপিণী যে-প্রকৃতি, জননী-জন্মভূমির রূপে, নিদ্রায় ও জাগরণে, মানুষের প্রাণে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দেয়—সেই প্রকৃতির একটি অ-রূপ চিন্ময় সত্তার প্রতি যে গভীর আকর্ষণ, তাহাও এই প্রেমের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। ইহাও মানবতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ইহার বিহনে মানবতার পূর্ণ বিকাশ হয় না। কিন্তু ইহা যে কেমন প্রেম, তাহা এই কাহিনীর ঐ নায়কটিকে না দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাও কবির প্রেম, না মানুষের প্রেম? খাঁটি মানুষের প্রেম বলিয়াই সেই প্রেমে মানুষ ঐরূপ কবি হইয়া উঠিয়াছে। গল্পটি ভাল করিয়া পড়িলে মনে হয়, লেখকের কল্পনা-মূলে এই তত্ত্বটি অলক্ষিতে বিদ্যমান ছিল, তিনি এই প্রেমকেও তাঁহার নায়কের জীবনধারায় গূঢ়-সঞ্চারী করিয়াছেন, উহাই শেষ পর্য্যন্ত মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের যে

প্রেম তাহাতে মানুষের হৃদয় মথিত হয়, সেই মন্থন-বিষ হজম করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। হৃদয়-সংগ্রামের সেই যে রণস্থল, তাহার পশ্চাতে ঐ প্রকৃতি মূক-মৌনী শুশ্রূষাকারিণীর রূপে দাঁড়াইয়া আছে—অবস্থাবিশেষে ঐ শুশ্রূষাকারিণীর শুশ্রূষা মানুষ চায় এবং পায়ও। এই তত্ত্বটিও ঐ কবিয়ালের জীবন-কাহিনীতে বড় সত্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহার সমগ্র সত্তা, তাহার সারাজীবন যে প্রেমে ভরপূর, তাহার উপাদান তিনটি—করুণা, সৌন্দর্য্য ও শান্তি। ইহার মধ্যে শেষ তুইটি পুষ্ট হয় প্রকৃতির অলক্ষ্য প্রভাবে; প্রথমটি মানুষের নিজ-প্রকৃতি-সম্ভব। আদি-কাল হইতেই উহার বীজ মানুষের প্রকৃতিতে আছে, কালে তাহা অঙ্কুরিত হয়, এবং ব্যক্তি-জীবনের কোন শুভলগ্নে তাহা পুষ্পিত হইয়া উঠে। এই প্রেমকে ঐ সৌন্দর্য্য ও শান্তিই অলক্ষ্যে লালন করে, সকল আঘাত হইতে তাহাকে রক্ষা করে। এ কাজ প্রকৃতিই করিয়া থাকে। এখানেও উহা নায়কের প্রেমকে যেমন পুষ্ট করিয়াছে, তেমনই উহাই তাহাকে বাঁচাইয়াছে—সংগ্রামশেষে সে-ও সেই মহা-শুশ্রূষাকারিণীর অঙ্কে মাথা রাখিয়া তাহার সকল বেদনা জুড়াইয়াছে।

ইহার পর, উপন্যাসের কাহিনী-অংশে, চরিত্র, ঘটনা, ও নাটকীয় সংস্থিতির যে প্রয়োগ-নৈপুণ্য আছে তাহার বিস্তৃত পরিচয় না দিয়া, আমি কেবল সংক্ষেপে তাহার একটু আভাস দিব। প্রথমে, নায়ক-চরিত্রের বিকাশ ও তাহার সেই প্রেম-সাধনার একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। দুর্দ্দান্ত খুনে-ডাকাতের বংশে তাহার জন্ম, তাহার সমাজ এবং সংসার তুইই আদিম প্রকৃতির। নিতাইএর রক্তে তাহারই প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে, দৈত্যবংশে প্রহ্লাদ জন্মিয়াছে। কিন্তু দেহের ঐ তুর্দ্দান্ত আগুনই যে প্রেমের দীপ্তিতে পরিণত হইয়াছে,—ঐ বংশধারার রূপান্তরিত প্রভাবই যে তাহার সেই প্রেম-শক্তির কারণ, লেখক সেই ইঙ্গিতই করিয়াছেন; অথবা, তাঁহার তেমন কোন সজ্ঞান অভিপ্রায় না থাকাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক, কারণ সৃষ্টির দৃষ্টিই অব্যর্থ; তাই সৃষ্টিকালে চরিত্রের যতকিছু নিমিত্ত-উপাদান আপনা হইতেই আসিয়া মিলিয়াছে। একদিন নিতাই সহসা একটা ঘটনায় আপনাকে চিনিল, নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিল যে, সে সকল সামাজিক উপাধিবর্জ্জিত, দৈবানুগ্রহধন্য এক ভিন্নশ্রেণীর মানুষ—সে কবি, অর্থাৎ সত্য-সুন্দরের পূজারী; যাহাকিছু মহৎ, মঙ্গলময় ও পবিত্র, সে তাহারই গান গাহিবার জন্য, রসনায় বাণীর প্রসাদ লাভ করিয়াছে; তাহার মুখে মিলযুক্ত

ছন্দোবদ্ধ কাব্য আপনা হইতে আসিয়া পড়ে, প্রাণ ভাববিদ্ধ হইলেই ঐরূপ শ্লোকে তাহা উৎসারিত হয়। নিজের এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল; তাহার ঐ দেহটার মধ্যে, ঐ ডোম-জাতীয় মানুষটার মধ্যে, এ কোন্ দেবতা বাস করিতেছে! এই দেবতাকে সকল অমর্য্যাদা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। তাহার প্রাণের পিপাসা ঐ দেবতারই পিপাসা; সে পিপাসা বড় মধুর, বড় পবিত্র, বড় সরল। সেই পিপাসা মিটাইবার জন্য সে গান রচনা করিতে লাগিল। সেই গানেরই গায়ক কবিয়াল হইয়া, সে বাংলার পল্লীসমাজে—তাহারই পরিচিত মানবসমাজে—অমৃত বিতরণ করিবে, মানুষের প্রাণ তাহাতে সাড়া দিবে, তাহার যশ-লাভ হইবে; তাহাতেই তাহার প্রাণের ঠাকুর পরিতৃপ্ত হইবেন। এই কবির জীবন-চিত্র যে বাস্তব পরিবেশে, এবং যে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম রেখায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতেও তারাশঙ্কর একটা বড় কাজ করিয়াছেন; তিনি এই কাহিনীতে বিগতযুগের বাংলা কবি-গান ও কবিওয়ালাকে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন—কোন ঐতিহাসিক শত চেষ্টাতেও তাহা পারিতেন না।

অতঃপর এই 'কবিয়াল' একটি মেয়েকে ভালবাসিল; পাখী যেমন প্রভাতের আলো-কে ভালবাসে, মরু-পর্য্যটক যেমন ঝরণা-শীতল শ্যামল পাদপচ্ছায়াকে ভালবাসে,—হয়তো বা নির্জ্জনবাসী নিঃসঙ্গ পুরুষ যেমন দৈবাগত অতিথিকে ভালবাসে, এ ভালবাসা তেমনই; ভ্রমর যেমন ফুলকে ভালবাসে, অথবা পতঙ্গ যেমন বহ্নিকে ভালবাসে—তেমন ভালবাসা নয়। মেয়েটির নাম 'ঠাকুরঝি', ঐ নামেই সকলে তাহাকে ডাকিত। এই মেয়েটিকেও 'কবি'র কবি যে তূলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও ওস্তাদ-শিল্পীর উপযুক্ত, বাংলার পল্লী-যুবতীর চিত্রহিসাবে এ চিত্র অনবদ্য। কিন্তু এ ভালবাসা—এই lyric love—ঐ চরিত্রের পূর্ণবিকাশের উপযোগী নয়; তাহার অদম্য প্রাণ-শক্তিকে, তাহার রক্তের সেই নিপীড়িত উগ্র কামনাকে অগ্নিশুদ্ধ হইতে হইবে, প্রেমেও তাহাকে শক্তি-সাধনা করিতে হইবে; সে-সাধনার প্রতীক মৃদুগন্ধী যূঁই-শেফালি নয়—উগ্রগন্ধী চাঁপা, রক্তরাঙা জবা। তাহার প্রেম পরস্পরের পিপাসাতৃপ্তির প্রেম নয়—সকল পিপাসা জয় করার প্রেম। তাই সে ঠাকুরঝির' প্রতি একটি অতিমধুর প্রীতির ব্যথায় উন্মনা হইয়া উঠিলেও তাহার কল্যাণকামনা করিয়া সে তাহাকে ফিরাইয়া দিল। সে বুঝিল, এ প্রেমের

পরিণাম কি; সরল-হৃদয়া অবোধ নারীর এই আত্ম-নিবেদন যতই অকপট হউক, তাহার শক্তি কতটুকু? অতিশয় সরল অকপট হইলেও তাহা দুর্ব্বল, তাহা জীবনের সঙ্গে বেশিদূর যুঝিতে পারে না, সে আগুন শীঘ্রই এক মুঠা ছাই হইয়া যায়। আবার, যাহা রিপুমাত্র, তাহা ব্যাধির মতই জীর্ণ ও জর্জ্জরিত করে, একদিন আরোগ্য হইয়াও যায়। অতএব, ঐরূপ প্রেমের তুলনায় ধর্ম্মই বড়; ঠাকুরঝির পক্ষে ঐরূপ প্রেমের পরিবর্ত্তে গৃহধর্ম্মচারিণীর ব্রতই কল্যাণকর। ঠাকুরঝিকে সে তাহার নিজের প্রেম-শক্তির বলেই ত্যাগ করিল; সেই ত্যাগের যে দুঃখ তাহাও করুণার সন্ধ্যাতারার মত তাহার হৃদয়াকাশে রশ্মি বিকিরণ করিতে লাগিল। ইহাই তাহার প্রথম পরীক্ষা। তাহার দেহবাসী সেই দেবতার মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য, সে অতঃপর সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল; ইহার পর সে যে-অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ না দিয়া পারিল না, তাহাতেই এই কাহিনী জটিলতর ও গভীরতর হইতে পারিয়াছে—ছোট-গল্পের নদীটি উপন্যাসের সাগরাভিমুখিনী হইয়াছে।

নিতাই রীতিমত কবিয়াল হইল। সে একটি ঝুমুরের দলের প্রধান কবির পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। যে মেয়েগুলিকে লইয়া এই দল, তাহারা রূপোপজীবিনী —অতিশয় নিম্নশ্রেণীর বারাঙ্গনা। ইহাদের ঐ সমাজই কবির সাধন-ক্ষেত্র হইল, উহাদেরই একজন হইল তাহার সেই সাধনার উত্তরসাধিকা। এই যে সমাজ এ কাহিনীর প্রধান পটভূমিকা হইয়াছে, ইহার চিত্র-রচনায় তারাশঙ্করের কবি-প্রতিভা—তাঁহার সেই বাস্তবভেদী তান্ত্রিক রস-দৃষ্টি—সেই সীমায় পৌঁছিয়াছে, যাহার পরে কোন কবিদৃষ্টি পৌঁছিতে পারে না। এখানে নারীজীবন-ট্র্যাজেডির নায়িকা হইয়াছে এক ঘৃণ্যতমা স্বৈরিণী। একমাত্র রুশ-সাহিত্যিক ডসটয়েফ্স্কি ছাড়া আর কোন পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকের বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনা নারীদেহের এতখানি দুর্গতি ও সেই সঙ্গে নারী-আত্মার এতখানি শক্তি এমন গভীর বর্ণে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ কাহিনীর কবিশক্তি এই কারণে আরও বিস্ময়কর যে, এখানে নারী-জীবনের সেই এক ট্র্যাজেডি, একই মাত্রায় ও প্রায় একই আকারে সংঘটিত হইয়াছে—অতি সাধারণ প্রতিবেশে, অতি সামান্য আয়োজন-উপকরণে; ইহা আভিজাত্যের সকল আভরণবর্জ্জিত। কিন্তু তাহাতেই, ক্রুশবিদ্ধ মহাপুরুষের মত, ঐ ক্রুশবিদ্ধ নারীর অন্তরাত্মার—তাহার নিঃসঙ্গ নৈরাশ্য-যাতনার—

মর্ম্মভেদী রব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্রটি গড়িয়া তুলিতে লেখক যে নাটকীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা কোন শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীর তুলনায় ন্যূন নহে।

মেয়েটির নাম—বসন বা বসন্ত। প্রথম হইতেই তাহার দেহে ও মনে একটা জ্বরতাপ, এবং তাহারই কারণে তাহার রূপেও একটা রক্তিমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখা যায়। সে প্রেমকে—নরনারীর সহজ ধর্ম্মকে—হত্যা করিয়াছে, করিতে বাধ্য হইয়াছে; তার পর সে আর কিছুকে, কাহাকে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধা করে না। তাহার নারীজীবন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—এ কথা সে কিছুতেই ভুলিবে না; সে নিজের প্রতিও যেমন নিষ্ঠুর, মনুষ্যজীবনের প্রতিও তেমনই উদাসীন। কিন্তু এ চরিত্রে আহত-হৃদয়ের একটা মর্ম্মান্তিক আক্রোশ—লাঞ্ছিত নারী-মর্য্যাদার একটা দুর্জ্জয় অভিমান আছে, তাহাই তাহাকে অন্তরের অন্তরে এমন নিঃসঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। সে বাহিরে একটুও আত্মপ্রকাশ করে না; বরং যাহাতে কেহ তাহার অন্তরের পরিচয় না পায়,—তজ্জন্য সে এমন ব্যবহার করে যে, সে যেন একটা ঘৃণিত বারাঙ্গনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আত্মবিস্মৃতির জন্য সে দেহের লালসাকেও জীয়াইয়া রাখে। এই অন্তর-রুদ্ধ, আত্ম-স্তব্ধ নারীকে লেখক যে কৌশলে, চকিত ইঙ্গিত ও ঘটনার অতর্কিত বিস্ফুরণে, আমাদের চিত্ত-গোচর করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাটকীয় রস-দৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় আছে। এই নারীর ঐ জীবনের পরিণামে, তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিদারুণ বেদনা তিনি যে ঘটনায় ও যে দৃশ্যে নাট্টীকৃত করিয়াছেন, তাহাও শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পীর উপযুক্ত। ঐ নারী যে-প্রেমকে হৃদয় হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, যে অমৃতের স্বাদ সে জীবনে কখনো পায় নাই, তাহাই যখন ধরা দিয়া তাহার প্রাণকে পিপাসার্ত্ত করিয়াছে, তখনই,—যে-মৃত্যুকে সে এতদিন নির্ভয়ে তাহার দেহে বাসা বাঁধিতে দিয়াছিল, সেই মৃত্যু আর ত্বরা সহিল না, করাল মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই অন্তিম কালে, এক দিকে প্রেম, অপর দিকে মৃত্যু—এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া হতভাগিনীর সেই আর্ত্ত-চীৎকার—এবং মৃত্যু অপেক্ষা প্রেমই অসহ্য হইয়া উঠার যে অনিবার্য্য চেতনা—তাহাতে জীবনের বাস্তবই চিরন্তন কাব্য হইয়া উঠিয়াছে; লেখকের দৃষ্টি যে কিরূপ অভ্রান্ত, এই কাহিনী-নাটকের ঐ দৃশ্যে তাহারই কঠিন পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

আরও বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না, যদিও হইতে পারিলে ভাল হইত, কারণ এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানির প্রতি অঙ্গ কবিকল্পনার পূর্ণ-রসদৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল। কেবল একটি চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলিব, এ চরিত্র আমাদের সমালোচনা-বুদ্ধিকেও স্তম্ভিত করে—সে ঐ ঝুমুরের দলের কর্ত্রী, তাহার নাম 'মাসী'। এই 'মাসী'টির জীবনে মানবভাগ্য-বিধাতার যে ক্রুর পরিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার মত দুর্জ্ঞেয়-ভীষণ আর কিছু কল্পনা করাও যায় না। সে তাহার হৃদয়কে শ্মশান করিয়া, সেই শ্মশানে, তাহারই মত কয়েকটি নারীর আত্ম-হত দেহে শবাসন রচনা করিয়া শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে; সকল হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া—স্নেহ-দয়াকে দূর না করিয়া, দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে। সংসারের যে দিকটা তাহার ভাগে পড়িয়াছে সে দিকটার দেনা-পাওনা সে এমন পাকা করিয়া লইয়াছে যে, কোন তন্ত্রসিদ্ধা ভৈরবীও তাহার মত নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার নহে। কিন্তু সেই নির্ম্মমতারও কোন্ অতল তলে তাহার দুই চক্ষের অশ্রুধারা জমাট হইয়া আছে—সে অশ্রু গলিয়া উপরের দিকে প্রবাহিত হয় না কেন—বসনের চিতা সাজাইবার কালে, কথায় ও কাজে, সে তাহার একটা চকিত আভাসমাত্র দিয়াছে। এ চরিত্র যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শুধুই দৃষ্টিতে নয়—দেহ-চেতনারও মূলে—বাংলার সেই তান্ত্রিক ভাব-সংস্কার অন্তর্গূঢ় হইয়া আছে। পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে ইহার সদৃশ চরিত্র মিলিতে পারে—কিন্তু তাহাতে মানব-জীবনেরই জবানীতে সৃষ্টির গভীরতম রহস্যের এমন ইঙ্গিত মিলিবে না, সেই দুর্জ্ঞেয় শক্তির নিদারুণ লীলা এমন ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ধরা দিবে না।

কথাবস্তুর পরিচয় এই পর্য্যন্ত। তাহার আয়োজন-উপকরণের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি; জীবনকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে—এবং সে দৃষ্টি কেমন সহজ অথচ কত গভীর এবং সত্য, তাহার বিস্তারিত আলোচনাও করিয়াছি। এই জীবন নিখিল-মানবজীবনের মানবতায় সমুজ্জ্বল হইলেও, তাহা যে একটি বিশেষ জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতির রঙ্গে রঙ্গীণ, সে কথাও বলিয়াছি; কাব্যখানির রচনায়, কবিকল্পনা বা কবিদৃষ্টির অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়ও কিছু কিছু দিয়াছি। এখন সর্ব্বশেষে, এ কাব্যের বাণী-রূপ বা ভাষার কিছু পরিচয় দিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়। কারণ, একটা কথা কখনো বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে—ভাব নয়, অর্থ নয়, তত্ত্ব নয়, এমন কি, ঘটনা বা কথাবস্তুও নয়—সেই ভাবনা-কল্পনা

তখনই কাব্য হয়ে উঠে, যখন তাহা একটা বাণী-দেহ ধারণ করে ; সেই দেহের অন্তরালে, বাণীর অগোচরে যাহা থাকে, তাহার কোন মূল্যই নাই,—যতক্ষণ না একটা সুঠাম, সুপরিচ্ছিন্ন, সুসম্বদ্ধ বাণীমূর্ত্তিতে তাহা প্রকাশ পায়। সেই প্রকাশের প্রেরণা যদি সুনিশ্চিত বা সত্যকার প্রেরণা হয়, তবে প্রথম হইতেই রচনার ভাষা সেই ছাঁচে ঢালাই হইতে থাকে, প্রতি শব্দ প্রতি বর্ণ সেই ভাবের ধ্বনি মূর্ত্তিটিকে সাকার করিয়া তোলে। ভাষা বলিতে শব্দযোজনারীতিই নয়—শব্দরস-প্রবাহ বুঝিতে হইবে। এই প্রবাহ যতক্ষণ ঠিক আছে, ততক্ষণ রচনার অন্য লক্ষণ-গুলির ভাবনা করিতে হয় না, তাহারা আপনা-আপনি রচনায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। আমি সেই ষ্টাইলের কথা বলিতেছি। তারাশঙ্করের এ গল্পটিতে রচনার সেই গুণ যেরূপ লক্ষণীয় হইয়াছে, আমার মনে হয়, তাঁহার আর কোন উপন্যাসে তেমনটি হয় নাই। চরিত্রগুলির কথোপকথনের ভাষাও যেমন, লেখকের বিবৃতি বর্ণনার ভাষাও তেমনই, একটি অখণ্ড ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে ; একটিতে ঐ মূর্ত্তিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, অপরটিতে সেই মূর্ত্তিরই উপযোগী অধিষ্ঠানভূমি প্রস্তুত হইয়াছে—যাহাতে ছায়া-আলোকের সচ্ছন্দ সম্পাত আমাদের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। উপন্যাসখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই বুঝিতে পারি, আমরা একটা নূতন ভাবমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছি ; সেই ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে কবিয়াল নিতাইয়ের ঐ গানগুলি ; সেই গানের অন্তর্নিহিত সুরই যেন সর্ব্বত্র অন্তঃশীলা হইয়া বহিতেছে। নিতাই কবিয়ালের প্রাণে প্রেমের সঙ্গে সঙ্গেই যে কাব্য-প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে এই দুইপংক্তিই তাহার নিশ্চিত প্রমাণ—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।
কালোকেশে রাঙা কোসম হেরেছ কি নয়নে ?"

—এ যেন আদি-কবির কণ্ঠোচ্চারিত সেই প্রথম শ্লোক, যাহার ছন্দে ও সুরে সমগ্র রামায়ণ গানের আকারে ধরা দিয়াছিল। তারাশঙ্করও যেন ঐ দুইটি পংক্তির মন্ত্রবলে, নিতাই-কবিয়ালের দেহটার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাহারই সাহায্যে সমগ্র কাব্যখানিকে একমুহূর্ত্তে দৃষ্টিগত করিয়াছেন—তাঁহাকে আর ভাবিতে হয় নাই, ঐ একটি রসগ্রন্থি হইতে পুরা-কাহিনীটি আপনিই আপনাকে বুনিয়া তুলিয়াছে। এ কাব্যের ভাষা যেখানে যেমন হোক—ঐ এক সুরের ভাষা। ভাষার সেই মূর্ত্তি খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখানো যাইবে না, কেবল সেই

ভাবমণ্ডলটির আভাস দিবার জন্য, লেখকের জবানীতে, ইহার কিছু পরিচয় করাইব।—

"ঠিক এই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল আর এক জন। পনের-ষোল বছরের একটি কিশোরী মেয়ে। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু দীঘল দেহ-ভঙ্গিতে ভুঁই-চাঁপার সবুজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটী, হাতে ছোট গেলাস; পরনে দেশী তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়।...সে এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে।...মেয়েটির সরল ভীরু দৃষ্টিতে বিস্ময় যেন কালো জলের স্বচ্ছতার মত সহজাত।...সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ মেয়েটি হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল—অসঙ্কোচ খিল-খিল হাসি।"

[পৃঃ ১৭]

* * * *

"মেয়ে পুরুষের একটি দল আসিতেছে। মেয়েদের বেশভূষা বিচিত্র, পুরুষ-গুলির চেহারাও বিশিষ্ট একটা ছাপমারা চেহারা। এ ছাপ নিতাই চেনে।

—'চা দাও ভাই, মরে গেলাম মাইরি!' কথাটা যে বলিল সে ছিল দলের পিছনে, দলটি দাঁড়াইতেই সে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইল। একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার শাদা ক্ষেতে যেন ছুরীর ধার—সেই শাণিত দীপ্তির মধ্যে কালো তারা-দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। শাদা আগুনের শিখার মধ্যে নাচিয়া ফিরিতেছে যেন দুইটা কালো পতঙ্গ—মরণজয়ী কালো ভ্রমর দুইটা!

"...মেয়েটা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—

'এই তুমারা ওস্তাদ নাকি? অ — মা — গ!' বলিয়াই সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে হাসির আবেগে তাহার দীর্ঘ কৃশতনু থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। মেয়েটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে। আর সে হাসির কি ধার! মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধূলায় লুটাইয়া দেয়।" [পৃঃ ৫৮]

* * * *

"রাত্রির শেষ-প্রহর অদ্ভুত কাল।···ধীর-সঞ্চারিত নৈঃশব্দের মধ্য দিয়া একটা হিম-রহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আছন্ন করিয়া ফেলে।···মাটির বুকের মধ্যে, গাছে-পাতায় থাকিয়া যে অসংখ্য কোটী কীটপতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিয়া থাকে, তাহারা পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, আচ্ছন্নের মত।···আকাশে জ্যোতির্লোক হয় পাণ্ডুর, সে লোকেও যেন হিমতমসার স্পর্শ লাগে। কেবল অগ্নিকোণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা—অন্ধ রাত্রি-দেবতার ললাট চক্ষুর মত। সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন-করা রহস্যময় এই গভীর শীতলতার স্পর্শে নিতাই শতচেষ্টা সত্ত্বেও জাগিয়া থাকিতে পারে নাই, আচ্ছন্নের মত দেওয়ালের গায়ে কখন ঢলিয়া পড়িয়াছিল।"

[পৃঃ ১৩৯]

* * * *

"চিতার উপর শবদেহ চাপাইবার পূর্ব্বে প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আঃ বসন, আমার সোনার বসন!' দুইফোঁটা জলও তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।···

"নিতাই দেহটা চিতার উপর চাপাইবার উদ্যোগ করিল, প্রৌঢ়া বলিল, 'দাঁড়াও, বাবা, দাঁড়াও'। সে আসিয়া বসন্তের আভরণ খুলিতে বসিল।···কিই বা আভরণ! কানে দুইটা ফুল, নাকে একটা নাক-ছাবি, হাতে দুইগাছা শাঁখা-বাঁধা, তাহার উপর বসন্তের ছিল একছড়া হাল্কা বিছা হার।

"নিতাই হাসিল। বলিল, 'খুলে নিচ্ছ, মাসী?'

মাসী তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর আপনার কাজে মন দিল। গহনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া সে বলিল—'বুকের নিধি চলে' যায় বাবা, মনে হয়, দুনিয়া আঁধার, খাদ্যি বিষ, আর কিছু ছোঁব না—কখন কিছু খাব না। আবার একবেলা যেতে না যেতে চোখ মেলে চাইতে হয়, উঠতে হয়; পোড়া পেটে দুটো দিতেও হয়···বাঁচতেও হবে, খেতে পরতেও হবে, এগুলো চিতেয় দিয়ে ফল কি বল?' বক্তব্য শেষ করিয়া সে বলিল, 'এগুলি আমার পাওনা, বাবা'।···প্রৌঢ়া আবার বলিল, কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—'আমার অদেষ্ট দেখ বাবা! আমিই হ'লাম ওদের ওয়ারিশান।' প্রৌঢ়ার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।" [পৃঃ ১৪১-৪২]

* * * *

"বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে সে সন্ধ্যায় আসিয়া বসিল। ডোমের ছেলে সে, মন্দির-প্রবেশের অধিকার নাই—সেজন্য তার আক্ষেপও নাই। প্রাঙ্গণের এক-প্রান্তে বসিয়া মন্দির-শীর্ষের ধ্বজার দিকে চাহিয়াই সে ধন্য হইয়া গেল। তার পর সে গান রচনা আরম্ভ করিল—

ভিখারী হয়েছে রাজা দেখরে নয়ন মেলে।
সাতমহলা সোনার দেউল গড়েছে সে শ্মশান ফেলে॥

গুন্ গুন্ করিয়া স্বর ভাঁজিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া সে গলা চড়াইয়া গান আরম্ভ করিল।•••

"এখানে ওখানে আরও কত জনে গান গাহিতেছে। হিন্দী গান। সেও উঠিয়া আসিয়া একটা জনতার পাশে দাঁড়াইল। স্বর তাহার মন্দ লাগিল না; মন্দ কেন, ভালই লাগিল। কিন্তু গান সে বুঝিতে পারিল না, ভালও লাগিল না। তাহার মনে গুঞ্জরণ করিয়া উঠিল রামপ্রসাদের পদ—

আমার কাশীতে যেতে মন কই সরে।
সর্ব্বনাশী এলোকেশী—সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে॥

আহা রে! ইহার চেয়ে কি ভাল গান হয়? তাহার সমস্ত অন্তরটা একটা গভীর বেদনার উদাসীনতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল গ্রামের মা-চণ্ডীকে। রামপ্রসাদের এলোকেশীর মত মা-চণ্ডী আজ এই কাশীতে আসিয়া তাহার আশেপাশে ফিরিতেছে।" [পৃঃ ১৫৭-৫৮]

* * * * *

যেখান-সেখান হইতে এই যে কয়েক টুকরা উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে কাহিনীর কোন পরিচয় পাওয়া যাইবে না, কেবল ভাবকল্পনার ভঙ্গি এবং তাহার ভাষা কেমন, তাহারই একটু ইঙ্গিত মিলিবে। নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণ, বা ঘটনাবস্তুকে পাত্র-পাত্রীর হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করিবার জন্য, লেখক যে মুখের ভাষা আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাও ঐ কবি-গানের যেমন সমগোত্রীয়, তেমনই তাঁহার সাহিত্যিক ভাষার সহিত কোথাও তাহার তাল কাটে নাই। ইহার কারণ দুইটি,—প্রথম লেখকের নিজের ভাষাও ঐ ভাবমণ্ডলের রসেই অভিষিক্ত; দ্বিতীয়, বাংলা সাহিত্যিক ভাষার যে রস তাহাও ঐ সমাজের ঐ ভাষা হইতেই সঞ্চারিত

হইয়াছে। সে ভাষাতেও উচ্চ ও নিম্ন—সমাজ-ভেদে যে স্তর আছে, তাহা কৃত্রিম; ঐ ভাষার রস একই মাতৃভাষার রস; বরং যাহাকে আমারা খাঁটি কথ্য-বুলি বলি, অর্থাৎ যাহা 'সাধু' বা মাৰ্জ্জিত নয়, তাহাই আরও রস-ঘন। ঐ মাতৃভাষাই আধুনিক 'পিতৃভাষা'কে প্রাণের দীপ্তি দান করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও যেমন, কবিগান, পাঁচালী, রামপ্রসাদের গানেও তেমনই, বাঙালীর অন্তর্জীবনের সেই কালচার ভাষাকে যে ছাঁচে গড়িয়া দিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই নব্য-সাহিত্যের ভাষায় ধরিয়া—বাঙালীর রস-জীবন উদ্ধার এবং উন্নত করিয়াছিলেন। তারাশঙ্করও সেই রসের রসায়ন-চাতুর্য্যে, এবং অব্যভিচারী কাব্য কল্পনার অমোঘ নিয়মে—এই কাহিনীর ভাষায়, রূপের বাস্তবকেও যেমন, রূপের অনুষঙ্গী ভাবকেও তেমনই এক বাণীচ্ছন্দে মিলাইতে পারিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই কাহিনীর ভাষায় সমগ্রভাবে আছে—বিচ্ছিন্ন পংক্তি-সমষ্টিতে তাহা পাওয়া যাইবে না। তাই আমি তেমন ভাষার দৃষ্টান্ত বেশি উদ্ধৃত করিলাম না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি তত্ত্ব স্মরণীয়। ঐ যে প্রাদেশিক বুলি (dialect), উহাও যে-সংস্কৃতির ফল, সে-সংস্কৃতি যেমন প্রাচীন তেমনই গভীর—বাঙালীর ভাব-জীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ উহাতেই প্রতিফলিত হইয়াছে—প্রাদেশিক হইলেও ঐ প্রাদেশিকতার একটি বিশেষ মূল্য আছে। ভাষার ঐ ছাঁচটিতেই এ পর্য্যন্ত বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ রস-সাহিত্য রচিত হইয়াছে। সেকালের শ্রেষ্ঠ নাগরিক সভা-কবি ভারতচন্দ্রও যেমন, একালের শেষ ও শ্রেষ্ঠ অভিজাত কবি রবীন্দ্রনাথও তেমনই, ঐ ভাষাকেই আপন আপন ভঙ্গিতে ভাঙ্গাইয়া, বাংলাসাহিত্যে আর্ট বা রসের চরমোৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছেন; একজনের বৈদগ্ধ্য এবং অপর জনের পরম-সুন্দর-পিপাসা ভাষার ঐ কুলধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়াছে, না করিয়া পারে নাই। অতি আধুনিক-বাংলাসাহিত্য যে সেই প্রাণ-রস-বর্জ্জিত হইয়া উঠিতেছে—অতিশয় কুৎসিত কৃত্রিম রূপ ধারণ করিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ, ভাষার সেই রস-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে, বাঙালীর মুখের বুলিও বিজাতীয় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই মুখের বুলিই সাহিত্যের ভাষা নয়। ইদানীং সাধুরীতি ও কথ্যরীতি নামে ভাষার যে দুই রীতির চলন হইয়াছে, তাহাতে এই বুলির কোন তারতম্য নাই—বরং ঐ কথ্যরীতিই আরও স্বেচ্ছাচারী; অতএব উহা রীতিভেদ মাত্র। রচনাবিশেষে, ভাবকল্পনার প্রকৃতিভেদে, ঐ দুই রীতির পৃথক উপযোগিতাও আছে।

তারাশঙ্করের আধুনিক রচনাগুলিতে ভাষার ঐ কথ্যরীতির প্রতি যে পক্ষপাত দৃষ্ট হয় তাহাও অকারণ নহে, আমি পূর্ব্বে তাঁহার কবি-দৃষ্টির যে ভাবান্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছি এ প্রসঙ্গে তাহাই স্মরণীয়।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এইখানেই আমি একটা কথা বলিবার সুযোগ লইব। যাঁহারা বলেন, সাহিত্যের ভাষায় জাতিভেদ নাই, অর্থাৎ যে-কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই—তাঁহারা একটা অর্দ্ধ-সত্যকে সত্যের গৌরব দান করেন। ভাষাই জাতিত্বের নিদান, এবং সে "জাতি" সমাজ, রাষ্ট্র এমন কি ধর্ম্মঘটিত জাতি নয়—একেবারে মানুষের অন্তরস্থ ভাব-পুরুষের 'জাতি'—ভাষা সেই জাতিত্বের অভিব্যক্তি। ঐ 'জাতি'র প্রতিষ্ঠায় 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষে'র সমান সহযোগিতা আছে। ইংরেজের সাম্রাজ্য লোপ পাইলেও ইংরেজ মরিবে না; কিন্তু তাহার ভাষার স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ স্বধর্ম্ম যদি লোপ পায়, তবে ইংরেজ-নামীয় মানুষটা লোপ পাইবে—মহামানবের একাকারে মিশিয়া যাইবে। সেই 'মহামানব' বস্তুটি কি, তাহার চেহারা কেমন, ভাষা কেমন, তাহা এখনও পুঁথিগত হইয়াই আছে। মৃত্যুই যদি মোক্ষ বা নির্ব্বাণলাভ হয়, তাহা হইলে ঐ 'মহামানবে' লীন হওয়া সেইরূপ উচ্চ অবস্থা বটে। যাহাদের সেই মোক্ষলাভ আসন্ন হইয়াছে, তাহারা ঐ মহামানবের 'তারকব্রহ্ম-নাম' জপিয়া থাকে; তদ্দর্শনে আর সকল জাতির বড় জোর একটু শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাই তাহারাও মাঝে মাঝে 'হরিধ্বনি' করে। যাক, উপস্থিত সে কথায় কাজ নাই। আমি বলিতেছিলাম, ঐরূপ উক্তি একটা অর্দ্ধসত্য মাত্র। সাহিত্যের ভাষায় বিজাতীয় শব্দের ব্যবহারে ছুঁৎমার্গ নিন্দনীয়; তাহার অর্থ এই নয় যে, এক ভাষায় অপর কোন ভাষার শব্দরাশি অবাধে প্রবেশ করিতে না দেওয়া অন্যায়। ভাষার নিজস্ব প্রয়োজনে, তাহার অভাব পূরণার্থে—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিসাধনে—নূতন ভাব ও নূতন বস্তুবাচক শব্দ বিভাষা হইতেও আহরণ করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেইরূপ আহরণের একটা মাত্রা বা সীমা আছে; অনাবশ্যক আহরণ ত' নহেই—মূল ভাষার শব্দের পরিবর্ত্তে অপকৃষ্ট বিজাতীয় শব্দ সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। তারপর, সেইরূপ শব্দের দ্বারা মূলভাষার প্রকৃতি পীড়িত না হয়, ইহাও দেখিতে হইবে—আর কিছু না হোক্, ধ্বনিপ্রকৃতি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহা না হইলে, সেই সকল শব্দ কালে আপনা হইতেই বহিষ্কৃত হইয়া যায়। বিভাষার নাম-শব্দগুলি অগত্যা

সহ্য করিতেই হয়—কিন্তু ভাবার্থমূলক শব্দ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ভাষা-রসবোধের প্রয়োজন আছে; শক্তিমান শিল্পী ভিন্ন আর কেহ সেইরূপ শব্দ স্ব-ভাষায় আত্মসাৎ করিতে পারে না। যাঁহার সেই সহজ-রসজ্ঞান আছে তিনিই বুঝিতে পারেন, কোন্ শব্দটি কেমন আকারে ও কেমন ভঙ্গিতে গ্রাহ্য হইতে পারে। প্রত্যেক ভাষার মত, বাংলা ভাষারও একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে; একটা অপেক্ষাকৃত নিকট ভাষার—যেমন, হিন্দীর—সহিত তুলনায় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। মূল একই সংস্কৃত হইতে যে সকল শব্দ উভয় ভাষায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে (হিন্দীর ঐরূপ শব্দাভিধান বাংলার তুলনায় অতিশয় অপর্য্যাপ্ত এবং অপরিপুষ্ট, তার কারণ, ঐ ভাষা এখনও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে নাই), সেইগুলিরও যথেচ্ছ আদানপ্রদান চলে না। ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে, একটা সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সন্‌মতি দে ভগবান্' —ভারতের নবধর্ম্মের এই 'কল্‌মা'-গীতি হইতে ঐ 'সন্‌মতি' শব্দটি লওয়া যাইতে পারে। ঐ শব্দটি আদৌ বাংলা নয়; 'সৎ+মতি' — সংস্কৃতও বটে, অর্থও খুব স্পষ্ট এবং পরিষ্কার, উহার ভাবও নূতন নহে; তথাপি বাংলাভাষায় — সংস্কৃতের দারুণ দাপটের দিনেও — এমন শব্দ তৈয়ারী হয় নাই। আমরা 'সুমতি', 'সুবুদ্ধি', এমন কি, 'সদ্‌বুদ্ধি'ও 'শুভবুদ্ধি'-ও বলি, কিন্তু 'সন্‌মতি' বলি না। কেন বলি না? আমাদের নিজস্ব ভাষা-রস-বোধে (instinct) বাধে বলিয়াই বলি না। এরূপ শব্দ-নির্ম্মাণ নিশ্চয়ই দুরূহ নয়, অভিধান-ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য আবশ্যক হয় না; আবার, বাঙালী বহুকাল সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেছে, বাংলাভাষা সংস্কৃতের শব্দরাশি যে পরিমাণ আত্মসাৎ করিয়াছে, এমন আর কোন ভারতীয় ভাষা করে নাই, তথাপি আমরা কখনো 'সন্‌মতি' শব্দ ব্যবহার করি নাই, —শুনিলেই মনে হইবে, উহা অ-বাংলা; যে বাঙালীর কিছুমাত্র নিজভাষার 'সংস্কার' আছে, তাহারই ঐ শব্দটি কেমন-যেন অদ্ভুত ঠেকিবে। ইহা একটা 'প্রেজুডিস' নয়; ইহাই জাতির ভাব-দেহী সেই অন্তর-পুরুষের প্রতিবাদ। খাঁটি বিদেশী-শব্দ হইলে এমন বোধ হইত না, কারণ, তাহা বাংলার এমন সদৃশ নয়; ঐ যে সদৃশ হইয়াও বিসদৃশ, ইহাই ঐরূপ অ-রুচির কারণ। আমি জানি, ঐ গানের ঐ শব্দটির সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য নবধর্ম্ম-বিলাসী বাঙালীর ভাল লাগিবে না; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আমি এখানে ধর্ম্মমন্ত্র বা ভক্তিরসের আলোচনা

করিতেছি না, — সাহিত্য ও ভাষার কথাই বলিতেছি। যাঁহারা খৃষ্টান বা মুসলমান তাঁহারাও তাঁহাদের মাতৃভাষায় উৎকট বিদেশী শব্দ ব্যবহার করিয়া ধর্ম্মভাবের গভীরতা অনুভব করিয়া থাকেন — সেখানে ভাষার কথাটাই বড় নয়, এবং সেই সকল শব্দের প্রয়োজনীয়তাও অন্যরূপ। তথাপি ইহাও সত্য যে, সেই সব বিদেশী শব্দ বাংলার প্রকৃতি-সহ না হইলে, তাহারা চিরদিন ভাষার বহিরঙ্গেই থাকিয়া যায়।

এইবার 'কবি'র সমালোচনা শেষ করি। আমি পূর্ব্বে একাধিকবার বলিয়াছি, এ কাহিনীর মূল-সুর গীতি-সুর হইলেও, সেই গীতি-সুরেই বাস্তবের কাহিনীরূপ ধরা দিয়াছে। সেই বাস্তবতা (Realism) কোন তত্ত্ববাদ বা মতবাদের মত, রস-বাদের বিরোধী নয়। সে-বাস্তব মানুষের মনুষ্যত্বের বাস্তব, তাহার মূলে আছে খাঁটি humanity বা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, — অর্থাৎ 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই ঋষিবাক্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। এ কাব্যে পঙ্কজের পঙ্কও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে — সেজন্য পঙ্কের পঙ্কত্বকে অস্বীকার করিতে হয় নাই। এ যুগের বাংলা কাব্যে কবির দৃষ্টি সতীর অসতী-অপবাদ মোচন করিয়াছে; তাহাতেও দেহ হইতে আত্মার পৃথক শুচিতা রক্ষা করিয়াই পতিতা নারী সতীশিরোমণি হইতে পারিয়াছে। ঐ শুচিতার সংস্কারই চিরন্তন আধ্যাত্মিক সংস্কার — সে সংস্কার খাঁটি 'humanity'র বিরোধী। বাঙালীর যে বিশিষ্ট সাধনার কথা বলিয়াছি, তাহার নাম দিতে হইলে, এই humanity-তত্ত্বকেই সহজের তত্ত্ব বলিতে হইবে — উহাও প্রকৃতিপন্থী, তান্ত্রিক। সাধারণ ভাষায় আমরা যাহাকে শাক্ত ও বৈষ্ণব বলি, কবিয়ালের চরিত্রে সেই দুই ভাবেরই আশ্চর্য্য লুকাচুরী রহিয়াছে, তাহার রক্তে যেন দুই বিপরীত ধারা একসঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। যে পরিপূর্ণ প্রীতির বলে তাহার প্রাণের প্রসার ঘটিয়াছে, সেই প্রীতি অগ্নিশিখার স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যায় নাই; তাহার রক্তের উগ্রতা সেই অগ্নির উগ্রতাকেও পরাস্ত করিয়াছে — উহাই তাহার শক্তিসাধনা। কিন্তু তাহার বৈষ্ণব-সাধনাই ঐ শাক্ত-সাধনায় যুক্ত হইয়া এমন সিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। ইহাও কোন বিশেষ মন্ত্রের সাধনা বা আশ্রমচর্য্যার ফলে হয় নাই। বাঙালীর জাতিগত প্রতিভায় যাহা বহুদিন অঙ্কুরিত হইয়াছে — যাহাকে একদা এক মহা-প্রতিভা আপন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া, একটা বিশেষ সাধন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল —

ইহা সেই আদিম বাঙালী-সংস্কার। এ সাধনা বৈষ্ণব না শাক্ত ? — সে প্রশ্নের উত্তর ঐ কবিয়ালের জীবন-সাধনা হইতেই পাওয়া যাইবে, কোন শাস্ত্রের সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন। উহা একাধারে শাক্ত ও বৈষ্ণব — উহাই তান্ত্রিক।

এই উপন্যাসের সম্পর্কে আরও একটি কথা আমার মনে হইয়াছে — আমাদের কথা-সাহিত্যে পুরুষ-চরিত্র তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, এমনই একটা অপবাদ আছে। কিন্তু এই উপন্যাসে সেই ধারণা বিচলিত হয়। আমার মনে হয়, ঐ অপবাদ সম্পূর্ণ সত্য না হইতেও পারে। একালে আমাদের পৌরুষের ধারণাই য়ুরোপীয় আদর্শের দ্বারা একটু বেশিমাত্রায় প্রভাবিত হইয়াছে। একথা সত্য যে, সাধারণ জীবনে, আমাদের সমাজে ও সংসারে, পুরুষের যে-চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা একরূপ অ-পুরুষই বটে। কিন্তু পৌরুষের যে আর একটি আদর্শ আছে তাহা আমাদের কথাকাহিনীতে ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই, ইহার একটা কারণ, একটি বিশেষ রসের প্রতি আমাদের পক্ষপাত ; দ্বিতীয় কারণ — ঐ পাশ্চাত্য আদর্শের গৌণ প্রভাব। পৌরুষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যদি ইহাও হয় যে, সকল অপরাধ সকল পাপকে সে ক্ষমা করিতে পারে ; নীলকণ্ঠের মত সকল বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়াও ওষ্ঠে করুণার সুধা-হাস্য কখনো হারায় না ; ঝড়কে বক্ষ-কপাট উন্মুক্ত করিয়া দেয় — তাহার পূর্ণবেগে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াও অটল ও অবিচলিত থাকে ; সে এমনই একটি জ্ঞান বা বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাহা শক্তিরই আরেক রূপ ; — তবে ঐ নিতাই-কবিয়ালের চেয়ে কাহারও পৌরুষ বড় নয়। সে পৌরুষ একটা পূর্ণতর শক্তির পৌরুষ বলিয়াই তাহা এমন স্তব্ধ ; তাহার কোন কীর্ত্তি নাই, কোন দুরন্তপনা নাই। আবার, রাজা-মহারাজা, বীর বা রাষ্ট্রনায়ক নয় বলিয়া তাহার পৌরুষ যদি তুচ্ছ হয়, তবে মানুষ বলিয়াই মানুষের কোন মূল্য নাই — 'সবার উপরে মানুষ সত্য', একথাও মিথ্যা।

'কবি'-উপন্যাসখানির এই যে বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহার কারণ, তারাশঙ্করের এই রচনাটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করি. কেন, আমার পক্ষ হইতে তাহার একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন ছিল। আমি জানি, বাংলার পাঠক-পাঠিকাগণ যেমনই মনে করুন — 'বড়-বড়' সাহিত্যিক, তথা সমালোচকেরা আমার এ কথায় সায় দিবেন না। কিন্তু এই সমালোচনা উপলক্ষ্যে,

আমি কেবল ঐ একখানি .উপন্যাসেরই আলোচনা করি নাই, বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার একটা ধারা নির্দ্দেশ করাও আমার অভিপ্রায়। বাংলাসাহিত্যও যেমন 'সাহিত্য', তেমনই বাঙালীর সাহিত্যও বটে; ইহার মূল্যনির্ণয়ে কেবল আর্টের মাপকাঠি ধরিয়া থাকিলেই চলিবে না, জাতির আত্মার যে অভিব্যক্তি সাহিত্যেও অনিবার্য্য তাহার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। কারণ, ইহা একটি স্বীকৃত সত্য যে, আর সকল কলাশিল্পের মত, সাহিত্যও — 'expressive of the soul of the country'; যে সমালোচকের সে দৃষ্টি নাই তাঁহার সকল পাণ্ডিত্যই নিষ্ফল; ঐ দুইয়েরই একত্র প্রয়োগের অভাবে বাংলাসাহিত্যের সমালোচনা পঙ্গু হইয়া আছে।

[পৌষ, ১৩৫৪]

অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা

১

সম্প্রতি বাংলা কাব্যে একটি নূতন ছন্দের আমদানি হইয়াছে, এবং সাহিত্যের নূতন-বাজারে তাহার বিজ্ঞাপনের পটহ-নাদ শুনা যাইতেছে। এই ছন্দের নাম হইয়াছে 'গদ্যচ্ছন্দ'। নাম হইতেই বুঝা যায় ইহার জাতি-নির্ণয় এখনও ঠিক মত হয় নাই। কারণ 'গদ্যচ্ছন্দ' ও 'সোনার পাথর-বাটি' একই ধরণের কথা। ছন্দ শব্দটির শাস্ত্রসম্মত অর্থ—ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'মেজার' (measure)। গদ্যের একটা 'রিদম্' (rhythm) থাকিতে পারে, কিন্তু 'মেজার' নাই। গদ্যের বাক্য-রচনায় অন্বয়-সম্ভূত ধ্বনিপ্রবাহ আছে, কিন্তু তাহা ছন্দ নয়; একজন সমালোচক তাহাকে 'দি আদার হার্মনি' বলিয়াছেন। এই 'হার্মনি' গদ্যের জন্মদিন হইতে ক্রম-পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু 'গদ্যচ্ছন্দ' নামে আধুনিক কালে যাহা ঘোষিত হইতেছে তাহা ছন্দ তো নয়ই—অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'রিদ্‌ম্'ও নয়।

তবে উহা কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আধুনিক বিনি-ছন্দের কবিতার একেবারে গোড়া ধরিয়া টান দিতে হয়। এই সাহিত্যের প্রেরণা যে খাঁটি কাব্যরসের প্রেরণা নয়, একথা এই যুগেরই রসিকসমাজ বার বার বলিয়াছেন। কিন্তু শোনে কে? যাঁহারা আধুনিকত্বের দাবী করেন, তাঁহারা বলেন,—প্রাচীন কালে (অর্থাৎ, ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগে) মানুষ যাহা ছিল আজ সে আর তাহা নয়। সে-যুগের সুখ-দুঃখ, আশা-বিশ্বাস এ-যুগের তুলনায় বালকোচিত ও হাস্যকর; তাহারা সারাজীবন—পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের বেত্রাধীন পড়ুয়ার মত—ধর্ম্ম, পরকাল ও ভগবানের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। আজ মানুষ সাবালক হইয়াছে, তাহার চোখ খুলিয়াছে—কাল্পনিক নরকের মত কাল্পনিক স্বর্গও আজ উবিয়া গিয়াছে। ভূত, ভগবান ও প্রেম—একই পর্য্যায়ের কুসংস্কার; ধ্রুবত্ব বা পূর্ণতার কোনও মনঃকল্পিত আদর্শ তাহাকে আর প্রবঞ্চিত করিবে না। যাহা গোচর তাহার অন্তরালে কোনও অগোচর, যাহা বাস্তব তাহার অতিরিক্ত কোনও তত্ত্বঘটিত অবাস্তব, যাহা তথ্য তাহার ইঙ্গিতস্বরূপ

কোনও বৃহৎ সত্য, যাহা খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট তাহারই আশ্রিত কোনও অখণ্ড-মণ্ডল—সে আর স্বীকার করিবে না। সৃষ্টির অন্তরালে কোনও রহস্য নাই; অর্থাৎ এমন কিছু নাই যাহা থাকিয়াও দুর্জ্ঞেয়। যাহা আছে তাহা সম্মুখেই আছে, এবং তাহা মানুষের মনকে উত্তেজিত করে মাত্র (মন ছাড়া আর কিছু নাই); তাহাকে প্রশ্নকাতর ও সংশয়াকুল করিয়া তোলে; সে প্রশ্নের—সে সমস্যার সমাধান নাই,—কেবল আছে একটা আদি অন্তহীন, অর্থহীন, ন্যায়নীতি ও আদর্শহীন মহাকোলাহল। মানুষ কেবল প্রশ্ন করিবে, জবাব প্রত্যাশা করিবে না—অসংলগ্ন তথ্যরাশি স্তূপাকার করিয়া প্রত্যেকটির উপরে একটি প্রশ্ন-চিহ্ন আঁকিয়া দিবে।

এই অতি-আধুনিক জীবন-চেতনাকে জীবন-রস-রসিকতা বলিলে ভুল করা হইবে; কারণ, রসিকতার লক্ষণ ইহা নহে। মানুষ বাস্তবকে কখনও অস্বীকার করে নাই। বস্তু-জিজ্ঞাসা ও বাস্তব-বাদ মানুষের রক্তমাংসেরই ধর্ম্ম; অতএব এ ধর্ম্ম পৃথিবীতে নূতন নয়,—বরং শাশ্বত সনাতন। ইহাই জীবধর্ম্মের নিদান। এই ধর্ম্মেরই প্ররোচনায় মানুষের চরিত্রে ও জীবনযাত্রার আদর্শে মোটামুটি তিনটি রূপভেদ দেখা যায়—জ্ঞান-শক্তির বৈরাগ্য, প্রেম-শক্তির রস-পিপাসা ও কর্ম্ম-শক্তির ভোগলিপ্সা; এই তিনের অবশ্যই নানা রূপ-সঙ্কর আছে, তাহারও অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে। কিন্তু শক্তি ও স্বাস্থ্য যেখানে অটুট, সেখানে এই তিনের রূপভেদ স্পষ্ট চোখে পড়ে। আধুনিক মানুষ শক্তি ও স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, তাই শক্তিহীন জ্ঞান, শক্তিহীন প্রেম, ও শক্তিহীন কর্ম্ম তাহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছে। কোনও একটার প্রাবল্য না থাকায়, এই তিনেরই নিম্নভূমির সাম্যাবস্থা তাহার আত্মচেতনাকে দুর্ব্বল করিয়া সংশয়-বিমূঢ় ও নাস্তিক করিয়া তুলিয়াছে। সে পৃথিবীকে—জীবনকে ভালবাসে; কিন্তু সে-ভালবাসায় রসিকের সংশয়মুক্তি নাই, কারণ তাহার প্রেম শক্তিহীন; তাহার জ্ঞানও মস্তিষ্কপীড়া মাত্র—আত্মচেতনার সহায় নয়, তাই তাহার প্রেমও ব্যাধি হইয়া দাঁড়ায়। আবার, ইহার সঙ্গে যদি ভোগস্পৃহার কর্ম্মশক্তি দুর্ব্বল কামনায় মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে—ভোগ্য বহির্বস্তুকে কর্ম্মপ্রতিভা বা সবল অহংচেতনার দ্বারা স্ববশে আনিবার সামর্থ্য না থাকে, তবে অবিশ্বাসের আত্ম-দ্রোহ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক কালে মানুষের এই অবস্থা—অর্থাৎ

ওই তিন শক্তির নিম্নতলের তামসিক সাম্যাবস্থা ঘটিবার বহু কারণ আছে। এ-যুগে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত নরনারীর সংখ্যাই অধিক, তাই এইরূপ মনোবৃত্তিই আধুনিকতার একটি লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, ইহা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধান্য মাত্র,—নতুবা, ইহা নূতনও নয়, অসাধারণও নয়। আজ ইহা যে-ভাবে ও যতদিকে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাই নূতন, এবং তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, সকল যুগের মত এ যুগেও প্রকৃত রসিকের সংখ্যা খুবই অল্প,—কিন্তু শ্রোতা বা পাঠকের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় তাহাদের মনোমত লেখকের সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে।

সত্যকার রসপ্রেরণা, জীবন-চেতনাকে আশ্রয় করিয়াও, তাহাকে উত্তীর্ণ হইয়া বিরাজ করে। রস-পিপাসার যে প্রেম তাহা সকল বিরোধ, সকল স্বার্থ ও সকল সমস্যাকে জয় করিতে পারে বলিয়াই – মানুষের সে একটি দিব্যশক্তি; তাহা বন্ধনমুক্তি নয়—বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি। এইরূপ মুক্ত হইবার শক্তি যাহার নাই সে কবিই নয়। সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব নয় বলিয়া—নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে কবিত্বঞ্চ সুদুর্ল্লভং। এ-যুগের কবিযশঃপ্রার্থী যাঁহারা, তাঁহারা কবিত্বের উপরে নরত্বকে স্থান দিবার পক্ষপাতী; কিন্তু নরত্বের মহিমা উপলব্ধি করা এবং নরমাত্রকেই দেবত্বের আসনে স্থাপিত করা এক বস্তু নহে। জগতের যাঁহারা শ্রেষ্ঠকবি, তাঁহারা নরত্বের অগাধ অসীম মহিমাসাগরে স্নান করিয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছেন; কিন্তু সে সাগর বিচ্ছিন্ন কূপ-পল্বলের সমষ্টি নয়। তাহার উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-চূড়া হইতে নিম্নতম গহ্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদের রসদৃষ্টি সমান সঞ্চরণ করিয়াছে—নরলীলার অনন্ত বিচিত্র রূপ তাঁহারা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা মানুষকে অবস্থার দাসরূপে দেখেন নাই—সর্ব্ব অবস্থায় মানুষকেই দেখিয়াছেন। দেখিবার এই ভঙ্গিই কবিশক্তি, ইহাই কবি ও কাব্যকে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ববাদের অধীন করিয়াছে। এই তত্ত্বকে আদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেও অস্বীকার করিতে পারে নাই।

আজ সাহিত্যে যে নব-আদর্শের ঘোষণা হইতেছে, তাহা এই তত্ত্বকেই স্বীকার করে না। অতি-আধুনিক সাহিত্যে যে-বস্তুর আত্যন্তিক অভাব লক্ষ্য করা যায়—তাহা মানুষের নিজেরই সৃষ্টি-শক্তির অভাব। সৃষ্টিকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাকে জেরা করা, তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া আত্ম-অপরাধক্ষালন,

অথবা, কাহারও অপরাধ নয় বলিয়া আত্ম-অপরাধও অস্বীকার করা—ইহাই যেন এ সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি। ইহাতে স্বীকার করা হয়, মানুষ প্রকৃতিরই অধীন, এবং যেহেতু জড়প্রকৃতির মূক ওষ্ঠে কোন কিছুর জবাব মেলে না—সেই হেতু মানুষেরও কোন প্রকার জবাবদিহি নাই। অতএব প্রকৃতি-শাসিত জীবনের অমীমাংসিত সমস্যাই সাহিত্যের উপজীব্য! এতকাল এই সৃষ্টির উপরেও মানুষ যে সৃষ্টি করিয়াছে—যে-সৃষ্টিতে জড়ের উপরে চিৎ জয়ী হইয়াছে, সে সৃষ্টি যে-শক্তির দ্বারা সম্ভব, তাহা ইহাদের অজ্ঞাত। ইহা কোনও মতবাদের কথা নয়, অপরোক্ষ উপলব্ধির বিষয়; ইহা যে-ধরণের কালচার বা চিত্তশুদ্ধির ফল, আজিকার দিনে তাহা যদি দুর্লভ বা অসম্ভব হয়, এবং সেই কারণে কাব্যরচনাও যদি ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু অশক্তিকে শক্তি বলিব কেন? যাহা কাব্য নয় তাহাকে জোর করিয়া কাব্য বলি কেন?

২

উপরে যাহা বলিয়াছি তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি অতি-আধুনিক সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখকের লেখা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। সাহিত্যে এরূপ রচনারও স্থান আছে—মানুষের মনের ইতিহাসের উপকরণ-হিসাবে। মানব-মহানাটকের কোন বিশিষ্ট রস-রূপ ইহাতে নাই, বরং সেই নাটকের অন্তর্গত পাত্রবিশেষের মুখনিঃসৃত খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বাক্যহিসাবে এগুলির কিছু মূল্য থাকিতে পারে। কথাগুলি এই—

মানুষের মানে চাই—
গোটা মানুষের মানে!
মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হায়রান হ'ল—
এবার চাই মানুষের মানে,
নইলে সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা হয় না!

* * *

মানুষের মানে চাই!
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর মোছা চলেছে?

লেখক মানে চান—সৃষ্টির মানে চাই, তাই মানুষের মানেটা আগে দরকার। কিন্তু মানুষ বিধাতার নিজেরই একটি জিজ্ঞাসা—মহাকালের পাতায় তার অর্থ লেখা আর মোছা হইতেছে, অর্থাৎ, সে অর্থ কখনও সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এ ব্যাপার কাব্যের পক্ষে অব্যাপার; এ জিজ্ঞাসা দর্শনের; কাব্যের কোন জিজ্ঞাসা নাই, তাই কাব্যপ্রেরণা-হিসাবে ইহা মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। আবার, লেখকের দার্শনিকতা কাব্যের ভঙ্গি করিতে গিয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি 'গোটা মানুষে'র অর্থ চান—শুধুই 'কাফ্রী ক্রীতদাস', 'হারেমের খোজা' 'ল্যাংড়া তৈমুর', 'হূন আত্তিলা', বা বুদ্ধ-খৃষ্টের মানে নয়,—চাই গোটা মানুষের মানে। এই 'গোটা মানুষ' কি?—যে-মানুষ একাধারে ব্যক্তি এবং ব্যক্তি নয়, তাহার ব্যক্তি-সত্তার তুচ্ছতাই সর্ব্বব্যক্তি-মহিমায় উজ্জ্বল হওয়া চাই। ইহার অবশ্য কোনও অর্থ হয় না—তবু অর্থ চাই!

যে-'মানে' হয় না, সেই 'মানে'-চাওয়ার অর্থ এই যে, কোনও 'মানে'তেই তাঁহার রুচি নাই। কারণ, জীবনকে কোনও নীতি বা তত্ত্বের বাঁধনে বাঁধিয়া লইতে তিনি নারাজ। অতি-আধুনিক পথের পথিক যাহারা, তাহারা জীবনের কোনও অর্থ জানিতে চায় না; তাহাদের কোনও গুরুমশাই নাই, এবং অর্থহীন বলিয়া কোনও কিছুকে তাহারা অপকৃষ্ট মনে করে না। তাহারা মানে চায় না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে কিছু বুঝে—এমন স্পর্দ্ধাও তাহাদের নাই। লেখক বলেন—

"আমরা স্বীকার করব না কি যে, সে উপলব্ধি আমাদের কত ক্ষীণ! নিজেকে অপরকে আমরা কতটুকু বুঝি? তবে যেটুকু চিনি আমরা অকপটচিত্তে বলি। ** আর সমস্ত বলার আড়ালে থাকবে একটি প্রচ্ছন্ন বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন। এটুকু আমাদের দুর্ব্বলতা, আমরা যে মানুষ!"

"আমরা নব-উন্মীলিত দৃষ্টি দিয়ে জীবনের যাত্রা দেখব, আর বলে' যাব।"

সে দেখা আর বলা এই রকম—

ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে একটি ঘাসের গুচ্ছি অনেকদিন
জীবনের জন্য যুঝেছিল—
প্রতিদিন দেখতাম কী তার প্রাণান্ত প্রয়াস একটি পুষ্পিত
প্রশাখা প্রসারিত করবার জন্যে!
একদিন বুঝি একটি ফিকে বেগুনিরঙের ছোট্ট ফুল ফুটেছিল,
কিন্তু মূল তখন দেউলে হয়ে গেছে;—সব শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেল।

পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখি নিষ্কলঙ্ক শিশুর দল
ক'টা ইঁদুর ছানা ধরে'
তাদের বলি দিয়ে উল্লাস করছে—কি সরল পৈশাচিকতা।
সৃষ্টির মূলেই যে নির্ব্বিকার নির্ম্মমতা।
দেখি, মৃত্যুর শিয়রে-নেওয়া চির-বিলাপের শপথ শাপ হয়ে ওঠে,
শুনি, বৃদ্ধ তার যৌবনের প্রেম নিয়ে পরিহাস করছে!
জীবনকে ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।
চীৎকার ক'রে বলি,
ভগবান যদি না থাকে ত' সৃষ্টি হোক্, আমি অভিসম্পাত দেব!"
হায় দুর্ব্বল মানবক!

উপরের এই সকল বচন হইতেই আধুনিক মনের ভঙ্গি ও প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র অতি-আধুনিক সাহিত্যের একজন মনস্বী লেখক, ও সমর্থনকারী apologist ; তাঁহার কথাগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছি—এগুলি ১৩৩৩ সালের 'কালিকলম'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যেমন অর্থের উপর আস্থাহীন, তেমনই তাঁহার কথাগুলির অর্থও খুব স্পষ্ট নয়। এই যে মনোবৃত্তি, ইহা কবি-মনোবৃত্তি নহে; কারণ, কোন-কিছুর মানে করিতে না চাহিলেও—জিজ্ঞাসা ইহাতে আছে; নাস্তিক্য-বাদও একটা সিদ্ধান্ত—একটা বিচারবিতর্কমূলক তত্ত্ব। এই 'অর্থ চাই না' যদি রসাবেশ-মূলক হইত, তবে ইহাকে কবিধর্ম্ম বলা যাইত। কারণ, জিজ্ঞাসা যেখানে উন্মুখ নয়, একেবারে স্তম্ভিত,—অর্থ-অনর্থের দ্বন্দ্ব যেখানে এক অপূর্ব্ব চেতনায় লয় হইয়া যায়, সেইখানেই কাব্য-সৃষ্টি হয়; এবং কাব্য অপরা সৃষ্টি, সে সৃষ্টির যিনি বিধাতা তাঁহার কোনও কৈফিয়ৎ থাকে না। অর্থ চাই না, অথচ মানস-বৃত্তি খুবই সজাগ—এ অবস্থা সুস্থ অবস্থা নয়। শেষের উদ্ধৃত পংক্তি-কয়টিতে লেখক উচ্চকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন—সে কথা গদ্য-কবিতার আকারে নূতন বটে, কিন্তু কথাহিসাবে অতি পুরাতন। তথাপি, সৃষ্টির এই 'সরল পৈশাচিকতা' ও 'নির্ব্বিকার নির্ম্মমতা' মানুষকে অপদস্থ করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এই নিদারুণ নির্ম্মমতাকেই রসরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন—জীবনের সুখ-দুঃখের তিনিও কোনও অর্থ করেন নাই। মানুষ যে কত দুর্ব্বল, 'গোটা মানুষে'র চেহারা যে কি, তাহা তিনি দুই চক্ষু পূর্ণ-উন্মীলিত করিয়াই

দেখিয়াছেন ;—'মানুষের মানে' তিনি চান নাই, কারণ প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু প্রকৃতি-পীড়িত মানুষের এই অসহায়, নিরুপায় অবস্থা সত্ত্বেও তিনি মানুষের আত্মাকে অবিশ্বাস বা অসম্মান করেন নাই। ভগবানকেও দায়ী করেন নাই, 'দুর্ব্বল মানবক' বলিয়া মানুষকেও কৃপা করেন নাই, কারণ তিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা,—ভগবানের দোসর এবং শয়তানেরও সখা। আমাদের দেশেও এই 'সরল পৈশাচিকতা' উচ্চ সাধন-মার্গের সহায় হইয়াছে ; মানুষ ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই।

কিন্তু অতি-আধুনিক সাহিত্যের মতবাদী লেখক এ কথায় সন্তুষ্ট হইবেন না ; কারণ—কবি, সাধক বা বীর হইলেই চলিবে না—তাঁহার 'গোটা মানুষ' চাই। এই 'গোটা মানুষে'র অখণ্ড অধিকারে প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষকে বসাইতে হইবে ; অথচ, এইরূপ ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন মনুষ্য-জীবনে কেবল খণ্ডতাই আছে, অখণ্ডতা নাই—এবং তাহাই একমাত্র বাস্তব সত্য ; অতএব, জীবনের কোনও অর্থ হইতে পারে না, উহা একান্তই দুর্ব্বোধ এবং জটিল। এ অবস্থায় কবি সাহিত্যিকেরা কি করিবেন ?—তাঁহারা কেবল দেখিবেন ও বলিয়া যাইবেন ; এবং সেই বলার আড়ালে একটি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন থাকিবে। একখানা খাতায় কেবল যাহা ঘটিতেছে তাহাই নোট করিয়া লইবেন—তথ্যের সত্যনিষ্ঠা থাকিবে, এবং তাহা কেবল তথ্যসমষ্টি বলিয়াই তাহাতে একটা মহা-শূন্যবাদের হাহাকার ও নৈরাশ্য—উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম, উদ্‌ভ্রান্ত-জ্ঞান ও উদ্‌ভ্রান্ত-চরিত্র-নীতি প্রকট হইয়া উঠিবে। ইহাই অতি-আধুনিক কাব্য।

৩

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহারা কি বাহিরে কি ভিতরে—কোথায়ও সৃষ্টির তত্ত্বকে স্বীকার করে না। মানুষের অন্তরে যে একটি আদর্শ আছে, যেখানে প্রতিফলিত হইয়া বাহিরে সব-কিছু অর্থবান বা মণ্ডলাকার হইয়া উঠে—আত্মার শক্তিতে বাহিরের অনাত্মা বশীভূত হইয়া একটি অখণ্ড চিন্ময় স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হয়—সে বিষয়ে ইহারা নাস্তিক। "আমরা জীবনের যাত্রা দেখব আর বলে যাব"—অর্থাৎ, ইহাদের অন্তরে কোনও সৃষ্টিক্রিয়া থাকিবে না ; ইহারা কেবল দেখিবে, বাহির নিজেকে যেমন দেখাইবে তেমনই

দেখিবে, সে দেখায় কোন অন্তরের দৃষ্টি থাকিবে না। যে-দৃষ্টিতে সর্ব্ব দ্বন্দ্ব দূর হয়—আত্ম ও অনাত্মের মহাযোগ-সাধন হওয়ায়, বিশেষ (Particular) বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াই এক মহা নির্ব্বিশেষের (Universal-এর) অপরোক্ষ উপলব্ধিতে সত্য-সুন্দর হইয়া উঠে—সেই কবিদৃষ্টির কোনও ধারণাই ইহাদের নাই। অতএব ইহারা কাব্য-বিদ্বেষী, ইহারা রসের ব্যাপারী নহে।

এই দৃষ্টি ইহাদের নাই বলিয়াই ইহাদের ভাষাও যেমন বস্তুগত, তেমনই ইহাদের রচনায় কাব্যের সুবলয়িত ছন্দ-সুষমারও প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ ইহাদের লেখায় ছন্দ থাকিলেই তাহা মিথ্যাচার হইত। "To see deep enough is to see musically"—সেই দৃষ্টি যেখানে নাই, সেখানে ছন্দ আসিবে কোথা হইতে? সুস্পষ্ট রূপসৃষ্টিতে ছন্দ কখনও অবান্তর হইতে পারে না। গাছের যে-ফুলটির পাপড়ি-পরিবেশ নিখুঁত মণ্ডলাকারে সুসম্পূর্ণ, সেইটির মধ্যেই তাহার পুষ্প-প্রাণ যেমন পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে, তেমনই, কবির অন্তরে কোনও রসবস্তু যদি সম্যক ধরা দিয়া থাকে তবে তাহার বাণী-সুষমা ছন্দকে বর্জ্জন করিয়া নিখুঁত হইতে পারে না। তাই বলিয়া এ কথাও সত্য নয় যে, ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই কবিতা। ছন্দ শুধুই বাক্যের অলঙ্কার নহে, নির্ভুল মাত্রাবিন্যাসের ধ্বনিসৌষ্ঠবই কাব্য নয়। রস যখন বাক্যে রূপ-পরিগ্রহ করে তখন সেই রূপের অন্তরঙ্গ উপাদানরূপেই ছন্দের আবির্ভাব হয়; কবির চিত্তে যাহা একবৃন্তধৃত শতদলের মত প্রকাশিত হইয়াছে, বাক্যেও তাহা বৃন্তধৃত, অর্থাৎ ছন্দোময় হইয়া উঠে। এই জন্য গদ্য যতই কাব্য-ঘেঁসা হউক, তাহার রস কাব্যরস হইতে স্বতন্ত্র। গদ্য-কাব্য, কাব্য ও সঙ্গীত, এই তিনের মধ্যে রসসৃষ্টির পার্থক্য আছে। গদ্যে রস থাকিলেও তাহা বাক্য-প্রধান। ভাষা-মাত্রই বস্তুবিজ্ঞানমূলক শব্দসমষ্টি। গদ্য যতই ভাবময় হউক, তাহাতে বস্তুর প্রতি পক্ষপাত আছে, তাই গদ্যকাব্যে ভাবের সুর ছন্দ-সুষমায় সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বস্তু ও ভাবের মধ্যে রসের একাত্মতাই কাব্যসৃষ্টির কারণ—ভাব ও রূপের ঐকান্তিক মিলনেই ছন্দের জন্ম হয়। আবার ভাব যখন একেবারে বস্তুবর্জ্জিত হইয়া প্রাণের অতি-সূক্ষ্ম উৎকণ্ঠারূপে অবস্থান করে, তখন তাহা ভাষাকেও ত্যাগ করিয়া সঙ্গীত-রূপ ধারণ করে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, রসের রূপসৃষ্টিহিসাবে কাব্যের স্থান সকলের উপরে।

কিন্তু ভাবোদ্দীপনার স্থরময় গদ্যও নয়—যেহেতু ইহাতে রস-স্থষ্টির বালাই নাই, এবং ভাষাও সর্ব্বশ্রী-বর্জ্জিত—'রিদম্'ও নয় ছন্দও নয়,—অতএব, এই সকল রচনা যে কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিবে কে? আমি শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের গদ্য-কবিতার কথাই বলিতেছি না, তাঁহার রচনা শক্তিহীনের রচনা নয়, যদিও তাহাকে কাব্য বলিব না; আমি অতি-আধুনিক কবিদের কথাই বলিতেছি। তাঁহাদের কবিতার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ কবিতাকে একজন বিলাতী সমালোচক 'cup and saucer'-কবিতা বলিয়াছেন, বাংলায় আরও ভাল নাম দেওয়া যাইতে পারে, ইহাকে 'বিড়ি ও দেশলাই'-কবিতা বলিলে ইহার স্বরূপ ও ভঙ্গি আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভাষার জাতি ও গোত্র, অভিধান, ব্যাকরণ, গদ্য ও পদ্য, ছন্দ ও মিল প্রভৃতি যত দুর্দ্দৈব ছিল—তাহা আর কাব্যরচনার বাধা হইতে পারিবে না। এ কবিতার ভাষাবস্তু অতিশয় সুলভ ও সার্ব্বজনীন—একটা বিড়ি মাত্র; উদ্দীপনাও অতি সহজে হইয়া থাকে—একটা দেশলাই-কাঠির ওয়াস্তা। আগে কাব্যরস সকলে উপভোগ করিতে পারিত না, এজন্য রসিক ও বেরসিক—ভেদ ছিল। এখন, যেমন লেখকমাত্রেই কবি, তেমনই পাঠকমাত্রেই রসিক—রসের এক মহাযান-সম্প্রদায়ে সকলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আধুনিক ইউনিভার্সিটির কল্যাণে এখন যেমন সকলেই গ্রাজুয়েট, কাহাকেও মূর্খ বলিবার জো নাই, তেমনই আজ দেশে রসিক নয় কে? এ যুগে যে কারণে 'মর‍্যালিটি' একটা কুসংস্কার মাত্র, কাব্যরসও ঠিক সেই কারণে একটা সার্ব্বজনীন সহজিয়া-সংস্কার।

[কার্ত্তিক, ১৩৪৩]

বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক

১

আধুনিক যুগ সাহিত্য-রসের যুগ নহে; কেন নহে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন। ইহা লইয়া দুঃখ করিবার কারণ থাকিলেও তাহাতে লাভ নাই। দেহের পক্ষে পথ্যাভাব, এবং মনের পক্ষেও নানা কুপথ্যের প্রাচুর্য্যে, এ যুগে যে-সকল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে সাহিত্য মাথায় উঠিয়াছে,—বুকের কাছে আর টিকিয়া থাকিবার জো নাই। যাঁহারা, 'Render unto Cæser what is Cæser's due'—এই আশ্বাস-বাক্যে বাস্তবের সহিত রফা করিয়াই রসের স্বর্গরাজ্যে বাস করিবার আশা রাখেন, তাঁহারা হয়তো এখন সংখ্যায় আরও অল্প; এবং বোধ হয় সেই কারণেই, যাহারা 'শিশ্নোদর' ছাড়া আর কিছুই মানিবে না, এবং যাহাদের সংখ্যা এ যুগে ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, তাহারা এই রসব্রহ্মের পূজারীদিগকে কেবলমাত্র ভোটের জোরে পিষিয়া শেষ করিতে চায়। সত্য কোন্ পক্ষে, ন্যায় কোন্ পক্ষে, ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে—আজিকার রাষ্ট্রনীতিতেও সে-প্রশ্নের মীমাংসা যে-ভাবে হইয়া থাকে—অর্থাৎ, একমাত্র দেখিবার বিষয় কোন্ পক্ষ সংখ্যায় বা জড়শক্তিতে প্রবল, তেমনই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিকের কথা গ্রাহ্য নয়; যাহারা সংখ্যায় অধিক সেই শিশ্নোদরপরায়ণ জনমণ্ডলী রসের যে নূতন অর্থ করিবে, তাহাই পণ্ডিত-মূর্খ রসিক-বেরসিক-নির্ব্বিশেষে সকলকে মানিয়া লইতে হইবে, এবং ব্যাস-বাল্মীকি হইতে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ—বেদ-উপনিষদের ঋষি হইতে আধুনিক মন্ত্রদ্রষ্টা পর্য্যন্ত—সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া, 'প্রগতি' নামক একটি অনার্য্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া, ভদ্রবেশী বর্ব্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে।

যুগধর্ম্ম তাহাই বটে, এবং তজ্জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। জীবনের সহিত রসের যে আত্মিক সম্বন্ধ, তাহা এ কালে রক্ষা করা বড়ই দুরূহ; এমন কি রসিকজনের পক্ষে যেখানে-সেখানে সেই রস নিবেদন করিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে। কিন্তু একটা বিষয় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়; রসকে যাহারা

স্বীকার করে না, তাহার সেই ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে শিবির-সন্নিবেশ করিতে তাহারা এতই অনিচ্ছুক কেন? গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর রসিক-সমাজ যে-বস্তুকে যে-নামে ও যে-রূপে সাক্ষাৎ করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে, এবং উপভোগ করিয়াছে, তাহা যদি একালে একান্তই অচল হয়, তবে এই নূতন দেশ এবং কালের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন নামে একটা নূতন বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলে তো আর কোনও বাদ-বিসম্বাদের কারণ থাকে না। কিন্তু 'প্রগতি'র মতলব তাহা নয়,—সেই সাহিত্যেরই বুকের উপরে বসিয়া, সেই রসেরই জাত মারিয়া, আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে হইবে, নতুবা ভূঁইফোঁড় হওয়ার একটা অসুবিধা আছে। অতএব জোর গলায় ঘোষণা করা চাই যে, 'প্রগতি'ও রসের প্রগতি; রস এতদিন বদ্ধ অবস্থায় ছিল, আমরা তাহাকে—'every aspect of life' জুড়িয়া, অর্থাৎ নালা-নর্দ্দমা পর্য্যন্ত—মুক্ত-ধারায় বহাইয়া দিয়াছি। যাহারা অতীতকালের অপ্রগতি-জনিত মধুদুগ্ধ-পিপাসাকেই রসপিপাসা বলিয়া মনে করে, তাহারা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে নাই,—চা খাইতে শেখে নাই। আড়াই হাজার বৎসরেও মানুষের যে যৌবনলাভ ঘটে নাই, বিংশশতাব্দীর একপাদ পূর্ণ না হইতেই সেই যৌবন উপস্থিত হইয়াছে; এত যুগ, এত জাতি ও এত বিভিন্ন ভঙ্গির কাব্যসাহিত্যে যে-রসের শাশ্বত ভিত্তি টলে নাই, আজ সহসা তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে। যদি ফুরাইয়াই থাকে, তবে তাহা লইয়া এত লাফালাফি কেন?

পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে স্থির হইয়া নাই, এই প্রগতিতত্ত্ব তো বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হইয়াছে। স্থির-পরিণাম অপেক্ষা গতিই যে শ্রেষ্ঠতর, রূপের জড়-সমাপ্তি অপেক্ষা ভাবের অনিয়ত চিৎ-প্রেরণাই যে মহত্তর,—এইরূপ চিন্তা বা দার্শনিক মতবাদ তো বহুকাল প্রচলিত আছে। তথাপি এইরূপ মতবাদ সত্ত্বেও সেই প্রাচীন রসবাদ কাব্যে ও কলা-শিল্পে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চিরদিন সকল-নিয়মের ঊর্দ্ধে আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আধুনিক প্রগতিবাদীর দল এমন কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, এমন কোন্ অজ্ঞাত সত্যের সন্ধান দিয়াছে, যাহার ফলে মানুষের আত্মা একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইতে বাধ্য হইবে?

আসল কথা, এই 'প্রগতি'র ধ্বজাধারিগণ এতদিন ঐই ভূমগুলেই অন্য নামে

পরিচিত ছিলেন; বিদগ্ধ রসিক-সমাজও যেমন সকল দেশে সকল কালেই ছিল ও আছে, এই পণ্ডিতম্মন্য অসভ্য বর্ব্বরেরাও তেমনই সকল যুগে সকল সমাজে বিদ্যমান ছিল। আজ যুগধর্ম্মের সুযোগে—মানব-সভ্যতার এই অতিশয় সঙ্কটময় দুর্দ্দিনে—ইহারা, এই রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা, জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল সুরু করিয়াছে। যাহাদের রসবোধের অভাব জন্মগত, রস কি বস্তু সেই চৈতন্যই যাহাদের নাই, তাহারাই আজ রসের অধিকার দাবি করিয়া সাহিত্যিক হইতে চায়। ইহারাই রস-ব্রহ্মের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারকে পদাঘাত করিয়া আপনাদের শূদ্রতারই জয় ঘোষণা করিতেছে। কাল তাহাদের অনুকূল; আজ দিকে দিকে মানবাত্মার দুর্গতি, মানবজাতির সুদীর্ঘ সাধনার পরম-ধনের অপচয়, যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ তাহারই ধূলিধূসর পরিণাম—জ্ঞানী ভক্ত ও রসিকের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে; এ হেন সময়ে, যাহারা পৃথিবীর ব্রাহ্মণ-সমাজে কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই ইতর মানুষেরা মহাসুযোগ লাভ করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক।

২

'প্রগতি' শব্দটির যাহা অর্থ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরাজিতে 'progress' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই বিশেষ ও ব্যাপক অর্থ বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শব্দের মোহ ও মাহাত্ম্য কম নয়, তাই এই বিশেষ শব্দটিকেই আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ ইহার অর্থগত বিদেশী ভাব আমাদের ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের বড় কাজে লাগিয়াছে। সম্প্রতি ইহারা নিখিল-ভারতীয় প্রগতি-কোম্পানির সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাদের এই উপবঙ্গীয় প্রগতিবাদকে বঙ্গবাসীর চক্ষে—প্রীতিপ্রদ না হউক—ভীতিপ্রদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—তাঁহারা সাহিত্যে প্রগতিবাদ প্রচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রে, সমাজে এবং জাতির জীবনঘটিত নানা সমস্যায় প্রগতিতত্ত্বের অবকাশ আছে; এবং সেই সকল ব্যাপারে তাহার আলোচনা ও প্রচারমূলক গ্রন্থরাজিকে প্রগতি-বাদী সাহিত্য বলিতে কাহারও আপত্তি নাই; কারণ, ইংরাজিতেও 'literature' শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়,—ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবরণও 'literature' আখ্যা পাইয়া থাকে। কিন্তু সাহিত্যের নামেই এই যে প্রগতির

দাবী, ইহা সত্যকার সাহিত্যকেই অস্বীকার করা,—ইহার মূলে আছে রসের বিরুদ্ধে বেরসিকের আক্রোশ। এই প্রগতিবাদ হইতে সাহিত্যের আদর্শকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য, ইদানীন্তন কালে য়ুরোপীয় সাহিত্যাচার্য্যগণ কাব্যরসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। যাহারা এইরূপ প্রগতিবাদী তাহাদের সহিত সাহিত্যের কোনও সম্পর্কই নাই, বরং সম্পর্ক অস্বীকার করাই উভয়পক্ষে মঙ্গলকর। ওদেশে সে চেষ্টা যথেষ্টই হইতেছে; আমাদের দেশে এ কাজ করিবার কেহ নাই, তাই অপর পক্ষের অনাচার এত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রগতিবাদীর দল সাহিত্যের অর্থান্তর করিতে চায়, কিন্তু নামান্তর করিতে রাজি নহে। জীবনকে ইহারা যন্ত্ররূপেই ভাবনা করে; যন্ত্রের কালোপযোগী পরিবর্ত্তন আছে,—নূতন অংশের যোজনা ও পুরাতন অঙ্গসংস্কার অবশ্যম্ভাবী। এবং যেহেতু যন্ত্রের ক্রিয়াও তদনুরূপ হইতে বাধ্য, অতএব সে বিষয়ে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না,—সাহিত্যও যে সেই জীবন-যন্ত্রেরই একটা ক্রিয়াবিশেষ! মানব-সমাজের গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জীবন-যন্ত্রও জটিলতর হইতেছে, সেই জটিলতাই তাহার গৌরব। অভাব যতই বাড়িতেছে, ততই যন্ত্রও চক্রবহুল হইয়া উঠিতেছে; এই সকল চক্রের মিলিত ঘর্ঘরধ্বনি চক্রবৃদ্ধির হারে কালক্রমে বিশালতর হইতেছে; সাহিত্যও তাই চক্রমুখরতায় পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর ঘোরনাদী হইয়া উঠিতেছে। ইহাই সাহিত্যের প্রগতি, এই নাদের উগ্রতাই সাহিতের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ! সাহিত্যও সৃষ্টিধর্ম্মী নয়, যন্ত্রধর্ম্মী; ইহাতে কেবল যুগের গতিধর্ম্মই আছে, কোনও শাশ্বত আদি-অন্তের স্থিতিধর্ম্ম নাই। আমাদের দেশের প্রগতিবাদী যাঁহারা, তাঁহাদের মত এতখানি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ, সেই মত কোন মূলতত্ত্বের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি যে-তত্ত্বকে তাহারা অতিশয় সুলভ বিদ্যার কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে আয়ত্ত করিয়া, আপনাদের রিপুবিশেষকে চরিতার্থ করিতেছে, তাহার মূলে এইরূপ ধারণাই আছে। সাহিত্য সৃষ্টিধর্ম্মী অর্থাৎ প্রাণধর্ম্মী,—তাহা যে যন্ত্রধর্ম্মী নয়, তাহার প্রমাণ, কোনও উৎকৃষ্ট কবিকীর্ত্তি এ পর্য্যন্ত বাতিল হইয়া যায় নাই; বাতিল হওয়া দূরের কথা, সেই কাব্যের অন্তর্নিহিত রসরূপ কালে কালে নবনবোন্মেষিত হইয়া উঠে, সে রসের বিকাশধারার শেষ নাই। এই বিকাশ আর ঐ যান্ত্রিক বিবর্ত্তন এক নয়; যাহা একবার সত্যকার সৃষ্টিপদবী লাভ করিয়াছে,

রসের জগতে তাহার আর মৃত্যু নাই, মৃত্যুনির্জ্জিত মানুষও তাহার প্রসাদে অমর হইয়া উঠে। অতএব সাহিত্যের প্রগতি বলিতে যদি ইহাই বুঝিতে হয় যে, এককালের সাহিত্য অন্যকালে অচল,—যাহা অগ্রবর্ত্তী তাহাই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তবে তাহা প্রগতি হইতে পারে, কিন্তু কদাপি সাহিত্য নহে। যতই প্রাচীন হউক, কোন কাব্য যদি উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ, সে সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ কবি-রসিকের এই উক্তি রসিকসমাজকে আশ্বস্ত করিবে—

All high poetry is infinite, it is as the first acorn, which contained all oaks potentially. Veil after veil may be withdrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight; and after one person and one age has exhausted its divine effluence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and an unconceived delight.

—কিন্তু প্রগতিবাদীরা, বিশেষত আমাদের দেশের ইঁহারা একথা স্বীকার করিবেন না; তাহার কারণ, তাঁহাদের যে সাহিত্য তাহাতে poetry-র বালাই নাই—'high poetry' আবার কি? ওদেশের নব্যসম্প্রদায় এ সকল কথা নিত্য শুনিতেছে, এবং শুনিয়া তাহার পাল্‌টা জবাব দিতে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করিতেছে; কারণ, তাহারা আমাদের এই ধনুর্দ্ধরদের মত এতটা নিরঙ্কুশ নহে। তাই যখন তাহারা শোনে—

I quite freely admit, that to a man hesitating between socialism and anarchy, or between polygamy and eugenics, or between overhead and underground connexions for tramway, *The Tempest* or *Macbeth* would have very little to say of any profit.

—তখন তাহারা বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্যও চুপ করিয়া থাকে।

৩

আমাদের প্রগতিওয়ালারা সেদিন সভা করিয়া, যে ভাষায় ও যে অর্থে, সাহিত্যের সদ্‌গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে ওদেশের গুরুভাইয়েরা লজ্জা পাইত, সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের দিন যে গত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাঁহাদের দিন আসিয়াছে, ইহা কি আর কাহাকেও ডাকিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে? সেই জন্যই তো দেশে যে কয়জন ভদ্র সাধু সজ্জন অবশিষ্ট আছে, তাহারা ঘটি-বাটি

সামলাইতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে যেমন ক্রমাগতই মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগ এবং অধিকতর দুঃসাহসী বিপ্লববাদী ব্যক্তিসংঘের মন্ত্রিপদলাভ রাজনৈতিক প্রগতির লক্ষণ, তেমনই, রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ সাহিত্যনায়কগণের পরাজয় ও এইরূপ যষ্টিধারীদের অভ্যুদয় সাহিত্যিক প্রগতির অকাট্য প্রমাণ। তুলনাটা আদৌ অসঙ্গত নয়; এই সকল বাহ্বাস্ফোটসম্বল বীরগণ, আর কোনও ক্ষেত্রে তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অগত্যা বাংলাদেশের নির্ব্বিকার ও নির্জ্জীব সাহিত্যসমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্য হাঁকডাক করিতেছেন। উপরে উদ্ধৃত উক্তির সেই 'profit'ই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য, সাহিত্যের দোহাই দিয়া কিছু profit করিয়া লইবার জন্যই ইহারা এই অপেক্ষাকৃত নরম মাটিতে কুস্তির আখড়া স্থাপন করিয়াছেন। সাহিত্যহিসাবেই সাহিত্যের ভাবনা করিতে ইহারা অক্ষম; কিন্তু সাহিত্য যাঁহাদের ধর্ম্ম ও সাধনার ধন, তাঁহাদের একজন এই ম্লেচ্ছদের সম্বন্ধে বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

It is an awful truth, that there neither is, nor can be, any genuine enjoyment of poetry among nineteen out of twenty of those persons who live or wish to live, in the broad light of the world—among those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in seciety This is a truth and an awful one, because to be incapable of a feeling of poetry, in my sense of the word, is to be without love of human nature and reverence of God.

—ইহাই উদ্ধৃত করিয়া অপর এক মনীষী বলিতেছেন—"That is an emphatic answer"।

কিন্তু শুনিবে কে? 'love of human nature' এবং 'reverence of God'—মানবপ্রীতি ও ভগবদ্ভক্তিকে—যে কাব্যরস-রসিকতার ভিত্তি বলিয়া একজন ঋষিকবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আধুনিক প্রগতির ধাপ্পাবাজি যাহাদের রসিকতার চরম পরিণাম, তাহাদের অভিধানে সেই প্রেম-ভক্তির বিন্দুবিসর্গও নাই। human nature বা humanity বলিতে ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্র, আত্মগত অভিমান, বা অহংচর্চ্চা, এবং শিশ্নোদরসাধন বুদ্ধিবৃত্তিই বোঝে। যত বড় বড় কথা তাহারা বলুক, এবং যত বড় পাণ্ডিত্য ও পৌরুষই তাহাতে থাকুক, মূল বক্তব্য সেই একই; অর্থাৎ, আমরা যাহা-খুশি বলিব, যাহা খুশি-করিব, এবং যাহা-খুশি খাইব; এই যাহা-খুশিকে 'আহা-মরি' করাইতে না পারিয়াই তাহারা রাগিয়া

কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছে। নিজেদের নিদারুণ অক্ষমতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকেই গৌরবান্বিত করিতে হইবে; তাই, রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নাই—ইহাই চীৎকার করিয়া বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের মত আক্ষেপ করিতেছে, আমাদের লেখা কেহ পড়িতেছে না! ইহাতে যেমন অকালপক্বের মর্কটকাঠিন্য আছে, তেমনই একপ্রকার করুণরসের নাকি-কান্নাও আছে। কিন্তু বিকাল-পক্ব প্রবীণ যিনি, যাঁহার পাণ্ডিত্য-দম্ভের সীমা নাই, তাঁহার আস্ফালন কৃত্তিবাসী অঙ্গদ-রায়দরবারকেও লজ্জা দিয়াছে, তাঁহার বাণীতে সত্যকার বীরত্ব আছে—

Croakers are not wanting to tell you—with sighing glances fixed on the past these men would tell you...

—এই 'tell you' যে কি, তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না, কারণ এই প্রবন্ধই তো তাহাই—কত বড় croakers আমরা! কিন্তু—

To these gloomy judgments I take the liberty respectfully to demur, and I claim that despite the wailings of these defeatists...the literature produced by lesser personalities today, is neither lacking in art, nor in any of the qualities that make high class literature. This literature, I claim, can, as pure works of art, hold its own against any literature in the rest of India, and perhaps of the world outside.

সেই দামু আর চামু! বাংলা-সাহিত্যে ইহারা আর মরিল না, অমর হইয়াই রহিল! কি ওজস্বিনী ভাষা, রসনার কি দিগন্তবিসর্পী লেলিহতা! "I claim" —অবশ্যই! সেইটাই যে আসল কথা; কারণ, বাংলার এই প্রগতি-সাহিত্যের অনেকখানিই তিনি যে নিজের অংশে দাবি করেন! "high class literature" "pure works of art"—এ সব যে তাঁহার নিজেরই কীর্ত্তির জয়গান! এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের তাহাদেরই সম্বন্ধে ঋষি-কবির সেই উক্তি স্মরণ করিতে হইবে —"those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in society"। ইহারা যে কস্মিন্‌কালে কোন জন্মে সাহিত্যরসের ধার ধারে না, ইহাদের রচিত সাহিত্য পড়িলে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে? পণ্ডিত হইয়াও এমন অপণ্ডিতের মত কথা বলে, ইহার কারণ কি? কারণ—যে দেশ ও যে সমাজ হইতে ইহারা সাহিত্যিক অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, সে সমাজে রসবোধের বালাই বা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা কোনকালেই ছিল না; কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই উক্তি যে বিদ্বেষবিজৃম্ভিত

নয়, তাহা যে অতিশয় সত্য, আজ এই প্রগতি-সম্প্রদায়ের মনোভাব ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না।

বাংলাদেশের প্রগতি-সাহিত্যের এই নেতা সাহিত্যের উপরে প্রগতির শাসন প্রচার করিয়াছেন এই বলিয়া যে—

No writing deserves the name of literature unless it marks some progress beyond the literature of the past.

The name of literature! ইংরাজীর জোর কম নয়! 'name of literature'-এর সংজ্ঞা দিন দিন যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমরা তো ইহাই বুঝি যে, যে-কোনও writing—এমন কি কবিরাজী মোদকগুলির বিজ্ঞাপনও—literature-নামের দাবি করিতে পারে। তাহাই যদি না হইবে, তবে এই সিনিয়র প্রগতি-মহাশয় সাহিত্যের বিধানদাতা হইলেন কি করিয়া? সে কোন্ সাহিত্য? সেকালের কথা ছাড়িয়া দিই,—একালে পৃথিবীর সাহিত্যিক সমাজে যাঁহারা সাহিত্যরস ও তাহার তত্ত্ব-আলোচনায় নিখিল রসিকসমাজকে বিস্মিত ও পুলকিত করিতেছেন, তাঁহাদেরও কেহ সাহিত্যের এমন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন নাই; সেই জন্যই কি ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত ও পরিশেষে ক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের এই বাঙালী সাহিত্য-বীর সাহিত্য সম্বন্ধে এত বড় একটা সত্য 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য' এমনভাবে ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন? রসজ্ঞান না হয় নাই থাকিল—সকলের তাহা থাকে না; কিন্তু এমন বুদ্ধিনাশ হইবার কারণ কি? সাহিত্য পড়িতে পড়িতে বুড়া হইয়া গেলাম; এত কবি, এত ক্রিটিক, এত মনীষী —প্রাচীন ও আধুনিক এত পণ্ডিতের এত কথাই শুনিলাম, কিন্তু এমন মগজভেদী উক্তি আর কোথায়ও শুনি নাই! হোমার-শেক্সপীয়ারকে লইয়া এখনও যাহারা খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির গবেষণা করে, ব্যাস-বাল্মীকির মধ্যে এখনও যাহারা কাব্যরসের অন্ত পাইল না—তাহারা তো এই "some progress beyond the literature of the past"-এর কথা কখনও ভাবিল না! সাহিত্যের রসটাই বড় কথা নয়, বড় কথা ওই 'progress'? প্রগতি—প্রগতি—প্রগতি! progressive literature-বাক্যটিও একটি tautology! কোন সাহিত্যই সাহিত্যপদবাচ্য নয়, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই; অস্যার্থ—সাহিত্য ক্রমাগতই সাবালক হইতেছে; তারিখ যতই আগাইয়া যাইতেছে, ততই তাহা

সেয়ানা হইয়া উঠিতেছে; অতএব যতই আধুনিক হইতেছে, ততই তাহার দাবি বাড়িতেছে,—পূর্ব্বের বইগুলিকে পিঁজরাপোলে অর্থাৎ মিউজিয়মে রাখিয়া দিতে হইবে! এই নব-অভিনবগুপ্তের মাপকাঠিতে আজিকার সাহিত্য আগামী-কল্যের সাহিত্যের কাছে হাত-পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিবে,—কেন না progress চাই; সাহিত্যরস ও রামা-শ্যামার দল-বাঁধিয়া 'হাম-বড়ামি'র হুল্লোড়—এই দুইই যে এক পদার্থ! প্রগতি, অর্থাৎ আপনাদের কীর্ত্তির কৃতিত্ব ঘোষণার জন্য, পূর্ব্বযুগের সকল কবি-মহাকবিকে হটাইয়া দিতে হইবে,—যাহারা কবিকুলপুঙ্গব তাহারা এই মূষিকের দলকে প্রণাম করিবে! তার কারণ—

By a long course of evolution we have reached an ampler synthesis which embraces equal freedom for all and freedom in every aspect of life; and social organisations till yesterday were striving to achieve this freedom in as full measure as possible.

—অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক সাহিত্য শ্রেষ্ঠ না হইবে কেন? এ যে কোন্ রসের সাহিত্য তাহা ওই 'every aspect of life' এবং 'social organisations' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ আর কিছুই নয়—সেই শিশ্নোদরসমস্যারই কথা; সেই জন্য আর সকল সাহিত্য বাতিল হইয়া গিয়াছে। Freedom in every aspect of life—ইহাই যে আধুনিক সাহিত্যের মূলমন্ত্র! আমরাও তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, কেবল ইহাই বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই মন্ত্রটির সাধনার জন্য একটা নূতন পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা করিলেই তো ভাল হইত—পূর্ব্ববর্ত্তীদের সেই আসনটির উপরেই এত লোভ কেন? এই সাহিত্য-নামটাকেও বর্জ্জন করিয়া একটা নূতন নামে এই 'brave new world'-এর পত্তন করিলে তো আর কোনও হাঙ্গামা হইত না। কিন্তু তাহা যে ইহাদের মনঃপূত নয় তার কারণ—সাহিত্য-নামটার একটা বনিয়াদী প্রতিপত্তি আছে, অসাহিত্যিক হইয়াও সেই প্রতিপত্তিটুকু চাই। শূদ্রের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের কারণও তাহাই—যাহাকে বলে দারুণ inferiority complex; ব্রাহ্মণত্বের প্রতি সভয় শ্রদ্ধা আছে, লোভও কম নয়; কিন্তু তাহা যে হইবার উপায় নাই, জন্মক্ষণেই বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন—তাই এত আক্রোশ, এত চীৎকার।

এই আক্রোশের বশেই ছোট প্রগতি-মহাশয় এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে চান যে, রবীন্দ্রনাথের দিন গিয়াছে এবং রবীন্দ্রোত্তর কবি-সাহিত্যিকগণ গড্ডলিকাবৃত্তি

করিয়া সেই মৃতযুগের মৃতভার বহন করিতেছেন। এ আশ্বাস যে চাই-ই, নতুবা বাঁচে কেমন করিয়া? কিন্তু ইহাতেও একটু গোল রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে যাহারা কেবলমাত্র অনুকরণ করিয়াই বাঁচিতে চায়, তাহাদের কথা বলি না, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে রসের যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহা যে সর্ব্বযুগের আদর্শ—রবীন্দ্রনাথও যে গড্ডলিকাবৃত্তি করিয়াছেন! তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথও কখনও বাঁচিয়া থাকেন নাই! খাঁটি প্রগতিতত্ত্ব অনুসারে রবীন্দ্রযুগও একটা পৃথক যুগ নয়, যেহেতু তাহাও পূর্ব্বতন যুগের মূলপ্রেরণাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে নাই, সেও মৃত-যুগের ভার বহন করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, ইহারা সাহিত্যকেই চায় না, চায়—যাহা-খুশি বলিব, যাহা-খুসি করিব, এবং যাহা-খুশি খাইব; এবং যে-সমাজ তাহাতে আপত্তি করিবে, তাহাকে decadent, vicious ও putrescent বলিয়া গালি দিব!

৪

বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদলের মতি-গতি ও অভিপ্রায় সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম; ইহাদের কথার জবাব দিবার চেষ্টা অনর্থক। তার কারণ—প্রথমত, যাহারা সাহিত্য বোঝে না, এবং বিশ্বাসও করে না—আত্মপ্রতিষ্ঠাই যাহাদের একমাত্র অভিপ্রায়, তাহারা কোন জবাব মানিবে না; দ্বিতীয়ত, যে দেশ হইতে এইরূপ সাহিত্যতত্ত্বের আমদানী হইয়াছে এবং এখানকার জলমাটির গুণে তাহার এমন বৈজ্ঞানিক ভাষ্য প্রস্তুত হইয়াছে—সেই দেশে বিষলতাও যেমন জন্মিয়াছে, তেমনই বিষঘ্ন ভেষজের অভাব ঘটে নাই। সেখানে আচার্য্যকল্প সাহিত্যিকের মুখে সাহিত্যবস্তুর যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শোনা যাইতেছে, ইংরাজী-অভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ব্বে যে কয়টি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি বিভিন্ন ব্যক্তির;- পরে আরও কিছু উদ্ধৃত করিব, তাহা হইতে অন্তত এইটুকু সপ্রমাণ হইবে যে, প্রকৃত সাহিত্য-জ্ঞান এখনও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয় নাই। একালেও সভ্যতম সমাজের শিক্ষিততম ব্যক্তিরা সাহিত্যের প্রসঙ্গে অসাহিত্যিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেছেন না। সমাজে চোর যেমন আপনা হইতেই চোরের দলে আকৃষ্ট হয়—সাধু সাধুর দলে, তেমনই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিক রসিকের

দলে, এবং বেরসিক বেরসিকের দলে মিশিয়া থাকে। অতএব দল গড়িলেই কোন-কিছুর প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না; বরং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নানা স্থানে শাখা স্থাপন করিয়া একটা 'নিখিল'-রকমের বড় দল গড়িয়া তুলিলেই বুঝিতে হইবে, উদ্দেশ্যটা সাহিত্যের দিক দিয়া সৎ বা সত্য নহে। এই সকল প্রগতিপন্থী সাহিত্যিক বীরকে আকাশে তুলিয়া সংবাদপত্রে পত্রপ্রেরকদিগের যে হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের অনুপাতে কাল্‌চার বড়ই কমিয়া গিয়াছে—সাহিত্যরসবোধ দুর্লভ হইয়াছে বলিয়াই যশ এত সুলভ হইয়াছে।

বাংলার প্রগতি-সাহিত্য যে-প্রগতির পরিচয় কিছুকাল যাবৎ দিয়া আসিতেছে, এতদিনে তাহা কোনও সুস্থ ও সহৃদয় ব্যক্তির অবিদিত নাই। এই সাহিত্য অতিশয় আধুনিক হইলেও ইহার লক্ষণ নূতন নহে, এবং ইহার সম্ভাবনা কোনও কালেই অগোচর ছিল না; তাহার প্রমাণ—১৩১৩ সালে, প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারিদিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ আমাদের লোভ নিজের চারিদিকে এমন সকল বিকার উৎপাদন করে, যাহাতে ছোটই বড় হইয়া উঠে, বড়ই ছোট হইয়া যায়; যাহাই ক্ষণকালের তাহাই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি লোভ জন্মে, তাহাকে আমরা এমনিই অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্র সূর্য্য তারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের সৃষ্টি বিধাতার সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।"

—পড়িয়া মনে হয় নাকি যে, এ যেন এই প্রগতি-সাহিত্যের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের একটি অতি আধুনিক উক্তি? এই যে freedom-এর অভিযান—সাহিত্যে এই দলবদ্ধ আস্ফালনই বিধাতার সৃষ্টির বিরুদ্ধে আধুনিক মানুষের চীৎকার। আমি এই সাহিত্যকে শিশ্নোদরসর্ব্বস্ব বলিয়াছি—বাক্যটি অশ্লীল হইলেও, অর্থটি সত্য অতএব সাধু। সেকালের সত্যদর্শী ঋষিগণ আধুনিক প্রগতিবাদের অর্থ বুঝিতেন—পৃথিবীময় আজ যে মানুষের দল "freedom in every aspect of life" বলিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের সেই ব্যাধির নিদান এক কথায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহারা ঐ অতিশয় সাধু বাক্যটি

সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব আমাদের লজ্জিত হইবার কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ ঋষি নহেন, তিনি কবি; তাই তিনি অতখানি নগ্নতার পক্ষপাতী হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারও বক্তব্য সেই একই,—অতিশয় ভদ্রভাবে তিনি বলিয়াছেন, "যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে তাহাকে এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়।" প্রগতি-সাহিত্য হইতেই ইহার উদাহরণ দিব। বাংলা কাব্যে প্রেমের কবিতা প্রায় নাই বলিলেই হয়—অত বড় ইংরাজী সাহিত্যেও তেমন প্রেমের কবিতা ঝুড়ি ঝুড়ি নাই—ইহাই বুঝাইবার জন্য মহাপণ্ডিত ও মহাসাহিত্যিক ছোট প্রগতি-মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন—

"যৌন-অভিজ্ঞতা জীবনে বেশির ভাগ মানুষেরই হয়, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা কবিদের মধ্যেই বা ক'জন বর্ণনা করতে পেরেছেন? ...ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হ'ত তা'হলে যে-কোনো মানুষই কি অল্প নৈপুণ্যের দ্বারা তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে পারতো না?"

এই জন্যই প্রেমের কবিতা বাংলায়, এমন কি ইংরাজীতেও—এত দুর্লভ! যৌন অভিজ্ঞতাই প্রেমের যে গভীরতম উপলব্ধির মূল, এবং তাহার যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতায় নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হওয়া চাই,—তাহা পশুর মতই মানুষের পক্ষেও অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া, তেমন কবিতা লেখা বড়ই দুরূহ। সে যে কত দুরূহ, তাহা বুঝে না বলিয়াই সাধারণ মানুষেরা এইরূপ কবিতার কবিকে ন্যায্য সম্মান দান করিতে চাহে না। এইরূপ সার্থক রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক এই লাইন কয়টি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, "এ রকম পংক্তি জগতে খুব বেশি লেখা হয় না"—

The moment of desire! the moment of desire!—the virgin that pines for the man who shall awaken her womb to enormous joys in the secret shadows of her chamber.

হায় বাল্মীকি, হায় কালিদাস! হায় শেক্সপীয়র, হায় রবীন্দ্রনাথ! বাংলার বৈষ্ণবপদাবলী তো গোল্লায় গিয়াছে। কারণ, এমন রজকিনী পাইয়াও দ্বিজ-কবি শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার মশলাগুলি কবিতার রসে মিশাইতে পারেন নাই! আমার 'শিশ্নোদরপরায়ণ' কথাটা কি মিথ্যা? না, রবীন্দ্রনাথ ভুল বুঝিয়াছেন?—"যাহার প্রতি আমাদের লোভ তাহাকে 'এমনি অসত্য করিয়া

গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্র সূর্য্য তারাকেও সে ম্লান করিয়া দেয়।"

এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের তাহারাই যদি সাহিত্যিক হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের আদর্শ কি হইবে, তাহা তো জানাই আছে। একজন ইংরেজ সমালোচক আধুনিক সাহিত্যিকদিগকে একটি নাম দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে নাম অবশ্য তাহারা গৌরবের সহিত বহন করিবে; কারণ, কিছুতেই তাহাদের গৌরবহানি হয় না। এই লেখক বলিতেছেন—

If we fasten then, one label on these books, on which is one word 'materialists,' we mean by it that they write of unimportant things; that they spend immense skill and immense industry making the trivial and the transitory appear the true and the enduring.

শেষের বাক্যটি যেন হুবহু রবীন্দ্রনাথেরই অনুবাদ! লেখক ইহাদিগকে নাম দিয়াছেন—materialists, অর্থাৎ জড়বাদী; এবং কি অর্থে, তাহা বুঝাইয়া বলিয়াছেন। সে দেশের আধুনিকদের সম্বন্ধে ইহাই হয়তো যথার্থ; কিন্তু আমাদের এই প্রগতির দল জড়বাদীও নহে—জড়েরও যে ধর্ম্ম আছে, ইহাদের তাহাও নাই; কারণ, জড়েরও প্রকৃতি-গুণ আছে, ইহারা সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। ইহাদের এই যে অনাচার, এই যে অসত্যের আরাধনা, ইহাতে 'immense skill and immense industry'-র প্রয়োজন হয় না; কারণ, তাহার সাড়ে-পনেরো আনাই অনুকরণ; ইহাদের জীবধর্ম্মই স্তিমিত, জড়ধর্ম্ম বরং ভাল ছিল।

উপরি-উক্ত সমালোচকের আর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আমাদের এই 'শিষ্য-বিদ্যা—গরিয়সী' প্রগতি-প্রতিভার যাঁহারা গুরু সেই ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের বিখ্যাত কয়েকজনের নাম করিয়া, তাঁহাদের তথাকথিত বাস্তবতার অজুহাত সম্বন্ধে, এই লেখকই বলিতেছেন—

Let us hazard the opinion that for us at the moment the form of fiction most in vogue more often misses than secures the thing we seek. Whether we call it life or spirit, truth or reality, this, the essential thing has moved off...we suspect a momentary doubt, a spasm of rebellion, as the pages fill themselves in the customary way. Is life like this? Must novels be like this?

পরিশেষে আর এক আধুনিক মনীষীর একটিমাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। যাঁহারা অন্তরে ধর্ম্মহীন, আধুনিক যুগের অহংমদমত্ততায়

যাহারা প্রাণের স্থৈর্য্য হারাইয়াছে, যাহারা মৃত্যুকেই মোক্ষ জানিয়া চিরকালের উপর ক্ষণকালকে আসন দিয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে, যাহারা বিকৃত দেহ-মনের স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যকেই প্রজ্ঞা ও প্রতিভার নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারাই প্রগতির ধূয়া তুলিয়া সাহিত্যকে বিকারগ্রস্ত করিতেছে। যে-ধরণের প্রগতিবাদের দম্ভ ইহারা করিয়া থাকে তাহাতে তত্ত্বগত প্রগতিও নাই—কারণ, কালের প্রবাহ-মানতাকেই ইহারা কার্য্যত অস্বীকার করে। নিজের আত্মাভিমানের অনুকূল করিয়া ইহারা কালকে বিচ্ছিন্ন বর্ষসমষ্টিরূপে ধারণা করে,—এক একটি বর্ষসমষ্টি আপনাতেই সমাপ্ত; যেন কালের কোন সুনিয়ত প্রবাহ নাই, তাহার প্রত্যেক অংশই এক একটি স্বতন্ত্র ঘূর্ণি। অতীত নাই, ভবিষ্যৎও ভাবনার বহির্ভূত; প্রেম নাই, বিশ্বাস নাই—আছে কেবল স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্য ও পাশব-স্বার্থের অসৎ উত্তেজনা। ইহাদের মনস্তত্ত্বে রসতত্ত্বের স্থান নাই—থাকিতে পারে না; তাই ইহারা কাব্যরসের চিরনির্ঝরকে বিদ্রূপ করে, মানুষের জীবনে যে বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, যাহার অভাবে মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহাকে ইহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। তাই, যাঁহারা যুগে যুগে মানুষের অধ্যাত্ম-জীবন পুষ্ট করিয়া, সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া, মানুষকে অশেষ ঋণে ঋণী করিয়াছেন, সেই অমৃত-সমাজ কবিগণের চিরনবীনতাময়ী বাণীকে ইহারা অতীতের আবর্জ্জনাস্তূপ বলিয়া মনে করে। তাহার কারণ, ইহারা জড়বাদী নাস্তিক, প্রেমহীন ও ধর্ম্মহীন। কিন্তু যাঁহাদের আত্মা এখনও সুস্থ আছে, যাঁহারা জ্ঞানে ও প্রেমে সমান বলীয়ান,—কবিত্বের অমৃত-হ্রদে অবগাহন করিয়া যাঁহাদের কান্তি উজ্জ্বল ও শান্তি সুস্নিগ্ধ হইয়া উঠে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এমনই একজন জগতের মহাকবিদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

To men such as these the debt of humanity is inestimable. They, above all others, keep the souls of men alive; they do not tell us of spiritual felicity; they create it in us from the substance of our coarser elements... Not that Shakespeare was a Christian, any more than the poet is a mystic—but he was religious, as all great poets must be. For high poetry and high religion are at one in the essential that they demand that a man shall not merely think thoughts, but feel them—that this highest mental act be done with all his heart and with all his mind and with all his soul.

আমাদের যুগন্ধর সাহিত্যিকদিগের যে সকল উক্তি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত এই উক্তি তুলনা করিলে, যাহারা মানুষ, পশু নয়—তাহারা কি বুঝিতে পারে না, কোন্ উক্তিটির মধ্যে, কাহার কণ্ঠস্বরে, মানুষের সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ব বৃহত্তর ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে? মনে হয়, জাতিতে জাতিতে যেমন, মানুষে মানুষেও তেমনই কত তফাৎ! নহিলে আমাদের দেশে, এই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক-সমাজে, এমন কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনিতে পাইলাম না কেন? প্রগতি তো সে দেশেও আছে।

[ফাল্গুন, ১৩৪৫].

বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি

১

পাশ্চাত্ত্য কবিমণ্ডলের মহাকবির সেই বচন 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'—আমরা প্রায়ই উচ্চারণ করি, তার কারণ, কথাটা বড় সত্য। কথাটার অর্থ যদি এই হয় যে, যে-গানে দুঃখের ভাব যত গভীর সেই গান তত মধুর, তাহা হইলে মানুষমাত্রেই যে তাহাতে সায় দিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ দুঃখের বার্ত্তা কি ধরণের বার্ত্তা—গানে যাহা এত মধুর হইয়া উঠে? নিশ্চয় তাহাতে কোন প্রবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা ঝড়ঝঞ্ঝা নাই, মানুষের আত্মঘোষণা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার সহিত কোন সম্পর্ক তাহাতে নাই; জনতা নাই, কোলাহল নাই। তাহাতে আছে কেবল একটি ব্যথা, সে যেন সন্ধ্যার করুণ ছায়ালোকে নিঃসঙ্গ-বিধুর হৃদয়ের দিনান্ত-স্মৃতি; জন্মান্তর-স্মৃতির মতই সে যেন একটা অস্ফুট অথচ তীব্র বিরহব্যাকুলতা—ভাবে ও অভাবে দ্বন্দ্ব। সে ব্যথা সান্ত্বনাহীন বটে, কিন্তু সে এমনই মধুর যে সান্ত্বনা পাইতে ইচ্ছাও হয় না। আসল কথা, ইহা গীতিকাব্যের রস; কবি যে বলিয়াছেন, 'songs' বা গান, ইহা সেই গানেরই রসবস্তু। যেহেতু সাহিত্য জীবনেরই রস-রূপকে নানা আকারে আমাদের হৃদ্‌গোচর করে, এবং যেহেতু মাধুর্য্যই রস, সেইহেতু কবির ঐ বচনটি এই অর্থে সত্য যে, সকল উৎকৃষ্ট কাব্যের মর্ম্মস্থলে ঐ করুণ সুরটি থাকিবেই—থাকেও। এই পর্য্যন্ত আমরা সকলেই বুঝি; যাঁহারা উঁচুদরের রসিক তাঁহারা, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতির ভিতরেও ঐ এক রসই আস্বাদন করিয়া থাকেন; তথাপি ঐ বিশেষ রসটিই আমাদের অধিকতর প্রিয়—উহা শুধুই আমাদের রসবোধকে নয়, হৃদয়কেও গভীরভাবে চরিতার্থ করে।

কিন্তু ইহাতেও কাব্যহিসাবে ইতর-বিশেষ আছে, আছে বলিয়াই, পাশ্চাত্ত্য সমাজে নাটকের আকারে এক নূতন কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই কাব্যের নাম 'ট্র্যাজেডি'। ইহা দুঃখেরই নাটকীয় রসরূপ। গানে আমরা দুঃখকে অনুভব করি মাত্র, নাটকে তাহাকে দেখি; এই যে প্রভেদ ইহা একটা বড় প্রভেদ। অনুভূতিতে কোন প্রশ্ন নাই, একটা ভাবাবস্থা আছে; গানে একটা অতি ক্ষুদ্র

ঘটনা, একটা সামান্য পরিস্থিতি, কিম্বা মন বা প্রাণের একটা বিক্ষোভকে আশ্রয় করিয়া ঐ ভাবাবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলেই হইল; সে যেন জীবন-সমুদ্রের কূলে বসিয়া বাঁশী-বাজানো; ঝটিকাক্ষুব্ধ তরঙ্গ-কল্লোল দূর হইতে একটা সুরের মত ভাসিয়া আসে—বাঁশী সেই সুরেই ভরিয়া উঠে। কিন্তু নাটকে আমরা সেই ঝটিকাগর্জ্জন ও তরঙ্গভঙ্গের অতিশয় নিকটে, এমন কি, মধ্যে গিয়া দাঁড়াই, সেখানে দুঃখের যে মূর্ত্তি দেখি তাহা ভাবমূর্ত্তি নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব-রূপ। তাহাতে শুধুই সুর নয়, একটা প্রবল ধাক্কা আছে; কেবল রসাস্বাদ নয়—আক্ষেপ আছে, প্রশ্ন-কাতরতাও আছে। রসের নাটকীয় রূপসৃষ্টি কেন যে অতিশয় বিশিষ্ট কবিশক্তি-সাপেক্ষ তাহা আমি অন্যত্র বলিয়াছি; আবার জীবনের ঐ দুঃখ-রূপটাকে যে-নাট্যকলায় পাশ্চাত্ত্য কবিগণ একটা নূতন অর্থে নূতন ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই ট্র্যাজেডিই যে সে সাহিত্যের একটি অনর্ঘ ও অপরূপ সৃষ্টি, তাহাও বলিয়াছি। এবার, ঐ ট্র্যাজেডি আমাদের সাহিত্যে কেন যে তেমন প্রসার লাভ করে নাই, এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কি অর্থে কতটুকু করিয়াছে, তাঁহারই একটু বিস্তারিত আলোচনা করিব।

এই প্রবন্ধে আমি ট্র্যাজেডি শব্দটি, সঙ্কীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেই গ্রহণ করিব, দুইটিই সমান আবশ্যক, যেহেতু এখন সেই শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা অপেক্ষা, জীবনে ও সাহিত্যে এই শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়; তার কারণ, দুঃখের সেই রূপকে আমরা এক্ষণে জীবনের নানা স্থানে খণ্ড-আকারেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি—জীবনেই হোক আর সাহিত্যেই হোক, যেখানেই ঐরূপ পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয় সেইখানে আমরা তাহার নাম দিই, ট্র্যাজেডি। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, এবং য়ুরোপীয় জীবন-দর্শনের প্রভাবে, আমরাও উহাকে একটি বিশেষ মর্য্যাদা দিতে শিখিয়াছি, এজন্য আমাদের ভাষায় উহাকে একটা নাম দিবার প্রয়োজন ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নাম এখনও দিতে পারি নাই, এখনও ঐ বিলাতী নামটাই ব্যবহার করিতেছি।

ইহার কারণ কি? বাংলা ভাষার দারিদ্র্য? সংস্কৃত ভাষা ত দরিদ্র নয়। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, ঐ 'ট্র্যাজেডি' বলিতে মূলে যাহা বুঝায় তাহার সেই বিশুদ্ধ রস আমরা এখনও আত্মস্থ করিতে পারি নাই, না পারিলে ভাষায় তাহাকে নির্দ্দেশ করিব কেমন করিয়া? ভাষার সহিত জাতির

অন্তঃ-প্রকৃতির যোগ এমনই। আমাদের প্রাণ মন ও আত্মার যে একটি বিশিষ্ট ধাতু বা গঠন আছে তাহার বিরোধী কোন ভাব অন্তর-গভীরে প্রবেশ করিলেও আমরা যে তাহাকে আমাদের সমগ্র সত্তা দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না, তাহার একটি প্রমাণ, ঐ পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির সহিত এত পরিচয় সত্ত্বেও আমরা তাহার একটা দেশী নাম এখনও স্থির করিতে পারি নাই। আমাদের ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কারে, যে একটি অনুভূতি-মার্গ আমাদের চিত্তে তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে করুণ-রস আমাদের পক্ষে সহজ হইলেও, কোন ঘটনার নিষ্ঠুর পরিণাম আমাদিগকে তেমন অভিভূত করে না, —জীবন ও জগৎ, আত্মা ও পরকাল সম্বন্ধে আমাদের এমন একটা সংস্কার আছে যে, আমরা কোন দুঃখকেই চূড়ান্ত বলিয়া মনে করি না। সব ঠিক আছে, কোনখানে অনিয়ম বা অবিচার নাই; কোন দুঃখই অমূলক বা অসঙ্গত নয়; এমন কি, জ্ঞান কিম্বা ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিলে দুঃখ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। আমরা কাঁদি বটে, সেটা জীব-ধর্ম্ম, কিন্তু সেই ক্রন্দনেও সান্ত্বনা আছে। এই সান্ত্বনার প্রয়োজন আমাদের প্রকৃতিতে, সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে, অতিশয় দৃঢ়মূল হইয়া আছে।

য়ুরোপীয় সংস্কার ইহার বিপরীত, তাহাতে দুঃখটা অতিশয় সত্য, উহার শক্তি অপরিসীম, ভগবানও সেই শয়তানের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। ঐ শক্তি এমনই দুর্জ্জয় যে, যিশুখ্রীষ্টের মত মহাপুরুষকে—সেই ঈশ্বরপুত্রকেও—ইহার হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে; তাঁহার সেই ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ, মৃত্যুযন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল, অর্দ্ধমুদিত দীপ্তিহীন স্থির অক্ষিতারকা য়ুরোপকে একটা দুঃস্বপ্নের মত অভিভূত করিয়াছে—খ্রীষ্টের সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুও তাঁহাকে যেমন মহিমান্বিত করিয়াছে, তেমনি জগতের দুঃখ-রূপটা তাহার চেতনায় দৃঢ়মূল হইয়া আছে। দুঃখ যেমন তাহাকে মুগ্ধ করে এমন আর কিছুই নয়; মনে হয়, এইজন্যই সে নিষ্ঠুরতা এত ভালবাসে। তাহার প্রকৃতি মূলে অখৃষ্টান; খ্রীষ্টের সেই বাণীকে, তাঁহার সেই আত্মাহুতির অন্তরালে যে অপার অন্তহীন করুণা উদ্বেল হইয়া আছে—তাহাকে সে সহজে আত্মসাৎ করিতে পারে না; করুণাকেও এখনও সে তাহার জীবনে সহজ করিয়া তুলিতে পারে নাই। সেই দুঃখ তাহাকে কোমল না করিয়া আরও কঠিন করিয়া তোলে, তাহার আত্মাভিমানকেই জাগ্রত ও উদ্ধত করে। সেই দুঃখ সেই যন্ত্রণা সহ্য করিবার যে শক্তি তাহাই তাহার পৌরুষ; তাই নাটকে

উপন্যাসে ঐ দুঃখ মানুষের চক্ষে কেবল অশ্রুর ধারাই বহাইবে না—তাহার সকল হীনতা ও দীনতাকে তিরস্কৃত করিয়া, চিত্তে একটি কঠোর তৃপ্তি ও প্রশান্তির উদ্রেক করিবে। এই রসই ট্র্যাজেডির রস।

এ রস আমাদের ভারতীয় বা হিন্দু সাহিত্যের রস নয়, আমরা জীবনেও এ রসকে প্রশ্রয় দিই না। তাহার কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা একরূপ দুঃখেরই পূজা। মানুষের মাহাত্ম্য-বোধের জন্য দুঃখকেই একান্ত করিয়া দেখিতে হইবে; জীবন ও জগতের কোন গভীরতর অর্থ—সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যুর সমন্বয়মূলক কোন সত্যের পিপাসা ইহাতে নাই। ভারতবর্ষের মানুষ দুঃখকে, মৃত্যুকে বা ঐকান্তিক বিনাশকে কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। সে প্রথম হইতেই আনন্দকে—অমৃতকেই একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাই কপিল বুদ্ধও হার মানিয়াছেন। ট্র্যাজেডি-নামক ওই কাব্য-কুসুমের মূল ভারতীয় চিত্তভূমিতে নাই; দুঃখকে সে অস্বীকার করে না—কোন মানুষই তাহা পারে না; কিন্তু আত্মার অজেয় বীর্য্য সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু বা ধ্বংসই যে সর্ব্বগ্রাস করিবে, এখানকার মানুষ তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়া ঐরূপ ট্র্যাজেডি তাহার নিকটে অমূলক; কাব্যে-নাটকেও সে মৃত্যুর মহাগহ্বর পূর্ণ করিয়া দেয়, অমূলক ও অর্থহীন বলিয়াই সে ঐরূপ কাব্যরসকে পরিহার করিয়াছে।

২

এইবার কিছু উদাহরণ ও তুলনাদ্বারা কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। একদা আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে, য়ুরোপীয় কাব্যের ঐ ট্র্যাজেডি এবং ভারতীয় ভাবকল্পনার দুর্দ্ধর্ষ আইডিয়ালিজ্‌ম্—এই দুয়েরই দুইটি দৃষ্টান্ত আমাকে যেমন মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল, আজও তেমনই করে। একটি ভিক্টর হুগোর অমর রোমান্স—Toilers of the Sea; এই উপন্যাস প্রেম বা যৌন-পিপাসার একখানি চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি, শেক্সপীয়ারের 'রোমিও ও জুলিয়েট' ইহার তুলনায় প্রেমের শৈশবলীলা মাত্র। উপন্যাসের আকারে এই যে ট্র্যাজেডি ইহাতে কবি প্রেমের পৌরুষ ও প্রেমের আত্মত্যাগ দুইয়েরই পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, এবং ট্র্যাজেডির যে অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ, সেই ধ্বংস বা মৃত্যু ইহার কাব্যরসকে মর্ম্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে প্রেমের মাহাত্ম্য, অপর দিকে মানব-ভাগ্যের

নিদারুণ নিষ্ঠুরতা এই কাব্যে এমনই সূক্ষ্ম অথচ গভীর রেখায় চিত্রিত হইয়াছে যে, ঐ কাব্য পড়িয়া আমার রসপিপাসু তরুণ মন অভিভূত হইয়া পড়িল। হুগোর কল্পনাশক্তি ও কলাকৌশলের কথা আপনারা জানেন, এই উপন্যাসে তাহা এমন একটি লিরিক রসতীব্রতা ও আর্টের প্রয়োগনৈপুণ্য লাভ করিয়াছে যে, আমি এখনও মনে করি, এই কাব্যখানি ফরাসী মহাকবির একটি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। আমি নিজে এইরূপ কাব্যরসেরই পক্ষপাতী; য়ুরোপীয় কাব্যকলা আমাকে যেমন মুগ্ধ করে, ভারতীয় সাহিত্য তেমন করে না—এ দুর্ব্বলতা আমি স্বীকার করি। ঐ যে দেহের বেদীর উপরেই অতিশয় সুস্থ ও সবল বাসনা-কামনার শতশিখাময় হোমানল, আমার মন পতঙ্গের ন্যায় তাহারই অনুরাগী; য়ুরোপীয় কাব্যে মানুষের পৌরুষ এবং প্রবুদ্ধ জীবনচেতনার আত্মঘাতী ক্ষুধা, যে রসধারা প্রবাহিত করিয়াছে তাহার তুলনায় আমাদের কিই বা আছে? একথা আজও স্বীকার না করিয়া পারি না। কিন্তু ইহাও বুঝি—ভারতীয় কাব্য যেমনই হোক, ভারত-বর্ষের জীবন-দর্শন আরও গভীর, আরও সত্য—সত্য, অর্থাৎ খণ্ড নয়, সম্পূর্ণ। এই দৃষ্টি এমনই যে, তাহাকে দেহের বা মনের ভাষায় রূপ দেওয়া যায় না; অন্যান্য কলাতেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনই, সেই অপার্থিব তত্ত্বরস-পিপাসা হেলেনীয় আদর্শে, কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় হইলেও আমি বাঙালী; তাই আত্মার সঙ্গে দেহ, তত্ত্বের সঙ্গে রূপ না হইলে আমার চলে না; ইন্দ্রিয় বা দেহকেই আমি সেই পরমদেবতার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া জানি, আমিও বলি—

Here in the flesh, within the flesh, behind,
Swift in the blood and throbbing on the bone,
Beauty herself, the universal mind,
Eternal April wandering alone;
The God, the holy Ghost, the atoning Lord,
Here in the flesh, the never yet explored,

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। ভারতীয় জীবন-দর্শনই স্বতন্ত্র; তাহাতে রসও সেই বস্তুর আস্বাদন, যাহাতে দেহ ও মনের বন্ধন ঘুচিয়া একটি অপূর্ব্ব মুক্তি-সুখের উদয় হয়। ভারতীয় কাব্যরসিক বলিবেন, এরূপ ট্র্যাজেডি অকারণ চিত্তবিক্ষেপকর, উহা রস হইতে পারে না; ঐ প্রেমও একটা পিপাসা, সেই

পিপাসার জয়গান করিবার জন্যই, যাহা মিথ্যা—সেই মৃত্যুকে মহিমান্বিত করা হইয়াছে। কাব্যকলার ক্ষেত্রে আমি ইহা স্বীকার করিয়াও করি না—কেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু ঐ উপন্যাসখানি পাঠ করার কিছুদিন পরেই একখানা বাঙলা মাসিকপত্রে আমি দুইটি প্রাচীন ভারতীয় উপকথা পাঠ করিয়াছিলাম; লেখকের বা প্রবন্ধের নাম মনে নাই; কিন্তু সেই দুইটি কাহিনীতে প্রেমের যে আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া আজিও চমকিত হই। দুইটির একটি আজিও স্পষ্ট মনে আছে। তাহাই স্মৃতি হইতে সংক্ষেপে বলিব। গল্পের ভঙ্গিও সেই প্রাচীন ভারতীয় ভঙ্গি—সেই বেতাল বা ব্রহ্মপিশাচের প্রশ্ন; এই ভঙ্গি এ গল্পের বড়ই উপযোগী হইয়াছে। গল্পটি এই।

দক্ষিণদেশে যে বিশাল অরণ্য আছে, সেই অরণ্যে একবার ভীষণ অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। পশুপক্ষী জীবজন্তু জলের সন্ধানে দিক্‌-বিদিকে ছুটিয়া শেষে দলে দলে মরিতে আরম্ভ করিল। ঐকালে এক মৃগদম্পতি বহুদূর ভ্রমণ করিয়া যখন পিপাসায় কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছে তখন এক জলহীন নদীর শুষ্কখাতে গোষ্পদ-পরিমিত জল দেখিতে পাইল। সেই জলে কেবল একজনের পিপাসা নিবৃত্তি হইতে পারে, দুইজনের পক্ষে তাহা অতিশয় অপর্য্যাপ্ত। একজনের পরিবর্ত্তে অপরে কিছুতেই সে জল কিন্তু পান করিবে না; উভয়ে উভয়কে তাহা পান করিয়া নিজ প্রাণরক্ষা করিতে বহু মিনতি করিল। যখন কিছুতেই কেহ তাহা করিবে না, তখন মৃগ মৃগীকে বলিল যে, যেহেতু সে তখন অন্তঃসত্ত্বা, তাহার জীবনে দুইটি জীবন রক্ষা পাইবে, অধিকন্তু সন্তান-হত্যার পাতক হইবে না,—তখন অগত্যা চরম শাস্তি বহন করার মতই মৃগী সেই জল পান করিয়া জীবনরক্ষা করিল, মৃগ প্রাণত্যাগ করিল। গল্পটি বলিয়া ব্রহ্মপিশাচ রাজসভার পণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করিল—ঐ মৃগদম্পতির মধ্যে কাহার প্রেম অধিক? প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না পাইলে সে ঐ সভার যে কোন একটিকে তাহার দীর্ঘ উপবাসব্রতের পারণার্থে ভক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিবে! পণ্ডিতেরা কেহই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না; কেহ যুক্তিসহকারে, মৃগের, কেহ বা মৃগীর প্রেম গরীয়ান বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। ব্রহ্মপিশাচ উভয়পক্ষের উত্তর অট্টহাস্যে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের একটিকে ভোজন করিবার অনুমতি চাহিল। রাজা পণ্ডিতগণের এই অক্ষমতা দর্শনে নিজেই লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন; ব্রহ্ম-

পিশাচের প্রস্তাবে তিনি প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এখন আর সত্যভঙ্গ করিতে পারেন না। রাজার এই উভয়সঙ্কটে তাহাকে উদ্ধার করিল আর এক সভাসদ; তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্বর্ণদণ্ডে যে শুকপক্ষী বসিয়াছিল, সেই মহাজ্ঞানী, জাতিস্মর, বাকশক্তিসম্পন্ন শুক ব্রহ্মপিশাচকে নিরস্ত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এই সামান্য প্রশ্নের মীমাংসায় এত বাদানুবাদের প্রয়োজন কি? ঐ মৃগদম্পতির কেহই সত্যকার প্রেমিক নহে, যদি হইত তবে কাহারও মৃত্যু হইত না। এক-জনের উপযুক্ত জলই যথেষ্ট; সেই জল তাহাদের একজন পান করিয়া বাঁচিবে, আর একজন অপরের সেই প্রাণরক্ষার আনন্দেই বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাকে আর পৃথক জল পান করিতে হইবে না—সেই আনন্দই অমৃত। ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম, যেখানে প্রেম আছে সেখানে মৃত্যু নাই। ঐ মৃগদম্পতির মধ্যে প্রেম ছিল না, ছিল কেবল একটা প্রবল আসক্তি, তাই তাহা জীবধর্ম্মের উপরে উঠিতে পারে নাই।

এই গল্প হইতে আপনারা ভারতীয় চিন্তার দুর্দ্ধর্ষ আইডিয়ালিজ্‌ম্ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; গল্পটি বাস্তবের দিক দিয়া মিথ্যা হইলেও ভাবের দিক দিয়া মিথ্যা নহে। মৃত্যুর হাত হইতে স্বামীকে ছাড়াইয়া লওয়ার যে পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে, সেই সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ সকল হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, ভারতবর্ষ জীবনের বাস্তবকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই; সেই বাস্তবকে ভেদ করিয়া, প্রকৃতি ও নিয়তির অন্তরালে একটা বৃহত্তর কিছুর দর্শন লাভ না করিয়া সে ক্ষান্ত হয় নাই। জীবনের নাট্যশালায় যে অভিনয় সে দেখে তাহাতেই সে সন্তুষ্ট নয়—নেপথ্যশালার সুগভীর রহস্যই তাহার রসবোধকে সর্ব্বদা সচেতন করিয়া রাখে।

এইজন্য আমাদের আধুনিক নাটকে ইউরোপের অনুকরণে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিতে গিয়া আমরা করুণরসাত্মক গীতিনাট্যই রচনা করিয়াছি। তাহাতে নায়ক বা নায়িকার চরিত্র এমন হওয়া চাই, যাহাতে আমরা তাহাদের গলা ধরিয়া কাঁদিতে পারি; দুঃখের অতি কঠিন রূপও করুণরসে বিগলিত হইয়া পুরুষের পৌরুষকেও যেন ধিক্কার দেয়। তাহাতে মানুষের ভাগ্য বা অদৃষ্টের পীড়ন থাকিলেও তাহার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ নাই—সে দুঃখের কারণ সম্বন্ধেও কোন

গুরুতর ভাবনা নাই, থাকিলে সে চরিত্র আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করিবে না। য়ুরোপীয় আদর্শে ট্র্যাজেডি রচনা করিতে গিয়া আমরা করুণরসাত্মক দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছি।

তথাপি আমাদের সাহিত্যে এককালে ঐ য়ুরোপীয় রোমান্টিক নাটক ও কাহিনী প্রভৃতির একটা বড় ধাক্কা লাগিয়াছিল, আমাদের কবি ও নাট্যকারগণ হঠাৎ খুব রোমান্টিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এককালে কত উপাখ্যান যে রচিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব আজ পাওয়া যাইবে না। উপন্যাসে ব্যর্থপ্রেমের হৃদয়বিদারক হা-হুতাশ আমাদের অতিক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী যৌবনকে স্বপ্নাতুর করিয়া তুলিত। প্রেমের অপূরণীয় কামনা ও তাহার নৈরাশ্য আমাদের কাব্যগুলিকে একরূপ ট্র্যাজেডি-রসে উচ্ছলিত করিয়াছিল। সেই সকল কাব্য-উপন্যাস যে সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়াছে, তাহার কারণ আমরা য়ুরোপীয় কাব্যে যে-রসের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, নিজেদের সাহিত্যে তাহা সৃষ্টি করিতে পারি নাই। সেই বিদেশী কাব্যের রস এমনই যে, তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও চঞ্চল করিবেই; কিন্তু সেই রস সৃষ্টি করিতে হইলে তাহাকে যে-ভাবে অন্তশ্চৈতন্যে আত্মসাৎ করিতে হয়, তাহা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, কেন তাহাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।

৩

আমাদের নব্যসাহিত্যে কেবল একজন মাত্র ঐ রসতত্ত্ব ও তাহার কলা-কৌশলকে যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ পারেন নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেই ঐ য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির রসপ্রেরণা এক নূতন রূপে ও নূতন ভঙ্গিতে ধরা দিয়াছে, ঐ গদ্য কথাকাব্যগুলিতেই আমরা রোমান্টিক ট্র্যাজেডির প্রায় সেই শেক্সপীরীয় কাব্যরস কিয়ৎ পরিমাণে আস্বাদন করিয়া থাকি। কিন্তু যেহেতু ঐরূপ ট্র্যাজেডি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার অনুকূল নয়, এবং যেহেতু নবত্বের বিস্ময়ই আমাদের রসবোধের একমাত্র মাপকাঠি, এবং যেহেতু বাঙলা সাহিত্য এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতের অনুকম্পা ও মূর্খের বিলাসব্যসনের অতিশয় সুখকর স্থান হইয়া আছে, সেইজন্য—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ কাব্যগুলির নবত্বলোপ হওয়ায়, তাহারা পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়গোত্রীয় পাঠকের পাঠশালা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক সংজ্ঞা-অনুযায়ী উপন্যাস রচনা করেন নাই, অতএব সেদিক

দিয়া উহাদের কোন পরিচয়ই যথার্থ হইতে পারে না ; তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে উৎকৃষ্ট রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শেই তাহা করিতে হইবে এবং তাহাতেও তাঁহার নিজস্ব প্রেরণা ও কল্পনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখানে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। আমি আমাদের সাহিত্যে ট্র্যাজেডির অস্তিত্ব ও প্রসারের কথাই বলিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ য়ুরোপীয় কাব্যরসকে অধিগত করিয়া তাঁহার উপন্যাসগুলিতেও সেই রস একরূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও মধ্যপথে ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সেই য়ুরোপীয় আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই, বা চাহেন নাই। য়ুরোপীয় আদর্শেই তিনি তাঁহার ট্র্যাজেডির অঙ্গবিন্যাস করিয়াছেন সত্য ; তিনিও দৈব বা অদৃষ্ট, Villain বা দুর্বৃত্তের দুরভিসন্ধি, আত্মঘাতী প্রবৃত্তি বা দুর্দ্দমনীয় বাসনা প্রভৃতির কারণে পুরুষের নিদারুণ পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেইরূপ ট্র্যাজেডি-প্রীতিও ক্রমে সংযত হইয়া আসিয়াছে ; মানুষের নিজ আত্মারই মহিমাবোধ—সব হারাইয়াও একটা উচ্চতর অধিকার বা মহত্তর সম্পদের আশ্বাস—প্রকৃতির সেই ছলনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে পারা—ইহাই তাঁহার ট্র্যাজেডির গূঢ়তর প্রেরণা হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ' পর্য্যন্ত তিনি য়ুরোপীয় আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন ; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতে তাঁহার কল্পনা ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছে, যদিও 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহে' সেই য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডিই এক নূতন ছন্দে তাঁহার কল্পনাকে পুনরায় আশ্রয় করিয়াছে। কারণ, 'সীতারামে' সেই অতি ভীষণ অদৃষ্টের লীলা—প্রেমময়ী সাধ্বী স্ত্রীর মূর্ত্তিতেই তাহার সেই যে নিষ্ঠুরতা ও সর্ব্বনাশ-সাধন, এবং 'রাজসিংহে'ও পুরুষ-বীর মোবারককে প্রবৃত্তির ক্রীড়নক করিয়া তাহার জীবনেও দৈবের সেই অট্টহাস—কোন অধ্যাত্মনীতি বা ন্যায়নীতি দ্বারা সেই ট্র্যাজেডির অন্ধকার ভেদ করা যায় না। 'সীতারাম'-রচনাকালে বঙ্কিমকে কি পাইয়া বসিয়াছিল জানি না ; বোধ হয় পুরুষ-ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকশক্তি এবং প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বা অন্ধপ্রবৃত্তি এই দুইয়ের কোনটাকে তুচ্ছ করিতে না পারিয়া—অথচ আধ্যাত্মিকতার প্রতি পক্ষপাতের বশে, তিনি এই কাব্যে যেন নিজের কাছেই নিজে হার মানিয়াছেন ; আর কোন কাব্যে তিনি ধ্বংসের এমন বিরাট অগ্ন্যুৎসব সৃষ্টি করেন নাই। কে জানে, হয়ত এই কালে কবির ব্যক্তি-জীবনেও

একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাই সর্ব্বধ্বংসের এইরূপ কল্পনা বড়ই আনন্দ-দায়ক হইয়াছিল।

তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডিগুলিতে সাধারণত সেই খাঁটি য়ুরোপীয় প্রেরণার সংশোধনই লক্ষ্য করা যায়। তিনি মানুষের মহত্ত্বকে ধর্ম্মবিশ্বাসের মতই বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু সে মহত্ত্ব তাহার নিজেরই নয়—একটা পরমা-শক্তির অংশ বলিয়াই সে মহৎ; সেই শক্তির শাসন তাহার নিজেরই আত্ম-শাসন; সেই শাসনকে অগ্রাহ্য করার যে শাস্তি তাহা যতই শোকাবহ হৌক, সেই শাস্তির দ্বারাই মানুষ তাহার যথার্থ মর্য্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আর একটা কথাও আছে। মানুষ ছোট নয় সত্য, তাহার মহত্ত্বের সীমা নাই ইহাও সত্য; কিন্তু তাহার দেহ দুর্ব্বল, ইহাও সত্য। এই দুর্ব্বল দেহের দুর্ব্বল হৃদয়ের যত কিছু মোহ—জীবন ও জগতের রঙ্গশালায় শত বর্ণে শত শিখায় স্ফুরিত হইতেছে; যাহা মূলে মিথ্যা তাহাই অপূর্ব্ব চিত্রে চিত্রিত হইয়া জীবনের যবনিকাখানিকে কি বিচিত্র, কি সুন্দর করিয়া তুলে! কবি বঙ্কিম এই মিথ্যাকেও মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাকেই সর্ব্বোপরি স্থান দেন নাই। সত্যই যদি শিব হয়, তবে ঐ মিথ্যাও শিবমোহিনী; শিবকে সম্মুখে রাখিয়াই তিনি ঐ শিবমোহিনীর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডিতে এই প্রকৃতির যে উপাসনা আছে তাহা অন্যরূপ, তাহার সম্মুখে শিব নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রকৃতি মোহিনী হইলেও বরদাত্রী। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুকোমল ছায়াদ্বারে তাহার যে রূপরাশি পুরুষকে পরশ-বিভোল করে, তাহার রসও যদি আস্বাদন না করিলাম, তবে একটা অত্যাবশ্যক চিত্ত-কর্ষণ হইতেই বঞ্চিত হইলাম। ঐ সৌন্দর্য্যের জ্বালাও সেই সত্যের সোপান; কেবল আগুন নয়, আহুতির কথাও মনে রাখিতে হইবে; ঐ আহুতির পর যে হবিঃশেষ-ভোজন তাহাই ত' দেবতার সহিত যজমানের একত্ব-বিধান করে।

•

ইহার পর আমাদের উপন্যাসে ও কাব্যে আরও দুইজন বড় কবির আবির্ভাব হইয়াছে, একজন রবীন্দ্রনাথ, আর একজন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভিন্ন বস্তু, কিন্তু তাঁহার কাব্যে এককালে ট্র্যাজেডি-রচনার প্রয়াস আমরা দেখিয়াছি। প্রথম দুইখানি উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'তে—বিশেষত প্রথম-

খানিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবিপ্রকৃতি, তাঁহার অতিশয় স্বতন্ত্র মৌলিক প্রতিভা, কি উপন্যাসে, কি নাটকে, কোথাও ট্র্যাজেডি তথা নাটকসৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করে নাই। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি এককালে 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জ্জন' নামে দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই যৌবনাবেগরঙ্গীন কবিস্বপ্ন—তাঁহার চিত্ত-ফুলবনের সেই নন্দন-বসন্ত এক অপূর্ব্ব গীতিরাগে উৎসারিত হইয়াছে। এখানে এই প্রসঙ্গে সেই কাব্যগুলির নাটকীয় গুণ-দোষ পরীক্ষা করিলে কাব্য ও কবির প্রতি অবিচার করা হইবে, তথাপি পাঠকপাঠিকার সুবিধার জন্য নাটক বা ট্র্যাজেডির লক্ষণ বুঝাইবার জন্য, আমি সংক্ষেপে কিছু বলিব। নাটকে উপন্যাসে যে objectivity বা আত্মনিরপেক্ষ বিষয়-কল্পনা কবির প্রধান সম্বল, রবীন্দ্রনাথের মত কবির তাহা ছিল না, থাকিতে পারে না বলিয়াই ছিল না। এজন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি বাহিরের মানুষ না হইয়া তাঁহারই অন্তরের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। 'বৌঠাকুরাণী'র উদয়াদিত্য, 'বিসর্জ্জনে'র জয়সিংহ, 'রাজা ও রাণী'র কুমারসেন, এমন কি রাজা নিজেও কবির আত্ম-প্রতিবিম্ব। এই কাব্যগুলির ভাব-মণ্ডল বাস্তব জীবন-রঙ্গভূমির এতই বহির্ভূত যে, তাহাতে মানব-মানবীর প্রেম বা অপ্রেম রক্তমাংস-ঘটিত কোন সংগ্রামে নিযুক্ত হয় না; সে প্রেমও প্রাণের নয়—মনের কামনা। রবীন্দ্রনাথের খাঁটি লিরিক-প্রেরণা ট্র্যাজেডির হৃদযন্ত্রটাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, ভিতরের সেই অগ্নিকুণ্ডকে—মনুষ্যচরিত্ররূপ দেহ-বাষ্পযানের সেই বয়লারটাকে, তিনি কাজে লাগাইতে পারেন নাই। নরদেহের শোণিত-শিরার সেই জ্বালা তাঁহার কাব্যে প্রায় কোথাও নাই; সেই আগুনের দূর-বিম্বিত আভা আছে, সেই জ্বালার ভাবোদ্ধৃত কাব্যরস আছে। 'বিসর্জ্জন' নাটকে গীতি-কবির আত্মভাব-প্রচার আরও অকুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যে অতিশয় ভাব-গভীর কবিত্বও যেমন পুনঃ পুনঃ ঝলসিয়া উঠিয়াছে, তেমন কবির আত্মভাব-প্রচারের দুর্দ্দমনীয় আবেগে ইহার পাত্রপাত্রীগণ ভস্ম হইয়া গিয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিসর্জ্জন' এই দুইখানি নাট্যকাব্যেই কবির কবি-যৌবন শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়াও, একটি আইডিয়ার বা মত-প্রতিষ্ঠার অতিরিক্ত আগ্রহে নিজ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা'য় যেমন নারীর অধিকার-বাদ, 'বিসর্জ্জনে'ও তেমনই, একটা ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাই কবির কাব্যপ্রেরণাকে নিরতিশয় খণ্ডিত করিয়াছে। তাই, ইহার কোন

চরিত্রই নাটকোচিত হয় নাই, অর্থাৎ প্রকৃতি বা সমাজের অনুরূপ হয় নাই। রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজা না হইয়া একজন পরম-ভাগবত বাউল-বৈষ্ণব হইয়াছে। ক্ষত্রিয়-যুবক জয়সিংহ, রাজপুত-বাচ্ছা না হইয়া মহাকবি ও দার্শনিক হইয়াছে; কতকটা হ্যামলেটের মত হইলেও সে হ্যামলেটও হইতে পারে নাই—হ্যামলেটের মত তাহার জন্মগত রাজরক্তের সংস্কার, শেষের কার্য্যটিতে ফুটিয়া ওঠে নাই। রঘুপতিও হিন্দু-মন্দিরের শাক্ত পুরোহিত না হইয়া, কবির অভিপ্রায়-সাধনের জন্য প্রাচীন মিসরের বা ফিনিসীয় দেব-মন্দিরের পুরোহিত হইয়াছে; সে তেমনই ক্ষমতালোভী, রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী, ধূর্ত্ত ও নাস্তিক; তার কারণ, সে পৃথিবীর সকল পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতিনিধি; সে-ধর্ম্মের যাহারা রক্ষক তাহারা জনগণের মূঢ় বিশ্বাসকে যেমন ঘৃণা করে, তেমনই তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকে। এই নাটকে, কবির স্বগত অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য শাক্ত বাঙালী ব্রাহ্মণকেও ঐ চরিত্র স্বীকার করিতে হইয়াছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, এই নাটকের একটি চরিত্রও ট্র্যাজেড়ির চরিত্র নয়, সকলেই অতিশয় দুর্ব্বল, ভাবের আতিশয্যে আত্মহারা। জয়সিংহের আত্মহত্যার মধ্যেও যেমন কোন সহজ মানবীয় বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির প্ররোচনা নাই, রঘুপতির পরিণামও তেমনই একটা ভাববাষ্পপূর্ণ গোলকের বিস্ফোরণ মাত্র; সে যেন এতদিন একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার সেই দুর্দ্ধর্ষ সংকল্প, সেই আত্মাভিমান তাহার চরিত্রগত নয়—সে যেন একটা মুখোস, তাই তাহার সেই সেই স্বপ্নভঙ্গের ট্র্যাজেডি একটি মেলোড্রামায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

'রাজা ও রাণী'র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এ নাটকখানিকে প্রেমের ট্র্যাজেডি বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেই প্রেমও লিরিক-প্রেম; ঐ লিরিক-প্রেম ইলা ও কুমারসেনের মধ্যে তাহার লিরিক-আবেগ নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ট্র্যাজেডির মূল নায়ক 'রাজা' ও নায়িকা 'রাণীর' চিত্রে সেই প্রেমের অভিমানই অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়াছে। এ ট্র্যাজেডিও রক্তমাংসঘটিত প্রবৃত্তির ট্র্যাজেডি নয়—ভাব-জীবনের ট্র্যাজেডি। 'রাজা' ও 'রাণী' প্রত্যেকেই আত্মনিষ্ঠ বা আত্মপরায়ণ Egoist—কাহারও ভালবাসায় আত্মদান নাই; 'রাজা'ও যেমন নিজেকে, অর্থাৎ তাহার মনের একটি ভাবকে ভালবাসে, 'রাণী'ও তেমনই, রাজাকে ভালবাসে না, সে ভালবাসে তাহার মনোগত ন্যায়-সত্যের আদর্শকে; ইহাদের কেহই রক্তমাংসের

মানুষ নয়—এক একটি ভাব-বিগ্রহ। তাই এই ট্র্যাজেডিও একখানি মনোহর গীতিকাব্য হইয়া উঠিয়াছে—ভাবের সৌরভে ও ভাষার ঝঙ্কারে রমণীয় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে এখানে এই পর্য্যন্ত।

৪

আমাদের সাহিত্যে ট্র্যাজেডির এই যে রূপান্তর বা ভাবান্তরেরে কথা বলিলাম, তাহাতে ইউরোপীয় আদর্শের ট্র্যাজেডি যে আমাদের ধাতুবিরুদ্ধ ইহা স্বীকার করিতে হয়। আমি বলিয়াছি, এই অক্ষমতার কারণ জাতিগত সংস্কৃতি ও স্বভাবের মধ্যে নিহিত আছে। কোন জাতির সাহিত্যে যে অনুত্তম কাব্য সৃষ্টি হয়, তাহা সেই জাতিরই জাতীয় রসসংবেদনার একটি পূর্ণ-বিকশিত পুষ্পিত রূপ। গ্রীকজাতিই আদি ট্র্যাজেডির জন্মদাতা; সেই জাতির বিশিষ্ট জীবন-দর্শন হইতেই ঐ কাব্যরসের উৎপত্তি। গ্রীকজাতির যে মনোধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এই যথাপ্রাপ্ত পরিদৃশ্যমান জগৎটাই তাহাদের ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা ও কবি-স্বপ্নের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কোন গভীরতর আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা তাহাদের সেই প্রকৃতি-প্রেম ও জীবন-রস-রসিকতাকে বিঘ্নিত করে নাই। প্রকৃতির ভিতরে সেই জাতি যে-নিয়মের যে সঙ্গতি ও সুষমা এবং পরিমিতির পরিচয় পাইয়াছিল, তাহার সেই শোভা ও সৌন্দর্য্যের নীতিকেই সে ধর্ম্মনীতিরূপেও বরণ করিয়াছিল। মানুষের জীবনে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম বা ব্যভিচারকে সে ভয় করিয়াছে। মানুষ যেখানে, ন্যায়-অন্যায়-বোধের স্বাতন্ত্র্য, তাহার মমত্বাভিমান বা প্রবৃত্তির প্রাবল্যকে ঐ প্রাকৃতিক সুস্থ-সুন্দর সৌষম্য-নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্রয় দিয়াছে, সেইখানে সেই নীতিই কঠিন নিয়তির রূপ ধরিয়া তাহাকে শাস্তি দিবে; সেই শাস্তিকে দেব-রোষ, 'নেমেসিস' (Nemesis) বা অলঙ্ঘনীয় প্রতিফল, অথবা 'ফিউরী' (Furies)—যে নামই দেওয়া হোক। জীবন-দর্শনের এই সরলতা, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মেরই ঐ অলঙ্ঘনীয়তা-বোধ, গ্রীকের চক্ষে মনুষ্য-জীবনকে যতখানি ভয়াল করিয়া দেখাইতে পারে—প্রবৃত্তির নগ্নতা, ঘটনার অনিবার্য্য গতি এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এ সকলই তাহার ঐ নাটককে একটি অপূর্ব্ব রস-রূপ দান করিয়াছে।

অতএব ঐরূপ ট্র্যাজেডি-রচনার পক্ষে একটি বিশেষ মনোধর্ম্মের প্রয়োজন

আছে। ঐ দ্বন্দ্ব বা প্রবৃত্তি-বিক্ষোভ, এবং ঐরূপ শোকাবহ পরিণাম যথাপ্রাপ্ত ব্যাবহারিক জগতেরই অন্তর্গত বটে, কিন্তু সকল জাতির দৃষ্টি এক নহে; এমন কি, উত্তরকালের গ্রীক-শিষ্য—ইউরোপীয় জাতিসকলের সাহিত্যেও ট্র্যাজেডির এই গ্রীক আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। মানব-জীবন ও মানব-ভাগ্যকে, প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও তাহার মূলকে, মানুষের পাপ ও মানুষের দুঃখকে তাহারা কতরূপে ভাবনা করিয়াছে; সমস্যা আরও অধ্যাত্ম-গভীর, আরও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রথম হইতেই জীবন ও জগৎকে আর এক দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাই তাহার রসানুভূতির মার্গও ভিন্নমুখী। সে এই পরিদৃশ্যমান জগৎটাকেই চূড়ান্ত মনে করে নাই, আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে সেই এক তত্ত্বকে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে নাই যে, দুঃখ-পরিণামী যাহা তাহা সত্য নহে—সকল দ্বন্দ্ব, সকল দুঃখই প্রাতিভাসিক। এই জন্য বহির্জগৎ ও জীবনের যতকিছু জটিলতা বা বিচিত্র-বিস্তার তাহার চিত্তে একটি রস-চেতনায় সমাহিত হইতে চায়; এইজন্য ভারতীয় কাব্যরস মূলে লিরিক না হইয়া পারে না; সেই রস নাটকের সাহায্যে পরিবেষণ করিতে হইলেও তাহা কাব্যই হইবে—দৃশ্যকাব্য হইবে, নাটক হইবে না। রবীন্দ্রনাথও খাঁটি ভারতীয় কবি, ঐরূপ ট্র্যাজেডি রচনা করিতে গিয়া তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও কাজ তাঁহার নহে; তাঁহার শেষ বয়সের নাটকগুলিতে তিনি আত্মসংশোধন করিয়াছিলেন।

তথাপি ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি-কাব্য সাহিত্যের একটা বড় সম্পদ; অতএব, কারণ যাহাই হউক—আমাদের কাব্যকলায় উহার অভাব একটা দৈন্যই বটে। সাহিত্যে তত্ত্বই বড় নয়; ভারতীয় তত্ত্ববাদ যত উচ্চই হোক, সেই তত্ত্ব নিম্নতর ভূমিতে রসসৃষ্টির বাধা হইবে কেন? ইহার কারণ, ঐ তত্ত্বকে আমরা জীবনের সহিত জড়াইয়া লইয়াছি। আমাদের সমাজ-জীবনে ও সংসারযাত্রায় ঐ তত্ত্বের এমনই প্রভাব যে, আমরা এখন আর জীবন হইতে তত্ত্বে আরোহণ করি না, তত্ত্ব হইতেই জীবন আরম্ভ করি। নহিলে ঐ তত্ত্বেরই কোন একটা রূপ যে রস-রূপ ধারণ করিতে পারে, শেক্সপীয়ারের অমর ট্র্যাজেডিই তাহার প্রমাণ। তাহাতে যে তত্ত্ব উঁকি দিতেছে তাহা ত হিন্দুদর্শন ও হিন্দুসাধনারই অনুমত। সে তত্ত্ব হিন্দুরই আর এক রসতত্ত্ব—শক্তি-লীলার তত্ত্ব। সেই শক্তি জীবনের ঊর্দ্ধে বা বাহিরে বিরাজ করে না; মানুষের জীবনে তাহার সহিত অদ্বৈতরূপে এক হইয়া যে লীলা

করিতেছে, তাহাই শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিগুলির রস ; তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপীয় জীবন-দর্শনও সেই গ্রীক জীবন-দর্শন হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে, এবং শেষে তথাকার এক কবি-ঋষি যে রসরূপে যাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাও ভারতীয় সাধনার বিরোধী নয়। শেক্সপীয়ারের নাটকে যদি কোন নিয়তির লীলা থাকে, তবে সে নিয়তি মানুষের প্রভু নয়, সে লীলা তাহার নিজেরই লীলা ; এইজন্যই সেই এক জীবন, কমেডি হইতে ট্র্যাজেডিতে, এবং ট্র্যাজেডি হইতে কমেডিতে—কখনো সূর্য্যালোকিত উর্ম্মিমালায়, কখনো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে, তুঙ্গ তরঙ্গে—উলসিত বিলসিত হইতেছে। সেই একই শক্তি কখনো হাস্যপরিহাসাদিরসালাপবিনোদিনী, কখনো বিকীর্ণমূর্দ্ধজা, বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী। এ সকলই মানুষের অন্তরবাসিনী সেই একেরই লীলা ; সে যেমন নিজের ফুলশয্যা নিজেই রচনা করে, চিতাশয্যাও তেমনই তাহারই রচনা। এই জন্যই শেক্সপীয়ারের নাটকে যে ধ্বংসের ছায়া ঘনঘোর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোন বহির্গত নীতি বা ধর্ম্মের প্রশ্ন নাই ; নাই বলিয়াই একদিকে তাহা যেমন নিদারুণ বলিয়া মনে হয়, আর একদিকে তাহাই একটি পরমরহস্যের বিস্ময়রসে হৃদয় আপ্লুত করে। শেক্সপীয়ার প্রকৃতি-পুরুষের ঐ দ্বন্দ্বকে লীলারূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই সেই দ্বন্দ্বে পুরুষ প্রায় সর্ব্বত্র পরাজিত হইলেও কুত্রাপি তাহার অসদ্‌গতি হয় নাই ; 'হ্যামলেট'-এ পুরুষ এবং 'অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা'য় প্রকৃতি কিছু অধিক প্রাধান্য লাভ করিলেও, শেষপর্য্যন্ত পুরুষের মহিমা প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির মহিমা পুরুষকে সমান মুগ্ধ করিয়াছে ; প্রকৃতি বা পুরুষ কাহারও মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। য়ুরোপ এই লীলাতত্ত্ব জানে না, তাই শেক্সপীয়ারের নাটকগুলিকে লইয়া এখনও সেখানকার রসিকসমাজে বিচারণার অন্ত নাই।

শেক্সপীয়ারের নাটকে যদি কোথাও দৈব বা অদৃষ্টের স্পষ্ট ছায়াপাত থাকে, তবে তাহাও নাটকের বহিরঙ্গ মাত্র, সেইটাই প্রধান তত্ত্ব নয় ; তৎসত্ত্বেও নায়ক-নায়িকার চরিত্র বা তাহাদের নিজশক্তির মহিমাই নাটককে রসোজ্জ্বল করিয়াছে ; এই অর্থে ঐ নাটকগুলির মুখ্য রস—'Romance of Character'। নায়কের সেই শোকাবহ পরিণাম—তাহার সেই সর্ব্বনাশ, যদি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়, সেও ঐরূপ একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়তির কারণে নহে ; বরং ইহাই মনে হয় যে, মানবীয় সত্তার সম্ভাবনা অসীম বলিয়া পার্থিব জীবনের গণ্ডি ঐভাবে বিদীর্ণ করাই

তাহার গৌরব—ঐ সর্ব্বনাশ সেই কারণেই অবশ্যম্ভাবী। এই কথাটাই একজন মনীষী সমালোচক আর এক ভাষায় বলিয়াছেন—

"The purest reality, the purest beauty, the purest love, cannot, by its own nature, manifest itself here on earth without disaster; but in disaster it can."

—মানুষের সেই পূর্ণতম সত্তাই purest reality; তাহাতে আমাদের ভারতীয় চিন্তা যোগ করিয়া বলা যাইতে পারে—ঐ সত্তার বাহিরে আর কোন reality নাই। 'But in disaster it can'—ইহার অর্থ, তাহার সেই পূর্ণ-মহিমা প্রকাশিত করিয়া দেখাইতে হইলে, ঐ disaster বা সর্ব্বনাশকেই চাই। শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির মূল তত্ত্ব ইহাই।

তথাপি যদি ঐ অদৃষ্টকে কোন অর্থে স্বীকার করিতে হয়, তবে একজন জার্ম্মাণ মনীষী তাঁহার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই যথার্থ, অর্থাৎ—'Character is Fate'। ইহাতেও হিন্দুর আপত্তি নাই, কারণ, তাহারও মতে মানুষের ঐ character আর কিছু নয়—তাহারই ভোগায়তন মানস-দেহ, পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের দ্বারা উহা গঠিত হইয়াছে; অতএব উহা তাহার নিজেরই সৃষ্টি; সেখানেও সে নিজেই কর্ত্তা, আর কোন শক্তির কর্ত্তৃত্ব নাই। ইহাকেই রস-দৃষ্টিতে দেখিলে যাহা হয় শেক্সপীয়ারের নাটক তাহাই। আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয়; ট্র্যাজেডির সেই Villain, বা সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য যে একটি অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত চরিত্রের অবতারণা—আধুনিক ট্র্যাজেডি-কল্পনায় তাহাও আর আবশ্যক হয় না। এখন ট্র্যাজেডির তত্ত্ব আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছে, একজন আধুনিক ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিকের মতে—

In tragic life, God wot,
No villain need be! Passions spin the plot,
We are betrayed by what is false within.

—ইহাও হিন্দুরই কথা, এবং ইহাই যদি ট্র্যাজেডির একটা মূল তত্ত্ব হয় তবে আমাদের সাহিত্যে ট্র্যাজেডি-রচনার বাধা কি?

আমি, ট্র্যাজেডি-রচনায় তত্ত্ব-বিশেষের উপযোগিতার কথা বলিতেছিলাম, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, কবিগণ আদৌ কোন একটা তত্ত্বকেই কাব্যের আকারে রূপ দিয়া থাকেন। কোন তত্ত্ব যদি কবি-চিত্ত স্পর্শ করে, তবে

তাহা আর তত্ত্ব থাকে না, কবি তাহা হইতে একটা রস-প্রেরণা লাভ করেন মাত্র। আধুনিক কালে কবিমানসে তত্ত্বের প্রভাব কিছু বেশি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ফলে, একজন ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক ট্র্যাজেডিকে যেন একটা তত্ত্বেরই বাহন করিয়াছেন; এই তত্ত্বও ভারতীয় চিন্তার একটা বিশেষ ধারাকে, সম্পূর্ণ না হোক, আংশিক সমর্থন করেন। জার্ম্মাণ দার্শনিক শোপেনহাউয়ের ভারতীয় দর্শন হইতে ইঙ্গিত পাইয়া দুঃখবাদের যে নব্য বৌদ্ধ-দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, ইংরেজ কবি টমাস হার্ডি তাহাকেই যেন কাব্যসৃষ্টিতে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সেই উপন্যাসগুলিতে, একটা অন্ধ অথচ সদাজাগ্রত, বিবেকহীন নির্ম্মম শক্তি মানুষের সকল প্রয়াসকে নিষ্ফল করিয়া দিতেছে; সেই শক্তির নিকটে, ন্যায়, সত্য, প্রেম কিছুরই কোন মর্য্যাদা নাই, মানুষের সকল মহিমাই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই নূতন ট্র্যাজেডিতে মানুষের আত্মস্ফূর্ত্তির কোন অবকাশই নাই; ইহার যে কাব্যরস তাহাকে কি নাম দেওয়া যায়? কিন্তু তাহাই আমার প্রশ্ন নয়; আমার বক্তব্য এই যে, ঐ ট্র্যাজেডির কাব্যরস যেমনই হোক, উহার অন্তর্গত তত্ত্ব আমাদের চিন্তায় নূতন নয়—বেদান্ত না হোক, বৌদ্ধ শূন্যবাদের সহিত উহার জ্ঞাতিত্ব আছে। কিন্তু ঐরূপ ট্র্যাজেডিও আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেখা দেয় নাই। তাহার কারণ সেই একই,—আমরা এরূপ তত্ত্বকেও একেবারে রস-রূপে আস্বাদন করি, জীবনের ক্ষেত্রে তাহা বেশীক্ষণ থাকিতে পায় না, একটি ভাবস্থির অনুভূতিরূপে তাহা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গীতি-কাব্যের সৃষ্টি করে; ঐ ধরণের নাটক বা ট্র্যাজেডি কোনটাই আমাদের আয়ত্ত নহে।

৫

এ পর্য্যন্ত আমি ট্র্যাজেডির শাস্ত্রসম্মত রূপ ও তাহার তত্ত্বই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ট্র্যাজেডির অর্থ আরও ব্যাপক করিয়া ধরিলে—তাহার নাটকীয়রূপ যেমনই হোক, জীবনে তাহাকে আমরা নানারূপে দেখিয়া থাকি এবং তাহাতেও এই রসের চকিত-চমক থাকে। ট্র্যাজেডি শব্দটির এখন যে বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার কারণ আছে। জীবনে যে দুঃখ আছে—সেই দুঃখের বৈচিত্র্য ও ভীষণতার অন্ত নাই, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। সেই দুঃখ সাহিত্যের কোন একটা বিশেষ রসরূপে নাটকীয় ঘটনাচক্রের সুবলয়িত আকারে, এবং তন্নিহিত

একটি তত্ত্বরূপে ফুটিয়া না উঠিলেও, সেই দুঃখকে সহ্য করিবার খাঁটি ট্র্যাজিক চরিত্র আমরা জীবনে প্রায়ঃ দেখিয়া থাকি; অতএব আধুনিক কাব্যে উপন্যাসে তাহার প্রতিচ্ছায়া থাকিবেই। এ কালের রসিক-চিত্তে রসসঞ্চারের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট; জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবুকতা অনেক বাড়িয়াছে, এজন্য সবই আর চোখে দেখিতে হয় না, ঐ ইঙ্গিতই যথেষ্ট, তাহা হইতেই পুরা নাটকখানি মনের মধ্যে নানা আকারে গড়িয়া লওয়া যায়। ট্র্যাজেডির সেই খণ্ডরূপ আমাদের নব্য সাহিত্যে দেখা দিয়াছে; সে কেমন তাহারই কিছু দৃষ্টান্ত, এবং তাহাতেও আমাদের ভারতীয় মনোভাব কিরূপ সাড়া দিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া আমি বর্ত্তমান আলোচনা শেষ করিব।

ইহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত, রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' নামক কবিতাটি। ঐ কবিতার ট্র্যাজেডি-কল্পনা অন্যরূপ—খাঁটি লিরিকের অনুরূপ; তথাপি সেই লিরিক-ট্র্যাজেডিকে ঘনঘোর করিয়া তুলিয়াছে যে একটি নাটকীয় ঘটনাবস্তু, কবি তাহাকে কেবল একটি বিদ্যুৎচমকের মত, ইঙ্গিতে শেষ করিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। মূল কবিতার সেই লিরিক বায়ু-মণ্ডলকে বিদীর্ণ করিয়া সহসা এই বজ্রধ্বনি হইল—

> "বালক কিশোর
> উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ-প্রেমে মোর
> উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
> তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
> দিয়েছে আপন প্রাণ।"

লিরিক কবির পক্ষে ইহার অধিক প্রয়োজন হয় না, ঘটনার দারুণতাও তাঁহাকে ত্রস্ত করে। মূল কবিতাটির ট্র্যাজেডি অন্যরূপ, কবি সেই ট্র্যাজেডিকেই বড় করিয়াছেন। ঐ ট্র্যাজেডি স্থূল, নায়িকার ট্র্যাজেডি আরও সূক্ষ্ম। তথাপি উহাই যেন মূল ট্র্যাজেডি, ঐ ক্ষুদ্র কলেবরেও সে যেন অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে, এবং তাহার ফলে মূল কবিতার রস-সংবেদনা ম্লান হইয়া গিয়াছে। এখানেও রবীন্দ্রনাথ ঐ 'উন্মত্ত অধীর' প্রেমকে, নিছক রক্তমাংসঘটিত একটা দুর্ব্বার প্রবৃত্তিরূপেই দেখিয়াছেন; তাহার পরিণাম যতই শোকাবহ হউক, তাহার কোন moral সত্য নাই বলিয়া, তিনি ঐ কবিতায় অপরবিধ ট্র্যাজেডিতেই

আকৃষ্ট হইয়াছেন; তাহার কারণ, সেই অপর ট্র্যাজেডির যে হাহাকার তাহাতে শান্তিরও একটা moral গৌরব আছে, অন্যটিতে সেই য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির বিরাট শূন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে।

এইবার শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'শ্রীকান্ত' হইতে এইরূপ একটি খণ্ড-ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত দিব। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম খণ্ডে ইহার এমন একটি বাস্তব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা কল্পনাকেও পরাস্ত করে; তথাপি সে যে কল্পনা নয় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লেখকের রচনাভঙ্গিতেই—তাঁহার কণ্ঠস্বরেই—পাওয়া যাইতেছে; লেখকের চক্ষেও সে যেন একটা হৃদয়স্তম্ভনকারী revelation বা দিব্যদর্শন। ঘটনাটি সেই 'অন্নদাদিদি'র চরিত্র ও জীবনসম্পর্কিত। এই ট্র্যাজেডিও উপরের ঐ কবি-কল্পিত ট্র্যাজেডি অপেক্ষা কম নিদারুণ নহে, বরং ভিতরে দৃষ্টি করিলে দুইটাই প্রায় একজাতীয় বলিয়া মনে হইবে। দুইটির মধ্যেই সেই এক frustration বা চরম ব্যর্থতার সান্ত্বনাহীন দুঃখ আছে। নাটক রচনা করিতে হইলে, উহাকেই যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কলাকৌশলে সাজাইতে হইত, এরূপ রচনায় তাহার অবকাশ নাই—প্রয়োজনও নাই। তথাপি এই কাহিনীতে action বা ঘটনাধারার প্রত্যক্ষ বাস্তবতাও কিছু আছে, সেই কারণেই ঐ চরিত্রের নাটকীয় রূপ কিছু অধিক ফুটিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই ট্র্যাজেডিও খাঁটি লিরিক—উহার প্রেরণা শাক্ত নয়, বৈষ্ণব। এই গল্পটি হইতেও, লেখকের সেই খাঁটি ভারতীয়, তথা বাঙালী-চিত্তের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কারণ, এই গল্পে লেখক বেদনার যে পাষাণ-কঠিন নারী-বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে ট্র্যাজেডির নির্ম্মমতা আছে বলিয়াই তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না, তাহার একটা অর্থ করিতে না পারিলে তাঁহার ভারতীয় প্রাণ কিছুতেই আশ্বস্ত হইবে না। অন্নদাদিদির সেই নির্ম্মম আত্মনিগ্রহ যে শক্তির পরিচায়ক, সেই শক্তিকে পূজা করিলেও, তিনি তাহার সেই দুর্গতি, তাহার মহিমার প্রতি অন্যায়ের সেই অট্টহাস্য, কিছুতেই মানিয়া লইবেন না—তেমন শক্তি কখনও শিবহীন হইতে পারে না। তত্ত্বঘটিত এই যে ক্ষুধা ইহাই খাঁটি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা—এ ক্ষুধা সাহিত্যে লিরিক প্রেরণা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। ইহাই শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রকে আকুল করিয়াছে—সারাজীবনে সে একটা বহ্নিমান উল্কার মত ছুটিয়া চলিয়াছে, যতক্ষণ না সেই প্রশ্নের সদুত্তর মেলে

ততক্ষণ জীবনের সকলই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ; সেই ক্রুশবিদ্ধ নারীর অসীম যাতনা, এবং যাতনার মধ্যেই তাহার মুখের সেই ততোধিক কঠিন প্রসন্নতা, তাহাকে একটা দুঃস্বপ্নের মত অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু বিচলিত হয় নাই একজন—সে ইন্দ্রনাথ ; সে যেন ঐ অন্নদাদিদির আধ্যাত্মিক সহোদর—দুইয়ের প্রকৃতি একই ধাতুতে গঠিত ; তাই অন্নদাদিদি ইন্দ্রনাথের দান গ্রহণ করিত, শ্রীকান্তের দান গ্রহণ করিতে পারে নাই ; শ্রীকান্তের দুর্ব্বলতাকে সে পরম স্নেহের চক্ষে দেখিত, ইন্দ্রনাথকে সে সমকক্ষের মত শ্রদ্ধা করিত। ঐ ইন্দ্রনাথের প্রকৃতিই খাঁটি ভারতীয় আদর্শের অনুরূপ—ট্র্যাজেডি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার চেতনার চতুঃসীমানায় তাহা নাই। সে মুক্ত পুরুষ, তাহার দয়া আছে—মমতা নাই, প্রেম আছে—আসক্তি নাই। শ্রীকান্তের প্রকৃতিও যদি ঐরূপ হইত তাহা হইলে আমরা এই 'শ্রীকান্ত'কেই পাইতাম না। শ্রীকান্ত বাঙালী, বাঙালী বলিয়া তাহার মমতা আছে, ভাবাকুলতা আছে ; আবার ভারতীয় বলিয়া, সে সকল আকুলতা ও উৎকণ্ঠার একটা সমাপ্তি বা সার্থকতা চায় ; যতক্ষণ তাহা না পাইতেছে ততক্ষণ সেই জ্বালাকে সে পরিহার করিবে না, আবার চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণও করিবে না। শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের এই মজ্জাগত বাঙালী-সংস্কার ও বাঙালী-হৃদয় ঐ উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে পূর্ণ চরিতার্থ হইয়াছে,—মুরারিপুরের আখড়ায় সেই দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হইয়াছে ; বৈষ্ণবী কমললতার প্রেম-সাধনার সেই তটহীন সাগর-সঙ্গমে শ্রীকান্তের হৃদয়-নদীর অশান্ত আক্ষেপ চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

তখন অন্নদাদিদির জীবনের সেই মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডিও তাহার প্রাণকে আর আকুল করিবে না ; সে ট্র্যাজেডি যতই শোকাবহ হৌক, যতই সহানুভূতির যোগ্য হৌক, তাহার ট্র্যাজেডিত্ব লোপ পাইবে, তাহার অর্থই অন্যরূপ দাঁড়াইবে। ভারতীয় সংস্কারের সেই আইডিয়ালিজ্‌ম্ প্রেমের ঐ ট্র্যাজেডিকে আর এক চক্ষে দেখিবে—এবং তাহাতে বাঙালী-প্রাণ যুক্ত হইয়া, প্রেমের ব্যর্থতাকেও বৃন্দাবন-স্বপ্নে সার্থক করিয়া তুলিবে। বাঙালীর অতি নিজস্ব সেই বৈষ্ণব-ভাবসাধনায়——'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া'—সকল আত্যন্তিক হৃদয়-বেদনার যে পরমৌষধি মিলিয়াছে, প্রেমের বিষকেই অমৃতে পরিণত করিবার যে রসায়ন সে আবিষ্কার করিয়াছে, শ্রীকান্ত কমললতার মধ্যে তাহাই সাক্ষাৎ-দর্শন করিয়া তাহার প্রাণের

সেই বিষম উৎকণ্ঠা নিবারণ করিল। রাজলক্ষ্মীর মত ইন্দ্রাণীও যাহা পারে নাই, এই ভিখারিণী বৈষ্ণবীই তাহা পারিল! তখন সে অন্নদাদিদির জন্যও আর দুঃখবোধ করিবে না—বুঝিবে যে, যে-বস্তুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই নারী জীবনের অতি দুর্গম পথে অভিসার করিয়াছে—পরমতীর্থে পৌঁছিয়া পরমসুন্দর প্রাণেশ্বরের পদে তাহা নিবেদন করিবার পূর্ব্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই। এ যাত্রায় এ পর্য্যন্ত তাহার ভুল হইয়াছে, তাহার সেই প্রেম পাত্রভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি কোন মিথ্যা, কোন মৃত্যুই সেই প্রেমকে আত্মভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, তাই সেই মোহের মধ্যেও সে আপন সত্যে আপনি অটল। তাহার সেই হৃদয়বহ্নি নিরাধার হইয়াই একদিন নিজের মধ্যেই আধার খুঁজিয়া পাইবে—সে আধার যে কি, কমললতাকে দেখিয়া শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল। অন্নদাদিদিও সেই একই পথের পথিক—একটু পিছাইয়া আছে মাত্র। প্রেমের, তথা জীবনের চরম সার্থকতার যে বাধা তাহাই ট্র্যাজেডির রূপ ধারণ করে; কিন্তু তাহাই ত' পূর্ণ সত্য নয়, এজন্য ট্র্যাজেডি-মাত্রেই মিথ্যা; সেই বাধা দেহের বাধা মাত্র—আত্মার নয়; ইহাও যেন সেই কথা—

"The purest reality, the purest beauty, the purest love, cannot, by its own nature, manifest itself here on earth without disaster; but in disaster it can.

* * * *

ইহাই ভারতীয় প্রকৃতির অতি গভীর অন্তর্নিহিত সংস্কার; এখানকার মানুষ যদি দুঃখের কঠোরতম মূর্ত্তিকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করে, মনে তাহা স্বীকার করিতে বাধে। সেই দুঃখকে যেমন করিয়া হোক সে পরাস্ত করিবেই; যাহারা দুর্ব্বল তাহারা পরাজয় স্বীকার করিলেও—কাঁদিবে, তবুও বিশ্বাস করিবে না; পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিবে, পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিবে না। যাহারা শক্তিমান তাহারা, হয় ইন্দ্রনাথের মত তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, নয় কমললতার মত, তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া তাহার সেই শিখা-শতদলেই আত্মার পদ্মাসন রচনা করিবে। আধুনিক কবি-শিল্পী বেদনার সেই মনোহরণকে রস-সৃষ্টির কাজে লাগাইয়াছেন বটে—কিন্তু সেও তাহার ঐ লিরিক সৌন্দর্য্যটুকু মাত্র; "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"

—ইহার অধিক প্রয়োজন তাঁহাদের নাই, সাধ্যও নাই; প্রয়োজন নাই এই জন্য যে, দুঃখ যদি মধুরই হইল তবে তাহার সেই ব্যাবহারিক দুঃখরূপ আর রহিল কোথায়? বরং প্রমাণ হইল যে, দুঃখও দুঃখ নয়, আসলে তাহাও একটা রস। এজন্য আমাদের কবি-প্রেরণা মুখ্যত লিরিক বা গীতি-প্রাণ হইতে বাধ্য; ভাবের দিক্ দিয়া যাহা একটি সর্ব্বদ্বন্দ্ববিরহিত তত্ত্বচেতনায় নিবৃত্তি লাভ করে, রসের দিক দিয়া তাহাই একটি অখণ্ড সুরমূর্চ্ছনায় পর্য্যবসিত হয়। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি যিনি, সেই রবীন্দ্রনাথও কাব্যের এই আদর্শকে মহিমান্বিত করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন—

জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ?
সকালে ফুটিছে সুখদুখ লাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা;
শুধু তা'র মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর,
মগন গগনতল।

এইজন্য আমাদের কাব্যে ঐ নাটক বা ট্র্যাজেডির রস পূর্ণমর্য্যাদা লাভ করে নাই, জীবনের বাস্তব-জটিল দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও তাহার নানা আকার ও প্রকারকে আমরা এমন মূল্য দিই না যে, কাব্যের মধ্যে ঐরূপ একটা মহিমায় তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যে দুইটি খণ্ড-ট্র্যাজেডির উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি, ঐরূপ ট্র্যাজেডিই আমাদের রস-চেতনার পক্ষে যথেষ্ট; উহারও রঙ্গস্থল বাহিরে নয়, ভিতরে; দ্বিতীয়টির মত যদি তাহাকে একটু বেশী বাহিরে টানিয়া আনা হয়, তবে তাহার জন্য কিরূপ রসায়নের প্রয়োজন—শ্রীকান্তরূপী খাঁটি বাঙালী কবি তাহা অতিশয় সত্য ও সুন্দর-রূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

[আশ্বিন, ১৩৫৩]

হাস্যরস ও হিউমার

ইংরেজি 'হিউমার' শব্দটির একটা অতি স্থূল সাধারণ প্রয়োগ আছে, তাহার বাংলা প্রতিশব্দ 'হাস্যরস' হইলে আপত্তি নাই, অবশ্য যদি তাহাতে নির্দোষ রস-উপভোগের হাস্যই বুঝায়। বাংলায় হাসি বলিতে যেমন—হাসি, তামাসা, মস্‌করা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক, রসিকতা, ভাঁড়ামি, রঙ্গরস, প্রভৃতি নানা ধরণের হাসি বুঝায়, ইংরাজিতেও তেমনই—Fun, Pleasantry, Jest, Buffoonery, Ridicule, Wit, Irony, Satire—প্রভৃতি শব্দ আছে। ইহাদের মধ্যে Wit, Satire, Irony—সাহিত্যিক পরিভাষার অন্তর্গত, ইহারা শুধু হাসি নহে—হাস্যরসের গূঢ়তর ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যবোধক। আমাদের ভাষাতেও হাসি-তামাসার কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গীর চল্‌তি নাম আছে, কিন্তু সাহিত্যিক পরিভাষায় তাহাদের কোন শ্রেণীবিভাগ নাই। রবীন্দ্রনাথ 'হাস্যকৌতুক' নাম দিয়া একদা যে-রসের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাও একটা স্থূল বস্তু—Sublime-এর বিপরীত Ridiculous বলিতে যাহা বুঝায়—সে তাহাই, সংস্কৃত 'হাস্যরসে'র ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত। কিন্তু Fun, Pleasantry, Jest, Buffoonery এবং আমাদের হাসি-তামাসা, রঙ্গরস, ভাঁড়ামি—এ সকলের একটা সাধারণ গুণ এই যে, ইহাদের মধ্যে যে-হাসির উত্তেজনা আছে তাহা সম্পূর্ণ বাহিরের ব্যাপার; কাজ বা কথার কায়দাই ইহার প্রাণ। Wit-এর মধ্যে মার্জ্জিত বুদ্ধির বাক্‌চাতুর্য্যই তাহার প্রধান রস—সংস্কৃত 'বৈদগ্ধ্য' বা বাংলায় সোজাসুজি 'রসিকতা' তাহার প্রতিশব্দ হইতে পারে,—যদিও রসিকতা শব্দটির আরও ব্যাপক অর্থ হয়। কিন্তু Satire ও Irony এই ধরণের আমোদের ব্যাপার নয়, ইহার উদ্দেশ্য ভিন্ন—এ হাসিতে শুধুই দন্ত নয়, দংষ্ট্রা-বিকাশ থাকে। উভয়েরই অভিপ্রায়—বিদ্রূপ; কিন্তু তফাৎ এই যে—Satire খোলাখুলি বিদ্রূপ, Irony চাপা-বিদ্রূপ; ইহাতে একটি বক্র-ভঙ্গি বা শ্লেষ থাকে; আবার, শ্লেষের কারণ অনুসারে Irony-র প্রকার ও মাত্রাভেদ ঘটে। Satire স্পষ্ট ও খোলাখুলি বিদ্রূপ হইলেও, ইহা যখন একটু বক্রভঙ্গীযুক্ত হয়, তখন ইহাকে Sarcasm বা টিটকারী বলা যাইতে পারে; তখনও কিন্তু ইহা Irony নয়,—যদিও সাধারণ ডিক্সনারিতে Irony-র প্রতিশব্দ

Satire-ও লেখে। ব্যাপক অর্থে Irony শুধু কথায় নয়, কাজেও হইতে পারে, যথা—'ironical cheers'; এবং সংস্কৃত 'সোৎপ্রাস উক্তি'ও Irony-র প্রতিশব্দ হইতে পারে; এই সঙ্গে 'Dramatic Irony' ও 'Irony of Fate' বাক্য দুইটিও স্মরণযোগ্য। কিন্তু Irony শুধু চাপা-বিদ্রূপ নয়,—বিদ্রূপের বক্রভঙ্গিতে ব্যথা ও মর্ম্মপীড়াও ফুটিতে পারে। Lear-এর Fool-এর হাস্য এই জাতীয়; আমাদের দ্বিজুরায়ের Satire-ও এইরূপ Irony-র সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। শরৎচন্দ্রের হাস্যরস অধিকাংশস্থলে এইরূপ মর্ম্মপীড়াজনিত Irony; রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার-সভা'র প্রধান রস যেমন Wit, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে যে-ধরণের হাস্যরস আছে তাহা প্রধানতঃ—Irony। তথাপি রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে পরিমাণ হিউমার আছে, শরৎচন্দ্রের তাহা নাই; একেবারে নাই বলি না, কিন্তু শরৎচন্দ্র যে একজন 'হিউমার'-রসদক্ষ লেখক, একথা সর্ব্বৈব অযথার্থ; কারণ, শরৎচন্দ্র যে-মাত্রায় sentimental, তাহাতে খাঁটি হিউমার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

এখন কথা হইতেছে তবে 'Humour' পদার্থটি কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্থূল অর্থে 'হিউমার' হাস্যরসই; তবে সে-রস আমোদ বা কৌতুক-প্রধান—মর্ম্মদাহ, আক্রোশ, তাহাতে নাই। আবার তাহা নিকৃষ্ট Farce-ও নয়। এই অর্থে, American বা English Humour বলিতে আমরা এক এক জাতীয় হাস্যরস-রসিকতার নমুনা বুঝি। সবদেশের সব মানুষই হাসে; একটা প্রাকৃত হাস্যরস (ঠাট্টা, মস্‌করা, ভাঁড়ামি) সকল দেশের লোকেই অল্প-বিস্তর চর্চ্চা করে। কিন্তু 'হিউমার' বলিতে এই অর্থে যে হাস্যরস-রসিকতা বুঝায়, হয়ত কোন জাতির মধ্যে তাহার তেমন প্রাচুর্য্য নাই, তাহারা এ রসের তেমন পক্ষপাতী নয়—Scotch জাতির এ দুর্নাম আছে। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতারাও এ বিষয়ে তেমন সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ইহাই হিউমার-শব্দের প্রচলিত অর্থের মোটামুটি সঙ্কেত। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনায় 'হিউমার' শব্দটির আর একটি গভীরতর ও মহত্তর আলঙ্কারিক অর্থ আছে। এই সূক্ষ্মতর অর্থে 'হিউমার' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে দেখা যাইবে, লেখকের রচনায় 'হিউমার'-এর রূপ যেমনই হোক, তাহার অন্তরালে লেখকের একটি মানস-ধর্ম্ম (an attitude of the mind) পরিস্ফুট হইয়া উঠে। জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা নির্লিপ্ত অথচ সহৃদয় মনোভাবই 'হিউমার'-এর মূল উৎস। জ্বালা, মর্ম্মপীড়া বা ন্যায়-অন্যায়-

বোধের আক্রোশ ত নহেই—কোন উচ্ছ্বাস বা অবসাদের অভিব্যক্তি খাঁটি 'হিউমার'-এর লক্ষণ নয়। মানুষের সর্ব্ববিধ নির্ব্বুদ্ধিতা,—তাহার অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, এবং বিশেষ করিয়া, ভাগ্যের পরিহাস-নিষ্ঠুর পীড়নে মানুষের যে চিরন্তন অসহায় অবস্থা—তাহার সম্বন্ধে অতিশয় ধীরবুদ্ধি ও আক্ষেপহীন মনোভাব রক্ষা করিয়া, সেই সকলের উপরে একটি লঘু-হাস্যের আলোকপাত করার যে প্রতিভা বা রসবোধ, তাহা হইতেই খাঁটি 'হিউমার'-এর উৎপত্তি হয়। এইরূপ রস-রচনার পক্ষে লেখককে সাধারণ মানবীয় সংস্কারের কিছু উর্দ্ধে উঠিতে হয়। এ রস-রসিকতার ক্ষমতা যেমন সকলের থাকে না, তেমনই সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভার মধ্যে অল্পবিস্তর এ রসের সন্ধান মিলিবে। এ রস অতি স্থূল হাস্যরস নয় বলিয়াই, এ রস উপভোগ করিতে হইলেও পাঠকের বিশিষ্ট রসবোধ বা taste থাকা চাই। আমার মনে হয়, যাঁহাদের এই 'sense of humour' আছে তাঁহারাই খাঁটি রসিক; এবং সাহিত্য-রসবোধের যে অভাব অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়—যে 'সহৃদয়তা'র অভাবই 'অরসিকতা'র কারণ—তাহার মূলে এই 'sense of humour'-এর অনটন লক্ষ্য করা যাইবে। সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষায় 'sense of humour' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাকেই আর একটু সূক্ষ্ম ও গভীর করিয়া লইলে এই রসিকতার লক্ষণ মিলিবে। স্থানকাল-পাত্রোচিত সামঞ্জস্যবোধ, বা sense of proportion না থাকিলে, আমরা যেমন মানুষকে হীনবুদ্ধি বলিয়া নিন্দা করি, তেমনই, মানুষের জীবন, তাহার চরিত্র ও ভাগ্য-সম্বন্ধে যাঁহার মনের মধ্যে একটি ভাব-সাম্য বা স্থিরবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে নাই—তাঁহাকেই আমরা এই অর্থে বেরসিক বলিতে পারি। মানুষের সমগ্র জীবন বা জগতের সব-কিছু সম্বন্ধে এই যে মনোভাব, ইহাতে কোন তত্ত্বসন্ধান বা সত্য-জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি নাই, একটা সামঞ্জস্য-বোধের রস-কল্পনামাত্র আছে—এইজন্য ইহাকে আমরা রসিক-বুদ্ধি (Poetic Reason) বলিতে পারি। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাপ-পুণ্য—মানুষের শক্তির অহঙ্কার ও অশক্তির দৈন্য—এই রস-কল্পনায় একটি সমান ভাবরসে অভিষিক্ত হইয়া যে রূপ ধারণ করে তাহাতে হাস্যরসের কোন জ্বালা বা আক্রোশ থাকে না; ইহাতে, করুণরসের মধ্যেও একটি উদাসীন নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা নিহিত থাকে। এইজন্য এইরূপ হাস্যরসে-যেমন জ্বালা বা আক্রোশ থাকে না, তেমনই ইহা করুণ-রসেরও বিরোধী নয়; Farce-এর মধ্যে

খাঁটি 'হিউমার'-কে প্রায়ই উঁকি দিতে দেখা যায়, সেই সকল স্থানে অতিশয় লঘু হাস্যরসও উৎকৃষ্ট কাব্যরসে পরিণত হয়। 'হিউমার'-এর মধ্যে যে সহৃদয়তা আছে তাহা ঠিক কারুণ্য বা করুণরস নয়, তথাপি অনেক উৎকৃষ্ট হিউমার-রস-রচনায় করুণরসের রেশ থাকে। Lamb-এর 'Easays of Elia' এবং Mark Twain-এর রচনায় হিউমার প্রায়ই একরূপ করুণরসের দ্যোতনা করে; কিন্তু সেখানেও সেই করুণরসের মধ্যে লেখকের মনোভাবের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে—পাঠক যদি নিজে না sentimental হন, তবে তাহা খাঁটি হিউমার বলিয়াই বুঝিতে পারিবেন। ডিকেন্সের লেখায় এই হিউমার বড় সহজেই করুণ-রসের প্রশ্রয়ে সংযম হারাইয়াছে; এইজন্যই বোধ হয়, ডিকেন্স্‌কে সুইনবার্ণ 'master in the conterminous provinces of laughter and of tears' —বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তথাপি, হাস্যরসের মধ্যেই করুণরস, এবং করুণরসের মধ্যেই হাস্যরসের সৃষ্টি—উৎকৃষ্ট হিউমারের লক্ষণ; কারণ, হিউমার-রস-রসিকের কল্পনায় হাসি ও কান্না তুল্যমূল্য, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদের দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলিতে হাস্যের অন্তরালে এই গুণ আছে বলিয়াই অমৃত বসুর প্রহসন অপেক্ষা সেগুলি অধিকতর সাহিত্যগুণোপেত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'লীলাবতী'র হেমচাঁদ-চরিত্রে অতি সূক্ষ্মভাবে এই রস সঞ্চারিত হইয়াছে। 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, যুবা সাজিয়া, নকল বাসর-ঘরে নকল-শালাজদের কানমলা সহ্য করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন সহসা—'মরে গেছি! মরে গেছি! ও রামমণি!' বলিয়া তাহার বৃদ্ধবয়সের একমাত্র পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী বর্ষীয়সী বিধবা কন্যার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে—তখন এই হাস্যরসে আর এক রসের সঞ্চার হয়; নিজ বার্দ্ধক্য অস্বীকার করিয়া যে-বৃদ্ধ বিগত-যৌবনের অভিনয় করিতেছে, সে যে কিছুতেই জরাকে ফাঁকি দিতে পারিতেছে না, নিমেষের মোহও টিকিতেছে না,—নিয়তির সহিত কঠিন সংগ্রামে বিমূঢ় মানবের এই অবস্থা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি তাহার অন্তরালে গভীর সহানুভূতির কারণ রহিয়াছে। কিন্তু সে সহানুভূতি-কালে অদৃষ্ট ও বিধাতার বিরুদ্ধে কোনও আক্রোশের ভাব নাই—ইহাই উৎকৃষ্ট হিউমারের নিদর্শন। এই pathos রচনা-বিশেষের হিউমারের মধ্যে স্ফুট বা অস্ফুট হইয়া থাকে; তাই বলিয়া সেই পরিস্ফুট

pathos-কেই উৎকৃষ্ট হিউমারের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, লেখকের যে মনোভাব হইতে হিউমারের উদ্ভব হয়, সেই মনোভাব-সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা হইবে না। এইরূপ ক্ষুদ্র ধারণার বশে, pathos-মাত্রকেই উৎকৃষ্ট হিউমার মনে করিয়া একজন লেখক শরৎচন্দ্রের রচনার যে সকল অংশে খাঁটি করুণরস ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেও খাঁটি হিউমারের ভঙ্গী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, এবং হিউমার ও Irony-তে গোল পাকাইয়াছেন। ইহারই প্রতিবাদে আর এক ব্যক্তি অভিধান হইতে 'হিউমার'-এর যে অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও এমন একটি কথা আছে যাহা না থাকিলে, 'হিউমার' কথাটির বিশেষ কোন অর্থই পাওয়া যাইত না, সেটি হইতেছে—'depending for its effect on kindly human feeling'। একটু ভাবিয়া দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, এই 'kindly human feeling'-এর সঙ্গে করুণরসের বিশেষ বিরোধ নাই; অবশ্য এ করুণরসের মাত্রা ও ভঙ্গী যে একটু বিশেষ রকমের, তাহা আমি যতদূর সাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। তথাপি অশ্রুমাত্রকেই 'হিউমার'-এর চতুঃসীমানা হইতে নির্ব্বাসিত করিলে আর একদিকে বাড়াবাড়ি করা হয়। শরৎচন্দ্রের রচনায় যে grim humour আছে, তাহা অতি তীব্র তীক্ষ্ণ Irony-রই উদাহরণ। তথাপি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' হইতেই 'হিউমার'-এর একটি অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বর্মার কাহিনীতে সেই যে দুইটি প্লেগভয়ভীত মাদ্রাজী (?) ক্রিশ্চিয়ানের মৃত্যুশয্যার বর্ণনা আছে, তাহা মুখ্যত pathos বলিয়াই উপভোগ্য নয়; নির্ব্বোধ দুর্ব্বল অসহায় মানবের দুর্দ্দশাদর্শনে যে একটি সহৃদয় অথচ নির্লিপ্ত হাস্যভঙ্গী এই করুণ দৃশ্যের বর্ণনাতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই উচ্চাঙ্গের 'হিউমার' বলা যায়।

'হিউমার'-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখা যাইবে, Ludicrous হইতে Pathetic পর্য্যন্ত সকল পর্দ্দায় 'হিউমার'-এর গতিবিধি আছে; কেবল, সেই সকলের মধ্যে যেখানে ঐ বিশিষ্ট মনোভাব (attitude of the mind)-এর পরিচয় নাই, তাহা 'হিউমার'-পদবাচ্য নয়। বস্তুতঃ, 'হিউমার' বলিতে যে রস বুঝায় তাহার সদ্ভাব কেবল সেই লেখকের রচনাতেই সম্ভব—যিনি সত্যকার সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী। এমন কি, মাত্র এই রসসৃষ্টির ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা খুব বিশাল না হইলেও, তাঁহারা

যে প্রতিভাশালী, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আবার ইহাও লক্ষ্য করা যায়, যাঁহারা 'হিউমার'-সৃষ্টিতে নিপুণ, তাঁহারা উৎকৃষ্ট pathos-সৃষ্টি করিতেও পারেন। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে যে একটি মাত্র লেখক, বিশেষ করিয়া, এই 'হিউমার'-গুণের অধিকারী, সেই প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ও 'কাশীবাসিনী'র মত গল্প লিখিয়াছেন; আবার; 'হিউমার'-এর প্রধান উপাদান যে 'kindly feeling' তাহাও যে কত সহজে অশ্রুজলের সৃষ্টি করে, তাহা তাঁহার 'ভুলশিক্ষার বিপদ' গল্পটি পড়িলে পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এই গল্পের নায়ক-চরিত্রটি উৎকৃষ্ট 'হিউমার'-এর নিদর্শন; কিন্তু সেই চিত্রেও যে অশ্রুপ্লাবন আছে, তাহা যে 'হিউমার'-রসের বিরোধী নয়—তার প্রমাণ, ঐ গল্পটিতে শেষ পর্য্যন্ত রস-বিপর্য্যয় ঘটে নাই।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একজন অধুনা লব্ধপ্রতিষ্ঠ শক্তিশালী লেখকের নাম করা যাইতে পারে—ইনি 'গড্ডলিকা'-প্রণেতা পরশুরাম। ইঁহার রচনায় যে হাস্যরস আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে Wit এবং Fun থাকিলেও তাহা অতি স্নিগ্ধ সংযত Satire; তাঁহার সেই Fun-এর অন্তরালে একটা অতিশয় প্রচ্ছন্ন cynical laughter আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার দুইটি উৎকৃষ্ট গল্পের নাম করা যাইতে পারে—'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ও 'ভূষণ্ডীর মাঠ'। ঠিক এই ধরণের হাস্যরস বাংলা-সাহিত্যে নূতন; তথাপি এই সকল রচনায় লেখকের attitude খাঁটি 'হিউমার'-এর attitude নয়—কারণ, এই হাস্যরসের অন্তরালে, মানুষের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে একটি সহৃদয় রসকল্পনার যে নির্লিপ্ত প্রসন্নতা, তাহা অপেক্ষা বিদ্রূপের ভঙ্গীই প্রবল,—যদিও সেই বিদ্রূপ এমন স্নিগ্ধ ও সংযত যে, বাংলা-সাহিত্যে তাহা একটি বিশিষ্ট হাস্যরসের আমদানি করিয়াছে। পরশুরামের রচনায় প্রভাত-কুমারের রচনাভঙ্গির যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেই উভয় লেখকের রচনা তুলনার দ্বারা বিচার করিবার সুবিধা আছে, এইরূপ তুলনায় উভয়ের হাস্যরস-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রভাতকুমারের হাস্যরসে যে উচ্চাঙ্গের 'হিউমার' আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার হাস্যরসসৃষ্টির মূলে এক ধরণের poetic reason বা কবি-বুদ্ধি আছে, পরশুরামের হাস্যরসে তাহা নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব। 'হিউমার' শব্দের ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ যখন নাই, তখন কি ইংরেজি শব্দটাই লইতে হইবে? এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম

আপত্তি এই যে, বাংলায় যখন আধুনিক সকল শাস্ত্রের পরিভাষা-সৃষ্টির প্রয়োজন আছে, তখন সাহিত্য-সমালোচনারও পরিভাষা চাই। সকল শব্দই যদি ইংরেজি হইতে গ্রহণ করিতে হয়, তবে আলস্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। সংস্কৃতভাষা যখন বাংলা শব্দের আকর-স্বরূপ রহিয়াছে এবং চিরদিন থাকিবে, তখন এইরূপ শব্দচয়ন বা শব্দ-নির্ম্মাণে অসুবিধা নাই। কাজটি অবশ্য পণ্ডিতের কাজ; কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভাবে আমরা যদি এইরূপ বিদেশী শব্দ এত অধিক গ্রহণ করি, তবে ভাষার নিজস্ব শ্রী ক্ষুণ্ণ হইবে, এবং অ-পণ্ডিতেরা প্রশ্রয় পাইবে। 'হিউমার'-শব্দটির সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি এই যে, এই ইংরেজি শব্দটির সঠিক তাৎপর্য্য এখনও যখন অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তখন সমান অপরিচিত একটা নূতন দেশী শব্দ ঠিক করিয়া লওয়াই কি অধিকতর সঙ্গত নয়? অতএব, 'হিউমার'-শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি হইতে পারে, সাহিত্যরসিক পণ্ডিতগণ তাহা নির্ণয় করুন; বর্ত্তমান লেখকের সে সাহসও নাই, সে পাণ্ডিত্যও নাই—এই আলোচনায় আমি যে বহু ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

সাহিত্য-সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায়

১

সাহিত্য এককালে সবদেশেই 'labour of love' ছিল; আমাদের দেশে এখনও কার্য্যতঃ তাহাই আছে। কিন্তু আজিকার দিনে এ ধরণের labour of love, বা প্রেমের দায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে, অথচ সাহিত্য-শ্রমীকে জীয়াইয়া রাখিবার পক্ষে এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই উপস্থিত কোথাও দেখা যাইতেছে না। এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য সাহিত্য-ধর্ম্মের গ্লানি বড়ই বাড়িয়া উঠিতেছে।

যাঁহারা সাহিত্যিক তাঁহারা ব্যবসায়ী নহেন, সাহিত্যিক প্রতিভা ও ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রায় এক সঙ্গে থাকে না। এজন্য বৈষয়িক ব্যাপারে সাহিত্যিক চিরদিনই পরমুখাপেক্ষী। অতএব, যেকালে অর্থনীতিই সকল নীতির উপরে, সেকালে সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা কতকটা ন্যায়বুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধি ও সাহিত্যিক হিতাহিত-বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইলে, সাহিত্যের অধঃপতন অনিবার্য্য। কিন্তু জাতির চরিত্রগত ব্যাধির ফলে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সেরূপ উন্নত হিসাব-বুদ্ধি বা দূরদৃষ্টির আশা এখনও দুরাশা মাত্র।

বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যাঁহারা সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক এমন অনিবার্য্য হইয়া উঠে নাই। সাহিত্যের তখন মর্য্যাদা ছিল—বাজার ছিল না; সাহিত্যপ্রীতিই তখন সাহিত্যের একমাত্র মূল্য ছিল, অন্যবিধ মূল্যের প্রত্যাশা বড় ছিল না। এখন সমাজে literacy অনেক বাড়িয়াছে, বটতলাই এখন সাহিত্যের ভদ্রপল্লী—এমন কি ভদ্রপল্লীকেও জুড়িয়া বসিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে রুচি ও আদর্শ অনেক নামিয়াছে, সব একাকার হইয়া গিয়াছে। ফলে, সাহিত্যের একটি বড়বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে—রীতিমত চাহিদা ও যোগানের পাল্লা চলিতেছে; ব্যবসায় জমিয়া উঠিয়াছে—উদরভরণের একটা নূতন উপায় মিলিয়াছে।

কিন্তু সাহিত্যের কামধেনুকে যে ভাবে দোহন করা হইতেছে, তাহাতে সে আর বাঁচে না; ইতিমধ্যেই ফুঁকা-দেওয়া সুরু হইয়াছে। সে দিকে ব্যবসায়ীদের

দৃকপাত নাই। চাহিদার অনুপাতে যোগান এত কম যে, খাঁটির কথা ভাবিলে চলে না; দুধের রংটা থাকিলেই হইব—শিশুদের দুধ চাই-ই, সাহিত্য-দুগ্ধ-লোলুপ শিশুর সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া চলিয়াছে, কাজেই কামধেনুও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এখন যে-কোনও ধেনু দিয়া কাজ চালাইতে হয়—যাহাকেই মাঠে পাওয়া যায় তাহাকেই দোহন করিতে হয়; খাইতে দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না, হইলে বোধ হয় ব্যবসায় চলিত না। বুড়াগরুকে ফুঁকা দিয়া এবং অপরগুলির দুধে জল মিশাইয়া কারবার চলিতেছে।

উপমা না হয় থাক। কিন্তু সাহিত্যিকদের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে খাঁটি সাহিত্যের ভরসা বড় কম। জীবিকার অভাবে ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া, তাঁহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করা দুষ্কর; কাগজের অপেক্ষাও কম দামে রচনা বিক্রয় করিতে হয়—প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে না পারিলে আধ-পেটাও মেলে না, স্ত্রী বেচিয়া অর্থোপার্জ্জনের মত কলালক্ষ্মীকে বেচিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিতে হয়। আজ তাঁহারা পণ্য-বিক্রেতার প্রসাদজীবী, তাহাতেও পেট ভরে না; পেট যদি ভরিত তাহাতে কতকটা সান্ত্বনা, এমন কি স্বাধীনতার সম্ভাবনাও থকিত।

যেদিন হইতে সাহিত্য জীবিকার বস্তু হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সাহিত্যিকের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছে। যাঁহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ছিল—সরস্বতীর সুন্দরী ও সতী মূর্ত্তিকে রসপিপাসু পাঠকের সমক্ষে স্থাপন করা, উৎকৃষ্ট ভাব-চিন্তার জগতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করাই যাঁহাদের বিধিদত্ত অধিকার, তাঁহারাই আজ জন-মনের পরিচর্য্যায় আত্মবিক্রয় করিতেছেন। গতযুগের সাহিত্যিকদের জীবন-কাহিনী হইতে জানা যায় যে, সেকালে plain living যেমন সম্ভব ছিল, তেমনই ভালো চাকুরীর উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বড় বড় সাহিত্যিকগণ ধর্ম্ম-সঙ্গত সাহিত্যসেবার অবসর পাইয়াছিলেন। এই তথ্য প্রণিধানযোগ্য; অবস্থা সেইরূপ না হইলে আধুনিক বাংলা-সাহিত্য এত শীঘ্র এমন ভাবে গড়িয়া উঠিত না। সত্য বটে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামের সাক্ষাৎ যোগ ছিল না বলিয়া, সাহিত্যের আদর্শ কল্পনাপ্রধান হইতে পারিয়াছিল—অর্থাৎ তাহাতে বস্তুজগৎ অপেক্ষা ভাব-জগতের প্রসার অধিক ছিল; কিন্তু এরূপ না হইলে গদ্যে ও পদ্যে ভাষার এমন শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইত না; কারণ, রসপ্রেরণাই সেই যাদুশক্তি—যাহার

বলে রসনায় বাক্‌ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হয়, এবং মানুষী ভাষা দৈববাণীর মত বিদ্যুন্ময় হইয়া উঠে। সাহিত্যকলার আদি এবং শেষ—একাধারে সাহিত্যের দেহ, প্রাণ ও আত্মা যাহাকে আশ্রয় করিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়া থাকে—সেই বাণীকে মূর্ত্তিমতী করিবার সাধনাই মুখ্যতঃ সে যুগের সাধনা ছিল। সে সাহিত্যকে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সাহিত্য, অথবা জীবন-সত্যহীন কাব্যবিলাস বলিয়া যাঁহারা কলরব করিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহাদের সাহিত্য-জ্ঞান প্রশংসনীয় নহে।

২

সাহিত্যের আদর্শ এক এক যুগে, জাতি ও সমাজের অবস্থা-অনুসারে, এক এক রূপ হইয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক ; কিন্তু তাই বলিয়াই কোনও সাহিত্য মূল্য-হীন নহে। বরং, জাতি ও সমাজের অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া যদি এমন কোনও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা যায়, যাহা জাতির স্বধর্ম্মের প্রতিকূল—তবেই সাহিত্য পীড়িত হয়, সৃষ্টির পরিবর্ত্তে অনাসৃষ্টিই বাড়ে। বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের দুর্দ্দশা, ও সেই সঙ্গে সাহিত্যিকের জাতিনাশ—এই দুয়েরই কারণ কতকটা ইহাই। আজকাল সাহিত্যের আদর্শ লইয়া যে কোলাহল উঠিয়াছে—অভিজাত ও সৌখীন বলিয়া এক আদর্শকে অশ্রদ্ধা করিয়া, সত্য ও বাস্তব-জীবনের দোহাই দিয়া যে অপর আদর্শ খাড়া করা হইয়াছে—তাহার মূলে আছে সাধারণের মনোরঞ্জন, যাহারা সিনেমা-গৃহের জনতা বৃদ্ধি করে তাহাদেরই দুষ্ট-ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন। শিক্ষিত, এমন কি উচ্চশিক্ষিত বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের রুচিও এতদপেক্ষা উন্নত নয় ; তার কারণ, পাণ্ডিত্য ও রসবোধ এক পদার্থ নহে। জীবন-সত্য বা বাস্তব-রসতত্ত্বের দোহাই যাহারা দেয় তাহারা এই নিকৃষ্ট গণ-মনোবৃত্তির পরিচর্য্যা করে। ইহারই ফলে, আজ বাংলা-সাহিত্যের প্রাঙ্গণে, সাহিত্য ও সাহিত্যসেবী উভয়কেই গ্রাস করিবার জন্য এক বিকট Frankenstein মুখ-ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে কল্পনা বা রসিকতা জনমনসুলভ তাহাই সাহিত্যের উপাদান নয়। যাহা সাহিত্যের পক্ষে জীবনীয়—সেই রসবস্তু আপামর সাধারণের গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে-রস কেবলমাত্র শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন সমাজের উপাদেয়, তাহাই—একমাত্র রস না হইলেও—উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু, যাহা অশিক্ষিত ও দুঃস্থ জনগণের

পক্ষে সহজসেব্য তাহাই উৎকৃষ্ট না হইতে পারে, এমন কি, তাহা কোনও প্রকার রস না হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব, সাহিত্যে বাস্তব বা জীবন-সত্যের আদর্শই যে সত্য তাহার প্রমাণ এই নয় যে, তাহা অধিকাংশ পাঠকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে,—দুর্ব্বল অসহায় দেহ-মনের যত কিছু দুঃখ, গ্লানি ও লজ্জার জয়গান করে। আধুনিক সাহিত্যে ইহারই নাম জীবন-সত্যের আদর্শ; অতিশয় ক্ষুদ্র যাহা তাহাকেই একটা বৃহৎ নাম দিয়া সাহিত্য-সমালোচনায় যে ধাপ্পাবাজী চলিতেছে, তাহার ফল সবদিকেই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

যে-দেশের জনগণ এখনও আর্টের পাঠশালায় ভর্ত্তি হয় নাই, যাহাদের রুচি ও রসবোধ তাহাদের জীবনেরই মত হীন, দুর্ব্বল ও পঙ্গু—বিদেশ হইতে আদর্শ ধার করিয়া এবং তাহার কদর্থ করিয়া, তাহাদের সেই মূর্খতা ও মূঢ়তাকেই প্রশ্রয় দেওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক, তাহা এখনও ভাবিয়া দেখিবার সময় যদি না আসিয়া থাকে, তবে সে সময় আর আসিবে বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রেও জাতির পক্ষে এখনও যেমন Dictator-এর প্রয়োজন আছে, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রুচি ও রসবোধকে শোধন ও সংযমন করিবার জন্য, জন-মনোবৃত্তির উপরে অভিজাত-চিত্তের শাসন এখনও অত্যাবশ্যক। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নাথের যুগ এখনও শেষ হয় নাই—হইবার নহে। বিদেশ হইতে ধার-করা আধুনিকতার আদর্শ খাড়া করিয়া—বাস্তবতা বা জীবন-সত্যের দোহাই দিয়া, যাঁহারা জন-মনের পরিচর্য্যাকেই সাহিত্যের ব্রত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করিতেছেন।

অরসিককে রসিক বলিয়া সম্মান করার ফলে যাহা হইয়াছে তাহা এই। এক-কালে সাহিত্যপল্লীর একটি সংকীর্ণ গলির নাম ছিল বটতলা; এখন পল্লী বাড়িয়া সহর হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলিটিও সাহিত্যের সেণ্ট্রাল এভেনিউ হইয়াছে; এখন আর তাহা মাত্র বটতলা নয়—মাহেশের রথতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে আর ইতর-ভদ্র নাই, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নাই,—একবেলা আমোদ উপভোগের জন্য সকলেই একদলভুক্ত হইয়াছে। দোকানীরা নগদ বিক্রয় করিয়া খুচরা লাভকে যথালাভ মনে করিতেছে। মাল দুই ঘণ্টা পরেই বাসি হইয়া যাইবে তাহা জানে, তাই ক্রমাগত চুল্লীর উপর নূতন কড়াই চাপাইতেছে; যাহা বাসি হইতেছে তাহাতে কুকুরেও আর মুখ দেয় না। পাঁচ বৎসর আগে-ছাপা বহি এ বৎসর আর কাটে

না। এই রথতলার মাল-সরবরাহের ভার লইয়াছেন আধুনিক 'ভুখা' লেখকগণ। কিন্তু তাহাতে পেট ভরে না। পুস্তকবিক্রেতাদের সঙ্গে গ্রন্থলেখকদের যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহা অনেকটা বাড়ীউলী আর রূপজীবিনীর মত! বহি যেমন হৌক, তাহার ভিতরে যাহাই থাক, বাহিরের চেহারাটা চটকদার হইলেই হইল; খরচ যা-কিছু ঐ জন্যই, অন্য খরচ বিশেষ কিছুই নাই। তার উপর যদি খানকতক বেশ একটু suggestive রকমের রঙীন ছবি—বারান্দা-বাসিনী উর্ব্বশীর 'অকুণ্ঠিতা অনবগুণ্ঠিতা' মূর্ত্তি জুড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ত' সোনায় সোহাগা! এইরূপ ছবি-দেওয়া কবিতার বই—নারীদেহের কোন একটি অঙ্গের অনাবৃত শোভায় আগা-গোড়া চিত্রিত অনুবাদ-কাব্য—প্রকাশ করা খ্যাতনামা প্রকাশকদিগের একটা কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পরস্পরে পাল্লা দেওয়া চলিতেছে। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্মনাশের উপরে এই ব্যবসায় নির্ভর করিয়া আছে, তাহারা ভাল করিয়া খাইতেও পায় না; তাহাদের কালিমা-বেষ্টিত চক্ষে অস্বাভাবিক জ্বালা, গণ্ডে ও ওষ্ঠে জ্বর-জনিত রক্তিমাভা!

পুস্তকপ্রকাশক ও পুস্তকপ্রণেতার সম্বন্ধ যেমন ধর্ম্মসঙ্গত বা সাহিত্যের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, পত্রিকা-ব্যবসায়ীদের ধর্ম্মজ্ঞান তদপেক্ষা উন্নত নয়। এই ব্যবসায় এখনও তেমন লাভজনক হইয়া উঠে নাই—অধিকাংশই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। যে কয়খানি পত্রিকা সচল তাহাদের পশ্চাতে অন্যবিধ ব্যবসায়ের পৃষ্ঠবল আছে। এরূপ পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশী নয়; তথাপি সাহিত্য-প্রচারের শক্তি ইহাদেরই আছে। বিজ্ঞাপন যোগাড় করিয়া তাহারই আয়ে সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে কোনও প্রকারে খানকয়েক ছোট অথবা বড় পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করিয়া বেকার অবস্থা দূর করিবার চেষ্টা আজকাল সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে—এইরূপ পত্রিকার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বড় কাগজগুলি প্রায় সম্পাদকবিহীন—স্বত্বাধিকারী, অর্থাৎ ব্যবসায়ী দোকানদারই ইহাদের কর্ণধার। সাহিত্যকে ইহারা খোলাখুলি অবজ্ঞার চক্ষে দেখে; ইহারা সাহিত্যের জমীদার—লেখকগণ ইহাদের প্রজা, নিতান্তই কৃপার পাত্র। পত্রিকার অধিকাংশ সেই সকল লেখকের রচনা দ্বারা পূর্ণ করা হইয়া থাকে, যাহারা লেখা ছাপা হইলেই কৃতার্থ বোধ করে। গরম চানাচুরের মত গল্প যাহারা লেখে তাহারা কিছু কিছু বকশিস পায়। দুই চারিটা খুব ভারি প্রবন্ধ ঐরূপ গল্পের সঙ্গে হজমী-গুলির মত বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

ইহাতেই সম্পাদনার চূড়ান্ত হইয়া যায়। ইহাই এই সকল পত্রিকা-পরিচালনার সাধারণ পলিসি—ব্যতিক্রম যে নাই তাহা বলিতেছি না।

কিন্তু ক্ষণজীবী পত্রিকার সংখ্যাই বেশী। ইহাতে ছাপাখানা কাগজব্যবসায়ী ও দপ্তরী কিছু পাইয়া থাকে—লেখক ত' নহেই; যাহারা প্রকাশক তাহারা তাহাদের সখ বা দুর্ব্বুদ্ধির দণ্ড দিয়া শেষে সরিয়া পড়ে। অর্দ্ধ-শিক্ষিত সাহিত্য-ব্যাধিগ্রস্ত ছোকরার দলই এই সকল পত্রিকার জন্য দায়ী। এই ব্যাধির বিস্তার যেমন হইতেছে, তেমনই পত্রিকা-সংখ্যা বাড়িতেছে—এরূপ পত্রিকা-প্রকাশ বন্ধ হইবে না দেখা যাইতেছে। এক দলের পর আর একদল ক্রমাগত স্থান পূরণ ও জঞ্জাল বৃদ্ধি করিতেছে। সাহিত্যিক হওয়া এতই সহজ, এবং ছাপাখানা এত বাড়িয়াছে যে, এই ধরণের প্রলোভন অনেকটা বাঙালীর ছেলের বিবাহ-করার প্রলোভনের মতই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ক্ষণজীবী পত্রিকা দ্বারা পত্রিকা-ব্যবসায়ীদের কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা, এবং হইতেছেও,—এইরূপ সাহিত্যচর্চ্চার ফলে, আজিকার বাজারের উপযুক্ত চলনসই লেখা অনেকের অভ্যস্ত হইতেছে; ইহারাই কিছুদিন পরে স্থায়ী পত্রিকাগুলির বিনামূল্যে লেখক হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে।

পুস্তক-প্রকাশকের কথা বলিয়াছি—পত্রিকা-ব্যবসায়ীর কথাও সংক্ষেপে বলিলাম। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়িগণ সাময়িক সাহিত্যের অধোগতির জন্য অধিকতর দায়ী। নিকৃষ্ট লেখকদের প্রশ্রয় দিয়া সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিবার শক্তি যেমন ইহাদের আছে, তেমনই, সুলেখক ও প্রতিভাবান নবীন সাহিত্যিকদিগকে আদর করিয়া এবং তাঁহাদের রচনার যথাযোগ্য মূল্য দিয়া সাহিত্যসাধনায় সাহায্য করিবার—এবং সেই সঙ্গে জাতির মনোজীবন উন্নত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের আছে। কিন্তু ধান চাল পাটের ব্যবসায়েও যেটুকু দেনাপাওনার ধর্ম্মবুদ্ধি আবশ্যক, এই ব্যবসায়ে সেটুকুরও প্রয়োজন নাই। কারণ, যাহারা সাহিত্যের ক্রেতা তাহাদের মাপিয়া লইবার মাপকাঠি, অথবা ওজন করিয়া দেখিবার বাটখারা নাই। এ ব্যবসায় শৌণ্ডিকের ব্যবসায় অপেক্ষাও নিরাপদ; কারণ, সেখানে খরিদদার মাতাল হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ প্রথম বোতলের হিসাব রাখে। এখানে গোড়া হইতেই রসোন্মাদ! পাঠক-পাঠিকার বয়স, বিদ্যাবুদ্ধি ও রসজ্ঞান, এই তিনের অন্ততঃ একটাও ঠকাইবার পক্ষে যথেষ্ট। দুই চারি-

খানি ছবি, কিছু ছড়া, ও গোটা কয়েক রসালো গল্প হইলেই হইল; তার উপর কাগজখানা যদি একটু মোটা, এবং নিয়মমত প্রকাশিত হয়, তবে আর কোনও বালাই নাই। পত্রিকা-সম্পাদনের ইহাই বাহাদুরী—ইহার অধিক বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলেই মাটী। ব্যবসায় বেশ চলিতেছে; মাছের তেলে মাছ ভাজা হইতেছে,—সিদ্ধির কুল্‌পী, অথচ আবগারী আইনের ভয় নাই।

৩

সাহিত্যের ব্যবসায় সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহার উত্তরে বলা যায়, ইহার জন্য ব্যবসায়ীরা দায়ী নহে, দায়ী শিক্ষিত সমাজ ও লেখকেরা। সাহিত্যের ব্যবসায়ে যদি সাহিত্য বাদ পড়িয়া কেবল ব্যবসায়টাই লক্ষ্য হয়, তবে তাহার কারণ—ব্যবসায় ও সাহিত্য এই দুইটা পরস্পরের দাবী রক্ষা করিয়া চলিবার মত সময় আমাদের দেশে এখনও আসে নাই; তাই বলিয়া ব্যবসায়ের পথ বন্ধ থাকিতে পারে না—সেজন্য অভিযোগ করা নিষ্ফল। লেখকদের আদর্শ ও সাধারণের রুচি যদি এমনই অধঃপতিত হয়, তবে সাহিত্যের ব্যবসায়ে ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজন হইবে কেন? সাহিত্যের ব্যবসায় যদি বন্ধ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলেই কি রুচি ও রসবোধ উন্নত হইত? প্রকাশ ও প্রচার অনিবার্য্য, বিশেষত আজিকার এই সস্তা ছাপাখানার যুগে। বটতলা চিরদিন আছে ও থাকিবে; আজ যে বটতলাই সাহিত্যের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, তার জন্য দায়ী কাহারা? তা'ছাড়া, যাহা কিছু পণ্য হইবার উপযোগী তাহার ব্যবসায়ী জুটিবেই। ব্যবসায়ে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বলিয়া পণ্যের কোনও জাতি নাই—সকল বস্তুরই চাহিদা আছে; অতএব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কিছুই অগ্রাহ্য হইতে পারে না। সাহিত্যও পণ্যহিসাবে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না—অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলিয়া পণ্যতালিকার বহির্ভূত হইতে পারে না। যাহাকে নিকৃষ্ট সাহিত্য বলা যায় তাহার ব্যবসায় কোন্ দেশে নাই? ব্যবসায়ীর দোষ কি?

আমিও সে কথা মানি। তথাপি, মনে হয়, সাহিত্যের ব্যবসায়ে শিক্ষিত ধর্ম্মবুদ্ধির প্রয়োজন আছে; এ ব্যবসায় একটু স্বতন্ত্র। কবিরাজী ঔষধের দোকান খুলিয়া যে কেবল মোদক বিক্রয় করে সে যেমন কবিরাজী ব্যবসায়কেই লোকের চক্ষে হীন করিয়া তোলে—ঔষধের পরিবর্ত্তে নেশার সামগ্রী বিক্রয় করিয়া

মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ; তেমনই, সাহিত্যের ব্যবসায় করিতে বসিয়া যাহারা সস্তা দামে, সুদৃশ্য মলাটে মুড়িয়া, বটতলারও অপাংক্তেয় উঞ্ছ সামগ্রী বিক্রয় করে, তাহারা ব্যবসায়ের নীতিকেও লঙ্ঘন করে। ইহারা যে সাধু ও শিক্ষিত, এক কথায়—respectable, এবং যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই যে ইহারা সরবরাহ করে,—এমন একটা প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য যাহা-কিছু দরকার, তাহার আয়োজন ইহারা করিয়া থাকে ; একই মার্কা দিয়া খাঁটির সঙ্গে বহুল পরিমাণে ভেজাল চালাইয়া থাকে। আমাদের সাহিত্য আছে, সমালোচনা নাই—দর ঠিক করিয়া দিবার জন্য কোনও ব্যবস্থাপক মণ্ডলী নাই; বরং, সমালোচনার মালিকও ইহারাই—সমালোচনী-পত্রিকাও এই সব ব্যবসাদারের করতলগত। সুবিধা ও সুযোগ থাকিলে, ইহাও বোধ হয় সাংসারিক রীতি বা ব্যবসায়-নীতির বিরোধী নয়। যেখানে বাধ্যতা নাই, সেখানে ধর্ম্মবুদ্ধি থাকিবে কেন? জনমত যেখানে উদাসীন, সেখানে সর্ব্ববিধ দুর্নীতির উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু সুস্থ জনমতও সৃষ্টি করা যায়—সাহিত্যের ব্যবসায়ী যাহারা তাহারাও এ কাজ করিতে পারে ; তাহাদেরও দায়িত্ব আছে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত জাতীয়-চরিত্রের কথাই ভাবিতে হয়, দেশের শিক্ষিত সমাজকে স্বীকার করিতেই হয়—"দোষ কারও নয় মা শ্যামা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।"

এখন উপায় কি? সাহিত্যের ব্যবসায় চলিবেই ; ছোট ছোট দোকান-গুলিতে সাহিত্যের বাজার ভরিয়া যাইবে ; ক্রেতার অভাব হইবে না। আর কেহ লাভবান না হইলেও কাগজওয়ালা, ছাপাখানা ও দপ্তরী—আধুনিক সাহিত্যের এই তিন প্রধান স্রষ্টা—কিছু করিয়া লইবেই। কিন্তু সাহিত্যসেবার কি হইবে? যাঁহারা সরস্বতীর আহ্বান সত্যই হৃদয়ের মধ্যে পাইয়াছেন—তাঁহারা কেমন করিয়া তাঁহাদের সাধনাকে জীয়াইয়া রাখিবেন? আমাদের দেশে যে-সাহিত্যকে লইয়া ব্যবসায় চলিতেছে তাহা সাহিত্য-নামের যোগ্য নয় ; তার কারণ, পয়সা খরচ করিয়া সাহিত্য পড়িবার মত ব্যক্তি আমাদের দেশে খুব বেশী নাই। কবিতার লেখক আছে—পাঠক নাই ; গল্প ও উপন্যাস ছাড়া অন্য কোনও উচ্চাঙ্গের রচনা পছন্দ করিবার মত রুচি, কিম্বা হজম করিবার মত বোধশক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের মুখাপেক্ষা করেন না। আসল কথা, লিখিতে পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র,

এবং তাহাতে সংবাদপত্র-জাতীয় সাহিত্যের এতটা কাট্‌তি হইয়াছে যে, ব্যবসায় চলিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ব্যবসায় চলিবার মত অবস্থা এখনও হয় নাই —যদি হইত, তবে পুস্তকবিক্রেতা ও পত্রিকা-ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়-বুদ্ধিকে আরও উদার, এবং ধর্ম্মবুদ্ধিকে আরও সজাগ রাখিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

এ অবস্থায়, সাহিত্যের আদর্শ রক্ষা করিতে হইলে, সাহিত্যসেবীকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। যাঁহারা সত্যকার সাহিত্যিক, যাঁহাদের শক্তি ও সাধনা আছে, তাঁহাদিগকে এখনও কিছুকাল একক অসহায়ভাবে তপস্যা করিতে হইবে। এখনও প্রতিদান বা পুরস্কার আশা করিবার সময় আসে নাই—সাহিত্য-জীবী না হইয়া সাহিত্য-সেবী হইতে হইবে। বিদেশের ভদ্র ও উন্নত সাহিত্যিক জীবন দেখিয়া লোভ করিলে কি হইবে? তাহাদের মত সাহিত্য-সেবার মূল্য দাবী করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। এদেশে এক্ষণে সাহিত্য ও জীবিকা দুইই একসঙ্গে চলিবে না—ইহা নিশ্চিত। যাহারা দাম দিবে তাহারা সাহিত্য চায় না; কাজেই দাম চাহিলে তাহাদের ফরমায়েস মত, 'রস'-নামে যে আর এক বস্তু আছে তাহাই প্রস্তুত করিতে হইবে। 'ভুখা-ভগবান'কেই সাহিত্য-দেবতা বলিয়া প্রচার করিতে হইবে—মানুষের মধ্যে যে নারায়ণ আছেন তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া সকলকে স্বদলে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে; নহিলে, সাহিত্য না বাঁচুক, জীবিকার উপায় হইবে না।

কিন্তু বিপদ এই যে, তাহাতেও পেট ভরে না। ধর্ম্ম ত নহেই, অর্থও তাহাতে নাই—আছে কেবল কাম; এবং তাহাতেই শেষে মৃত্যুরূপ মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে। প্রতি মাসে দশটা গল্প ও দুইখানি উপন্যাস লিখিতে পারিলেও সিগারেট-খরচা জুটিবে কিনা সন্দেহ। তাই মাসের পর মাস যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে রক্তমুখে সাহিত্যের সঙ্গে জীবিকার পাল্লা চলিয়াছে! স্কুল কলেজে পড়িবার সময় যেটা ছিল সখ, এখন তাহাই প্রাণের দায় হইয়া উঠিয়াছে। যেটুকু শক্তি বা প্রতিভার আভাস এককালে ছিল, খেয়াল-খুসীর অনাচারে ও মিথ্যা-অভিমানের স্বেচ্ছাচারে তাহাকে নষ্ট করিয়া, আলোকের পরিবর্ত্তে আগুনের ফুল্‌কি ছিটাইয়া, এখন যাহারা চিতাগ্নির বেড়াজালে বেষ্টিত হইয়াছে

তাহারা আর কি করিবে? সাহিত্যধর্ম্মকে যাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহাদের জাতিও গিয়াছে, অন্নও জোটে না। আত্ম-প্রবঞ্চনার চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা নাই; সারস্বত সাধনায় সে প্রবঞ্চনার ফল আরও ভীষণ। যদি এতটুকুও সাহিত্যিক বিবেক এত অনাচারের মধ্যে এখনও বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার দংশন-জ্বালা আরও অসহ্য। এই দন্তচক্রময় জীবিকাযন্ত্রের পেষণে মহাপ্রাণী আর্ত্তনাদ করে, নিজের কাছে ফাঁকি চলে না। মূর্খ জনসাধারণকে দুই দণ্ডের আমোদ যোগাইবার জন্য ব্যবসায়ের যূপকাষ্ঠে জানিয়া শুনিয়া আত্মবলিদান করিতে হয়; অতি তুচ্ছ ও ক্ষণজীবী সাহিত্য-জঞ্জাল বৃদ্ধি করিয়া মুখে যতই আত্মগৌরব প্রকাশ করুক না কেন, অন্তর নিশ্চয়ই কাঁদে। যাঁহারা এককালে ভাল গল্প লিখিতেন, তাঁহাদের সে শক্তি আর নাই; যাঁহারা হয়ত ভাল কবিতা লিখিতে পারিতেন তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর গল্প-উপন্যাস লিখিতে সুরু করিয়াছেন। শক্তির এই অপব্যবহার এবং প্রতিভার এই স্বধর্ম্মত্যাগে কার না দুঃখ হয়? আত্মপ্রসাদ বা আত্মতৃপ্তির উপায়ও আর থাকে না; জিজ্ঞাসা করিলে সেই এক কথা—"কি করি, জীবিকাসংগ্রহের জন্য আত্মবিক্রয় করিতে হয়।"

যাঁহারা এখনও আধুনিক সাহিত্য-জীবিকার এই কুম্ভীপাকে পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে সর্ব্বশেষে দুই চারি কথা বলিয়া আমি এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আমাদের জাতীয় দুরবস্থা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, জীবিকা আরও দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জীবিকার অনেক পথ এখনও পড়িয়া আছে—দুইটি অন্ন খুঁটিয়া লইবার জন্য শক্তি ও বুদ্ধিকে হয়ত আরও বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হইবে, অনেক রকমের অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, জীবিকার সন্ধানে জীবনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিতে হইবে। কিন্তু সে-পথ সাহিত্য-সেবার পথ নয়; অন্ততঃ এদেশে এখনও সে পথ প্রস্তুত হয় নাই। যাঁহারা নিতান্তই সাহিত্যের সেবা ত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যেন—জীবিকার জন্য সাহিত্য নয়—সাহিত্যের জন্যই জীবিকা নির্ব্বাচন করেন; যদি দুইই এক সঙ্গে না চলে, এবং নিজেকে বলি দিয়া সাহিত্যকে বাঁচাইবার শক্তি না থাকে, তবে সাহিত্যকেই বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা যেন জীবিকার উপায় করেন। দুঃখ করিয়া ফল নাই—ইহাই পুরুষোচিত কাজ। যদি সাহিত্যসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়—সেও ভাল, তথাপি এরূপ অবস্থায় সাহিত্যকে জীবিকা

করিলে সাহিত্যের কি সেবা করা হইবে? বরং এমন সেবা না করিলেই সাহিত্যের কল্যাণ হইবে, সৃষ্টি করিতে না পারিলেও—সাহিত্যের আদর্শ-রক্ষায় গৌণভাবেও সাহায্য করা সম্ভব হইবে। আজিকার দুর্দ্দিনে ইহাও একরূপ সাহিত্যধর্ম্মপালন; কীর্ত্তির গৌরবই একমাত্র গৌরব নয়—অপকীর্ত্তি হইতে আত্মদমন করাও কম কীর্ত্তিকর নহে। অতএব যদি দুঃখ, দুর্গতি ও দারিদ্র্য, উপেক্ষা ও অনাদর সহ্য করিয়া সাহিত্যব্রত উদ্যাপন করা সকলের সাধ্যায়ত্ত না হয়, সরস্বতীর সেই অভিশাপ-বর বহন করিবার সামর্থ্য সকলের না থাকে—দেবী যদি সেবা চান, অথচ জীবনযাত্রা তাহার অনুকূল না হয়—তবে, মহাকবির সেই অতি-সত্য বাক্য স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হইবে—"Those also serve who only stand and wait"।

[ফাল্গুন, ১৩৪০]

সাহিত্য ও যুগধর্ম্ম

১

জগতে একটা যুগান্তর চলিয়াছে, একথা আমরা সকলে জানি। আমাদের দেশেও সেই যুগান্তরের হাওয়া ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এই তথ্য আমরা প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিতেছি। ব্যাপারটা কিছু আকস্মিক বলিয়া মনে হইলেও, ইহার সূচনা হইয়াছে অনেক আগে,—যেদিন রাজশক্তির মারফতে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা পাকা হইয়া গেল। সেই প্রথম ধাক্কাটা আমরা অনেক দিক দিয়া সহিয়া লইতে পারিয়াছিলাম; ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও নানা সংস্কারের সঙ্গে য়ুরোপীয় ভাব ও চিন্তাধারার একট আপোস করিয়া মনের ও প্রাণের উপর-তলাটায় নির্ব্বিঘ্নে আত্মপ্রসাদ উপভোগের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সব জায়গায় কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া লইয়া—কোথায় দাগরাজী কোথাও বা চূণকাম, কোথাও বড়জোর এক-আধটা খিলান বদলাইয়া—প্রায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভিত নড়িতে আরম্ভ হইল; তারপর গত দশ-পনের বৎসর যাবৎ ব্যাপারটা এমন বেমানান হইয়া উঠিয়াছে যে, হালে আর পানি পাওয়া যায় না; এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ভয় ভাবনা করিয়া আর ফল নাই, 'যাহা হইবার—হইবেই' মনে করিয়া প্রবল স্রোতের মুখে গা ভাসাইয়া চলিয়াছি। রাষ্ট্র বা সমাজের কথা বলিবার অধিকারী আমি নহি, কিন্তু সাহিত্যে এই যুগধর্ম্ম যে ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার সম্বন্ধে, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, তাহাই বলিব।

কোন সাহিত্যই দেশকালের প্রভাববর্জ্জিত নয়। সাহিত্যের জন্ম হয় দেশ-কালের গণ্ডির মধ্যে, সেইখান হইতেই তাহার শিকড়গুলি রস সঞ্চয় করে; ফুল মাটির উপরে, এমন কি বহু উচ্চে পৃথক বৃন্তে ফুটিয়া উঠে বটে, কিন্তু সকল জাগতিক সৃষ্টির মত তাহার বিকাশ হয় পাঞ্চভৌতিক নিয়মে। তারপর সেই

বিকাশের চরম ভঙ্গীটি দেখিয়া তাহার মূল্য-নিরূপণ হয়। তখন রসিক ব্যক্তিরা তাহার সৌন্দর্য্য-রসটুকুরই বিচার করেন, এবং সেই রস-রূপটিই তাহার একমাত্র সার্থক লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করেন। এই বিচার যথার্থ, ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু তথাপি, দেশকাল এবং জাতি বা সমাজবিশেষের সম্পর্ক তাহার ক্ষয়-বৃদ্ধির মূলে—প্রচ্ছন্ন থাকিলেও—বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়াই আছে; নির্ব্বিশেষ রসের বিচারে তাহাকে বাদ দিলেও, তাহার উৎপত্তি ও বিকাশধর্ম্মের সঙ্গে এই সকলের একটি নিবিড় যোগ আছে; রসিক-সমাজের রত্নাগারে স্থান পাইবার পূর্ব্বে সাহিত্যকে তাহার কারখানা বা রসশালায় একটা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিতে হয়। এই কার্য্যকারণতত্ত্ব সাহিত্যের পক্ষেও সমান বলবৎ—জগতের কোনকিছুই স্বয়ম্ভূ বা ভুঁইফোঁড় নহে।

এই কথাটি মনে রাখিয়া আমি বর্ত্তমান যুগের বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিতে চাই। এই আলোচনার একদিকে সাহিত্যের শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন আদর্শকেও স্বীকার করিব, আবার তাহার সৃষ্টি ও বিকাশের অন্তরালে যে যুগধর্ম্মের অমোঘ নিয়ম বর্ত্তমান, তাহাকেও অস্বীকার করিব না। বরং, যে-সাহিত্য প্রত্যক্ষ যুগসাহিত্য, যাহার বর্ত্তমানটাই প্রকট—ভবিষ্যৎ পরিণতি এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহার বিচারে ওই শেষ দিকের আলোচনাই বিশেষ আবশ্যক। এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না যে, বর্ত্তমান যুগে আমরা যে-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা এখনও খুবই কাঁচা; তাহাতে যেটুকু রং ধরিয়াছে, তাহা রৌদ্রপক্বের রং। এ সাহিত্য এখনও সাহিত্যহিসাবে আলোচনার যোগ্য হয় নাই বটে, তথাপি ইহার মধ্যে এমন একটি প্রবৃত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, যাহাকে, আর কিছু না হোক, একটা নূতনতর কালের ইঙ্গিত বলিয়া মনে করা অন্যায় নয়। এই সকল লক্ষণ হয়ত খুব বাহ্যিক ও ক্ষণিক, হয়ত অল্পকালের মধ্যেই গভীর-তর স্থায়ী লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িবে—তথাপি, ইহাকে আর উপেক্ষা করা যায় না। ইতিমধ্যেই এইগুলিকে লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য-সমাজের নানা পাড়ায় নানা রকমের দুর্দ্দান্ত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, এবং সেই আলোচনায় সাহিত্যের নিত্যস্বরূপ সম্বন্ধে নিদারুণ সংশয়ের সৃষ্টি হইতেছে। একটি ঘূর্ণী-পাকের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে থাকিলে কোন কল্যাণই হইবে না; সৃষ্টির চেয়ে

অনাসৃষ্টিই বাড়িয়া যাইবে, এবং যে যুগান্তর অনিবার্য্য তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে গিয়া মিছামিছি শক্তিক্ষয় করা হইবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি 'নব্যভারত' পত্রিকায় 'আধুনিক-সাহিত্য' নাম দিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেগুলিতে একটি কথা আমি খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এই যে, বাংলাসাহিত্যে একটা যুগের অবসান হইয়াছে, ইংরাজী আমলের প্রথম যুগের যে সাহিত্য তাহার প্রবৃত্তি রবীন্দ্র-নাথ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; সে ছিল চিত্ত-চমৎকার ও কল্পনা-বিলাসের যুগ। সে যুগে আমরা লাভ করিয়াছি—এক অভিনব সাহিত্যকলা, কাব্যসৃষ্টির উন্নত আদর্শ ও তাহার উপযোগী ভাষা। সে যুগের যাহা সত্যকার প্রেরণা ছিল তাহার ফসলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়াছে। বর্ত্তমানে সে প্রবৃত্তি ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া একটা নূতনতর চেতনার সংঘর্ষে প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে; এবং একটা নূতন ভাব-সত্যকে আশ্রয় করিবার জন্য আজিকার সাহিত্যবুদ্ধি অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এই নূতন ভাব-সত্য যে কি তাহা আমি 'নব্যভারতের' প্রবন্ধে বিশদভাবে বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এইখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না; আশা করি, বর্ত্তমান আলোচনায় তাহা স্বতঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সেকালে, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আক্রমণে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মুখ্যতঃ ভাবপ্রধান। সর্ব্বত্র একটা আদর্শ-নির্ণয়ের ব্যাকুলতা, নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সামঞ্জস্য-চেষ্টা, এবং নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আত্মসম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার অসীম আগ্রহ—ইহাই ছিল সে যুগের প্রধান প্রবৃত্তি। সে যুগে বাস্তব জীবন অনেকটা স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত ছিল—জীব-জীবনের গভীরতম চেতনা, নিপীড়িত প্রাণধর্ম্মের আর্ত্তনাদ, দেহ-দুঃখ,—এ সকল সেদিন এমন জাগিয়া উঠে নাই। তাই সে-যুগের প্রতিভা ও মনীষা শাশ্বত সত্য-সুন্দরের মন্দির গড়িতেই ব্যস্ত ছিল, পদ-নিম্নের মৃত্তিকা এবং নিতান্ত প্রত্যক্ষ ও বাস্তব দেহটিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার প্রয়োজন সেদিন হয় নাই। কিন্তু সহসা যুগান্তর উপস্থিত হইল, নানা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা-পরম্পরায় জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশও শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল; রস আর বাহিরে কোথাও রহিল না, নিজের বাস্তব দেহমনকে নিংড়াইয়া যতটুকু পাওয়া যায় তাহাও তিক্ত ও বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে,—দেহ সাড়া দিয়াছে, কিন্তু সে

দেহ অতিশয় দুর্ব্বল ও রুগ্ন। তাহার ফলে আজিকার সাহিত্যের যে রূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

২

যুগান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের পরিবর্ত্তন হইবে—ইহা স্বাভাবিক। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে যাহা সত্য, তাহাকে অবহেলা করিলে সাহিত্য-প্রেরণা মিথ্যা হইয়া যায়। যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, তিনি দেশকালকে উপেক্ষা করিয়া যত বড় কল্পনাকেই আশ্রয় করুন না কেন, তাহা জীবন্ত ও প্রাণময় হইবে না। সত্যকে আমরা দেশকালের প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যেই উপলব্ধি করি—সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই প্রতিভার শক্তি-বলে শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন হইয়া উঠে। আমাদের দেশেও যুগান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের রূপটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গত-যুগে তাহাকে যে-ভাবে এবং যে-রূপে ধারণা করিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আর তাহাকে ঠিক তেমন ভাবে সন্ধান করিতে গেলে তাহার নাগাল পাইব না, সে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এযুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার মিল নাই—তাই সে যুগের সাধনমন্ত্র এ যুগে অচল। যাঁহারা সাহিত্যের সম্পর্কে এই যুগধর্ম্মকে স্বীকার করেন না, তাঁহারা এ কালের এই আদর্শ-বিপর্য্যয়, চিত্ত-বিক্ষেপ ও দ্বন্দ্ব-সংশয়ের মধ্যে দিশাহারা হইবেন—যাঁহারা রসিক তাঁহারাও নূতন পানপাত্রকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন, কারণ, অভ্যাস জিনিষটি রসিকের পক্ষেও সমান অন্তরায়,—রসিকও যে মানুষ।

আমি এই যুগধর্ম্ম মানি। কিন্তু এই নবযুগের প্রারম্ভেই সাহিত্যের অজু-হাতে যাহা সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে আশান্বিত হইতে পারি নাই, বরং যথেষ্ট শঙ্কিত হইতেছি। এ কথা আমিও বুঝি যে, এই নব্য-সাহিত্য সবেমাত্র জন্ম লাভ করিয়াছে, ইহা সাবালক হইতে এখনও অনেক দেরী। এ যাবৎ এই সাহিত্য-রচনায় যে প্রবৃত্তি প্রকট হইয়াছে, তাহাতে কোন ধর্ম্মেরই লক্ষণ নাই; এখনও তাহা সজ্ঞান সপ্রতিভ নয়; এখনও তাহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী, form বা রূপ, নির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে নাই। কেবল একটা বালসুলভ উত্তেজনা ও অস্ফুট ভাব-বিদ্রোহ ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। তাহাতেও বালকোচিত স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। এই আধুনিক সাহিত্য-কর্ম্মিগণ 'তরুণ', 'সুজ'

সবুজ

বলিয়া আপনাদিগের নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু তারুণ্য ও চির-হরিতের যে গূঢ় ও সত্য অর্থ আছে সে অর্থে তাঁহারা এই পদবীর উপযুক্ত নহেন ; বরং তাঁহাদের কীর্ত্তির তুলনায়, ওই শব্দদুইটির অর্থ একটু হাস্যকর হইয়া পড়ে। যদি বয়সের নবীনত্ব বা দেহের যৌবনই একমাত্র দাবী হয়, তবে সেই দাবী পশু-পক্ষীরও আছে, এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বজীবেরই একটা কচি ও কাঁচা অবস্থা থাকে। যদি ওই তারুণ্যটুকুই একমাত্র সম্বল হয়, তবে তাহা' হইতে অন্ততঃ সাহিত্যের সৃষ্টিশালায় তাঁহাদের নিকট হইতে বেশী কিছু আশা করা যায় না। যৌবনই বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ, জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির অনুকূল; কিন্তু যে যৌবন বিশ্বগ্রাস করিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে না, যাহার সাধনা বা তপস্যা নাই, যে-যৌবন সত্যের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে না—দুঃখ যাহার বিলাসমাত্র, সুলভ-মতবাদ ও সহজপাঠ্য নিকৃষ্ট সাহিত্য যাহার কৃত্রিম কল্পনার আশ্রয়, অতিশয় অলস ও দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ভাবোন্মাদ এবং কালি-কলমই যাহার সাহিত্য-রচনার একমাত্র উপকরণ—সেই যৌবন সাহিত্যের কোন্ কাজে লাগিবে? সবুজ রংটি খুব সুন্দর, তাহার সঙ্গে যে সকল ভাব মনে আসে তাহাও উপাদেয়; কিন্তু পুকুরের পানাও ত সবুজ, কোন কোন সাপের রং সবুজ—সবুজ বলিয়া গর্ব্ব করিবার সময়ে এ কথাটিও মনে রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ তরুণ বলিয়া বা সবুজ বলিয়া প্রবীণদের সঙ্গে ঝগড়া করিলেই সাহিত্যের উপকার হইবে না। তারুণ্য বা adolescence জীবধর্ম্ম বটে, তাহার সঙ্গে সাহিত্য-প্রতিভার কোন সুনিশ্চিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে নূতনকে বরণ করিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই; বরং পুরাতনের আসন টলিয়াছে, এবং সেই আসনে নূতনের আবির্ভাব যে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—এ বিশ্বাস আমি করি। যাহার প্রতিষ্ঠার লক্ষণ এখনও দেখিতে পাইতেছি না, তাহার সূচনা লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়াই আজ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি সাহিত্য-কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার নই, ঢিলা পায়জামাধারী সিগারদংশী অভিজাত-সাহিত্যের dilettante-ও আমি নহি। সাহিত্য-বৃক্ষের মূল হইতে তাহার শাখার ফুলটি পর্য্যন্ত সমস্ত বিকাশধারাকে আমি সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি; বরং ওই শিকড়গুলিকেই খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার আগ্রহ আমার আছে,—কেবলমাত্র ফুলের

ঘ্রাণ লইয়া গাছটাকে অবহেলা করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। তাই রসবিচারে Aesthetics-এর বা রসশাস্ত্রের দাবীও যেমন মানি, তেমনি সেই রসসৃষ্টির গভীর রসাতলের সন্ধানও রাখিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, এই ভবিষ্যৎ সাহিত্য একটু স্বতন্ত্র হইবে, সেই সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিবে জীবনের আর এক ক্ষেত্র হইতে। যেমন প্রত্যেক কবির কল্পনায় একটা স্বাতন্ত্র্য আছে,—এই স্বাতন্ত্র্য যাঁহার যত বেশী তাঁহার প্রতিভাও তত মৌলিক, এবং এই স্বাতন্ত্র্য নির্ব্বিশেষ রসসৃষ্টির পক্ষে বাধা না হইয়া, তাহার প্রকৃত সহায়—তেমনই, প্রত্যেক যুগের একটা বিশিষ্ট প্রেরণা আছে; যদি সে প্রেরণা সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিকূল না হয়, তবে তাহা হইতে যে সাহিত্যের জন্ম হয়, যুগবৈশিষ্ট্যসত্ত্বেও তাহা সর্ব্বকালের সাহিত্য হইয়া উঠে। মানুষের প্রাণের মধ্যে সত্যকার সাড়া না জাগিলে কোন সত্যবস্তুর জন্ম হয় না, এই সাড়া জাগে বাস্তবজীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাড়নায়। সাহিত্যও শুধু রস-রূপের ধ্যান নয়—তাহা দেহচেতনাহীন আত্মার আনন্দ-গান নয়; অতি নিবিড় ও গভীর দেহ-চেতনাই সাহিত্যের জন্মহেতু। সেই চেতনা দেহকে অতিক্রম করে বটে, তথাপি দেহের ভিতর দিয়াই তাহার জন্ম হয়। নিছক মনঃকল্পিত কোন বস্তুই মানুষের জীবনে সত্য হইতে পারে না; তাই যেখানেই সেই রকম কিছু দেখি তাহাকেই কৃত্রিম বলিয়া মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধা জাগে। এই বাস্তব-ভিত্তি যতই প্রচ্ছন্ন হোক—যাহা প্রকৃত সাহিত্য তাহার মূলে ইহা থাকিবেই; না থাকিলে সাহিত্য যে কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহা বোঝা কঠিন।

এখন প্রশ্ন এই—এ যুগের সেই বাস্তব-প্রেরণা কি? তাহা এখনও খুব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই সত্য, তথাপি তাহা আমরা নানা দিক দিয়া অনুভব করিতেছি। রাষ্ট্রে ও সমাজ-জীবনে তাহার আভাস যতটুকু স্পষ্ট, এ যুগের সাহিত্য-সাধনায় তাহা এখনও তত সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে নাই। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্য-ধর্ম্মের বিরোধ ঘটিতেও পারে—যে যুগে এইরূপ বিরোধ ঘটে, সে যুগে সাহিত্য ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। যে অবস্থার গুণে বাংলা-সাহিত্য এতদিন এমন অবাধে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, আদর্শবাদ ও ভাবুকতার এমন আশ্চর্য্য ফসল ফলিয়াছিল—সে অবস্থা আর নাই; তথাপি অন্য কারণে আমরা আর একটা সাহিত্যের পত্তন এই যুগেও আশা করিতে

পারি। বর্ত্তমানে অনেক দিকে আমাদের স্বপ্ন-ভঙ্গ হইয়াছে, আমরা এখন এমন এক প্রকার বাস্তবের সম্মুখীন হইয়াছি, যাহা আমাদের দেহ-চেতনাকে অতি-মাত্রায় প্রবুদ্ধ করিয়াছে—সত্যের আরেক রূপ অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে যেমন ভয়ব্যাকুল, তেমনই বিস্ময়-বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। নিছক আদর্শবাদ মনকে এখনও মুগ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাণে তেমন সাড়া জাগায় না। একটা নূতন ক্ষুধা, নূতন বেদনা-রসের আনন্দ আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু সেই অনুভূতি এখনও সাহিত্যের প্রেরণা হইয়া উঠে নাই। তার কারণ, কেবলমাত্র অনুভূতি হইলেই হইবে না—সাহিত্যসৃষ্টির জন্য প্রতিভার প্রয়োজন। মানুষ যে শক্তিবলে বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করে—সেই শক্তি বাণীর প্রসাদযুক্ত হইলে কবি-প্রতিভায় পরিণত হয়। আমি রসতত্ত্বের আলোচনা এখানে করিব না, করিয়া কোন লাভ নাই। 'রস'কে ইঙ্গিতে আভাসে নির্দ্দেশ করা যায়—উহা অনির্ব্বচনীয়। আমার বক্তব্য এই যে, যুগধর্ম্ম-বশে সাহিত্যের উপাদান, বা প্রাণস্পন্দনের রীতি যেমনই হৌক্—কোন যুগের বস্তুসম্পদকে রসসম্পদে পরিণত করিতে হইলে কেবল দরদী হইলেই চলিবে না, চাই সেই প্রতিভা—যাহা যুগ-বিশেষের সম্পত্তি নহে, সকল যুগের পক্ষেই এক,—চাই সেই প্রাণশক্তি, প্রজ্ঞা ও কল্পনা। কতকগুলি মত বা যুক্তির দোহাই দিলে হইবে না, কোনও নজীরের জোরেই যাহা কাব্য নহে তাহাকে কাব্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। প্রত্যেক সাহিত্য-কীর্ত্তি ভাবে ও প্রকাশরীতিতে স্বতন্ত্র, তাহার প্রমাণ তাহাতেই মিলিবে; অলঙ্কারশাস্ত্রও তাহার প্রমাণ নহে, ইতিহাসও তাহার প্রমাণ নয়; কারণ, সাহিত্যের মূলপ্রবৃত্তি 'নিয়তিকৃতনিয়ম-রহিত'; তাহার বহিরঙ্গে যে কালের যে চিহ্নই থাকুক, তাহার মর্ম্ম-কোরকের রূপটি স্বয়ম্প্রভ ও স্বয়ংপ্রকাশ। আমাদের জীবনে যে নূতন দেহ-চেতনার সাড়া জাগিয়াছে, যে আদর্শ-পরিবর্ত্তনের লক্ষণ বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সাড়া সাহিত্যের মধ্যে এখনও সত্যকার সৃষ্টিশক্তি হইয়া দাঁড়ায় নাই।

তরুণের দল যাহাকে সাহিত্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহার ভাবে ও ভাষায়, এই প্রতিভার কোন লক্ষণ নাই—আছে কেবল দুর্ব্বলের চিত্তদাহ, অজ্ঞানের দুঃসাহস—কিছু-না-মানার বাহাদুরী। তাহার কল্লোল যতখানি, ততখানি সে গভীর নয়। তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই; সে সাহিত্য যদি

তরুণের সাহিত্য হয়, তবে তাহার নিকট ইহার অধিক কি আশা করিবার আছে? পূর্ব্বে অভিভাবকের শাসন প্রবল ছিল, এখন তাহা নাই বলিলেই চলে; বরং অভিভাবক-বয়সীরা হঠাৎ কি ভাবিয়া ইহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া নিজেদের বিগত ও বিস্মৃত যৌবনের রোমন্থন আরম্ভ করিয়াছেন। সস্তা ছাপাখানা, পাঠক-পাঠিকার অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধি, এবং ব্যবসাদারী পত্রিকা—একদিকে এই তিন যুগ-মহিমা, অপরদিকে—অনাহার ও অস্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্দ্দশা, এবং গত ১৫।২০ বৎসর যাবৎ বাংলা দেশের স্কুল কলেজে শিক্ষাদানের অবনতি, এই সকল কারণে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—সাধারণ শিক্ষার বিস্তার হইলেও 'কাল্‌চার' অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাই সাহিত্যের আসরে যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া একটা 'বোল্ হরিবোল্' আরম্ভ করিয়াছে। একদল বলিতেছেন, লেখাতে অধিকার সকলের আছে, বিশেষতঃ যুবকদিকের তাহা ত' জন্মগত সংস্কার—লেখার মধ্যে অজস্রতা ও অবাধ অসংশয় স্বেচ্ছাচার-ই প্রাণের লক্ষণ। অতএব মাভৈঃ! কাহারও কথায় কর্ণপাত করিও না, আমরা আছি; আমাদের বয়স বিদ্যাবুদ্ধি অনেকের চেয়ে বেশী, অথচ প্রাণ তোমাদেরই মত 'সবুজ'— 'সবুজ' কথাটি ত আমাদেরই আবিষ্কার, যৌবনের জয়যাত্রার বাজনা ত আমরাই প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আরেক পক্ষ সাহিত্য-সৃষ্টির কোনও ধারই ধারেন না—কেবল শাসনটাই জানেন; ও জিনিষটা তাঁহাদের নিকট শুক্‌না হরীতকী—আহারান্তে চর্ব্বণীয়; মাত্রা বেশী হইলেও বিপদ আছে। একদিকে ড্রয়িংরুমবিহারী dilettante, অপরদিকে অশ্বত্থবৃক্ষবাসী জরদ্গব—এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া সাহিত্য খাবি খাইতেছে।

৩

এই গণ্ডগোল কাণে উঠায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এইবার শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি, সাহিত্য-ধর্ম্ম কি, সাহিত্যের শাশ্বত আদর্শ কি, তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনা তিনি বহুবার বহু প্রবন্ধে করিয়াছেন—যাঁহারা সাহিত্যরসিক ও পণ্ডিত তাঁহাদিগকে সে কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু শিক্ষা ও সাধনা-বিমুখ, প্রাণধর্ম্মের নামে রিপুর উপাসক, অতি দুর্ব্বল ও বিকৃত-মস্তিষ্ক তরুণ ও প্রবীণের দল, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পাঠক-

সমাজের উৎসাহে যে শিবের গাজন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে গুরুমন্ত্রের প্রয়োজন নাই—সকলেই গলায় 'পাটা' পরিয়া মহা মহা সাধক হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপদেশে বা কশাঘাতে যে কোন ফল হইবে না, তাহার অন্য কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,- সাহিত্য-প্রকৃতির আলোচনা করেন নাই। কিন্তু কেবলমাত্র Aesthetics বা রসতত্ত্বের মূল সূত্রটির আলোচনা করিলে সাহিত্যের বহিরঙ্গটি মূল্যহীন হইয়া পড়ে। যে বাস্তব উপাদানকে আমি সকল সাহিত্য-কীর্ত্তির মূলভিত্তি বলিয়াছি, যাহার সঙ্গে দেহ-মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইলে, পূর্ণপ্রেরণা-সঞ্চার হয় না, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া একবারে রসতত্ত্বে আরোহণ করিলে দেহধর্ম্মী মন নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যে শাসন জারী করিয়াছেন, তাহা অবশ্য তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে—তিনি ব্যতীত সত্য কথা তেমন করিয়া বলিবার শক্তি আর কাহারও নাই। সে আদর্শ হইতে কোন যুগের সাহিত্য এতটুকু বিচলিত হইতে পারে না, এ কথা মানি। কিন্তু কথাটা আধুনিক সাহিত্যের পন্থানির্দ্দেশের পক্ষে আর একটু বিশদ ও সবিশেষ হইলে ভাল হইত। বোধ হয়, তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকটে আশা করাও যায় না। তিনি তত্ত্ব বা শাস্ত্রহিসাবে কিছু বলেন নাই, নিজেরই অলোকসামান্য কবিধর্ম্মের মর্ম্মকথাটি খুব স্পষ্ট করিয়া সংক্ষেপে জানাইয়াছেন। ইহা লইয়া তর্ক চলে না। একদিকে কথাটি খুবই সত্য, তদুপরি তাহা আবার অত-বড় কবির জীবনব্যাপী সাধনার উপলব্ধি। ওকালতি-বুদ্ধি বা নৈয়ায়িক বিদ্যার সাহায্যে তাঁহার কথার ছল ধরিয়া—ভ্রম প্রতিপাদন করিতে যাওয়া—শুধু যে পণ্ডশ্রম তাহা নয়, নিতান্তই হাস্যকর। তাঁহার বক্তব্যের মূল মর্ম্ম, যে-কোন রসিক ব্যক্তি বিনা প্রমাণে হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

কিন্তু একটু গোল হইয়াছে। তিনি উপাদানের কথাটি অনেকখানি করিয়া বলিয়াছেন এবং তাহার নির্ব্বাচন-নীতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নতর জীব-ধর্ম্মের প্রয়োজন রসবোধের অনুকূল নহে, এ কথা সত্য; কিন্তু মানুষের অনুভূতি-মার্গে বিশ্বের প্রবেশাধিকার আছে, কোন বস্তুই সেখানে অগ্রাহ্য নয়। সেই অনুভূতিই—রসবোধের না হৌক—রসকল্পনার মূল প্রেরণা, একথা বলিলে রসতত্ত্বের হানি হয় না। গাছের মাথায় উঠিয়া শিকড়কে অস্বীকার করিলে চলে কি? তাহার দোষ হয় এই যে—মাটির কথাটা মনেই থাকে না। ফুল ফুটিল না,

গাছ কাটিয়া দাও,—আপত্তি নাই; তাহা মালীর দোষ হইতে পারে, গাছেরও দোষ হইতে পারে; কিন্তু সেজন্য মাটির সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে চলিবে না, সকল জায়গার মাটিই চাষ করিয়া দেখিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, এক রকমের বাছাই-করা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধর্ম্ম; এই বাছাই-করায় কোনও 'বস্তু'র খোঁচা নাই, অর্থাৎ প্রয়োজনের তাড়না নাই—ইহা আমার আত্মার অতি সহজ স্বাধীন আনন্দ-বোধের পছন্দ। কিন্তু সেজন্য নির্ব্বাচনের প্রয়োজন কি? সে ধর্ম্ম ত বস্তুগত নহে, তাহা রসিকের আত্মগত। প্রয়োজন-বোধও আত্মগত, বস্তুগত নয়; সাধারণ জীবধর্ম্মে যে বস্তুটির অতিশয় প্রয়োজন—ব্যক্তিবিশেষের রস-কল্পনায় সেই বস্তুই প্রয়োজনাতীত—অতএব সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে। 'আব্রহ্মস্তম্ব' যদি 'সৎ' হয়, তাহা হইলে আত্মার আনন্দবোধের কোথাও বাধা থাকিতে পারে না,—যদি আমার সেই আত্মীয়তা-শক্তি থাকে। কিন্তু আরও একটু মুস্কিল হইয়াছে। জীবধর্ম্ম ও প্রয়োজনের কথা তিনি যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে প্রশ্ন উঠে—আত্মার আনন্দবোধ কি দেহ-তাড়নাকে একেবারে বাদ দিয়া? না, দেহ-চেতনার ভিতর দিয়াই,—তাহাকে অতিক্রম করিয়া? এই কথাটি স্পষ্ট হওয়া দরকার। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকৃতির যে পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে দেহঘটিত কোন ব্যাপারই তাঁহার কল্পনায় এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মার সঙ্গে বিরোধ করিয়া থাকিতে পারে না, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভায় সে তন্মুহূর্ত্তেই আত্মার দ্বারা পরাজিত হইয়া শাশ্বত সৌন্দর্য্যলোকে দীপ্তি লাভ করে। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ যত সত্য হোক, সাধারণ মানুষ কখনও ইহাকে প্রাণের মধ্যে স্বীকার করিবে না; কারণ, এত বড় প্রজ্ঞা ও কল্পনাশক্তি মানবসাধারণের—তত্ত্বগত অধিকার হইলেও—বস্তুগত অধিকার নহে। সাহিত্য এই আনন্দবাদে পৌছিতে না পারিলেও তাহা উপাদেয় হইতে পারে, জগৎ-সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য তাহার প্রমাণ। অনেক উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি, এই বাস্তব-দুঃখ ও দেহ-চেতনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কবির নির্লিপ্ত চিত্তের কল্পনাশক্তিই তাহা হইতে রস সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উপাদান হইয়াছে অতি তীক্ষ্ণ দেহ-চেতনা, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার নানাধরণের বিরোধ—সে যুদ্ধক্ষেত্র যত বড়ই হউক, এবং সে যুদ্ধ-ঘোষণা যত উচ্চভাবেরই হউক। প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কথা স্রষ্টার মনের কথা—বাহিরের কথা নহে; শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার নাটকের Villain-গুলিকে

চাবুক মারিবার তাড়নায় সৃষ্টি করেন নাই, একথা সত্য; তাঁহার মনে সেই ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি সামাজিক নীতির তাড়না নিশ্চয় ছিল না,—ছিল কেবল সেগুলিকে সৃষ্টি করার আনন্দ। কিন্তু এমন কথা যদি কেহ গোড়াতেই বলিয়া বসেন যে, ওই রকম চরিত্র আমাদের বাস্তবজীবনের উপদ্রব, আমাদের জীব-ধর্ম্মের স্বাচ্ছন্দ্যবোধের সঙ্গে তাহার একটা বিরোধ রহিয়াছে, অতএব উহা রস-সৃষ্টির অনুকূল নহে—তবে কথাটা বড় অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে—রসসৃষ্টির উপাদান ও রসবোধের নিয়ম, এই দুয়ের সামঞ্জস্য হয় কবির প্রতিভায়। কাঁকর চারিদিক হইতে খোঁচা দেয় বলিয়া, আর পদ্ম সেই প্রত্যক্ষ দেহানুভূতির অনেক বাহিরে বলিয়াই যে, এই দুইয়ের মধ্যে সাহিত্যিক উপাদান-হিসাবে একটা সুস্পষ্ট প্রভেদ আছে—এমন কথা বলিলে, রসতত্ত্বের হানি হয় না বটে, কিন্তু রসসৃষ্টির গোড়ার কথায় একটু গোল বাধে। এই রসসৃষ্টির প্রসঙ্গে আমাদের দেশে একটি প্রাচীন উপমা চলিয়া আসিতেছে। একখানা শুষ্ক অস্থি-খণ্ড চর্ব্বণ করিয়া আপনারই মুখনিঃসৃত রক্তে যখন সেইখানি বেশ সিক্ত হইয়া উঠে, তখন কুকুর সেইটিকে সেই অস্থির রস মনে করিয়া পরমানন্দে উপভোগ করে। এই শুষ্ক হাড়ের সঙ্গে তাহার জিহ্বা ও মুখগহ্বরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়—সেই কঠিন ঘর্ষণই—এখানে রসসৃষ্টির কারণ। উপমাটি সার্থক উপমা বটে। বাহিরের ওই হাড়খানার মধ্যে রস নাই, রসটা আসিতেছে কুকুরের নিজের মুখ হইতেই—কিন্তু ওই হাড়খানাও দরকার,—এমন কি, তাহার দ্বারা মুখটি ক্ষত হওয়ারও প্রয়োজন আছে!

মূল রসতত্ত্বের আলোচনায় Realism বা Idealism প্রভৃতি নামকরণের কোনও সার্থকতা নাই—কোনও কাব্যই একেবারে Real বা একেবারে Ideal হইতে পারে না। তবে যদি স্থূলভাবে কবি-কর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ বুঝিয়া লইবার বা বুঝাইয়া দিবার জন্য একটা ভেদ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়, তবে একথা বলিলে দোষ হয় না যে, আমাদের সাহিত্যে এ-যাবৎ কাল Idealism-ই প্রবল হইয়া আসিয়াছে; তন্মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথের Idealism যে কত বড়, কত গূঢ় ও গভীর—তাহা বিশেষ করিয়া ধারণা করা চাই। এত বড় সজ্ঞান ও শক্তিশালী Idealist কোন যুগের কোন সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার সেই অতি-প্রবল ও একান্ত বস্তুভেদী কল্পনায়, বাস্তব তাহার যতকিছু বাস্তবতা লইয়াই

রূপান্তরিত হইয়া গেছে। প্রয়োজন বা দেহ-তাড়নাকে তিনি কখনও তাঁহার কল্পনায় ভাল করিয়া আমোল দেন নাই; এদিক দিয়া মানুষের জীবনের যে সকল জটিল ও দুর্ব্বার সমস্যা আছে, তাহার বাহ্য উগ্র রূপকে, এক উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি আবৃত ও অপসারিত করিয়াছেন। তাই যাহা দেহঘটিত চিত্তবিক্ষোভ, যাহা নানা যুগে, নানা ঘাতপ্রতিঘাতে জীব-জীবনের সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সাহিত্যের নিত্য-বিষয় হইতে পারে না—ইহা রসতত্ত্বের উচ্চ কথা হইলেও, রবীন্দ্র-নাথের মুখে এই কথার তাৎপর্য্য আরও গভীর। রবীন্দ্রনাথ নিজের কবি-ধর্ম্মের কথা অনেকবার অনেক কবিতায় স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহাদের সে সম্বন্ধে এখনও কোন সন্দেহ আছে, তাঁহাদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' নামক কবিতাটি পড়িতে বলি। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য-সাধনার মূলমন্ত্রটি আর কোথাও এমন যথার্থ ও সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই সঙ্গে আর একটি বিখ্যাত কবিতার ('পুরস্কার'—সোনার তরী) এই পংক্তিগুলিও স্মরণীয়,—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণ মন খুলি';
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
　　ফুটাই আকাশ ভালে।
অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
　　সংসার-ধূলি জালে।
অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখরে
অসীম কালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব-নির্ঝ'র ঝরে
　　ঝর্ঝ'র সঙ্গীতে;
স্বর-তরঙ্গে যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা,—
সেথা হ'তে টানি' ল'ব গীতধারা
　　ছোট এই বাঁশরীতে।

আমরা এযুগের মানুষ, কিছু বেশী বাস্তব-পীড়িত ও দুর্ব্বল ; কাজেই এতবড় আদর্শকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ বা শক্তি, কিছুই আমাদের নাই। অসীম-কালের মহাকন্দর হইতে বিশ্ব-নির্ঝরের সঙ্গীতধারাকে টানিয়া আনিবার ভান আমরা করিতে পারি, কিন্তু তাহা এ যুগের সত্যকার প্রবৃত্তি নহে। ইহাতে যদি সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব না হয়, তবে সে সম্বন্ধে এখন হইতেই নিরাশ হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। আমাদের একমাত্র আশা এই যে—কোন সমস্যাই রসের আধার হইতে পারে না বটে, তথাপি মানুষের সমগ্র দেহ-মন-প্রাণকে সে নাড়া দিতে পারে। মানুষ যখন সেই সমস্যাকেই বড় করিয়া তাহাকে নিত্য-সত্যের পূজা দেয়, তখন সে সাহিত্য-সৃষ্টি করে না, আপনার জীবধর্ম্মেরই একটা নূতন পরিচয় সে ইতিহাসে রাখিয়া যায়। কিন্তু ওই সমস্যার তাড়নায় সে যখন নিজের মধ্যেই ডুব দেয়, তখন নিজের গভীরতম অনুভূতিক্ষেত্রে নিজের সঙ্গেই তাহার একটা নূতন করিয়া পরিচয় হয়। সে পরিচয়ের রহস্য-বিস্ময় যখন তাহার বহুদিনের অভ্যস্ত সংস্কারকে নাড়া দিয়া প্রাণের জড়তা দূর করে, তখন কি সেই বাহিরের প্রভাব, সেই অনিত্য যুগধর্ম্মের তাড়না তাহাকে সঞ্জীবিত করে না? রবীন্দ্রনাথ যে-যুগের মানুষ সে যুগও একটা বড় সমস্যার যুগ ছিল ; সে সমস্যা বাহিরের দিকে খুব প্রবল না হইলেও অন্তরের ভাবনায় খুব বড় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই যুগ-মন্থনের ধন্বন্তরী তিনি—সর্ব্বশেষে অমৃত-পাত্র হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন। তেমনই, আজ যে-সমস্যা আমাদের দেহমনকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বাহিরের তাড়নাটাই বেশী বলিয়া হতাশ হইবার কারণ দেখি না। বরং মনের অত্যধিক প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, কিছুদিন দেহের অধীন হইয়া, নিত্য-সত্য-স্বরূপকে আর এক পাত্রে ঢালিয়া পান করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা মিথ্যা, যাহা অনিত্য তাহাকেই নিঃশেষ করিতে চাই—যাহা জীবধর্ম্মের স্থূল দুঃখ, অতএব হেয়, তাহারই মশাল জ্বালাইয়া একটু নৃত্য করিলে ক্ষতি কি? নিত্য ত চিরদিনই আছেন, কিন্তু এই অনিত্য যদি যুগধর্ম্মের বশে একবার দেখা দিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রাণের সিংহাসনে বসাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেই বিচিত্র রস আস্বাদন করিতে দোষ কি? রবীন্দ্রনাথ সার্থক সত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, সত্যকার মানুষ 'লাখে না মিলিল এক'! একথা চিরযুগের বটে, কিন্তু আপাততঃ এই যুগে আমরা রসানুভূতিকে এত সূক্ষ্ম করিয়া সত্যের অত বড়

সাধনা করিব না। তিনি যাহাকে সাধারণ সত্য বলিয়াছেন সেই সাধারণ সত্যের মানুষকে তাহার জীবধর্ম্মের শাসনের মধ্যেই নির্ব্বিচারে বরণ করিব; অনাত্মার দ্বারা আচ্ছন্ন আত্মার নিদারুণ দৈন্য, তার যতকিছু অগৌরব, দেহ-দুঃখের দুর্গতি ও কুশ্রী আকার, এই সকলই—সূক্ষ্ম রসবিলাস নয়—প্রত্যক্ষ দেহ-চেতনার দ্বারাই আত্মসাৎ করিব; ইহাই হইবে এ যুগের সাহিত্যের উপাদান। তারপর যদি সেই চেতনার পরিপূর্ণ আবেগে কাহারও 'চোখের জল ফেল্‌তে হাসি পায়', এবং তাহার সেই প্রতিভা থাকে, তবে তাহা হইতে অভিনব রসসৃষ্টি হইবে। এ কথা বলিলে ত রসতত্ত্বের কোন বিঘ্ন হয় না, শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কথাই ত বজায় থাকে। ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন দুই শ্রেণীর লোক—এক, যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আভিজাত্যে মুগ্ধ, যাঁহাদের নিকট জগৎ ও জীবন "শূন্যায়মান ডিক্যাণ্টারের" মত বৈঠকী রসালাপের উপকরণ; আর, যাঁহারা আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চিন্তার অল্পাধিক অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশের Don Quixote হইয়াছেন, চারিদিকে নানা সমস্যার বিভীষিকা দেখিয়া ঝুটা মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও যৌনতত্ত্বের তালপাতার তলোয়ার হাতে দেশের নানা দৈত্য ও ভূত ঝাড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ইঁহারা দুই দলই বর্ত্তমান যুগের উপসর্গ-মাত্র, ইঁহাদের দ্বারা যুগপ্রতিষ্ঠা ত পরের কথা—নবযুগের উদ্বোধনও হইবে না।

অথচ দেশে যুগান্তর আসিয়াছে। এ জাতি যদি এই মন্বন্তর উত্তীর্ণ হইয়া বাঁচিয়া উঠে,—যদি দেহে মনে প্রাণে সুস্থ হইবার অবকাশ পায়, তবে—আমি যে সাহিত্যের আভাস দিয়াছি, তাহা ভাষায় মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিবে। এখনই যে তাহা একেবারে একটুও হয় নাই তাহা নহে। যুগসন্ধিস্থলে আমরা শরৎচন্দ্রকে পাইয়াছি। তাঁহার রচনায় পূর্ব্বযুগের Idealism পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান অথচ অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আকস্মিক উদয়ে বাংলার পাঠকসমাজ যে নাড়া পাইয়াছিল তাহা এখন অভ্যস্ত হইয়া গেছে; তাঁহার রচনাসম্বন্ধে প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই সমান হইয়া একটা স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিয়াছে—ইহাও স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিক্রিয়া। অতি সঙ্কীর্ণ বাঙালী-সমাজের যেখানে যেটুকু বাঁধন খোলা ছিল, সেইখান দিয়া তিনি কতকটা প্রত্যক্ষ পরিচয়, কতকটা তীক্ষ্ণ সহানুভূতি ও কল্পনার সাহায্যে, নরনারীর হৃদয়-দ্বার অসীম শ্রদ্ধায় ও সমবেদনায় উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। গতযুগের আদর্শসূত্র তাঁহার মধ্যে

ছিন্ন হয় নাই, কারণ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও উপন্যাস তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার হৃদয়-রাধিকা প্রেমকেই একমাত্র পাথেয় করিয়া অন্ধকারে দুর্গম-গহনে দুঃসাহসিক অভিসারে যাত্রা করিয়াছে—কোন সুস্পষ্ট সমস্যার তাড়নায় নয়, নৈরাশ্য-কাতর বিরহীর বংশীরব শুনিয়া। কাব্য-সাহিত্যের কথা আমি বলিব না, সত্যকথা বলিলে তাহা আমার পক্ষে শোভন হইবে না। কিন্তু কথা-সাহিতের অকথ্য উপদ্রবের মধ্যেও একটু ক্ষীণ আশার রেখা আমি যেন দেখিতে পাইতেছি। সে কথা এখনও উল্লেখ করিবার সময় হয় নাই; হয়ত সে সম্ভাবনা অর্দ্ধপথেই নির্ম্মূল হইবে—কে বলিতে পারে?

[ফাল্গুন, ১৩৩৮]

সাহিত্যের আসর ঃ কবি ও কাব্য

১

সাহিত্য মুখ্যভাবে আলোচনার জিনিস নয়, উপভোগের জিনিস—এ কথা মনে রাখিলে সাহিত্যকে লইয়া দল বাঁধা, অথবা বারোয়ারী-যাত্রার মত যখন তখন যেখানে সেখানে আসর বসাইবার জন্য মণ্ডপ তুলিবার উৎসাহ হইবে না। কারণ, সাহিত্য উপভোগ করিবার মত সংস্কার ও সংস্কৃতি সকলের নাই—সামাজিক ও রাজনৈতিক বচসা যেমন সকলেই করিতে পারে, সাহিত্যকে লইয়া তাহা করিতে পারিলে সাহিত্যই উবিয়া যায়। অতএব, সাহিত্যের আসরে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি বলিতে হইল বলিয়া কেহ যেন ক্ষুব্ধ না হন। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ করিয়া সকলকে আশ্বস্ত হইতে বলি যে, সাহিত্যরসিক হইতে না পারাটা যতই লজ্জার বিষয় হউক, মানুষের আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য আরও কত বস্তু রহিয়াছে—সেখানে সিদ্ধিলাভ যে-শক্তির দ্বারা সম্ভব, তাহা মাত্রাভেদে অনেকেরই আছে। সাহিত্যরসবোধের যে সাক্ষাৎ জ্ঞাতি-শত্রু, তাহার নাম পাণ্ডিত্য ;—আপনারা এ রসে বঞ্চিত হইলে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পাণ্ডিত্য-চর্চ্চা করিতে পারেন। এ ছাড়া আরও কত পথ রহিয়াছে। প্রভুত্ব ও ধনশক্তি আরও বড় পুরুষার্থ, তাহার সাধনা করিলে গরিব কবি বা সাহিত্যিককে অনুগ্রহ-ভাজন করিয়া তাহার দ্বারাই স্বমহিমা কীর্ত্তন করানো যায়। সমাজে সাহিত্য-রসিক বা কবির সম্মান কতটুকু? কবি হইয়া সংসারে কেহ সত্যকার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল ; কবির শক্তি, বা তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রকে সমাজ কোন কালেই শ্রদ্ধা করে না ; গানের ওস্তাদ বা নটনটীকে এক হিসাবে আদর করিলেও, তাহাদিগকে যেমন কেহ সত্যকার শ্রদ্ধা করে না, তেমনই কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হইলেও সমাজ তাহার সহিত একটা নিরাপদ ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলে,—সে যে একটা অস্বাভাবিক চরিত্র, এবং সেরূপ শক্তি যে কোন কাজের নয়, ইহাই মনে করে। অতএব, সাহিত্যের পক্ষ হইতে যদি বলা যায়, এটা ভিড় করিবার স্থান নয়,—রস উপভোগ করিবার শক্তি সকলের নাই, তাহা

হইলে সংসার ও সমাজের তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই, বরং পাগলের দলে ভিড়িবার সখ না হওয়াই শ্রেয়।

কাব্য যে লক্ষ্মীছাড়ার কীর্ত্তি, অর্থাৎ যাহারা ও রস সৃষ্টি করে, তাহারা যে সাক্ষাৎ সংসার-যুদ্ধে অপারগ হইয়া দূরে সরিয়া থাকে, অতএব কিছুই লাভ করিতে পারে না—ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে সংসারবিরাগী—এ কথা সত্য নহে; বরং যাহা 'রাগের' আতিশয্যের ফল, তাহাকেই আমাদের 'বৈরাগ্য' বলিয়া ভ্রম হয়। জগৎ ও জীবনের প্রতি তাহাদের সেই প্রেম খাঁটি বলিয়াই স্বার্থসাধনের প্রবৃত্তি লোপ পায়,—যে 'অহং' জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়, সে অহং তেমন জাগ্রত হইতে পারে না বলিয়া, কবিরা সংসারে নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল কৃপার পাত্র হইয়া থাকেন। তাই বলিয়া, কবিরা শক্তিহীন নহেন—কেবল ইহাই সত্য যে, সংসার যে-শক্তির ভজনা করে, সে শক্তি কবিদের নাই। সেরূপ শক্তিমান হইতে হইলে ছোট-বড় নানা আকারের স্বার্থকে পরম-পুরুষার্থ করিতে হয়, এবং যাহার 'অহং' যত বেশি, সেই তত শক্তিমান হইয়া থাকে। কবিরা এইরূপ শক্তিমান নয় কেন, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু জীবনকে আরও পূর্ণ, আরও গভীর ভাবে ভোগ করিবার শক্তি তাঁহাদেরই আছে—বাহিরের ঐ যুদ্ধ একরূপ জয় করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের অন্তরের সুখ আরও সত্য, আরও গভীর। তাই কবির মুখেই আমরা শুনি—

এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে ক'দিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে;
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।

ফার্সী কবি হাফেজের সঙ্গে তৈমুরলঙ্গের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের যে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। কবি হাফেজ যে সৌন্দর্য্যধ্যানে মশগুল, যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি ধরণীর আধিপত্যও তুচ্ছ করিয়াছেন, শতরাজ্যবিজয়ী তৈমুর—সংসারের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভীতি ও ভক্তি-

ভাজন সেই শক্তিমান পুরুষ—তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাই হাফেজকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মূর্খ তুমি! তাই তোমার প্রেয়সীর গালের একটি তিলের বদলে তুমি আমার বোখারা সমরখন্দের অতুল বৈভব বিলাইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছ—সে বৈভব কখন চোখে দেখিয়াছ? দেখিলে এত বড় স্পর্দ্ধার কথা বলিতে না।" কিন্তু হাফেজ যে-রূপে মুগ্ধ, সে যে মানুষের হৃদয়-মন-আত্মার কত বড় আরাম, তাহা তৈমুর ও তৈমুর-উপাসক সাধারণ নরনারী কি বুঝিবে? আমিও বুঝাইতে পারিব না, কেবল কবিদের সাক্ষ্যমাত্র উদ্ধৃত করিতে পারি; আমাদেরই একজন কবি সেই আনন্দে, সেই অতুল সৌভাগ্যগর্ব্বে বলিতে পারিয়াছেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসী তার!

আর একজন এই সৌন্দর্য্য-বিহ্বল অবস্থার আভাস দিয়াছেন এই কয়টি কথায়—

ভাবিলাম মনে, ধরণী দেখায়ে দিল
ঐশ্বর্য্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
ক্ষণতরে দেখা দিয়ে গেল।—ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ-গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষা, শান্ত হ'য়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ-চরণতলে।

এইজন্যই কবিদের মনে কোন দৈন্য নাই—সংসারের উপেক্ষাও তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সত্য বটে, অতিশয় আত্মসচেতন লিরিকে কবিদের কেহ কেহ যেন নিজেদের কাছেই নিজেদের মহিমাবোধ অটুট রাখিবার জন্য সংসারকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে আত্মঘোষণা করেন—কবির আসন যে কত উচ্চে, তাহা অকৃতজ্ঞ ও অবোধ সমাজকে স্মরণ করাইয়া দেন। ইংরেজ কবি শেলির সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করুন—

"Poets are trumpets which sing to battle, poets are the unacknowledged legislators of the world."

—এই কথাই একজন সামান্য কবিও আরও উচ্চ-স্বরে, আবেগকম্পিত বাক্য-ঝঙ্কারে ঘোষণা করিয়াছেন—তাহাতে মনে হয়, সংসার কর্ত্তৃক উপেক্ষিত অভিমানী কবি যেন আশ্বাস ও আত্মপ্রসাদের শেষ অবলম্বন খুঁজিতেছেন; কথাগুলি সত্যই বড় চটকদার—

We are the music-makers
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams ;—
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams :
Yet we are the movers and shakers
Of the world for ever, it seems.
With wonderful deathless ditties
We build up the world's great cities ;
And out of a fabulous story
We fashion an empire's glory :
One man with a dream, at pleasure,
Shall go forth and conquer a crown,
And three with a new song's measure
Can trample a kingdom down.

আমাদের দেশের আধুনিক কালের যিনি শ্রেষ্ঠ কবি, তিনিও অন্তরে এই উপেক্ষার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই—বরং আরও স্পষ্টভাষায় সে কথা বলিয়াছেন, এবং আপনার মত করিয়া তাহার সান্ত্বনাসৃষ্টিও করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট।
হৃদি-শয্যাতল
শুভ্রদুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।
সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা।

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন ; সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;
অয়ি মহীয়সী মহারাণী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্ ! আজি
এই যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে,
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর ?

—এখানে সমাজ ও সংসারকে কবি কোন জবাব দেন নাই,—নিজেরই অন্তরকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, নিজেরই মহিমাবোধ জাগ্রত করিয়াছেন।

সংসারের অবহেলায় কবিগণের এই যে অভিমান, ইহা কবির নয়—কবি-মানুষটির দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের আত্মসচেতন মনোভাব। কবিদের ইষ্টদেবতা পরম-সুন্দর, তাঁহার উপাসনায় সকল অসৎ সৌন্দর্য্য-ধাতুতে পরিণত হইয়া সৎ হইয়া যায়। সেজন্য কবিহৃদয়ের আশ্বাস এত দৃঢ়—কবির প্রেম এমন সর্ব্বজয়ী ও শক্তিশালী যে, কবি-চরিত্রে বা কবি-রচিত কাব্যে কোথাও অহঙ্কার বা দম্ভ অভিমান থাকিতে পারে না ; সে শক্তি পূর্ণশক্তি বলিয়াই তাহাকে আত্মঘোষণা করিতে হয় না, কাব্যও বিনাযুদ্ধে আমাদিগকে জয় করিয়া লয়। কেবল বাক্যের উদ্দীপনা, ছন্দের ঝঞ্ঝনা, অথবা কোন আইডিয়া বা আবেগের উত্তেজনা—কবিশক্তির লক্ষণ নয়। জগতের এক শ্রেষ্ঠ কবি সেই শক্তিকে এই কয়টি কথায়—ব্যাখ্যা নয়—একেবারে রূপ দিয়াছেন—

'Tis the supreme of power :
'Tis might slumbering on its own right arm.

—অর্থাৎ, সে শক্তি সকল শক্তির উপরে—সে যেন আপনারই দক্ষিণ বাহুর উপরে মাথাটি রাখিয়া আধ-নিদ্রায় মগ্ন হইয়া আছে। (তাহার হুঙ্কার নাই, আস্ফালন নাই, আপন পূর্ণতা-ভরে সে আপনার মধ্যে স্থির হইয়া আছে।)

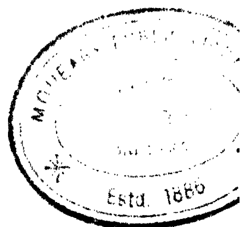
২

সভা-সমিতির বক্তৃতায়, বা পত্রিকাদির প্রবন্ধশালায়—যথার্থ সাহিত্যরসাস্বাদন যে কেন হইতে পারে না, সেই কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং কথা হইতে কথান্তরে গিয়া অনেক অবান্তর কথাও হয়তো বলিয়াছি। সাহিত্যের রসালাপ করিতে হইলে উপযুক্ত আসর চাই, এবং সে আসরে জনতা কম হইবারই কথা। তথাপি এমন কথা বলি না যে, গুহ্যসাধনার ভৈরবীচক্রের মত, সেখানে কেবল কয়েকটি দীক্ষিত সাধকেরই মাত্র আসন থাকিবে। তেমন আসরও হইতে পারে না এমন নয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ নাই—তাহাকেই আদর্শ করিলে আপনাদের মত সাধুসজ্জনের সঙ্গলাভ আর ঘটিবে না। যাঁহারা সেই রসিক-শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের কোনরূপ আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয় না, কোন জিজ্ঞাসা আর তাঁহাদের নাই; তাঁহারা কেবল চক্রে বসিয়া একত্রে ঢালেন ও পান করেন—একেবার বুঁদ হইয়া থাকেন, কথা কহিয়া নেশাটিকে তরল করিতে চান না। এ অবস্থা খুবই কাম্য বটে, কিন্তু আমরা অনেকে এখনও কথা কহিতে চাই—জানিতে চাই, বুঝিতে চাই; এবং হয়তো বুঝি না বলিয়াই বুঝাইবার জন্য আরও অধীর হই। এজন্য সেরূপ আসরে আমাদের চলিবে না। একজন স্থফী কবি এইরূপ রসপানের আসরকে 'শরাবখানা'র সহিত উপমিত করিয়া যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা লোভনীয় সন্দেহ নাই, যথা—

একটু তফাতে ব'সে আছে দেখি ইয়ারের দল
একদম মাতোয়ারা—
উন্মাদ যত, নেশায় বেহুঁশ—প্রাণ ভ'রে পিয়ে
পীরিতির রসধারা;
নাই করতাল, বেহালা, সারং—মজলিসে তবু
ফুর্ত্তির কমি নাই;
বোতল, গেলাস, মদ দেখি না যে—তবু ঢালে আর
পান করে একজাই!

এই শরাবখানার যিনি অধিষ্ঠাত্রী, সেই রূপসী তরুণী সাধক-কবিকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আগেভাগেই বলিয়া দিলেন—

অবিশ্বাসীর আসর এটা যে—সুরা দিয়ে হয়
অতিথির সৎকার,
শুরু হ'তে সেই আখের অবধি হেথায় কেবলই
অবাক-চমৎকার!
পূজা-নমাজের ঘর ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড় এই
শরাব-খানার মাঝে,
খুলে ফেলে ওই দরবেশ-বেশ সাজিতে হবে যে
ফুর্ত্তিবাজের সাজে।
কাঁধে পর' দেখি কাফেরের সুতা, ফেলে দাও ওই
পুঁথি আর জপমালা;
পেয়ালার মদ ভরপুর পিও, চলে এস ভেঙ্গে
ধর্ম্মের আটচালা।
চুর হয়ে শেষে চুমাটি বাড়াও, গালে গাল দিয়ে
কথা কব কানে-কানে,—
একটি সে কথা!—জান্ তর্ হয়ে ত'রে যাবে তায়,
যদি বোঝ তার মানে।



ভাগ্যবান পুণ্যবান কবির আর উপায় কি? তাই তিনিও বলিতেছেন—

করিলাম তাই! চাও যদি ভাই, আমারি মতন
দিল্‌খানা লালে-লাল,
এক ফোঁটা এই খাঁটির লাগিয়া খোয়াও সকলে
ইহকাল পরকাল।

এমন করিয়া ইহকাল পরকাল দেখাতে আমরা নিশ্চয় রাজি হইব না, ততখানি রসাবস্থার অধিকারী আমরা এখনও হই নাই; অতএব একটু নিম্নাধিকারে থাকিয়া এখনও পুঁথি ও জপমালার দাসত্ব করিব। আমাদের আসরে কেবল এমন ব্যক্তিকে চাই, যিনি ততখানি রসপিপাসু না হইলেও এই রসের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন; রসালাপের মধ্যে তাঁহার যেন আর কোন অভিপ্রায় না থাকে—অন্তত এই সময়টুকুর জন্যও তাঁহার চিত্ত যেন সকল স্বার্থবুদ্ধি ও বৈষয়িক সংস্কার হইতে মুক্ত থাকে, ব্যক্তিগত মতামতের অভিমান বা কোনরূপ লাভের লোভ কেহ যেন এখানেও সঙ্গে করিয়া না আনেন। ব্যবসায়ের সুবিধা, বড়লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণ, দলবিশেষের দলপতি হইবার জন্য নিজের খ্যাতি ও

প্রতিপত্তি বৃদ্ধি-করা, কবি, ভাবুক বা চিন্তাশীল লেখক বলিয়া শীঘ্র একটা নাম করিবার আকাঙ্ক্ষা, পত্রিকা-সম্পাদকদিগের কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করিবার, অথবা ততোধিক কঠিনহৃদয়া আধুনিক মালবিকা-চতুরিকাদিগের অন্তরে একটু প্রবেশ-পথের আশা—এ সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। সাহিত্য যদি কেবল জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে এতখানি চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এখানে কেবল তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি হইলেই চলিবে না, অন্তরের আর্দ্রতা ও ঋজুতা চাই, সত্যকার পিপাসা চাই,—সে পিপাসা কেবল সাগর-শোষণের দম্ভেই চরিতার্থ হইবার নয়; বরং যে বিন্দু-মাত্র আস্বাদন করিতে পারিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, সেই বিন্দুটিকে রসনায় ধরিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া চাই। ইহাকে পাইয়াছে এমন লোক খুব কম হইবারই কথা; কিন্তু পায় নাই—পাইতে চায়, এমন লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অতএব সাহিত্যিক আলাপের আসর খুব ছোট হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা জনসভার মত বৃহৎ হইতে পারে না।

সাহিত্যের রসচর্চ্চা করিবার জন্য এইরূপ আসরের প্রয়োজন আছে, তাহা মানি; কাব্যামৃত-রসাস্বাদ ও সজ্জন-সঙ্গ, এই দুইটিই সংসারবিষবৃক্ষের অমৃতময় ফল, আর সকলই বিষ—এ কথা আজিকার দিনে সকলে স্বীকার না করিলেও, আপনারা যে কয়জন আজ এখানে, ফুটবল-ম্যাচ ও অন্য নানা লোভনীয় বা লাভজনক দেখা-সাক্ষাৎ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহার কিছুও স্বীকার করিবেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, এমন আসরে আপনারা কেমন আলাপ আশা করেন? আমি জানি, অনেক—অনেক কেন প্রায় সকল—সাহিত্যিক অধিবেশনেই অভিভাষণ ও বক্তৃতাগুলি নিতান্ত আনুষ্ঠানিক বলিয়াই শ্রোতৃবর্গ তাহা কোনমতে সহ্য করিয়া থাকেন। বড় বড় সাহিত্যিকেরা যখন তাঁহাদের বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, ভাব, ভাষা, তথ্য ও তত্ত্বের চরকিবাজি করিতে থাকেন, এবং আপন আপন কৃতিত্বের ক্রমিক উন্মাদনায় দেশ কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া শেষে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে আত্মসংবরণ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গ এই ভাবিয়া রোমাঞ্চ-কলেবর হন যে, এই মরুভূমিতেও শীতল উৎসের দর্শন মিলিবে—এখানেও নৃত্য ও গীতের প্রচুর ব্যবস্থা আছে। হয়তো সেই নৃত্যকলা ও অন্যান্য কলা দিগভ্রান্তকারিণী মরীচিকার মতই বারিহীন, তথাপি ওই বক্তৃতার মত তাহা সদ্য-প্রাণঘাতী নয়। ইহাও জানি যে, আপনাদের এই বৈঠক তেমন

বৃহৎ ব্যাপার নয়; ইহা শাখা ও প্রশাখায়, কলার প্রদর্শনী ও কলাবিদ্‌গণের বিশেষত্ব-বাহুল্যে, পুষ্পোদ্যানকে ফলবান বৃক্ষবাটিকায় পরিণত করে নাই; আপনারা সত্যই একটু রসপান-অভিলাষে আসিয়াছেন। সে পক্ষে আমার পরামর্শ এই যে, এ আসরে কথার কচকচিকে গৌণ করিয়া কবিতাপাঠ ও আবৃত্তি প্রভৃতিকেই মুখ্য করা হউক। নবীন সাহিত্যিকদিগের উৎসাহবৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের রচনাও শুনিতে হইবে, কারণ যেখানে অজস্র মুকুলোদ্গম,—সেখানে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের কয়টি দৃঢ় বৃন্তে প্রস্ফুট কুসুমাকার ধারণ করিবে—সে সংবাদ লইবার জন্য সাহিত্যামোদী-মাত্রেরই উৎসুক হওয়া উচিত। কিন্তু যে সকল কাব্য-কুসুম পূর্ণস্ফুট ও অম্লান হইয়া আমাদের সাহিত্য-নন্দনে বিরাজ করিতেছে, তাহাদের গন্ধ-মধু পাঁচজনে মিলিয়া উপভোগ করাই এরূপ বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সুফী-কবির শরাব-খানায় যে কাজ হইয়া থাকে, তাহার অন্তত কিছুও আমাদের অসাধ্য নয়; প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাত্রে এক একটু কাব্যের রস ঢালিয়া দিবেন—পান করিবার সময়ে কোন কথার প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বে বা পরে সেই সুধার কিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন করিলে স্বাদের মাধুর্য্য-বৃদ্ধি হয়। সাহিত্যরস এমন করিয়া উপভোগ করিবার প্রয়োজন আছে। ইদানীং এইরূপ রস-চর্চ্চা বিরল হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই, কাব্যের সহিত মানুষের হৃদয়ের যোগ সুস্থ ও সবল থাকিতেছে না। এক্ষণে কাব্যরস আফিম বা চণ্ডুর সামিল হইয়া উঠিতেছে; ঘরে বসিয়া একাকী, নিতান্ত অসামাজিকভাবে—যাহার যেমন রুচি—কাব্যরস-সেবন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তি হইলেও প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয় না; এবং কাব্য-সাহিত্যের রসসম্ভোগে একটা বড় ত্রুটি থাকিয়া যায়—রস-সংবেদনা একটা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে বলিয়া, বিভিন্ন হৃদয়ে আবেদন-বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাহার যে একটা সম্পূর্ণতর রস-প্রমাণ আছে, তাহা আর ঘটিতে পারে না। কবিতাকে এইরূপ যাচাইয়া লওয়ার প্রয়োজন অল্প নহে। অতএব, এইরূপ সাহিত্যিক আসরের আমি যে একান্ত পক্ষপাতী, তাহা বলাই বাহুল্য।

৩

এখন আমি এ আসরে কি বলিব? আমাকে যখন আপনারা এ সভার মঞ্চাসনে বসাইয়াছেন, তখন বুঝিতেছি যে, কচকচির ভারটা আমাকেই বহিতে

হইবে। আমি পণ্ডিত নই, পাণ্ডিত্যের ব্যবসাদারী আমার সাধ্য নয়; আমি যাহা বলিব, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইবার ছলে, নিজে কতটা বুঝিয়াছি তাহাই নিজের কাছে যাচাই করিয়া লইব। যদি আপনাদের কাছে তাহা পরিষ্কার হইয়া না উঠে, তবে বুঝিব, আমার নিজের কাছেও তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই। আমি আপনাদের সমক্ষে কাব্যপরিচয়ের দুই চারিটি সাধারণ সূত্রের অবতারণা করিব; মনে হয়, আপনাদের রসপিপাসু মন সেটুকু বরদাস্ত করিতে পারিবে।

প্রথমেই কবির 'কল্পনা' সম্বন্ধে কিছু বলিব। কাব্যরস আস্বাদনের সঙ্গে চিন্তাবৃত্তির যেমন কোন সম্বন্ধ নাই—ও রস আমরা যে রসনার দ্বারা আস্বাদন করি সে রসনা যেমন মস্তিষ্কের সমদেশবর্ত্তী নয়, তেমনই, কবিরা যে দৃষ্টি দ্বারা জীবনের রস-রূপ আবিষ্কার করেন, তাহাও সাধারণ মনস্তত্ত্বের অধিকারভুক্ত নয়; এই দৃষ্টিকেই আমরা কল্পনা বলি। কিন্তু কল্পনা কথাটার একটা দুর্নাম আছে, এজন্য উহার অর্থ একটু শোধন করিয়া লইলে ভাল হয়। কবিদের দেখা—একরূপ অনুভূতি; সে অনুভূতি শুধুই দেহের অনুভূতি বা মনের অনুভূতি নয়—আরও ভিতরের, সে যেন একটা পূর্ণতর চৈতন্যের অনুভূতি। ইহাতে সাধারণ জ্ঞানবৃত্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া ভাষায় তাহার পরিচয় ঠিকমত দেওয়া দুরূহ। আমাদের বাক্য ও বাক্‌পদ্ধতি যে-ক্রিয়ার প্রয়োজনে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা হইতে ইহা ভিন্ন, তাই কবির এই দেখার প্রকারটিকে কবিও বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে পারিবেন না; বুঝাইবার প্রয়োজনও হয় না, কারণ, কবিরা যাহা দেখেন, তাহা ঠিক তেমন করিয়া আমাদিগকেও দেখাইয়া থাকেন—সেই দেখা আমাদেরও দেখা হইয়া উঠে। তথাপি চিন্তার সাহায্যে, সেই দেখার বিশেষত্ব আমরা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারি—তাহা হইতেই এই কল্পনা বা কবিদৃষ্টির লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায়। কবির সেই দেখার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে জগৎ ও জীবনের সব কিছু রূপান্তরিত হইয়া আমাদের প্রাণের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। ইহাও আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সে সময়ে আমরা চিন্তা করি না, বিশ্লেষণ করি না; কেমন করিয়া এমনটি ঘটিল, তাহার ভাবনাও থাকে না। অথচ তখন আমাদের চৈতন্য যে নিদ্রিত বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে তাহা নয়, বরং তাহা অতিমাত্রায় উদ্‌বুদ্ধ হয় বলিয়াই আমরা কাব্যরস-আস্বাদনে এত আনন্দ পাই। যদি বলি যে, দৈনন্দিন জীবনের যে জাগ্রত অভিজ্ঞতা, তাহাই

আমাদের গভীরতর চৈতন্যকে আবৃত করে; যাহাকে আমরা সজ্ঞান অবস্থা বলি, তাহাই আমাদের অন্তশ্চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখে; যদি বলি, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়সাক্ষী মনেরই একটা ষড়যন্ত্রের ফল—সেইজন্যই আমরা জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না; সে কেবল আমাদিগকে আঘাত করে মাত্র, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব-কোলাহল তুলিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে, নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়া আমাদের মনকে মুক্ত হইতে দেয় না, এবং জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদিগকে জীবনের বহির্দ্বারেই বসাইয়া রাখে;—তাহা হইলে আপনারা চমকিত হইবেন না, কারণ, ইহা যে সত্য, তাহা কাব্যরস-আস্বাদনকালে আপনারা ক্ষণকালের জন্যও উপলব্ধি করেন। তথাপি আপনাদের অনেকেই হয়তো বলিবেন, জগৎ ও জীবনের সেই রূপান্তর—যাহা কাব্যে আমরা অনুভব করি—তাহা আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু পরে ইহাই বোধ হয় যে, তাহা সুখস্বপ্নের মত মিথ্যা; কবির সেই দেখা ও দেখানো যাহার দ্বারা সম্ভব হয়; তাহা কল্পনা মাত্র,—সত্যের উপরে সুমোহন মিথ্যার জাল বিস্তার করিবার সে এক আশ্চর্য্য যাদুশক্তি। এ কথার উত্তরে আমি কেবল একটা প্রশ্নই করিব, তাহা এই যে, আপনারা কাব্যরস-আস্বাদনকালে স্বপ্নে-লাখ-টাকা-পাওয়া ভিখারীর মত পুলকবিহ্বল হন—না, সুখ-দুঃখের অতীত, দেশকালহারা সর্ব্বসংশয়-মুক্তির একটা অপূর্ব্ব চেতনার অধিকারী হন? মুহূর্ত্তের জন্যও হন কি না? এইরূপ অনুভূতি হইতে কোনও রসিক ব্যক্তি বঞ্চিত হইতে পারেন না; যাঁহারা হইয়া থাকেন, তাঁহারা—পুণ্যবান্, অর্থাৎ রসিক—নহেন, তাঁহারা জগন্নাথ দেখিবার সময়েও লাউ-মাচা দেখিয়া থাকেন। যদি কোন প্রকৃত রসিক এমন কথা বলেন, তবে তাঁহাকে আমি বলিব—"হয়, Zান্তি পার না।" ইহারই নাম আনন্দ; আর, আগে যে অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সুখানুভূতি মাত্র—সেখানে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে নাই, জাগ্রত চেতনার সেই অতিস্থূল সংস্কারই একটা ভিন্ন দেশকালের আশ্রয়ে একই মোহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কবির এই যে দেখা ও দেখাইবার শক্তি, তাহাকেই আমরা নূতন অর্থে 'কল্পনা' নাম দিয়াছি। এই দিব্যদৃষ্টির ফলে খণ্ডের মিথ্যা পূর্ণের সত্যে পরিণত হয়,—জীবনের সমগ্র-রূপ সেই অনুভূতিকেন্দ্রে মণ্ডলায়িত হইয়া দেখা দেয়; ইহাকেই আমি 'রূপান্তর' বলিয়াছি, এবং এই রূপান্তর যে মিথ্যা নয়, তাহার প্রমাণ ঐ আনন্দ। ভাল করিয়া স্পষ্ট

করিয়া বলিতে না পারিলেও,—সকল যুগের সকল দেশের রসিক ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের দেশের—এই বাংলা দেশেরই—এক পুরাণকার তাঁহার গ্রন্থে (বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ) প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—

ন কবের্বর্ণনং মিথ্যা কবিঃ সৃষ্টিকরঃ পরঃ।
সর্ব্বোপয্যেব পশ্যন্তি কবয়োঽন্যে ন চৈব হি॥

—অর্থাৎ, 'কবির বর্ণনা মিথ্যা নয়, কবিই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর। কবিগণের দৃষ্টি সকলের দৃষ্টির উপরে, আর কেহ তেমন দেখে না'। বেশ মনে হয়, আমরা এখানে যাহা বলিতেছি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই লেখক ঠিক সেই কথাই বলিতেছেন। কবির বর্ণনা মিথ্যা হইতে পারে না—এই কথা খুব বড় কথা, আধুনিক কবিও এক স্থানে ঠিক সেই কথা বলিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছেন—

সেই সত্য যা' রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

তাহা ছাড়া, উপরি-উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকটিতে আরও দুইটি এমন শব্দ আছে, যাহার ব্যবহার আধুনিকতম কাব্যবিচারে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি 'সৃষ্টিকর' ও 'পশ্যন্তি' এই দুইটি শব্দের কথা বলিতেছি, আপনারাও কাব্যবিচারে এই দুইটি শব্দের বিশেষ অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবেন। 'পশ্যন্তি'র অর্থ যে-'দেখা' এবং কবির কাজ যে 'সৃষ্টি করা'—'কল্পনা' বলিতে তাহার অধিক বুঝিতে হইবে না; অথচ ইহা যে কতখানি, তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে কাব্য-রসের অতি সূক্ষ্ম বিচার ও কাব্যরচনা-কৌশলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু এ জিজ্ঞাসা নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, শাস্ত্র এক জিনিস, আর রসিক-হৃদয়ের সাক্ষ্য আর এক বস্তু। কাব্যবিচার যিনি করিবেন, তাঁহার এই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, তাঁহাকেও এক হিসাবে কবি হইতে হইবে। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের লেখক পুরাণকার হইলেও তাঁহার সে উপলব্ধি হইয়াছিল, যাঁহারা পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী কাব্যসমালোচক, তাঁহাদের তাহা হয় নাই। অতএব কাব্য-আলোচনায় এই কল্পনা-শক্তিকেই সর্ব্বাগ্রে প্রণতি নিবেদন করিতে হইবে; ইহার প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নাই, কাব্য-সমালোচনাতেও তাহার অধিকার নাই—এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না। জ্ঞান নয়, পাণ্ডিত্য নয়, ভূয়োদর্শন নয়, বয়সের গৌরবও নয়—শ্রুতির

ভাষায়, বহুশ্রুত বা মেধাও নয়—এ অধিকার কেহ চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে পারে না, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ',—ইনি যাহাকে আপনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ ইহা সহজাত বা প্রাক্তন; ইহা সেই শ্রদ্ধা, যাহার অভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও নিষ্ফল। এজন্য, যাহার ইহা নাই সে যেন—যাহার আছে তাহাকে ঈর্ষা, নিন্দা বা বিদ্রূপ না করে; সে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির সাধনায় রত থাকিয়া আপনার ইষ্ট লাভ করুক; কিন্তু সেই সকলের কোন একটিকে উদ্দেশ্য করিয়া এ রাজ্য জয় করিবার চেষ্টা—যাহা আজকাল অনেকেই করিতেছেন—তাহার মত অধর্ম্মাচরণ আর নাই।

৪

কাব্যের আকৃতি, অর্থাৎ তাহার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তির সম্বন্ধে আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে। পদ্যে রচিত না হইলে আমরা কোন রচনাকে কাব্য বলি না; গদ্য-কবি হইতে হইলেও (আজকালকার ফ্যাশন অনুসারে) বাক্যগুলিকে পদ্যের মত চরণযুক্ত করিতে হয়। এ বিষয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকের বচনই যথার্থ—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। পদ্য ও গদ্য—কাব্যের দুই রীতি মাত্র, কাজে দুইই এক। কবি হইবার জন্য জোর জবরদস্তি করিয়া অতিশয় রসহীন বাক্যকেও পদ্যের আকৃতি দিবার চেষ্টা হাস্যকর। ভাব-কল্পনার প্রকৃতি ও ক্ষেত্র অনুসারে কাব্য পদ্য বা গদ্য-রীতি আশ্রয় করে। মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির বিষয় একই—কাব্যের সেই চিরন্তন বিষয়; কিন্তু তাহাদের রচনায় যে রীতিভেদ বা আকৃতির পার্থক্য আছে, তাহার কারণ—বিষয় এক হইলেও কবি-কল্পনার প্রকৃতি এক নয়। মহাকাব্য ও উপন্যাস তুলনা করিলে দেখা যাইবে, উহাদের ধরন প্রায় এক, কেবল জীবনের যে দিক বা স্তর কবির কল্পনাকে অধিকার করিয়াছে, তাহারই প্রয়োজনে একটি সহজে পদ্যময় হইয়া উঠিয়াছে, অপরটি গদ্যকেই বাহন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই দুইয়ের দ্বিবিধ প্রেরণা লক্ষ্য করিলেই গদ্য ও পদ্যের পৃথক উপযোগিতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। নাটকেও গদ্য ও পদ্যের স্বতন্ত্র উপযোগিতা আছে; আজকাল নাটক হইতে পদ্য বহিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাই প্রমাণ হয় না যে, পদ্য-নাটক খাঁটি নাটক নয়; যাহারা এমন কথা বলে, রসিক-সমাজে তাহারা কৃপার পাত্র বটে। তথাপি এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে

গদ্যেই হউক আর পদ্যেই হউক, কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে কবির সেই দৃষ্টির উপরে—সেই দেখাইবার শক্তির উপরে। যখন কোন কাব্য পাঠ করি, তখন এ বিচার করিবার অবকাশ থাকে না যে—ইহা পদ্য, না গদ্য। কোন্ কাব্যের পক্ষে কোন্টা উপযোগী সে বিচার করেন কবি—কিংবা কবিও নয়, কাব্যের কল্পনা-বীজ বা মূল-প্রেরণায় তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কবির দৃষ্টিতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা যদি সত্যকার প্রকাশ হয়, তবে, তাহার সেই রস-রূপ আপনার বাণীদেহের আকৃতি আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লয়, কবিকেও ভাবিতে হয় না। কথাটা আর একটু স্থূলভাবে—হিসাব করিয়া বলি। কবির অন্তরে কাব্যের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, ধরা যাক তাহার উপাদান দুইটি—ভাব ও বস্তু; ভাব, অর্থাৎ কবির নিজস্ব অনুভূতি, এবং বস্তু, অর্থাৎ জীবন ও জগৎ-ঘটিত ব্যাপার। কাব্যের সেই বীজের মধ্যেই এই দুই উপাদানের পরিমাণ বা মাত্রাভেদ গোড়া হইতে থাকে। বস্তুর মাত্রা যদি বেশি হয়, তবে সে কাব্য গদ্যে রচিত হওয়াই স্বাভাবিক; যদি ভাবের মাত্রা বেশি হয়, তবে তাহা পদ্যচ্ছন্দে কবিতার আকারে প্রকাশ পায়। আবার যদি তাহা একেবারে ভাবসর্ব্বস্ব হয়, অর্থাৎ বস্তুর সম্পর্ক যদি প্রায় শূন্য হয়, তবে তাহা শব্দের সুর-রচনা বা গীত হইয়া উঠে। এ হিসাব কিন্তু একটা মোটা হিসাব—ব্যাপারটা বুদ্ধিগম্য করিবার উপায় মাত্র, যদিও বুদ্ধির প্রবেশ এখানে নাই। উৎকৃষ্ট কাব্যের পক্ষে, ভাব ও বস্তুকে এইরূপ হিসাব করিয়া ভাগ করিয়া দেখানো সম্ভব নয়, সেখানে ভাব ও বস্তুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব আসিয়া পড়ে। যাহাকে আমরা এখানে 'ভাব' বলিতেছি, তাহা 'বস্তু' হইতে পৃথক একটা কিছু নয়; কবির হৃদয়ে বস্তু যে 'বিশেষ'-রূপে প্রকাশ পায়, তাহাই ভাব; অতএব ভাবই হইতেছে সেই ছাঁচ, যাহা কবিতার বস্তুকেও তাহার বিশিষ্ট রূপটি দিয়াছে; এবং যেহেতু এই বিশিষ্ট রূপই কবিতার সর্ব্বস্ব—বস্তু এখানে ঐ রূপ ধরিয়াই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে—অতএব, কাব্যবিচারে ভাব ও বস্তুর পার্থক্যবিধান তত্ত্বসঙ্গত নয়। কিন্তু এখানে এরূপ তত্ত্ববিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই,—একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেই যথেষ্ট; আমাদের ঐ হিসাবটাই আর একটু টানিয়া চলিব। নাটকের কথা বলিতেছিলাম। নাটক ও উপন্যাস এক নয়; তথাপি শেক্সপীয়ারের পদ্য-নাটকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্যের—তাঁহার উপন্যাসগুলির—তুলনা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-ট্র্যাজেডিগুলি যেমন নাটকও নয়, তেমনই পদ্য-কাব্যও

নয়; অথচ শেক্সপীয়ারের নাটকীয় ট্র্যাজেডির অনেক লক্ষণ তাহাদের প্রেরণার মূলে রহিয়াছে; এবং গদ্যে হইলেও সেই কবিত্ব তাহাতে প্রচুর। কিন্তু তথাপি সেগুলি নাটকের আকার পায় নাই এইজন্য যে, তাহারা কেবল দৃশ্য নহে, পাঠ্যও বটে—ঘটনাবস্তু হইতে কবি আপনাকে একেবারে সরাইয়া লইতে রাজি নহেন,—কেবল দেখিলেই চলিবে না, তাঁহার কথাও শুনিতে হইবে; এইজন্য নির্ম্মাণকৌশলেও ইহা গদ্য-কাব্য, নাটক নহে। ইহারও কারণ, কবির দৃষ্টি এখানে কেবল রসদৃষ্টিই নহে, সেই রসদৃষ্টির সঙ্গে একটা সচেতন ব্যাখ্যা-প্রবৃত্তি আছে। অতএব, যেজন্য তাহা নাটক হইতে পারে নাই, সেইজন্য তাহা গদ্যও হইয়াছে। নাটকও গদ্য হইতে পারে; বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইয়াও নাটক হয় নাই কেন, তাহা বলিয়াছি; আবার, ভাব-প্রধান হইয়াও তাহারা গদ্যচ্ছন্দ আশ্রয় করিয়াছে কেন, তাহাও বলিতেছি। এই কাব্যগুলিতে কবির রসদৃষ্টি বস্তুর ভাবরূপকে যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তেমনই, সেই ভাবরূপের উপরে আপনার অতিজাগ্রত মানস-চেতনার শাসন কখনও ত্যাগ করে নাই। যে আধ্যাত্মিক বৃত্তিবিশেষকে আমাদের শাস্ত্রে বিবেক বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রবৃত্তিকে সেই বিবেক ভিতর হইতে বল্গাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে রস-সঙ্গ করিয়াও পুরুষ আপনাকে অসঙ্গ রাখিতে চায়; সেই সঙ্গ-সুখের মধ্যেই যে মুক্তি, তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। কবি-মানসের এই অতিজাগ্রত চেতনা জগৎ ও জীবনের রসরূপকেই একান্ত হইতে দেয় নাই—রূপরসের যে আত্যন্তিক আবেশ বাণীকে ছন্দোময় করিয়া তোলে, তাহাকে বশে রাখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলি পদ্য-নাটক না হইয়া গদ্য-ট্র্যাজেডি হইয়াছে। শেক্সপীয়ার ও বঙ্কিম উভয়ের কাব্যের বিষয়বস্তু এক, এবং কবিপ্রেরণাও মূলে সগোত্র বলিয়া মনে হয়, তথাপি একজনের কবিদৃষ্টি অবিমিশ্র বলিয়া—জগৎ ও জীবনের বস্তুগত সত্তাকে রসরূপে আত্মসাৎ করিবার শক্তি দ্বিধাহীন বলিয়া—তাহা কাব্যমন্ত্র-সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছে; অপরের দৃষ্টি সেইরূপ দ্বিধাহীন নয়—বস্তু ও ভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, একে অন্যের উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত একেরই জয় হইয়াছে। অথচ এই কাব্যগুলির উপাদান ও প্রেরণা এমনই যে, গদ্য-উপন্যাস হইলেও তাহারা বারবার শেক্সপীয়ারকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

৫

আর একটি বিষয়ে কিছু বলিয়া আজিকার আলাপ শেষ করিব। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহা হয়তো তেমন কাজে লাগিবে না; কিন্তু ইহারই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব, তাহা সাধারণ কাব্য-পাঠকেরও কিঞ্চিৎ কাজে লাগিতে পারে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা সাক্ষাৎ কাব্য-পরিচয়ের সুবিধা হইতে পারে। আপনারা সকলেই নাটক, নভেল, এমন কি কবিতা পড়িতেও ভালবাসেন—কেন ভালবাসেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। এই সকল রচনায় আমরা আর একটা এমন জীবনের স্বাদ পাই, যাহা আমাদের চিত্তকে ক্ষণকালের জন্যও সুস্থ করে। কবিকল্পনা বা কবিদৃষ্টির প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ করিব না, বোধ হয় আপনাদের তাহা স্মরণ আছে—এই আর এক জীবন ও জগতের উদ্ভাবনাকে একটা মিথ্যা স্বপ্নরচনা মনে করা যে ভুল, তাহাই বলিয়াছিলাম। এখন আমি সেই কথাটাই একটু ভাঙ্গিয়া কাব্যের প্রকৃতি-ভেদের কথা বলিব। ধরিয়া লওয়া যাক, অধিকাংশ কাব্যের মতলবই এই যে, আমরা যেন তাহাতে বাস্তব-জীবনের এই দাহ হইতে একটা শীতল আশ্রয় পাই। জগতে যাহা নাই, কিন্তু আমাদের গভীরতর চেতনায় যাহা কল্পনা করিয়া আমরা আশ্বাস পাই,—এই সকল কাব্যে, কবিগণ তাহারই অনুযায়ী একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই জগৎকে আমরা যদি বাস্তব হইতে পলাইয়া বাঁচিবার জগৎ বলি, তবে তাহা মিথ্যা হইবে না—এ বিষয়ে আপনারা সকলেই একমত, তাহা জানি। অতএব একজন আধুনিক ইংরেজ সমালোচকের অনুসরণ করিয়া আমরা এই ধরণের কাব্যকে "Poetry of Refuge" বা আশ্রয়-সন্ধানের কাব্য বলিতে পারি। ইহাতে প্রখর সূর্য্যালোক জ্যোৎস্নালোকে পরিণত হয়; অথবা, সূর্য্য যেন মধ্যগগনে না উঠিয়া পূর্ব্বাকাশেই ভ্রমণ শেষ করিয়া অস্ত যায়; যত কিছু শোক-তাপ একটি স্নিগ্ধ সান্ত্বনার রসে সিঞ্চিত হয়, কখনও বা অশ্রু হাসির ছদ্মবেশে পরম রমণীয় হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা স্বপ্ন-রচনা নয়; ইহাও এক প্রকার সৃষ্টি—একটা সুসম্বদ্ধ সুসংস্থাপিত জগৎ। অন্তরের অন্তরে আমরা ইহাকে সত্য বলিয়াই অনুভব করি, কারণ ইহার মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সুষমা আছে। স্বপ্নে তাহা থাকে না, তাহাতে কোন সুসম্পূর্ণ জগৎ নাই,

কোন শৃঙ্খলা নাই—তাহা তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার অনাসৃষ্টি মাত্র। অতএব এখানেও যে কল্পনার ক্রিয়া রহিয়াছে, তাহা কবি-কল্পনা; সেই কল্পনা যেন ধ্যানে বসিয়া, কোন এক নিগূঢ় প্রেরণার বশে, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই কণ্টকহীন করিয়া, তাহার সকল কঠিনতা দূর করিয়া, এমন একটি ছাঁদে মাল্যরচনা করে যে, মানুষ তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ক্ষণিকের জন্য জীবন-মুক্তির আনন্দ পায়।*

এইবার আর এক জাতীয় কাব্যের কথা বলিব। এ কাব্যে কবির কল্পনা জীবনকে মুখামুখি দেখিবার, এমন কি তাহার অন্তস্তল ভেদ করিবার দুঃসাহস করিয়াছে। 'Poetry of Refuge' না বলিয়া ইহাকে 'Poetry of Interpretation' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই Interpretation বা ব্যাখ্যা দুই রকমে বা দুই উপায়ে হইতে পারে। জীবনের যত দ্বন্দ্ব—সুখ-দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব পুরামাত্রায় স্বীকার করিয়াই, তাহাকে এমন একটি দৃষ্টির দ্বারা মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনার অনুগত করা যায় যে, মানুষকে তাহার জন্য আর হতাশ হইতে হয় না। ইংরেজ কবি শেলী ও আমাদের রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই শ্রেণীর কাব্য। এই সকল কাব্যে কবির কল্পনা জীবনের সকল বিরূপতাকে একটা সুষম-রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছে—ভ্রম-সংশয়, দৈন্য-দুর্দ্দশা, কুরূপ-কুৎসিতের সমাধানমূলক এক একটি বাণী তাহাতে রূপময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় কাব্যের আর এক স্তর আছে, সেখানেও কবির সৃষ্টি সমাধানমূলক বটে, কিন্তু তাহাতে সেই সমাধান এইরূপ কোন আদর্শ বা আইডিয়ার দ্বারা হয় নাই। সেখানে কবি-চিত্ত জীবনের ভীষণতম মূর্ত্তিকে, শুধু স্বীকার নয়—বরণ করিয়াছে; যে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি বা দেহ-দশাকে জয় করিতে না পারিয়া মানুষ নৈরাশ্যে অবসন্ন হয়—অতিশয় শক্তিমান ও হৃদয়বান ব্যক্তিও চরম বিড়ম্বনা ভোগ করে, এ সকল কাব্যে কবির দৃষ্টি তাহার প্রতিই দৃঢ়বদ্ধ, এবং সেই দ্বন্দ্বকেই পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া তাহার যে রসরহস্য উদ্ঘাটিত করে, তাহাতেই আমাদের অন্তরে এক আশ্চর্য্য উপায়ে প্রহেলিকার সমাধান হইয়া যায়,—দুঃখ দুঃখরূপেই আমাদের প্রাণে একটি প্রশান্তির উদ্রেক করে। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, আসক্তি ও বিদ্বেষের মূলে—জীবনের সকল কোলাহল, উল্লাস ও আর্ত্তনাদের মধ্যে—যে মহাশক্তির লীলা রহিয়াছে, তাহা

প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের আত্মসম্বিৎ যেন বাড়িয়া যায়, আমরাও সকল দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া যাই। উপরি-উক্ত ইংরেজ সমালোচক এই দুই স্তরের কাব্যকেই এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন—কেবল কবিদৃষ্টির পরিধি ও প্রখরতার তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহা শুধু এইরূপ স্তরভেদ নয়, কবির দৃষ্টিগত পার্থক্যও ইহাতে আছে। প্রথমোক্ত কাব্যে, Interpretation—বা, অনর্থের একটা অর্থ করিবার অভিপ্রায় আছে, কিন্তু শেযোক্ত কাব্যে অর্থ-অনর্থের ভেদ-জ্ঞানই যেন নাই। এই দ্বিতীয় স্তরে আছে—মহাভারতের কাব্যাংশ, শেক্সপীয়ারের 'লীয়র', 'হ্যাম্‌লেট', আমাদের মধুসূদনের 'মেঘনাদ', ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা',; প্রথম স্তরে আছে—শেলীর 'প্রোমিথিউস', রবীন্দ্রনাথের 'বৃহত্তর কাব্য ও নাটক', বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি। কাব্যগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছি মাত্র—কক্ষভুক্ত করি নাই; কেহ যেন মনে না করেন যে, কাব্যহিসাবে তাহারা যে সকলে সমান, ইহাও আমার অভিপ্রায়; সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এই দুই জাতি ভিন্ন কাব্যের আর কোন জাতির অস্তিত্ব সন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক কালে সাহিত্যের যে নানা ভঙ্গি দাঁড়াইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি বা রসপিপাসা চরিতার্থ করা নয়, বরং যাহাতে কাহারও রসপিপাসা আর না হয়, তাহারই যেন প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অতএব আমাদের আসরে সেগুলিকে দূর হইতে নমস্কার করাই ভাল। তথাপি ধর্ম্মত বলিতে হইলে, এই আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে, দুই একজন বিদেশী লেখকের রচনায় (একজনের কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে, ইঁহার নাম—Somerset Maugham) এক নূতনতর কবি-দৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছি; তাহাতে, 'Refuge' বা 'Interpretation'—কোনটাই নাই; সান্ত্বনাও নাই, সমাধানও নাই। সে কাব্যে জীবনের বাস্তবকেই এমন এক রূপে উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে যে, তাহাকে যেমন স্বীকার করিতে হয়, তেমনই, তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি আধুনিক সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বাস্তব-বাদের কথা বলিতেছি না। এ বাস্তব দেহ-সম্পর্কহীন মন, অথবা মন-সম্পর্কহীন দেহের বাস্তব নয়; ইহার দৃষ্টি আরও গভীর—এ সকল রচনায়, প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর শাসনে মানুষের বিবেক ও বুদ্ধির লাঞ্ছনা ও জীবনের নিষ্ফলতা এমন করিয়া চিত্রিত

হইয়াছে, এবং তাহাতে মানুষের শক্তি ও অশক্তি, তাহার ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, পরস্পরকে এমন পরিহাস করিতে থাকে যে, তাহাই তাহার একমাত্র নিয়তি বলিয়া মনে হয়; এবং শেষ পর্য্যন্ত একটা বিমূঢ়তাই জাগে। ইহাতে ট্র্যাজেডিও নাই, কমেডিও নাই; ব্যাখ্যা নাই, বিশ্লেষণ নাই, কোন জিজ্ঞাসাও নাই—কারণ, সকলই নিষ্ফল। তথাপি, মানুষের সামাজিক বা নৈতিক সংস্কার, এমন কি, আত্মরক্ষামূলক স্বার্থসংস্কারেরও অন্তরালে সেই প্রবৃত্তি-রূপ নিয়তিকে এমন করিয়া দেখিবার যে দৃষ্টি, তাহাকেও এক প্রকার কবি-প্রতিভাই বলিতে হইবে। কিন্তু এই জাতীয় কাব্য ওই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টিতে পড়ে? চেষ্টা করিলে বোধ হয়, দ্বিতীয়টির কোন এক স্তরে ফেলিতে পারা যায়, নতুবা গত্যন্তর নাই।

আজ এই পর্য্যন্ত—এ আলাপের শেষ নাই। তবু যে এতদূর চলিয়াছে, তাহার কারণ, ইহার আগাগোড়াই একতরফা। প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিই নাই, ভুল করিলেও তাহা ধরাইয়া দিবার—লোক নাই বলিব না—উপায় ছিল না। আবার, এত বেশি সময় লইয়াছি যে, ইহার পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ধৈর্য্য থাকা অসম্ভব। তথাপি আশা করি, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার সব না হউক, কতকটা আপনাদের মনে ধরিবে। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আজ যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন তত্ত্ববিচারের অভিপ্রায় ছিল না, তথাপি কোন কোন স্থানে আমার ভাষা তত্ত্বগন্ধী হইয়া উঠিয়াছে তাহা জানি, আপনারা সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।*

[ভাদ্র, ১৩৪৭]

* সঙ্গীত-সাহিত্য-বিতানের (টালা, কলিকাতা) সাহিত্য-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা



বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য

১

বিষয় 'বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য'; কিন্তু প্রথমেই,—'বাংলা সাহিত্য' বলিতে কি বুঝিতে হইবে? নিশ্চয়ই যাহা বাংলা ভাষায় লিখিত, এবং বাঙালী-জীবন ও বাঙালী প্রাণ-মনের কাহিনী; অর্থাৎ যাহা 'বাংলা' এবং 'সাহিত্য'। আজিকার আলোচনায় আমি বর্ত্তমান সাহিত্যের 'সাহিত্য' কথাটি আরও একটু সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি; কারণ আমি কেবল সেই ধরণের রচনার আলোচনা করিব, যাঁহাকে খাঁটি সৃষ্টি-ধর্ম্মী বলা যায়, বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যে, সেই জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির নিদর্শন পাই গল্পে ও উপন্যাসে। নাটকের কথা আমি বলিব না, বলিলে অনেকেরই ভাল লাগিবে না; যাঁহারা এই ইঙ্গিতে ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদিগকে একটা সান্ত্বনার উপায় বলিয়া দিতেছি—তাঁহারা যেন আমার উপর রুষ্ট না হইয়া, ইহাই মনে করেন যে, আমি নাট্যরসবঞ্চিত, প্রেক্ষাগৃহত্যাগী, হতভাগ্য ব্যক্তি; আমার নাটক সম্বন্ধে কোন 'বাসনা' বা 'সংস্কারই' নাই; অতএব সে সম্বন্ধে আমার বলিবার অধিকারও নাই। কিন্তু কবিতার সম্বন্ধেও আমি ওইরূপ কথা নিজমুখে বলিব না; অথবা সে সম্বন্ধে কেবল ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইব না। কারণ, আমি বলিব—বর্ত্তমানে বাংলা কবিতা মরিয়াছে, শুধুই মরা নয়—মরিয়া ভূত হইয়া বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছে। অতএব গল্প-উপন্যাস ছাড়া আর কিছুরই সংবাদ উপস্থিত পাওয়া যাইতেছে না। সে সংবাদ যে অতিশয় শুভ ও আশ্বাস-জনক, আমি তাহাই বলিতে বসিয়াছি। এই গল্প-উপন্যাস যাঁহারা লিখিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই সম্প্রতি কয়েকজন এ সাহিত্যে স্থায়ী আসন-লাভের অধিকারী হইয়াছেন। এখানেও একটা কথা পুনরায় বলিয়া রাখি, আমি আমারই সাহিত্যিক বিচার-বুদ্ধি ও আদর্শ অনুযায়ী আলোচনা করিব—সে বিচার আমারই; তাহার সহিত কাহারও মতদ্বৈধ হইলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, এবং হইলে—কেহ বা কোন পক্ষ যেন ক্ষুণ্ণ না হন। আমার মতের মূল্যবিচার করিবেন তাঁহারাই, যাঁহারা নিঃস্বার্থ সাহিত্য-প্রেমিক ও সাহিত্য-জ্ঞানী; যাঁহারা নিজেরাই এই

সাহিত্য-রচয়িতা বলিয়া অভিমান পোষণ করেন তাঁহারা, অথবা তাঁহাদের দল বা ভক্তসম্প্রদায় খুশি হইবেন কিনা, সে ভাবনা আমার আদৌ নাই। আমি যাহা বলিব, তাহা সমসাময়িক সমাজের মুখ চাহিয়াই নয়—আমি এমন কথাই বলিব যাহা, আমার জ্ঞানে ও বিশ্বাসে, পক্ষপাতপ্রসূত নয়,—সাহিত্যিক নয়—সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাই তাহার কারণ। এক্ষণে আরও দুইচারি কথা বলিয়া আমার আলোচনার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিব।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাংলাসাহিত্য বলিতে আমি বাংলা ভাষায় রচিত বাঙালীর নিজের জীবন, তথা নিজেরই প্রাণমনের গূঢ় গভীর ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়-কাহিনীই বুঝিব। 'সাহিত্য' শব্দটি যতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হউক, শেষ পর্য্যন্ত তাহা জাতির ভাষায় জাতির আত্ম-সাক্ষাৎকার ভিন্ন আর কিছুই নয়; সেই আত্ম-সাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠ কবিগণের প্রতিভায় এমন স্তরে গিয়া পৌঁছায় যে, তাহা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। অতএব, আমি এই গল্প-উপন্যাস-সাহিত্যের বিচারেও সেই এক মাপকাঠিই ব্যবহার করিব; ভালমন্দ-বিচারের পূর্ব্বেই, আমি সেই সকল উপন্যাসকে সযত্নে দূরে পরিহার করিয়াছি—যেগুলি বাংলাও নয়, বাঙালীরও নয়। বর্ত্তমান কালে শহর নামক পীঠস্থানেই সকল শ্রেষ্ঠ ভাব-চিন্তার ধারা আসিয়া মিলিত হয় বটে, এবং যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে দেশের ও জাতির শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র হয় শহর, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে—প্রথমতঃ, বাঙালী জাতি এখনও শহরবাসী হয় নাই; এবং তাহার জাতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতি—আজও পর্য্যন্ত খাঁটি যেটুকু অবশিষ্ট আছে—তাহা পল্লীরই স্তন্যরসে পুষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, পরাধীন জাতির পক্ষে নাগরিক সভ্যতা যে কত বিষময় ও ভয়াবহ, তাহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বত্র চাক্ষুষ করিতেছি। যাহাদের আত্মা আর সুস্থ নাই, যাহারা একান্তই পরানুচিকীর্ষু ও আত্ম-ভীরু, যাহারা নিজের জাতি, কুল ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে—অর্থাৎ পিতা-মাতার সম্বন্ধেও—লজ্জা অনুভব করে, তাহাদের পক্ষে বিদেশ হইতে সদ্য জাহাজে-আমদানি-করা পণ্য-সভ্যতা যে কি ভয়ানক অহিতকর, তাহা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শহরই এই পণ্য-সভ্যতার মহা-বিপণি; আত্মভ্রষ্ট পরাধীন জাতির পক্ষে এই বিপণি সেই সম্প্রদায়ের মাথা বেশী করিয়া ঘুরাইয়া দিয়াছে—যাহাদের মন একেবারে সকল সংস্কৃতি-দোষবর্জ্জিত ছিল, যাহারা ইতিপূর্ব্বে ইহার

নিকটেও বাস করে নাই; তাহারাই এই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে নিঃশেষে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। ইহারা সাহিত্যের নামে যাহা রচনা করে—সেই গল্প-উপন্যাস প্রভৃতিতে ইহাদের আত্মকথা নাই, ইহাদের নিজেদের দেশ ও সমাজের কোন ধারণা বা স্বজাতীয় সভ্যতার কোন ঐতিহ্য-সংস্কার নাই; ইহারা যে ভাষায় লেখে, তাহাও যেমন ইংরেজীর আক্ষরিক প্রতিধ্বনি, তেমনই যে জীবন ইহারা 'ভণিয়া' থাকে তাহাও বিদেশীর নিকট ধার-করা একটা মুখোস মাত্র; সেইজন্য ইহারা জীবনকে 'প্রকাশ' করিতে পারে না—'ঘোষণা' করিয়া থাকে। ইহাদের রচনায় বাঙালী কখনও তাহার প্রাণের গভীরতম আকুতির সাড়া পাইবে না—বাংলাদেশের জল-মাটি আকাশ-বাতাসের একটা তাজা রংও তাহাতে খুঁজিয়া পাইবে না। ইহাদের জন্মলাভ হইয়াছে দেহে নয়—মনে, অর্থাৎ কতকগুলি কেতাবী বুলির জগতে। জীবন যে কি, তাহা ইহারা জানে না; জীবনকে জানিতে হইলে যে একটি মাত্র উপায় আছে, সেই উপায় ইহাদের নাই—ভূত পিশাচদের যেমন থাকে না; দেহ ধারণ করিয়া, তপ্ত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-পুলকে দেহীগণের সমাজে মিশিয়া, দেহেরই তীব্র উৎকণ্ঠায় মনকে ভাব-কল্পনার দিব্য-দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করার যে পরম কবি-সৌভাগ্য, তাহা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে কেমন করিয়া? ইহারা জীবনের সেই অনুভব-বাণীর পরিবর্তে 'স্লোগান' গাহিয়া কৃতার্থ হয়। দেহের শিরা-স্নায়ুতন্ত্রীর যে আঘাত-বেদনা প্রাণের দিব্য-প্রেরণায় রূপান্তরিত হইলে, তবেই সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয়—সে বেদনা ইহারা বোধ করা দূরে থাকুক—কল্পনাও করিতে পারে না; অর্থাৎ কাব্য-সৃষ্টি করা দূরের কথা, কাব্যরস আস্বাদনের শক্তিও ইহাদের নাই। অতএব সাহিত্যিক-নামলুব্ধ, আত্মকৃতিত্ব-মুগ্ধ, জন্মমাত্রেই মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত—এবং সেইজন্যই, আত্মরক্ষা ব্যাকুল, দলগঠনপূর্ব্বক-প্রোপাগাণ্ডা-নিপুণ—এই হতভাগ্যগণের সাহিত্যিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

"তবু এত কথাই বা বলিলাম কেন? বলিবার কারণ আছে। এ যুগে আমাদের সমাজে সাহিত্যের ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তিরও যে বুদ্ধিভ্রম লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে যাহা চিরন্তন তাহাকেও সাময়িকরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে। বাংলা সাহিত্য এক্ষণে পণ্ডিতের গবেষণার বস্তু হইয়াছে—উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রগণকেও সেই গবেষণার ফলাফল ভোগ করিতে হয়। এতদিন যাহা মাসিক-

সাহিত্য বা বৈঠকখানা-বিলাসের সামগ্রী ছিল, এক্ষণে তাহা বিদ্বৎ-সভার বিচারাধীন হইয়াছে, সেই বিচার গুরুতর গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়া স্থায়ী মূল্য দাবি করিতেছে। অথচ তাহাতেও সেই বৈঠকখানাসুলভ বক্তৃতা—অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত রুচি ও মনোভাবের অবাধ গতি সমান অব্যাহত থাকে। বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহা কেবল অর্জ্জিত বিদ্যাই নয়, তাহার জন্য কিছু মূলধনও চাই। লজ্জার কথা এই যে, যিনি বাংলা সাহিত্যের বিচার করিতে বসেন, তাঁহার বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও সেই জ্ঞান নাই, যাহা দ্বারা অতি সহজেই নির্দ্ধারণ করা যায়—কোন্ ব্যক্তি লেখকপদবাচ্য-কে নয়; আমি আর সকল লক্ষণ ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের প্রচার সহজ ও অনিবার্য্য হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের (বিশেষত বহুজন-পঠিত ও জনপ্রিয় উপন্যাস প্রভৃতির) সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণার উৎপত্তি হইতেছে। অতএব আমি যে এই নিতান্ত সাময়িক ঘটনাকেও এ আলোচনায় এতখানি স্থান দিতেছি কেন, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন; আমি বলিব, এ সমাজে সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে এ দুর্গতি-ভোগ অনিবার্য্য।

বৰ্ত্তমান বাংলাসাহিত্যের উপন্যাস-সম্পদের কথা বলিতে বসিয়াছি—সে প্রসঙ্গে কয়েকজন কৃতী লেখকের কৃতিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। কোন্‌গুলিকে কেন বাদ দিয়াছি, সে কৈফিয়ৎ এতক্ষণ সবিস্তারে দিয়াছি, তথাপি, একটা বিষয় উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে। আমি, সেই সকল লেখককেও আমার এ আলোচনার যোগ্য মনে করি না, যাঁহারা কেবল ভাষার একটু পরিচ্ছন্নতা অথবা গল্প বলিবার একটা ভঙ্গিমাত্র আয়ত্ত করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদের রচনা সর্ব্বৈব অনুকৃতিমূলক, সত্যকার সৃষ্টি নহে। সৃষ্টি করিতে হইলে যে দৃষ্টির আবশ্যক, সে দৃষ্টি যে ইহাদের নাই, তাহার প্রমাণ—ইহারা সিনেমা-ছবির মত কতকগুলি কৌশল শিখিয়া লইয়াছেন; আধুনিক পাঠকের হৃদয়গ্রাহী কতকগুলি নিকৃষ্ট সেন্টি[redacted]—এবং অতি-গভীর সহৃদয়তা ও দার্শনিকতার ভঙ্গি সহকারে তাহারই শ্রেষ্ঠতা-প্রতি[redacted]কৌশল ইহারা আয়ত্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এগুলি হয় 'কমরেডী' ভাববিলাস, নয় 'তরুণ-তরুণী'-বিদ্রোহের অতি তেজস্কর টনিক। আমি এ গুলিকেও বাদ দিয়াছি।

১

গত কয়েক বৎসরের বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা আমার সহিত একমত হইবেন যে, আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁহাদের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁহারা—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সাময়িক খ্যাতির দিক দিয়া আরও একজনের নাম এই তালিকায় যুক্ত হইতে পারে—ইনি শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়—ছদ্মনাম 'বনফুল'। তথাপি, ঐ তিনজনকে প্রথম গণনীয় করিয়াছি এইজন্য যে, ইঁহারা কেবল সাময়িক খ্যাতিই নয়, আরও স্থায়ী আসন লাভ করিবার মত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আগে ইঁহাদের কথাই বলিব।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনার প্রতি আমিই সর্ব্বপ্রথম 'শনিবারের চিঠি'তে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম—তখন তাঁহার 'পথের পাঁচালী' 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছিল। এই প্রথম উপন্যাসখানির দ্বারাই তিনি যেন—leapt into fame—একলম্ফে যশের শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন; আজও তাঁহার সেই যশ অক্ষুণ্ণ আছে, তাহার কারণ, তাঁহার দৃষ্টি যেমন, তাঁহার ষ্টাইলও তেমনই মৌলিক। এই মৌলিকতার কারণ দুইটি; প্রথমতঃ, আমাদের রসপিপাসাকে তিনি একটা ভিন্নমুখে ফিরাইয়াছেন—পূর্ব্ববর্ত্তীগণের (রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র) মত জীবনের অন্তঃস্রোতে বা বহিঃস্রোতে অবগাহন করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিতে চাহেন নাই; তিনি তীরে বসিয়া তটশোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, জীবনের দুর্গম গহনে প্রবেশ না করিয়া, আপনার মানস-যন্ত্রে তাহার প্রসারিত পট-দৃশ্যের ছবি তুলিয়াছেন। জীবন তাঁহার নিকটে একটা স্থির শান্ত গতিহীন ও প্রায় সুসজ্জিত মনোহর চিত্রশালা। তাঁহার চোখ দুইটির পিছনে একটি যে ভাবরসগ্রাহী মন আছে, তাহার রসায়নাগারে বাহিরের যত কিছু—মানুষ, পশু, পক্ষী, মাঠ, বন, নদী ও আকাশ—কেবল একটি রসরূপে পরিণত হয়; প্রাণ যেন বলে,—এই তো! ইহার অধিক কি চাই? তুচ্ছতম বন্যলতায় ও তৃণ-পুষ্পে—ভুখারী মানুষের অতি-ক্ষুদ্র জঠরের ক্ষুদ্র ক্ষুধার খুদ-কুঁড়াতেও কি অমৃত রহিয়াছে! চাই কেবল সেই স্বল্পে-তুষ্ট, তুচ্ছ-লুব্ধ, যাহা-পাই-তাহাতেই-ধন্য রসাভখারী মন, তাহা হইলেই

জীবনের ধূলামাটিও পরম পদার্থ হইয়া উঠিবে। বিভূতিভূষণের ব্যক্তি-মনোভাব এমনই বটে, কিন্তু কবিশিল্পীহিসাবে তাঁহার মৌলিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ—তিনি এই কাঙাল-সুলভ পিপাসাকে সাহিত্যে একটি অভিনব ষ্টাইলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। এই ষ্টাইল জীবনের দ্বন্দ্ব-গভীর, রহস্য-ঘোর, বিরাট-বিপুল অথবা সূক্ষ্ম-জটিল শক্তি-মহিমার ষ্টাইল নয়, তথাপি তাহা good art বা নিছক রস-সৃষ্টির ষ্টাইল বটে। এই রসেরই সিদ্ধ সাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁহারও কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র ছিল—সহজ ও সর্ব্বব্যাপ্ত যাহা ('joy in widest commonalty spread') তাহারই রসরূপ সৃষ্টিকরা; এই রস-সম্ভোগের কথাই তিনি তাঁহার 'চিত্রা'-কাব্যের "সুখ"-নামক কবিতাটিতে বড় চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

মনে হইতেছে,
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত বিকশিত,
উন্মুখ অধরে ধরি' চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি চিরদিন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে যাহাকে অতিশয় সরল ও সহজরূপে উপভোগ করিয়াছেন, জীবনের আলেখ্যরচনায়—গল্পে ও উপন্যাসে—তাহাকে এমন বাউল শিশুর বেশ ধারণ করান নাই। বিভূতিভূষণ কিন্তু সেই বাউলের একতারাটি মাত্র সম্বল করিয়া উপন্যাসেও সেই সুর বাজাইয়াছেন। তাঁহার কল্পনা লিরিক-কবির মতই আত্মকেন্দ্রিক, তাই তাহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ; তিনি কেবল তাঁহার নিজেরই ভাবানুভূতির লিপিকার। ঔপন্যাসিককে জীবনের রূপকার হইতে হইবে, এরূপ একান্ত লিরিক-কল্পনা উপন্যাসের উপযোগী নয়। তিনি জীবনের আর্টিষ্ট মাত্র—কবি নহেন। তাঁহার যাহা-কিছু সৃষ্টিনৈপুণ্য তাহা ওই ষ্টাইলেই সীমাবদ্ধ; ওই ষ্টাইলের বলে তিনি তাঁহার সেই প্রথম উপন্যাসের পরে বহু গল্প-উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জীবনের রহস্যপুরীর কোন নূতন দ্বার-উন্মোচন নাই; সেই একই সুরের আলাপ আছে। এইরূপ রচনা বিভূতিবাবুর

পক্ষে এতই সহজ এবং তাঁহার ওই ষ্টাইল এমনই হৃদয়গ্রাহী যে, তিনি অনায়াসে সাহিত্য-বিপণির পণ্যভার বৃদ্ধি করিতেছেন, সামান্য ডায়েরী-জাতীয় রচনাও উপন্যাসরূপে বাঙালী পাঠকের উপাদেয় হইয়া উঠে।

তথাপি, বিভূতিভূষণ একজন বিশিষ্ট সাহিত্য-শিল্পী, তাঁহার মৌলিকতার দাবিও স্বীকার করিতে হইবে। আমি ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থে বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী"র ভাবজগৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহাও এইখানে স্মরণীয়। সেখানে আমি তাঁহার কল্পনার মৌলিকতা ও কবিত্বের দিকটাই বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছি, উপন্যাসহিসাবে ঐ রচনার মূল্য-বিচার করি নাই। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস মানুষের যে কাহিনী গাহিয়াছে, তাহাতে লিরিক-সুরের অবকাশ যথেষ্ট থাকিলেও, তাহার রস—মানুষের জীবনাবেগের প্রাবল্য, তাহার সুখ দুঃখের গভীরতম অনুভূতি, এবং দ্বন্দ্ব-সংশয়ের আবর্ত্ত-ফেনিল তরঙ্গকে—এক কথায় জীবনের সমগ্র রূপকে আশ্রয় করিয়াছে। প্রত্যেক যুগের সাহিত্যে জীবনের যুগোচিত অনুভূতি ও তজ্জনিত ধ্যান-ধারণা যেমনই হউক,—যাহা কেবলই আর্ট নয়—কাব্যও বটে, অর্থাৎ, যাহা মানুষেরই গভীরতম পরিচয়-কাহিনী, তাহাতে আমরা কেবল সুর পাই না, কথাও পাই; সে কেবল সুন্দরের কথাই নয়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্বঘটিত এক অপূর্ব্ব রহস্য-রসের কথা। অতএব বিভূতিভূষণের রচনাগুলি আকারে ভঙ্গিতে উপন্যাস হইলেও, আমি—মাত্রাভেদ সত্ত্বেও যাহাকে খাঁটি সৃষ্টিশক্তি বা কবিশক্তি বলিয়াছি—তাহার দিক দিয়া, তিনি বড় ঔপন্যাসিক নহেন, একজন শক্তিমান সাহিত্য-শিল্পী-মাত্র। একরূপ মনোবৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সহিত রস-পিপাসা যুক্ত হইলে, মানুষ ও প্রকৃতিকে একটি স্থির-চিত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া যে ধরণের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সম্ভব, তিনি সাহিত্যে সেই সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা। এই হিসাবে তাঁহার মৌলিকতাও যেমন সত্য, তেমনই তাঁহার প্রতিভা যে রবীন্দ্র-যুগের রস-সাধনারই একটি স্বাভাবিক পরিণাম—তাহাও সত্য।

ইহার পর, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের প্রতিভা ও প্রবৃত্তির পরিচয় আমি তাঁহার 'কবি'-নামক গল্পটির সমালোচনায় বিস্তৃতভাবে দিয়াছি, অতএব এখানে অতি সংক্ষেপে তাঁহার দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। তারাশঙ্করের

জীবন-দর্শনে দিবালোক যতই প্রখর হউক, তথাপি তাহার পশ্চাতে তিনি সর্ব্বদাই জীবনের অপর পিঠ—সেই রহস্যময়ী রাত্রির দিকটাও স্মরণে রাখিয়াছেন ; সে রহস্য ভেদ করিতে না পারিলেও সেই কুহকিনীর কটাক্ষ-ইঙ্গিত তিনি বারবার অনুসরণ করিয়াছেন, যেন তিনি—

"Night, the shadow of light,
And life, the shadow of death."

—এই দুইয়েরই রহস্য মিলাইয়া দেখিতে চান। তাই তাঁহার কল্পনায় প্রকৃতির নিয়মই মানুষের নিয়তি নয়। সেই নিয়তিই প্রকৃতির নিয়ম-শাসনকে অসীম অর্থ-গৌরব ও পরম রমণীয়তা দান করিয়াছে। তাই প্রকৃতির তাড়নায় মানুষের জীবনে যত বহ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হয়, তাহার সেই বহুবর্ণের আতস-শোভা তিনি যেমন অপলক নেত্রে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তেমনই, তাহার পশ্চাতে যে অন্ধকারের পটভূমি রহিয়াছে, তাহাকে সেই শোভার একটা বড় কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন ; সেই অন্ধকারে জীবনের যে অংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাকেই তিনি বৃহত্তর বলিয়া জানেন এবং তাহারই সঙ্কেতে তিনি যে রূপ-সৃষ্টি করেন, তাহাতে সকল জ্ঞান-বিচার স্তম্ভিত হইয়া যায় বলিয়াই একটি মধুর উৎকণ্ঠায় আমাদের রসচেতনা অনুরণিত হইতে থাকে। তথাপি ইহা নিছক কাব্যরস নয়, আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকের সেই 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' ইহা নয়। ইহাও জীবনের বাস্তবরূপোদ্ভূত রস, এ রসের উপভোগকালে জীবনচেতনা লুপ্ত হয় না, বরং জীবনেরই একটা বিশিষ্ট রূপের বিশিষ্ট ভঙ্গি সর্ব্বক্ষণ সেই রস-চেতনায় বিদ্যমান থাকে—তাহার সেই রূপই অপরূপ হইয়া উঠে। তারাশঙ্কর বাংলা-সাহিত্যে জীবনের এই যে রস-রূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন, বাস্তব জীবনেরই সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্য ও বিরূপতা—সর্ব্বস্তরের জীবন, এমন কি, মনুষ্য প্রকৃতির কুৎসিত ও বীভৎস প্রকাশকেও তিনি যে রসরূপে পরিণত করেন, তাহার মূলে আছে সেই রসচেতনা। জীবনের এই যে রূপস্রোত ইহাও একটা মহারূপকের নাট্যাভিনয়। রঙ্গভূমিতে মানুষের চরিত্র ও নিয়তির এই রহস্যরসবোধ যাহার কল্পনার উদ্দীপন-কারণ—তিনি বিশ্লেষণ করেন না, আবিষ্কার করেন ; ব্যাখ্যা করেন না, সৃষ্টি করেন ; প্রমাণ করেন না, প্রদর্শন করেন। তারাশঙ্করের সকল উৎকৃষ্ট রচনায় এই ইঙ্গিতমূলক প্রদর্শন আছে, রূপের সেই রূপক-রস-সঙ্কেত আছে ; কোন যুক্তিতন্ত্র,

কোন থিয়রি বা মতবাদ—কোন কিছুর ঘোষণা তাহাতে নাই। কল্পনার এই objectivity—বিশেষ করিয়া তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে জীবনের যে রূপ-চিত্রাবলী উদ্ঘাটিত করিয়াছে, তাহার বৈচিত্র্য সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মত। তাঁহার দৃষ্টি সেই এক রসকেই বহুর মধ্যে বিচিত্ররূপে আবিষ্কার করিয়া, কুৎসিত-সুন্দর, ভীষণ-মধুর, নিষ্ঠুর-কোমল প্রভৃতি সকল বস্তুকেই সমান উপভোগ করে; প্রত্যেককেই তাহারই ভাবে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া সেই অপক্ষপাত রস-সম্ভোগ তাঁহার গল্পগুলিতে সম্ভব হইয়াছে। আমি তাঁহার আর্টের যে objectivity-র কথা বলিয়াছি, তাহার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, তাঁহার গল্পের প্রতিবেশ ও ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে চরিত্রগুলি এমন অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে, সবগুলি একত্রে একমুখে গল্পটিকে রসের পরিণাম-মুহূর্ত্তে পৌঁছাইয়া দেয়; ইহার আর একটা লক্ষণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাঁহার রস-সৃষ্টিতে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ-ভঙ্গি নাই; গল্পের সকল উপাদানই নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মত কাজ করে; চরিত্রগুলিও কোথাও আপনাদিগের অন্তরদ্বার আপনারাই এতটুকু উন্মোচন করে না—সে বিষয়ে তাহাদের যেন কোন সজ্ঞানতাই নাই; তাহারা খাঁটি জীবনধর্ম্মী মানুষের মত ব্যবহার করে—কথায় ও কাজে তাহাদের গূঢ়তম প্রবৃত্তির ইঙ্গিতমাত্র প্রকাশ পায়; অর্থাৎ, লেখক নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়াছেন—তাই ঘটনা বা চরিত্রের কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নাই। জীবন বলিতে যে একটি পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারকে আমরা কেবল ধ্যানেই উপলব্ধি করি, তাহাই এ সকলের মধ্যে যেন চকিতে চমকিয়া উঠে—বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুদর্শন হয়, ক্ষুদ্র নখের দর্পণে দেশ-কালের বিস্তৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাকেই আমি রূপের রূপক-মহিমা বলিয়াছি—অতি ক্ষুদ্র মানব-মানবীর ক্ষুদ্র কাহিনীতে সর্ব্বমানবের নিয়তি প্রতিবিম্বিত হয়; অতি ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ প্রেম-সঙ্কটে বিরাট ট্র্যাজেডির ছায়া পড়ে; যেন জীবনের সম্মুখভাগে, তাহাকে আড়াল করিয়া যে বিশাল যবনিকা দুলিতেছে—যাহাকে আমরা পরিদৃশ্যমান বাস্তব-দৃশ্যপট বলি—তাহার যে-কোন স্থানের ক্ষুদ্রতম ছিদ্রপথেও চক্ষু সংলগ্ন করিলে, সেই এক অসীম রহস্য-সাগরকেই উদ্বেলিত হইতে দেখিব। তারাশঙ্করের যে কোন উৎকৃষ্ট গল্প ইহার নিদর্শন—এখানে বিশেষ করিয়া তাঁহার 'ঘাসের ফুল' নামক গল্পটি আমার মনে পড়িতেছে।

তারাশঙ্করের কবিশক্তির পরিচয়-প্রসঙ্গে আমি জীবন-রস-রসিকতার যে আর

এক ভঙ্গি, ও তাহার আর্ট সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি—তাঁহার রচনাগুলির অনেকাংশে তাহা প্রযোজ্য হইলেও, আমি এমন কথা বলি না যে, তাঁহার ছোট গল্পগুলিতেই সেই আর্টের চরম পরিণতি ঘটিয়াছে। এই দৃষ্টি তাঁহার আছে—তাঁহার ছোট গল্পগুলিতে তাহা প্রায়ই সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে তিনি যে রসদৃষ্টিসুলভ অসাধারণ ভাব-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাসেও সাধারণত সেই শক্তির নিদর্শন থাকিলেও সমগ্রভাবে সেই সংযম এখনও তাহাতে দেখা দেয় নাই। তাহার কারণ, উপন্যাস রচনাকালে তিনি জীবনের যে সুপ্রশস্ত পটভূমিকার শরণাপন্ন হন, তাহাতে তাঁহার কল্পনা ভিন্নমুখী হইয়া পড়ে—বন্যার জলবিস্তারে নদীর তটরেখা স্থানে স্থানে লুপ্ত হইয়া যায়। তিনি চিরন্তন-কে গৌণ করিয়া যুগ-মহিমাকেই মুখ্য করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। যুগ-সমস্যা বা যুগ-প্রবৃত্তি জীবনের নিত্য-রূপের—অর্থাৎ রসরূপের—অন্তরায় নয়, বরং তাহারই নিরন্তর তটবন্ধনে যাহা কালাতীত, তাহাই নব নব রসরূপ পরিগ্রহ করে। কবি-শিল্পীর পক্ষে, বিশেষত জীবনের দক্ষতম রূপকার—ঔপন্যাসিকের পক্ষে, সেই উপাদানগুলির প্রয়োজন অল্প নহে; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার রসদৃষ্টি আরও মুক্ত ও স্বচ্ছ থাকা আবশ্যক—বন্যার ভাব-প্লাবনে শিল্পীও যেন স্ব-স্থান চ্যুত না হন, তাঁহার নির্লিপ্ত রস-চেতনায় আত্ম-ভাবের (personal sentiment) ছায়ামাত্র না পড়ে। উপন্যাসের সুবৃহৎ আকারে জীবনের জটিল ও বহুবিচিত্র রূপকে সেই এক রূপক-রসে অভিষিক্ত করার যে আর্ট, তাহাই কবি-শক্তির পরাকাষ্ঠা—তারাশঙ্কর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বাংলাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

ইহার পরেই শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যাইতে পারে। একহিসাবে বিভূতিভূষণের কথা-শিল্পও বাংলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও তিনি একাধিক রসের সম্যক পরিবেষণ করিয়াছেন—জীবনের স্নিগ্ধ-করুণ-কোমল, হাসি-অশ্রুময় [illegible] ও নিপুণ তুলিকাস্পর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং সেই কারণেই একজন শক্তিমান কথাশিল্পী বলিয়া খ্যাতিলাভের যোগ্য, তথাপি, দুইটি রসের—হাস্য ও বাৎসল্যের—রূপসৃষ্টিতে তিনি যে অব্যর্থ প্রেরণার পরিচয়

দিয়াছেন, তাহাতে বাংলা কথা সাহিত্যে একটি অতিশয় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই হাস্যরসের ইংরেজী নাম 'হিউমার', বাংলায় ইহার প্রতিশব্দ এখনও তৈয়ারী করা যায় নাই। ভাঁড়ামী, বিদ্রূপ বা স্থূল পরিহাস-রস ইহা নহে; ইহাও জীবনকে দেখিবার একটি গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গি. সে দৃষ্টি এমনই যে, তাহাতে অশ্রু ও হাসি পরস্পরের সহিত লুকাচুরী খেলিতে থাকে, একরূপ অনুকম্পাই ঐরূপ 'হিউমার'-রসের জনয়িতা। মানব-চরিত্রের যাহা-কিছু দোষ-ত্রুটি, যাহাকে আমরা, হয় গালি দিই, নয় কৃপার চক্ষে দেখি, তাহাই এমন একটি রস-রূপ ধারণ করে যে, সেই দোষ-ত্রুটিগুলাই আমাদের হৃদয়ে প্রীতির উদ্রেক করে। ইহাই উৎকৃষ্ট হাস্যরস বা 'হিউমার'; এ রসের সদ্ভাব সাহিত্যে তেমন সুলভ নয়; এইজন্য যাঁহারা এই রসের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরবও স্বতন্ত্র। শেক্সপীয়ারের কেবল ট্র্যাজেডিগুলাই নয়—সেই সঙ্গে তাঁহার কমেডিগুলাও মহাকবির মানব-জীবন-দর্শন, তথা কবি-প্রতিভাকে এমন অবিসংবাদী করিয়া তুলিয়াছে। এই রসেরই রসায়ন-কৌশলে, মানুষের যে মূঢ়তা ও দুষ্প্রবৃত্তি নীতিবাদীগণের চক্ষে ঘৃণার্হ ও দণ্ডনীয়, তাহাই আমাদের প্রাণে একটা প্রশ্নাকুল তিতিক্ষার উদ্রেক করে—হাসিতে পারি বলিয়াই, একটা গভীর-তর সত্যের আভাস পাই। ইহাই উৎকৃষ্ট হিউমার। অতএব, বিভূতিভূষণ যদি সেই রস, আমাদের এই সহজ, সরল, তরঙ্গ-তুফানহীন সমাজ-জীবনের অশ্রুসরোবর হইতে আহরণ করিয়া—সেই 'প্রত্যহের কুশাঙ্কুর'কে—সেই অভ্যস্ত বলিয়াই অলক্ষিত—হৃদয়ের ক্ষতি ও ক্ষতগুলাকে, এমন কমেডির উপাদান করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে আমাদের সাহিত্যের একটা বড় অভাব তিনি পূরণ করিয়াছেন। ঐ হিউমার বাঙালী-চরিত্র ও বাঙালী-জীবনের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ না হইয়া পারে না, কারণ, বাস্তব অতিক্রম করিলেই, তাহা আর জীবন-দর্শন হইবে না—Satire কিম্বা ভাঁড়ামীতে পরিণত হইবে। আবার, তাহা যদি কবিদৃষ্টিবৰ্জ্জিত হয়, অর্থাৎ অতিশয় বাস্তব-নিষ্ঠ হয়, তবে তাহা জীবনের একটা খণ্ড-রূপকেই দেখিবে—সে রস 'হিউমার' হইবে না, একরূপ 'বিদ্রূপ'-রস হইবে, তাহাতে প্রেমের পূর্ণ-দৃষ্টি-থাকে না। বিভূতিভূষণের পূর্ব্বে আর একজন শক্তিমান কথা-শিল্পী বাংলাসাহিত্যে এই রসের আমদানি করিয়াছিলেন—তিনি স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; বিভূতিভূষণ তাঁহার

সগোত্র, এমন কি সাহিত্যিক বংশধর বলিলেও হয়; কিন্তু তিনি ঐ 'হিউমার'কে আরও ব্যাপক,—আরও গভীর, এবং সূক্ষ্মতর করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার রচনার যে আরেকটি রসের কথা বলিয়াছি—সেই বাৎসল্য-রসকে তিনি যেমন স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছেন তেমন আর কেহ করেন নাই; এই শক্তিও অসাধারণ বলিলেই হয়। আমার এমনও মনে হয় যে, এই রসের প্রকটনে, তিনি তাঁহার প্রতিভার এমন একটি বাঙালী-সুলভ প্রেরণার পরিচয় দিয়াছেন, যাহার জন্য সেই গল্পগুলি, এক অর্থে, খাঁটি বাংলা-সাহিত্য হইয়াছে। এ দেশ বিশেষ করিয়া মা ও ছেলের দেশ—উমা ও বাল-গোপাল বাঙালীর রস-জীবনের একটি স্থায়ী আলম্বন হইয়া আছে। আধুনিক কথা-সাহিত্যে তাহার যে উপযুক্ত স্ফুরণ হয় নাই, ইহাই বিস্ময়কর। সেই বাৎসল্য-রস-সুধা অন্ততঃ এই একজনের সাহিত্যিক প্রেরণা পুষ্ট করিয়াছে। এই রসেরই ক্ষুধা বিভূতিভূষণের একখানি সুবৃহৎ উপন্যাসে আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'কে হাজার পৃষ্ঠা ধরিয়া যে মাতৃস্তুতি করিয়াছেন —বাঙালী মায়ের স্নেহময়ী প্রতিমাটিকে যেমন করিয়া সূক্ষ্মতম রেখায়-বর্ণে আঁকিয়া তুলিতে ক্লান্তি মানেন নাই, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি নিজেই স্নেহাতুর শিশু হইয়া মায়ের হৃদয়খানির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন,—শিশু নিজে যে বাৎসল্যের 'বিষয়' হইয়া থাকে, সেই বাৎসল্যের 'আশ্রয়'টাকেও সে যেন বুঝিতে চাহিয়াছে—নিজের প্রাণের জবানীতেই মাকে চিনিয়াছে। উহাই যে একমাত্র উপায়!—যাহা 'জানিতে' চাই, তাহাই যে 'হইতে' হইবে।

এই সকল রসেরই আদি রস—মধুর রস; বাৎসল্যেরও তাহাই—শাস্ত্র ইহাই বলে। অতএব, বাৎসল্য হইতে সখ্য বেশিদূর নয়। তাই বিভূতিভূষণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর সেই একই মন্দিরসংলগ্ন পাকশালায়, ভক্তিমান পূজারীর মত শুচিবাসে ও শুদ্ধচিত্তে, সেই রসেরও পায়স-ব্যঞ্জন পাক করিয়াছেন। শিশুর রূপ ধরিয়া ঠাকুর যে রসের লীলায় আমাদের ঘর-সংসার আলো করিয়া রাখেন, সে রসের পাকও যেমন,—ঘরের বাহিরে ব্রজবনে, তাঁহার দুর্ললিত কিশোর-লীলাও আমাদের বয়োভারপীড়িত মনকে ক্ষণেকের জন্য যে রসাবেশে লঘু করিয়া দেয়, তাহাও কতকগুলি গল্পে তেমনই উপাদেয় হইয়াছে। তাঁহার গল্পগুলিতে এই লীলারস উৎকৃষ্ট 'হিউমার' হইয়া উঠিয়াছে; সে হিউমার

যে সূক্ষ্ম পর্দ্দাগুলির উপরে গতায়াত করিয়া থাকে, তাহার আস্বাদনও অতি সূক্ষ্ম রসবোধসাপেক্ষ। তাঁহার রচনার সর্ব্বপ্রধান গুণ—সৌকুমার্য্য; এই সৌকুমার্য্য কেবল ভাব, বিষয় বা উপকরণগতই নয়,—সকল রচনার অন্তরালে আমরা একটি অতিশয় সংযমী, পরসহিষ্ণু, নির্ব্বিরোধ, কোমল-হৃদয়, অথচ তীক্ষ্ণ রসদৃষ্টি-সম্পন্ন শিল্পী-চরিত্রের আভাস পাই। এই ব্যক্তিত্বই তাঁহার স্টাইল—ইহাই তাঁহার রচনার 'হিউমার'-গুণের কারণ। তাঁহার হাসিও যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, অশ্রুও তেমনই,—যেমন করুণ তেমনই মধুর। জীবনের হাসি ও অশ্রুকে পাশাপাশি গাঁথিয়া একই মণিমালায় তাহাদের অভিন্নতা সম্পাদন করার যে উৎকৃষ্ট রস-দৃষ্টি—তাহারই একটি সুকুমার ললিতভঙ্গি বিভূতিভূষণের রচনাকে লক্ষণীয় করিয়াছে। আবার "নীলাঙ্গুরীয়" নামে তিনি যে উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন তাহাতে রসের যাহা সার সেই উজ্জ্বল-রসের ভিয়ান আছে, এ রসের পাকনৈপুণ্যে শুধুই শিল্পী-মন নয়,—জীবনের অতলকে মন্থন ও তাহার গরল হইতেই অমৃত—মৃত্যুর হাত হইতেই সঞ্জীবনী—উদ্ধার করার যে কবি-শক্তি, তাহাই বিশেষ করিয়া আবশ্যক। এই উপন্যাসে বিভূতিবাবু সে কাজ করেন নাই, তাঁহার অভিপ্রায় এত উচ্চ বা দুঃসাহসিক নয়। তথাপি তাঁহার নিজস্ব পাকপ্রণালীতে বা নিজের ব্যক্তি-মানসের সেই ষ্টাইলে, তিনি এই রসের যে রূপটি নিজেরই অভিজ্ঞতার পটবস্ত্রে রঙিন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে সেই বৃন্দাবনী বাঁশির সুরেও একটু নূতন মূর্চ্ছনা যুক্ত হইয়াছে। জীবনের মাঠে বাটে চারিদিকে কতসুরে কত হৃদয় সেই এক বাঁশির সুরে ব্যাকুল হইয়া উঠে; অনেকস্থলে স্পষ্ট অভিসার সঙ্কেতও পাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পৌছানো আর হয় না। কালিন্দীর ক্রূর-কৃষ্ণ জলধারা চিরবিচ্ছেদের অশ্রু-তরঙ্গিণীর মত প্রেমকে দুই পারে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। এই 'একা-নদীই বিশ ক্রোশ' হইয়া উঠে, বারবার লগ্নভ্রষ্ট হয়, পারের নৌকা ছাড়িয়া দেয়—তখন খেয়াঘাটে গড়াগড়ি দিয়া জীবনের বাকি সন্ধ্যাটুকু শেষ করিতে হয়। তাই এমন একখানি উপন্যাসের সমালোচনা সহজ নয়; জীবনকে তিনি যেমন দেখিয়াছেন—সে দেখা যেমনই হউক, তাহাতে 'seriousness and sincerity' থাকিলে এবং তাহার বাণী-রূপ সার্থক হইলেই হইল; ইহার অধিক দাবী [illegible] অন্যায়। কিন্তু আমাদের উপন্যাসগুলিতে কেমন যেন শেষ রক্ষা হয় না, জীবনের খণ্ডচিত্রগুলি পরপর একটি সূত্রে গাঁথা হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সূত্রের দুইমুখ যুক্ত হইয়া একটি

সম্পূর্ণ সুষমণ্ডলায়িত কাহিনী হইয়া উঠে না। তাহার কারণ—'রিয়্যালিজ্‌ম' নয়; আমি কাব্যে সেইরূপ রিয়্যালিজ্‌ম মানি না; একমাত্র কারণ, আত্ম-নিরপেক্ষভাবে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টি, তাহা আমাদের লেখকদের নাই; আমাদের সকল কাব্যই lyrical—আত্মকেন্দ্রিক। আরও কারণ এই যে, আমরা ভাব-রসিক, জীবনের রণস্থল হইতে আমরা সরিয়া যাই; তাই প্রেম আমাদের কর্ম্মশক্তির প্রেরণা নয়—ধ্যান-কল্পনার বস্তু। লেখক এই উপন্যাসেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন; এ উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রে কর্ত্তব্যের নির্ম্মমতা বা প্রেমের আত্মবিস্মৃতি,—কোনটাই নাই, তাই যে ট্র্যাজেডির পূর্ণতর বিকাশ ইহাতে সম্ভব ছিল, পুরুষের শক্তিহীনতার জন্য তাহা ঘটিতে পারে নাই, উপন্যাসটিও কাহিনী-হিসাবে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে নাই। তথাপি এই উপন্যাসেও বিভূতিভূষণের কবিশক্তির যে বিশিষ্ট পরিচয় আছে, তাহাতে আমি পূর্ব্বে তাঁহার কবিদৃষ্টির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহারই প্রমাণ মিলিবে, অর্থাৎ যাহাকে জীবনের "conterminous provinces of laughter and of tears" বলা হইয়াছে, সেই দুইয়েরই উপরে তাঁহার অধিকার প্রায় সমান; মানবজীবনের রূপকার হিসাবে এইরূপ কবিশক্তিও একরূপ অদ্বৈতসিদ্ধির পরিচায়ক,—অশ্রুকে যে নেত্রপুটে রুদ্ধ করিতে পারে, সে-ই হাসির তত্ত্ব বুঝিয়াছে।

ইহার পর, যাঁহার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা কয়েকটি বিশেষ কারণে আবশ্যক, তাঁহার স্ব-নাম—শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, বি-নাম—'বনফুল'। 'বনফুল'কে সমসাময়িক বাংলা-সাহিত্যের একজন খাঁটি 'আধুনিক' কথাশিল্পী বলা যাইতে পারে, কারণ জীবনের ব্যাখ্যা-কর্ম্মে তিনি বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাক্ষ্যই মান্য করিয়া থাকেন। সকল সাহিত্যিক প্রেরণাই সহজাত—অনুকূল বা প্রতিকূল শিক্ষা ও প্রতিবেশের প্রভাবে সেই জন্মগত প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। 'বনফুল'—ডাক্তার, এজন্য তাঁহাকে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক চর্চ্চা করিতে হয়। এই কারণেই বোধ হয়, বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্বকে—বায়োলজি, ফিজিওলজি, এবং প্যাথোলজিকে তিনি তাঁহার সাহিত্যিক জীবন-বাদের অন্তর্গত করিতে পারিয়াছেন। মানুষের জীবন তাঁহার নিকটে অতিশয় সুস্পষ্ট ও সুগোচর বস্তু, বহু খণ্ড-চিত্রে তিনি মানুষের চারিত্রিক অ্যানাটমি এক-একখানি স্বতন্ত্র প্লেট-

এর দ্বারা প্রদর্শিত করিয়াছেন। দেহের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য ছাড়া মানুষের আত্মা বলিয়া আর কিছুর রহস্য তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

'বনফুল'ও এক অর্থে প্রকৃতিবাদী—Naturalist; তাঁহার আর্ট মানুষের স্নায়ু-শিরা-শোণিত-বিজ্ঞানের আর্ট। তিনি যে প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক তাহার মূলে কোন আধ্যাত্মিকতা নাই,—অতএব খাঁটি জড়বাদ মানুষকে যে চক্ষে দেখিতে পারে, 'বনফুলে'র রচনাগুলিতে সেই দৃষ্টি আছে; একটা জড়-শক্তি চেতনাযুক্ত হইলে তাহার ক্ষুধা, এবং তাহার ধর্ম্মবোধ বা morality যে আকার ধারণ করিতে পারে, 'বনফুলের' সৃষ্ট মনুষ্যজীবগুলি তাহার অধিক কিছু দাবী করে না। এই যে দৃষ্টি, এবং ইহার বশে যে সাহিত্যসৃষ্টি, তাহার রস কিরূপ হইতে পারে, এবং সেই সাহিত্য একটা বিচিত্র কিছু হইলেও কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে—সে বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা 'বনফুলে'র একটি বিস্ময়কর কীর্ত্তির কথা বলিব। আমি বলিয়াছি, 'বনফুল' যে প্রকৃতি-শক্তির উপাসক তাহা জড়বাদের 'প্রকৃতি'; কিন্তু হঠাৎ একবার—সেই একবার মাত্র—এই জড়া-প্রকৃতি তাঁহার বৈজ্ঞানিক মনকেই আশ্রয় করিয়া, একটা অতিরিক্ত কিছুর সন্ধান তাঁহাকে দিয়াছিল। প্রকৃতির সেই শক্তিকেই, একদা বৈশাখের রৌদ্রতাপ-মূর্চ্ছিত অবস্থায়, স্বপ্নাবেশে, তিনি তান্ত্রিকের আরাধ্যরূপে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন—'রাত্রি'-নামক গল্পটিতে সেই দুঃস্বপ্নের যে রস-রূপ পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে তাহাই 'বনফুলের' বৈজ্ঞানিক আত্মাভিমানের উপরে কবি-প্রেরণার আচম্বিত জয়লাভ। এই একখানি উপন্যাসে তিনি তাঁহার জীবন-দর্শনের যেটুকু কবিত্ব তাহা নিঃশেষ করিয়াছেন। যে দৃষ্টিতে প্রকৃতির দেহ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, সেই দৃষ্টিকেই যতদূর সম্ভব প্রশ্রয় দিয়া ঐ 'রাত্রি'-রূপিণী প্রকৃতি যেন তাঁহাকে পরিহাস করিয়াছে; দেহ-বাদের, অর্থাৎ জীব-প্রবৃত্তির যে ক্ষুদ্র ও খণ্ড সংস্কারগুলাই তাঁহার জীবন-দর্শনের একমাত্র ভিত্তি, এবং যাহা তাঁহার সেই বৈজ্ঞানিক জগৎ-বিধানের life-force, জীবন-রক্ষা নীতিরও পরিপোষক—যে-নীতি জড়বাদীকেও মানিতে হয়—সেই নীতিরও উচ্ছেদকারিণী ঐ ছিন্নমস্তা তাঁহাকে চকিত থকিত করিয়াছে। 'রাত্রি'-গল্পটিতে লেখকের সেই অবস্থা যে [illegible] হইয়াছে, তাহা ঐ রচনার আদ্যন্ত একটা দুর্দ্ধর্ষ গতি-বেগ এবং অজগরদৃষ্টি-মোহিত একাগ্র কল্পনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ঘটনা, চরিত্র ও ভাবমণ্ডল যেন একটি বিন্দুকে

কেন্দ্র করিয়া অন্ধবেগে ঘুরিতেছে; লেখক যেন ঝড়ের মুখে উড়িয়া চলিয়াছেন—মাধ্যাকর্ষণের বাধাও নাই! 'রাত্রি' বনফুলের অবচেতন মনের সেই মানসী, যে একবার মাত্র তাঁহার অনাত্মবাদকে—নাস্তিক্যনীতির অতিক্ষুদ্র ভোগবাদকে—একরূপ শূন্যবাদে পরিণত করিয়া, আত্ম ও অনাত্মের দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে। ঐ একবার একটা দৈবী-প্রেরণা তাঁহার মনের লৌহপিণ্ডটাকে প্রচণ্ড অগ্নিতাপে আরক্তিম করিয়া রচনাকেও রসবৎ করিয়াছে। কিন্তু ঐরূপ কল্পনায় যে তত্ত্বরস আছে, তাহা ঐ একটা বিগ্রহ বা ব্যক্তি-মূর্ত্তিতেই নিঃশেষ হইয়া যায়,—তাহাকে জীবনের সকল মূর্ত্তিতে বৈচিত্র্য দান করা যায় না—কারণ, উহাও জীবনের একরূপ প্রতিবাদ। অতএব, ঐ উপন্যাসখানিকে পৃথক রাখিয়া 'বনফুলে'র গল্পগুলির সাধারণ প্রেরণা ও রচনা-ভঙ্গি পরীক্ষা করিতে হইবে।

'বনফুলে'র প্রথমদিকের গল্পগুলিতে একটা vital energy বা জীবনাবেগের স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য করা যায়, তাহাই তাঁহার ভাষাতেও একটা সাবলীল বলিষ্ঠতা সঞ্চার করিয়াছে। এই দুইটি কারণে তিনি সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই শক্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার বিপরীত একটা অসাহিত্যিক মনোভঙ্গি ক্রমেই স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি তাঁহার রচনার যে লক্ষণগুলি দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছিলাম, এই কয় বৎসরে তাহার যে বিকাশ লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে আমার সেই পূর্ব্ব-মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমার পক্ষে লজ্জার কারণ নাই; সমসাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা যতই অপক্ষপাত ও সুবিচারিত হউক, লেখক-বিশেষের পূর্ণ-পরিচয় করা দুঃসাধ্য। সেরূপ ক্ষেত্রে সমালোচক, বিশ্বাস নয়—কেবল আশা করিতে পারে যে, তাঁহার দৃষ্টি অভ্রান্ত না হইলেও, কোন কোন বিষয়ে কোন কোন লেখকের সম্বন্ধে ভুল করে নাই। আগামী কাল সে বিচার করিবে। বর্ত্তমান কালে সাময়িক সাহিত্যের বিচার আরও এক কারণে দুঃসাধ্য হইয়াছে; দেশে হঠাৎ যে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহার ধাক্কায় সাধারণ মানুষও যেমন, ভাবুক, কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও তেমনই একটা উদ্‌ভ্রান্তি, এবং উৎকট স্বাতন্ত্র্য-পিপাসার বশবর্ত্তী হইয়াছে—রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অব্যবস্থার প্রভাবে কেহই আর ধীর বা আত্মস্থ থাকিতে পারিতেছে না। সাহিত্যও এই কারণে সহসা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। শক্তিমান সাহিত্যিকেরাও সাহিত্যে আত্ম-প্রচার এবং

আত্মপরায়ণতার নির্লজ্জ পরিচয় দিতেছেন। অতএব, কিছুকাল পূর্ব্বে যাহা বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত ছিল, আজ তাহা যে ভুল হইয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

'বনফুলে'র সাহিত্যিক প্রেরণায় ব্যক্তি-অভিমান বা স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা ক্রমেই উগ্রতর হইয়া উঠিতেছে। মানুষ আত্মম্ভরি হইতে পারে; মতবাদী দার্শনিক বা তত্ত্ব-প্রচারক যাহারা তাহারাও একরূপ আত্মম্ভরিতার পরিচয় দেয়; এমন কি গীতিকাব্যেও একরূপ আত্মম্ভরিতা কবিদৃষ্টিকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে। কিন্তু কথাশিল্পীর পক্ষে—জীবনের রূপকারের পক্ষে—এইরূপ আত্মাভিমান অতিশয় মারাত্মক। জীবনকে যিনি যে-দৃষ্টিতে দেখুন না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে একটা রহস্যের বিস্ময়বোধ থাকিবেই—সেই বিস্ময়বোধই রসাবেগের কারণ; এক-এক শিল্পী এক-এক রূপে জীবনকে আবিষ্কার করেন, কিন্তু সেই আবিষ্কারের পশ্চাতে যে অনাবিষ্কৃতের ছায়া প্রসারিত হইয়া থাকে তাহাই জীবনের রস-রূপ—তাহাই কাব্য, তাহাই সাহিত্য। জীবন ও জগৎকে পঁড়া-পুঁথির মত পড়িয়া ফেলিয়াছি, তাহার কল-কব্জার সকল কেরামতি আমার নিকটে ধরা পড়িয়াছে; তাহাকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিবার কিছু নাই, অতঃপর সে আমারই হুকুম খাটিবে—অর্থাৎ আমি যেমন দেখাইতেছি, তাহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ, তাহাতে কোন কুসংস্কারের—কোন Idealism-এর বালাই নাই; আমার মত ধীর দৃষ্টি কাহার আছে?—এইরূপ মনোভাব যদি বৃদ্ধি পায়, তবে সেইরূপ লেখকের সাহিত্যিক মৃত্যু অনিবার্য্য। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'বনফুল' এক হিসাবে Naturalist, বা প্রকৃতিপন্থী; কিন্তু তাহা খাঁটি সাহিত্যিক প্রকৃতি-পন্থা নয়। সে প্রকৃতিপন্থার উদ্ভব হইয়াছিল ফরাসী-সাহিত্যে, এবং বালজাক, মোপাসাঁ প্রভৃতি লেখকগণ সেই প্রকৃতি-পন্থার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সাধক। মোপাসাঁ মানুষকে একটা উন্নত শ্রেণীর জন্তু বলিয়া কল্পনা করিলেও, তিনি তাহার সেই পশুত্বকে শিল্পীর রস-দৃষ্টির দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন; তাঁহার রচনাতেও শিল্পীকে ছাপাইয়া মানুষ লেখকটার আত্মম্ভরিতা ফুটিয়া উঠে নাই। সকল নীতি, সকল সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিলেই জীবনের সত্য-রূপটিকে আবিষ্কার করা যায় না; নীতি-দুর্নীতির উপরেও একটা বড়-কিছু সেই জীবনের অন্তরালে বিরাজ করিতেছে,—সেই দুজ্ঞেয়কে একটা না একটা ভঙ্গিতে প্রাণের বিস্ময়-প্রণাম

নিবেদন করিতে হয়। যে-মানুষ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে তাহার আত্মম্ভরিতা থাকে না; মানুষ হিসাবে থাকিতে পারে, শিল্পীর পক্ষে তাহা অতিশয় ক্ষতিকর। 'বনফুলে'র সাহিত্য-সাধনার যে মন্ত্র এককালে একটা শক্তিমন্ত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল—এবং রচনার প্রাচুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে যাহার অচির-সিদ্ধি বড়ই আশান্বিত করিয়াছিল তাহা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি ভাষার সাবলীল বলিষ্ঠতা, এবং—বিষয় যেমনই হোক, ভঙ্গির legerdemain, বা সুনিপুণ কসরত্—তাঁহাকে বর্ত্তমান পাঠকসমাজে জনপ্রিয় করিয়াছে—তাহাও একটা কম গৌরব নহে। তিনি যেমন চুটকি গল্প লিখিতে (তাঁহার উপন্যাসগুলিও রাশীকৃত চুটকির একত্র পরিবেষণ) সিদ্ধহস্ত, তেমনি চুটকি নাটক লিখিয়া অগণিত পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করিয়াছেন; দুইখানি বড় নাটকও লিখিয়াছেন, তাহাতেও নাট্যরসপিপাসু গড্ডলিকা-দলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই নাটক দুইখানি ('মধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর') যে কিরূপ নাটক তাহা আমাদের ভাষায় না বলিয়া, একজন পাশ্চাত্য মহামনীষীর বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (কারণ নাটকের প্রসঙ্গ এ আলোচনার বহির্ভূত) তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে, এইরূপ রাশি রাশি অপ-নাটক সকল দেশেই রচিত হইয়া থাকে।

"The attempt to be effective by means of the matter used, thereby ministering to the evil propensity of the public is absolutely to be censured in branches of writing where the merit must lie expressly in the *form*. However there are numerous bad dramatic authors striving to fill the theatre by means of the matter they are treating. For instance, they place upon the stage any kind of celebrated man, however stripped of dramatic incidents his life may have been, nay, sometimes without waiting until the persons who appear with him are dead" [Schopenhauer ; *On Authorship and Style*]

[তাৎপর্য্য :—কাব্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে রচনার রস-রূপটার উপরে, বিষয়টার উপরে নয়। কিন্তু মূর্খ জন-সাধারণ বিষয়টার দ্বারাই আকৃষ্ট হয়, তাই নিকৃষ্ট নাট্যকারগণ কেবল চটকদার বিষয়ের সাহায্যে নাটক রচনা করিয়া রঙ্গমঞ্চগুলি ভরিয়া তুলিতেছে; যেমন, যে-কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে তাহারা রঙ্গমঞ্চের উপরে দাঁড় করাইয়া দেয়, তেমন ব্যক্তির জীবনে নাটকোচিত ঘটনার অবকাশ থাকুক বা নাই থাকুক।]

ইহার পর, 'জঙ্গম' নামক একখানি অতিকায় উপন্যাসের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। আমি পূর্ব্বে তাঁহার সাহিত্যিক দৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ম্মের সম্বন্ধে যে লক্ষণগুলির উল্লেখ করিয়াছি, এই উপন্যাসে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলিবে। ইঁহার মনে কোন 'borderland of doubt' নাই—কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মোহ নাই। ইহাই তাঁহার সেই অকুতোভয়তার কারণ। 'জঙ্গম'-নামক উপন্যাসে যে আত্মমত-ঘোষণার audacity আছে, তাহাও এক হিসাবে উপভোগ্য হইয়াছে,—উৎকৃষ্ট autobiography যে কারণে উপভোগ্য হয়। কারণ, Fool ও Angel—এই দুই-এর মধ্যে প্রথমোক্ত প্রাণীই রসিক-চিত্তকে সহজে আকৃষ্ট করে। একবার পুরীর সমুদ্রতীরে একটি দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহার রস-স্মৃতি আমার মনে এখনও অটুট আছে। সম্মুখে অনন্ত-বিস্তার জলরাশি পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ে উদ্বেল হইয়া দীর্ঘ তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইতেছে; তীরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি, নগ্নগাত্রে মালকোঁচা বাঁধিয়া, উবু হইয়া বসিয়া আছে। তাহার হাতে একটি ডাবা-হুঁকা; সে ঐ সমুদ্রকে যেন অবজ্ঞা করিবার জন্য, হুঁকা হইতে ধূম টানিয়া, সমুদ্রের দিকে ফুৎকার করিয়া নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার সেই অবিচলিত আত্মপ্রসাদ—সেই বিরাট বিপুল বিস্ময়কে ধূম-ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়ার সেই অপূর্ব্ব প্রয়াস দেখিয়া সেদিন যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম—আজও তাহা হইতে পারি। যিনি পরমরহস্যময়—যাঁহার সেই বিরাট সত্তাকে—সেই অনাদ্যন্ত স্বরূপকে—বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে ধ্যান করিয়া জগতের ঋষি ও কবি আজিও নব নব ঋক্ রচনা করিতেছেন, তিনিও কম রসিক নহেন—ক্ষুদ্র মানুষের অন্তহীন স্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনিও যে তাহা কৌতুকসহকারে উপভোগ করেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই উপন্যাসেই স্পষ্ট দেখা যায়, তাঁহার জীবন-দর্শনে রহস্যের লেশমাত্র নাই। সকল রহস্যই মানুষের স্বভাব বা প্রবৃত্তির একটা এখনো-অমীমাংসিত কারণ মাত্র; তাহাতে বিস্মিত বা বিচলিত হইবার কিছুই নাই; প্রত্যক্ষের উপাসনাই একমাত্র rational attitude; accept কর, এবং 'live as best as you can'। মানুষ আসলে একটা বুদ্ধিজীবী পশু বই তো নয়, তাই তাঁহার কল্পিত চরিত্রগুলির বৈরূপ্য আছে সারূপ্য নাই; কারণ, যে individuality-র মূলে আছে একটা গভীরতর সত্তা—সেই সত্তাকে তিনি স্বীকার করেন না। কবি

কীট্‌সের ভাষায় এমন কথা বলা যাইতে পারিত যে—"each of them cuts a figure, but is not figurative", কিন্তু ততটুকু মর্য্যাদাও তাহাদের নাই। এই উপন্যাসের নারী ও পুরুষ-চরিত্রগুলির সঙ্গে তারাশঙ্করের ছোট-গল্পের অসংখ্য চরিত্রের তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে—তাঁহার মানুষগুলা কিরূপ authentic, তাহাদের individvality কত গভীর! রাজা-জমিদার হইতে বেদে, সাপুড়ে, বেশ্যা ও বিকলাঙ্গ—সকলের মধ্যে, কেবল বাহিরের আকৃতি ও প্রকৃতির প্রভেদই নয়, সেই প্রভেদের মধ্যেই প্রত্যেকটিতে এমন একটি individuality ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা অখণ্ড মনুষ্যত্বের দ্যোতক—সে প্রভেদ যেন সেই অভেদত্বকেই আরও সুগোচর করিয়াছে। তাই সেখানে জীবন কোন একটা মতবাদ বা তত্ত্বের অধীন হইয়া আমাদের মনের 'যুদ্ধং দেহি'-বুদ্ধিকে উদ্যত করে না—যথার্থ রসোদ্রেকের দ্বারা গভীরতর চৈতন্যকে তৃপ্ত করে। 'বনফুল' জীবনকে ততখানি খাতির করিতে প্রস্তুত নহেন; বরং তাহার যতকিছু মহত্ত্বকে caricature করিয়া, Idealism-মাত্রকেই হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাভাজন করিয়া, তাঁহার বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধির ইজ্জত রক্ষা করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার এই বিরাট উপন্যাসখানিতে প্লটের কোন বালাই নাই—'জঙ্গম' নামটি বোধ হয় তাহাই ঘোষণা করিতেছে। অর্থাৎ জীবন জিনিসটা একটা 'জঙ্গম' বা নিয়ত-গতিমান, আদর্শহীন, ধর্ম্মহীন পশু-প্রকৃতির বিকাশ। এই উপন্যাসের কোথায়ও একটা সমগ্রদৃষ্টি নাই। যে চুটকি-রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত, তাহারই একটি স্তূপ ইহাতে রাশীকৃত করা হইয়াছে। তাঁহার মনের পিস্তল হইতে অনবরত গুলিবর্ষণের মত, কতকগুলা চরিত্র—ঠিক চরিত্র নয়, কেবল কতকগুলা মুখ ও মুখভঙ্গি (সঙ্গে সঙ্গে বচনভঙ্গিও)—তিনি যেন ছুঁড়িয়া চলিয়াছেন। অথবা, উপন্যাসখানিকে Zoologyর জন্তুশালাও বলা যাইতে পারে,—প্রত্যেকটি মনুষ্য-জন্তু নিজ নিজ খাঁচায় আবদ্ধ থাকিয়া স্ব স্ব প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে; তাহাদের সেই চাল-চলন ও মুখভঙ্গি—লেখক বিধাতাপুরুষের মতই নির্ভুল করিয়া তুলিয়াছেন। 'জঙ্গম' সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার অবকাশ নাই। তবু আমি যে এই লেখক সম্বন্ধে এতকথা লিখিতে বাধ্য হইলাম তাহার কারণ—প্রথমতঃ, বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যের প্রসঙ্গে এতবড় একজন সাহিত্যিক পালোয়ানের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা না করিলে, গ্যালারী হইতে তুমুল প্রতিবাদ উঠিবে; দ্বিতীয়তঃ,

আমি এই প্রসঙ্গে 'বনফুল' সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে যে মন্তব্য করিয়াছিলাম (গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য), তাহা অনেকাংশে প্রত্যাহার করিয়াছি, তাই একটু বিস্তারিত কৈফিয়তের প্রয়োজন ছিল।

৩

এইবার আরও কয়েকজন সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী শক্তিমান লেখকের পরিচয় দিব। ইঁহাদের মধ্যে, বোধ হয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—অন্ততঃ নূতনের পথিকৃৎ হিসাবে, সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম করিতে হয়। শৈলজানন্দই সর্ব্বপ্রথম বাংলাসাহিত্যে, 'regional'—অর্থাৎ অঞ্চলবিশেষ ও সমাজ-বিশেষের জীবনকে উপন্যাসের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কয়লা কুঠি'র গল্পগুলিতে একটি নূতন রসের সৌরভ পাওয়া গিয়াছিল। পরে 'অতসী' ও 'নারীমেধ' নামক দুইখানি গল্পগ্রন্থে তাঁহার যে শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহাতে একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। 'নারীমেধে'র গল্পগুলিতে যে-ধরণের 'রিয়ালিজ্‌ম্' আছে, তাহা বাংলায় প্রথম, এবং একটি বিশিষ্ট-রস-হিসাবে, আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'রিয়ালিজ্‌ম্' অর্থে আমি অবশ্যই একটি বিশেষ মতবাদের কথা বলিতেছি না, সাহিত্যের 'রিয়ালিজ্‌ম্'—অর্থনীতি বা দর্শনশাস্ত্রের 'রিয়ালিজ্‌ম্' নয়। কল্পনা বা মনোগত রাগ-বিরাগ, এবং ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির সংস্কারমুক্ত হইয়া, জীবনকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখিবার যে ভঙ্গি, অথচ তাহাতেই একপ্রকার রসাস্বাদের যে প্রবৃত্তি, তাহাই সাহিত্যের 'রিয়ালিজ্‌ম্'; এই 'রিয়ালিজ্‌ম্' আর একটু ব্যাপক বা মূল-সন্ধানী হইলে, তাহাই 'Naturalism'এ পরিণত হয়। শৈলজানন্দের 'রিয়ালিজ্‌ম্' সমাজ-জীবনকে অতিক্রম করিয়া আরও ভিতরে প্রবেশ করে নাই। এই 'রিয়ালিজ্‌ম্'ই পরে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্করের প্রতিভায় আরও গভীর ও মূলসন্ধানী হইয়া—একরূপ তান্ত্রিক জীবন-দর্শনে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মধ্যে এইরূপ বৈশিষ্ট্য দাবি করিতে পারেন—শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ও শ্রীযুক্ত সরোজ রায় চৌধুরী। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই কবি-দৃষ্টি স্বতন্ত্র।

জগদীশচন্দ্র এখনও যথোচিত প্রতিষ্ঠালাভ করেন নাই। অথচ তিনি শৈলজানন্দ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং মনে হয়, তাঁহারও পূর্ব্বে গল্প লিখিতে আরম্ভ

করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সেই গল্পগুলির কথাই বলিতেছি, যাহাতে মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্জ্ঞেয় দৈব-নির্য্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার এক প্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্ব্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও, তত ভয়ঙ্কর নয়—যত ভয়ঙ্কর তাহার সেই অতি-প্রাকৃত রূপ। যাহাকে আদিম মানবের কুসংস্কার, অথবা বিকারগ্রস্ত রোগীর দুঃস্বপ্ন বলা যায়—সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থবুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে করে, জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার গল্পে—শুধু সম্ভাব্যতা নয়—এমন বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছেন যে, ইংরাজীতে যাহাকে bizarre বলে, সেই ভাব আমাদিগকে অভিভূত করে। মনে হয়, আমরা এমন একটা বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগ্রত-চৈতন্যের অগোচর; সৃষ্টির নেপথ্যে যে পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—এ সকল যেন তাহারই ক্বচিৎ-দৃষ্ট মূর্ত্তি; আদিম মানুষের অর্দ্ধবুদ্ধ চেতনায় ইহারই ছায়া পড়িত। কিন্তু এখনও সেই সকল অনুভূতি হয়তো আমাদের চেতনার নির্জ্জান স্তরে সঞ্চিত আছে, অতি-প্রাকৃতের সেই বিরাট বেষ্টনী যে এখনও আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে—নানা ইঙ্গিতে ইসারায় আমরা সে কথা স্মরণ করিতে বাধ্য হই। জগদীশচন্দ্রের একটি গল্পে, মৃত্যুর পরেই পুনর্জ্জন্ম-ঘটনা, এবং সেই সম্পর্কে একটি স্বপ্ন, এমন ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে—যাহা একটা লৌকিক কুসংস্কার মাত্র তাহাও গুরুতর রহস্যভারের মত মনের উপর চাপিয়া বসে। এই ঘটনাটি সত্য বলিয়াই মনে হয়, অর্থাৎ, কোন একটা অর্থে কোথাও ঘটিয়া থাকিবে; কিন্তু লেখকের নিজস্ব কল্পনা ও রচনাভঙ্গি ইহাকে এমন একটা রূপ দিয়াছে যে, তাহা অপেক্ষা bizarre বা uncanny কিছু বাংলা গল্পে আর কোথাও ফুটিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। এই দৃষ্টি ঠিক রসদৃষ্টি নয়, কারণ, ইহা normal বা সুস্থ নয়; তথাপি ইহাও আর্টের পর্য্যায়ভুক্ত; জগদীশচন্দ্র ইহাতেও যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে একজন শক্তিশালী লেখক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বর্ত্তমান সাহিত্যের পাঠক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—সেপ্রতিষ্ঠা জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইবে

না। রচনার প্রাচুর্য্যে ইনি 'বনফুল'কে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেইজন্যই সাহিত্যের বাজারে একটু পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া আছেন। কিন্তু সাহিত্যিক রসসৃষ্টিতে তিনি যে কল্পনা ও কলাকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়। আমরা এ যুগের কাব্য-সাহিত্যে যে সুরটি হারাইতে বসিয়াছি, শরদিন্দু বাবু তাহাকেই, তাঁহার সহজাত কাব্য-সংস্কারের বলে কতকটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই সুরের, সেই রসের মাদক-মোহে তিনি সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ হইতে প্রায়শঃ ভ্রষ্ট হইয়াছেন—Hall Caine, Rider Haggard বা Conan Doyal-এর রোমাঞ্চকর উপকথা-রস তাঁহার শিল্পী-মনকে কিছু বেশি আকৃষ্ট করিয়াছে। এই ধরণের রচনায় তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাংলা কথাসাহিত্যে লক্ষণীয় হইলেও—সৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা অনুকরণপটুতার পরিচায়ক। আমরা তাহাতেও বিস্মিত হই; এমন কি, গল্প-গুলির উদ্ভাবন-কৌশল ও কল্পনা-ভঙ্গিতে চমৎকৃত না হইয়া পারি না; কিন্তু তাহাতে জীবন-যবনিকা-ভেদী সেই দৃষ্টি নাই—নিছক গল্পহিসাবেই তাহা উৎকৃষ্ট। অবশ্য এই গল্প-রসও উপেক্ষার বস্তু নয়—ঐ রসই মানুষের চিরন্তন ক্ষুধার সামগ্রী। মানুষের মনে যে চিরন্তন রহস্যরসপিপাসা—দূর ও দুর্জ্ঞেয়ের প্রতি তাহার যে একটি অবশ আকর্ষণ আছে; কালের যে যাদুশক্তি প্রকৃতি ও সমাজের নিত্যরূপটিকেও অনিত্য-মনোহর করিয়া তোলে বলিয়া, এককালের অতি-পরিচিত বাস্তবও একালের স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হয়; এবং অতীতকালের অস্পষ্ট কুয়াসার মধ্য দিয়া জীবন ও জগৎকে অসীম রহস্যের আংশিক প্রকাশ মনে করিয়া আমরা যে পরমোৎকণ্ঠা অনুভব করি;—সেই রসের সেই কল্পনা শরদিন্দু বাবুর রচনায় যেখানে যতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট দান।

ঐ একটি গুণ—তাঁহার চিত্তের ঐ রসপ্রবণতা হইতেই তিনি এমন কয়েকটি গল্প রচনা করিয়াছেন, যাহা বাংলা কথাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে। সেই অতীতের রোমান্সকে তিনি তাঁহার একটি গল্পে ('মরু ও সঙ্ঘ') যে রস-রূপ দান করিয়াছেন, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। এ গল্পের কল্পনা ও পরিকল্পনায় তিনি যে ভাবুকতা ও দার্শনিক রসদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মানব-জীবনের শাশ্বত সমস্যাই তাঁহার জীবন-দর্শনকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া

তুলিয়াছে, তেমনই তাহাতে যে একটি সুকর্ষিত সুমার্জ্জিত বিদ্বান-সুলভ মনোভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও অনন্যসুলভ। এই কাহিনীতে রোমান্স-রস বা ইতিহাসের যাদু যেমন চরমে উঠিয়াছে, তেমনই ইহার ভাববস্তু হইয়াছে—মানুষের সহিত প্রকৃতির দ্বন্দ্ব, ভিতরে ও বাহিরে সেই এক শত্রুর সহিত প্রাণান্তিক সংগ্রাম, এবং পরিণামে সেই চিরন্তন হাহাকার। আর একটি গল্পে তাঁহার ঐতিহাসিক কল্পনা একটি অসাধ্য-সাধন করিয়াছে—যাহাকে 're-conquest of antiquity' বলে—প্রায় তাহারই কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। গল্পটির নাম 'বাঘের বাচ্চা'; সাধারণ বাঙালী পাঠক ইহার সূক্ষ্ম ইতিহাস-রস অনুধাবন করিতে পারিবে না, কিন্তু এই গল্পটি একটি 'gem' বা নিখুঁত মুক্তা। ইতিহাস হইতে রোমান্স নিষ্কর্ষণ করিবার শক্তি তাঁহার আরও অনেকগুলি গল্পে প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাতে মশলার ঝাঁজ কিছু বেশী, সাধারণ পাঠকের রসনা তাহাতে সহজেই সাড়া দিবে। সেগুলির নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শুধুই ইতিহাস-জগৎ নয়, আমাদের এই বাস্তব প্রত্যক্ষ সমাজের জীবনযাত্রা হইতেও, শরদিন্দু বাবু যে অপূর্ব্ব কাব্যরস দুই চারিটি গল্পে সঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জীবন-রস-রসিকতারও পরিচয় মিলিবে। আমি বিশেষ করিয়া একটি গল্পের উল্লেখ করিব—নাম, 'হাসি-কান্না'; উহাতে বাস্তবেরই যে রোমান্স-রস আছে, তাহা শুধু কাব্য নয়—জীবনেরই পূজা, মনুষ্যহৃদয়কে সুগভীর বিশ্বাস—তাহারই সম্বর্দ্ধনা। প্রেম নামক অতিশয় বাস্তব হৃদয়বৃত্তিকে অবাস্তবের মধ্যে স্থাপনা করিয়া তাঁহার ঐ রোমান্স-কল্পনা যে কিরূপ আমোদ উপভোগ করে, এবং উৎকৃষ্ট পরিহাস-রসকেই কিরূপ কাব্য-রসে পরিণত করে—'তন্দ্রাহরণ' গল্পটি তাহার একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। এ হাসিও শরদিন্দু বাবুর,—ইহার রস স্বতন্ত্র। আমি কেবল আর একটি মাত্র গল্পের উল্লেখ করিব—যা করিলে এই পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। শরদিন্দুবাবু যে মুখ্যতঃ কবি—অর্থাৎ তাঁহার কল্পনা ততটা বস্তুগত নয়, যতটা ভাবগত, তাঁহার ঐ প্রবল রোমান্টিক প্রবৃত্তিই তাহার প্রমাণ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কথাশিল্পী, তাঁহার কল্পনা সর্ব্বত্র একটা গল্পবস্তুকে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু একটিমাত্র গল্পে তিনি যেন একটি রোমান্টিক লিরিক-কবিতা রচনা করিয়াছেন। গল্পটির নাম—'গোপন কথা'; গল্পের আকারেই হৃদয়ের সেই লিরিক-ঝঙ্কার,

এমন নিখুঁত নিটোল কবিতা হইয়া উঠিতে আর কোথাও দেখি নাই—সে স্থর রোমান্সের শেষ পর্দ্দায় পৌছিয়াছে। ইহাই শরদিন্দুবাবুর কবি-প্রতিভার গোপন কথা।

আমি শরবিন্দুবাবুর গল্পগুলির এই যে নাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করিলাম, তাহার কারণ, এই ধরণের কবি-প্রকৃতি যাঁহাদের, অর্থাৎ যাঁহাদের শিল্পী-মন কেবলই নূতন নূতন রসরূপের সন্ধান করে—ভ্রমর না হইয়া প্রজাপতি-বৃত্তি অবলম্বন করে, এবং সেইজন্য জীবনকে কোন একটা দিক হইতে স্থির ও সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে চায় না, তাঁহাদের রচনায় রস-বিলাসের খেয়াল আধিপত্য করে; ফলে, রসাবেশের কতকগুলি শুভক্ষণে উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করিয়া থাকিলেও—রচনাপুঞ্জের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিয়া একটি স্থসঙ্গত পরিচয়-পত্র নির্ম্মাণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। ইহার উপর, শরদিন্দুবাবু ইদানীং তাঁহার সেই কলাবিলাসকেই একটু অধিক প্রশ্রয় দিয়াছেন—চুটকি-রচনার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে; এইরূপ রচনা চিত্রিত পতঙ্গের মতই লঘু ও ক্ষণজীবী; তাহাতে সাময়িকতার তাগিদ মিটিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বখ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়। এই প্রবৃত্তি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনে পূর্ব্ব হইতেই ছিল বলিয়া, তাঁহার গল্পগুলি বৈচিত্র্যে প্রশংসনীয় হইলেও, উৎকর্ষে সমান নয়। এইজন্যই, তাঁহার কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্পের উল্লেখ বিশেষভাবে করিতে হইল; তিনি যে সাময়িক পত্রিকার খ্যাতনামা গল্পলেখকদেরই অন্যতম নহেন, অথবা অতি-আধুনিক জিনিয়াস-লেখকদের শ্রেণীভুক্ত নহেন বলিয়া বাতিল হইয়া যান নাই—ইহা বলিবার প্রয়োজন ছিল।

শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর গল্প-রচনা সম্বন্ধেও এইরূপ একটু বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ইনি সমসাময়িক সাহিত্যে তাদৃশ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারিলেও, রচনার ভাষায় ও ভঙ্গিতে ইনি যে সাহিত্যিক রস-পিপাসার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই এই লেখককে একালের কথা-কোবিদগণের—বাণীকুশলীদের মধ্যে—গণনা করা যায়। ইনিও কথাশিল্পে কাব্য-কল্পনার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, ইঁহার সেই কল্পনা রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত নয়; এমনও বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রিয় গল্প-রচনা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই, তিনি গ্রাম্যপ্রকৃতি, এবং প্রাচীন পল্লীজীবনের রোমান্স—ইতিহাস ও কিম্বদন্তী মিলাইয়া

—যে কথা-কাব্য রচনা করিবার প্রয়াসী, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-জাতীয় কল্পনাই বর্ত্তমানের বাস্তব-পটভূমিকাকে আশ্রয় করিয়া, সেই বাস্তবকেই, একটি অবাস্তরের মায়াবগুণ্ঠন পরাইয়া দেয়। অতএব ইঁহার সেই কাব্য-প্রেরণায় একটি বিশেষ প্রবৃত্তিই লক্ষণীয় ; নবাবী আমলের যে বাঙালী সমাজ ও বাঙালী জীবন তাহারই অস্তচ্ছটা এখনো যেখানে যেটুকু লাগিয়া আছে,—অথবা অতীত হইয়া গেলেও তাহার যেটুকু এখনও স্মৃতি হইতে লুপ্ত হয় নাই—তাহারই রসাবেশ তাঁহাকে সাহিত্যিক শিল্পকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে। কিন্তু এই রসাবেশের প্রমাণ যতটা সুস্পষ্ট, রূপসৃষ্টিতে তাহা ততটা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই ; তাহার একমাত্র কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তিনি তাঁহার কাব্যসাধনায় তন্ময়তার অবকাশ পান নাই—লগ্ন উপস্থিত হইলেও ধীর ও আত্মস্থ হইয়া সেই লগ্নগুলিকে নিজেই বরণ করিয়া লইতে পারেন নাই,—তাঁহার কবি-শক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, কবিকার্য্যে তাহার সম্যক সফলতার অভাব দেখিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্তই করিতে হয়।" কিন্তু তথাপি আমি যে তাঁহাকে বর্ত্তমান কালের শক্তিমান কথাশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার কারণ, এই লেখকও ইঁহার দুইটি রচনায় লগ্নভ্রষ্ট হন নাই—সেই গল্পদুইটি এমনই যে, আর কিছু না লিখিলেও, কেবল ঐ দুইটির জন্য তিনি যে বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, ইহা বলিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না। তাঁহার 'নরবাঁধ' ও 'মাথুর, এই দুইটি বড় গল্প—বিশেষতঃ শেষোক্তটি বাংলা সাহিত্যে বাঁচিয়া থাকিবে। এমন গল্প যিনি লিখিতে পারেন তাঁহার প্রতিভা অবিসংবাদিত, সে প্রতিভা যতই অল্প-প্রসূ হউক। আমি পূর্ব্বে তাঁহার কবি-প্রবৃত্তির যে বিশেষ লক্ষণটির কথা বলিয়াছি—এই দুইটি গল্পে তাহা সত্যকার সৃষ্টিসাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে –আর্টের সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'নরবাঁধ' নামক গল্পটিতে কিম্বদন্তীর চরিত্র ও ঘটনাকে এমন সুকৌশলে নাট্যীকৃত করা হইয়াছে যে, শেষে তাহা বাস্তব-বর্ত্তমানের হাহাকারকেই একটি অপরূপ রূপে রসোজ্জ্বল করিয়াছে ; কল্পনার এই কেন্দ্রগত একাগ্রতা ও সৌষম্যই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক . এই রূপ-সমগ্রতা (unity of form, বা organic wholeness)—ইহাই সেই Expression, যাহাকে উৎকৃষ্ট আর্ট বলে ; ঐ অখণ্ডতারই নাম—রস-রূপ। এই গল্পে অতীতের রোমান্সকে বর্ত্তমানের বাস্তবের সহিত যেভাবে যুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতেই

কল্পনাও একটি গভীরতর সত্যরূপ ধারণ করিয়াছে ; ঐ সত্যই লেখকের কবি-চিত্তকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাই গল্পটি এমন সার্থক 'সৃষ্টি' হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় গল্পটির প্রেরণা সম্পূর্ণ বিপরীত—একটিকে অপরের পরিপূরক বলা যাইতে পারে ; কারণ, একটিতে যেমন আছে শক্তি-সাধনার নির্ম্মম-কঠিন ভাব-মণ্ডল, তেমনই অপরটিতে আছে বাংলার সেই লোকায়ত—জল-মাটি ও আকাশ-বাতাসে নিত্যনিঃস্যন্দী—বৈষ্ণব ভাবরসধারা ; এই কারণে এই গল্পটি যেমন এখনও বাস্তব, তেমনই ইহার কাব্যরসও যেমন গাঢ়, তেমনই গভীর ; বস্তুতঃ বাংলা কথাসাহিত্যে এই গল্প রসে ও রূপে একহিসাবে অতুলনীয়। ইহার চরিত্র-সৃষ্টিতে যে সূক্ষ্ম-গভীর বাস্তব-জ্ঞান, এবং কাহিনীর পরিণতিমুখে যে অবশ্যম্ভব কাব্যরস—এবং এই দেশেরই মাটির পাত্রে সেই কাব্যরসের যে পরিবেষণ আছে, কোথাও এতটুকু ভেজাল নাই—তাহাতে মনে হয়, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু এই গল্পটিতেই তাঁহার কবি-আত্মাটিকে চরিতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার কবি-জীবনের উৎকণ্ঠা ইহাতেই নিঃশেষ হইয়াছে। আমি এই গল্পটির সম্বন্ধে অন্যত্র আর এক প্রসঙ্গে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি, তাই এখানে ইহার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ঐ দুইটি-মাত্র গল্প লিখিয়াই কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা দাবী করিতে পারেন ? তিনি কি সকল শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের সমকক্ষ ? না, তাহা নহেন, কারণ, সৃষ্টিকে ছাড়িয়া যদি স্রষ্টার দিকে তাকাইতে হয়, তবে প্রতিভার একটা বড় প্রমাণও চাই, তাহা সৃষ্টির প্রাচুর্য্য ; উৎকৃষ্ট প্রতিভার উহাও একটা অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। কিন্তু মনোজ বসুর সেই প্রতিভা না থাকিলেও, তিনি যে একবারও সত্য-সত্যই বাণীর প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও কম সৌভাগ্য নয়—তিনি যে ঐ দুইটি সুবর্ণকণিকা সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই অমরত্বলাভ করিবেন। অপরপক্ষে, যে সকল লেখক কেবলমাত্র রচনার প্রাচুর্য্যে, সাময়িক সাহিত্যে সাময়িক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, আপনাদিগকে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া দম্ভ করিতেছেন, তাঁহাদের একটি রচনাও দীর্ঘজীবী হইবে না,—হইবার প্রয়োজনও নাই ; কারণ, তাঁহারা 'মরার পরে অমর' হইতে চান না, তাঁহাদের আত্মারও তেমন অমরতার বালাই নাই ; যে কয়দিন বাঁচিয়া আছেন, ঐ দম্ভ ও আত্মপূজার সুযোগ-লাভই

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইলেও স্থির নয়; এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহাতে একটা খেয়ালী মনোভাবের পরিচয় পাই—ইহা আশঙ্কাজনক বটে।

অমলা দেবী তাঁহার 'মনোরমা' নামক প্রথম গল্পের বইখানিতে যে ধরণের আধুনিক সমাজ-চিত্র, যে দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহাতে তিনি তখন হইতেই আমাদের পরিচিত-মণ্ডলীর মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কাব্য-কল্পনা প্রায় নাই বলিলেও হয়; তিনি অতিশয় নির্ভুল ও গভীর রেখায় এমন কতকগুলি চিত্র আঁকিয়াছেন, যাহার জন্য, যেমন প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রয়োজন, তেমনই ঠিকমত বর্ণ-সন্নিবেশের ও রেখা-বিন্যাসের কৌশল পাকা শিল্পীর মত আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। এই রচনা-শক্তির মূলে আছে সুগভীর সহানুভূতি বা বেদনাবোধ, তাহাই তাঁহার দৃষ্টিকে এমন অন্তর্ভেদী করিয়াছে—সমাজের বহিরাবরণ জীর্ণ-কন্থার দীর্ঘ সেলাইগুলি খুলিয়া দিয়া তিনি নির্ম্মমভাবে তাহাকে বে-আব্রু করিয়া দিয়াছেন। এ ধরণের সাহিত্য বড় সাহিত্য নয়; ন্যায়, সত্য ও নীতি-জ্ঞানই ইহার প্রধান প্রেরণা—জীবনের রহস্যরূপের সন্ধান ইহার মুখ্য অভিপ্রায় নয়; তথাপি অমলা দেবীর ষ্টাইল খাঁটি সাহিত্যিক বটে, সেই গুণেই রচনা উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশিও কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন—পণ্ডিত-ভাবুক, সমালোচক ও কবি বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি আছে, সেই খ্যাতির বিস্তার কামনা করিয়া তিনি নাটক ও উপন্যাস-রচনাতেও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। নাটকের সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নাই বলিয়া আমি এই 'জি. বি. এস'-শিষ্য আধুনিক একলব্যের শরসন্ধানচাতুরীর কথা কিছুই বলিতে পারিব না, তবে, আধুনিক সাহিত্যের একমাত্র রস—Satire, এবং Satire-সৃষ্টিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-কর্ম্ম—ইহাই যাঁহার সাহিত্যিক ধর্ম্মমত, তাঁহার উপন্যাসগুলি যদি তাহারই আনুষ্ঠানিক নিদর্শন হয়, তবে বলিতে বাধ্য হইব যে, তিনি তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই; কারণ সেগুলির মধ্যে প্লটের যে নিরঙ্কুশ গতি আছে, এবং চরিত্রগুলিতে যে স্বপ্ন-সুলভ কাল্পনিকতা আছে—তাহার কোনটাতেই Satire-এর প্রেরণা নাই—কল্পধেনুর ভাবুকতা সূক্ষ্ম-চিন্তা, ও বাস্তবের উপরে মনের রং ফলাইয়া সার্থক ডায়েরী-রচনার কৃতিত্ব আছে।

তথাপি আমি তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছি এইজন্য যে, বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্যের তিনি একজন শক্তিমান লেখক।

৪

বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা উপস্থিত একরূপ শেষ হইল। এই প্রবন্ধে আমি যেমন কেবল কথাসাহিত্যেরই আলোচনা করিয়াছি—তাহার কারণ কি, আরম্ভেই বলিয়াছি—তেমনই, প্রবন্ধের শেষে আর দুই একটি কথা না বলিলে, অনেকের মনে নানা প্রশ্ন জাগিতে পারে। কথাটা এই যে, আমি এই আলোচনার যে লেখকগুলির নাম করিয়াছি, সত্যই কি তাঁহাদের ছাড়াও এমন আরও কয়েকজন কথাশিল্পীর আবির্ভাব হয় নাই, যাঁহারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য? ইহার উত্তরে আমার প্রথম কৈফিয়ৎ এই যে, দুই-একজন লেখকের নাম হয়তো করা উচিত ছিল, তথাপি করি নাই এইজন্য যে, তাঁহাদের রচনার বৈশিষ্ট্য অল্পদিন মাত্র দেখা দিয়াছে, এখনও সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলা নিরাপদ নহে। দ্বিতীয় কারণটাই প্রণিধানযোগ্য, আমি আর একবার সেই কথাটাই বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এ কথা মনে রাখা উচিত যে, গল্পের আর্ট যেমনই হোক, তাহাতে যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, হিসাব-বোধ, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও ভাষার পারিপাট্য থাকুক না কেন,—তাহাকে সাহিত্য হইতে হইবে, অর্থাৎ তাহার মুখ্যকর্ম্ম হইবে রস-সৃষ্টি—বিষয়বস্তু যেমনই হোক, তাহাকে রসবস্তুতে পরিণত করিত হইবে। জীবনকে—বাস্তবেই হোক, আর কল্পনাতেই হোক—ছোট বা খণ্ডিত করিয়া দেখিলে, তাহার অঙ্গ বা অংশবিশেষকেই পরিপ্রেক্ষণ করিলে, বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্বজিজ্ঞাসা তৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রসসৃষ্টি হয় না। একথা বেরসিকে বুঝিবে না—স্বীকার করিবে না, তাহা জানি, কিন্তু আমি যে-সমাজের রসিক, তাহাকে ঐ কথা স্বীকার করিতেই হয়; অতএব, আমার পক্ষে তাহাতে কোন অপরাধ হয় না। ঐ রসসৃষ্টিমূলক যে রচনা তাহাই সাহিত্য,—তাহা কাব্য, নাটক, গল্প, নিবন্ধ যেমন আকার বা প্রকারের হোক। আমি এই যে কথা-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম তাহাও ঐ সাহিত্যিক আদর্শ ও মাপকাঠির প্রমাণে। এজন্য আমি যেমন নকল, অথচ চটকদার গল্প-উপন্যাসগুলাকে বাদ

দিয়াছি, তেমনই, সেই শ্রেণীর লেখক ও তাঁহাদের রচনাকেও এই আলোচনার বিষয়ীভূত করি নাই—যাঁহারা ঐরূপ বৈজ্ঞানিক তথ্যসন্ধানের দৃষ্টি দ্বারা জীবনকে সমগ্র ও গভীরভাবে না দেখিয়া, তাহার কোন একটা সামাজিক ও সাময়িক রূপ-বিকৃতিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, এবং তাহা হইতে একটা মতবাদের সমর্থন ও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যে রসদৃষ্টি থাকিলে সাহিত্যের জীবন-দর্শন একটা মানসিক খতিয়ান মাত্র না হইয়া, আমাদের অন্তরতম চেতনায় একটা দিব্যদর্শন হইয়া উঠে, সেই রসদৃষ্টিকেই ইঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন। ঐরূপ বৈজ্ঞানিক বাস্তব-বাদের যে দৃষ্টি তাহাও একরূপ শক্তির নিদর্শন হইতে পারে, তাহাতেও এক প্রকার বিবরণী-রচনা গল্প বা উপন্যাসের আকারে রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে আমি খাঁটি সাহিত্যপদবাচ্য মনে করি না। এ বিষয়ে পাঠকগণের রুচি ও সংস্কার পৃথক হইতে পারে, তাহা মানি, এবং সে বিষয়ে আমার কোন বিবাদ বা প্রতিবাদ নাই। অতএব, এইরূপ লেখককে বাদ দেওয়ার জন্য তাঁহারাও যেন আমার সহিত বিবাদ না করেন। সর্ব্বশেষে, একটি কথা আমি বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখি, আমি ভবিষ্যৎ প্রত্নতাত্ত্বিকের জন্য, এ যুগের কথাসাহিত্যিকদের একটি সুসম্পূর্ণ নাম-তালিকা সংগ্রহ করিতেছি না; সে কাজ আমার নয়, সাহিত্যের সেইরূপ ইতিহাস লইয়া যাহারা মাতামাতি করে, তাহারা সাহিত্যের মজুরবৃত্তিকে—তাহা যে কারণে যতই প্রয়োজনীয় হোক—সাহিত্য-বিচারের সমকক্ষ বলিয়া দাবি করে, এবং পাণ হইতে চুণ খসিলেই, ভদ্রলোকের পাড়াকেও ধোপা-পাড়া করিয়া তোলে।

[কার্ত্তিক, ১৩৪৯]

